শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধুত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

উদ্ভ্রান্ত ভারত
বর্ষ - ২৫
সংখ্যা - ১-৪, ৬
বর্ষ - ২৬
সংখ্যা - ১, ৬-৫
বর্ষ - ২৭
সংখ্যা - ১-৪
বর্ষ - ২৮
সংখ্যা - ১
১৩৭৮ - ১৩৮১

'আমি বিশ্বনাগরিক

"এই বিশ্বই আমার মহামঠ"

ঘ-ফাল্গুন ১৩৭৮, ১২

পঞ্চবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

॥ ২৪ পরগণা জেলার অধিবাসীদের বিশেষ দায়িত্ব ॥

* আপনার এলাকায় শান্তি বজায় রাখুন।
* বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী—জাতি গোষ্ঠী ও বিভিন্ন ভাষাভাষী নাগরিকদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখুন।
* ভুলবেন না—সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।
* বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকারকে সব বিষয়ে সহযোগিতা করুন।

॥ ২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত ॥

॥ সুলেখা মানেই উৎকর্ষ • উৎকর্ষ মানেই সুলেখা ॥

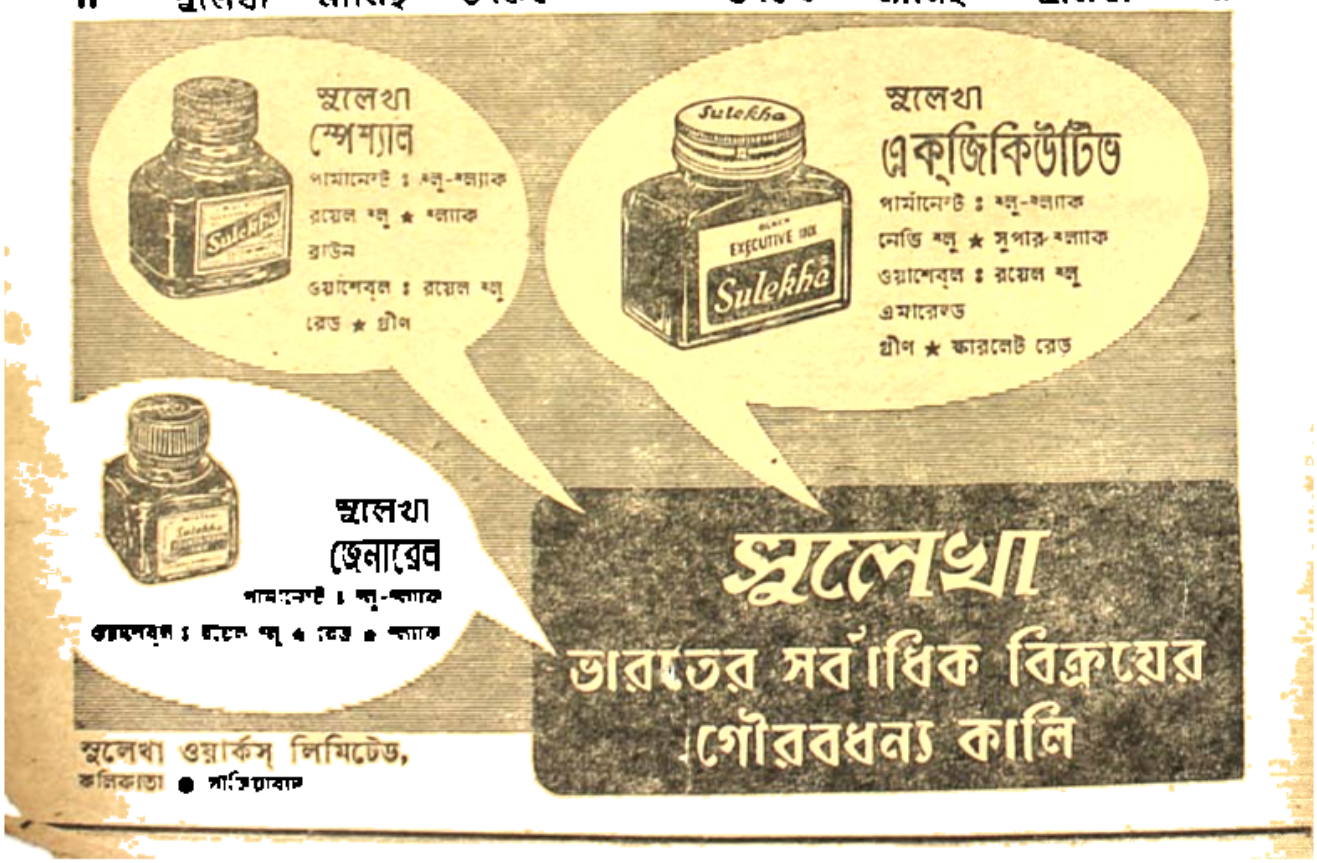

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

উদ্বুদ্ধভারত

মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭২

পঞ্চবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

যোগাচার্য, সর্বমন্ময় মূর্তি, বিশ্বনাগরিক, নরনারায়ণ আশ্রম-দেবতা প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রীমিতাগোপাল-দেবের প্রদর্শিত পথের পথিক শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অদ্ভুত উজ্জ্বল দিব্য তথা উজ্জ্বল ভারত গড়ার স্বপ্ন নিয়ে সেই স্বপ্নের দার্শনিক ও সাহিত্যিক রূপ দিবার প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই 'উজ্জীবন্ত' পত্রিকা। এর প্রথম পর্যায় তিনি বের করেছিলেন ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের রাধাষ্টমী দিনে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে। দুই বৎসর চলার পর শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বৃন্দাবন চলে যাওয়ায় সে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় 'উজ্জীবন ভারতে'র কথা লোকে বুঝতে পারেন না এবং তার উত্তরে পুরুষোত্তমানন্দ যা লিখেছিলেন তা থেকে আজকের দিনের 'উজ্জীবন-ভারতে'র কথাও আমরা জানতে পারব। তিনি লিখছেন,...'আমার কোন সুহৃৎ ঠিকই বলেছেন—অসহযোগের কথা বলতে বলতে হঠাৎ দাক্ষায়ণীর কথা, রাধার কথা এসে পড়লেই বুঝি যেন কেমন ওলট পালট হয়ে যায়, তখন আর সূত্র ঠিক রাখতে পারি না। বুঝি আর না বুঝি, তবুও যেন 'দাক্ষায়ণী বুঝেছি' বলে একটা যে কোন রকমের সংস্কার আমাদের আছে; সংসারের বাইরের খোলসটাকে কোন রকমে আমাদের মনের মত করেই বেশ আরামে আছি যে সংসার-তত্ত্ব বোঝা হয়েছে। সব জিনিষই যে তাসা তাসা দেখতে শিখেছি, এ বোধ আমাদের নেই। দাক্ষায়ণীও বুঝিনি, সংসারের সমাজ-নীতি রাজনীতি প্রভৃতিও বুঝিনে। সংসারকে বেদান্ত-ভাগবত থেকে আলাদা করে দেখেছি, বেদান্ত ভাগবতকে মুটেছাড়া ক'রে তাকে বনবাস দিয়েছি; এই বনবাসী বেদান্ত ভাগবতকে ও তার অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী উমাপতিকে পুনঃস্থাপনার নামে পরিপূর্ণ 'আমি'-র মূর্তিতে ফিরিয়ে আনবার জন্যই 'উজ্জীবন ভারতে'-র সাধনা; যা মনের দুয়ারে দিয়েছিল বনে, তাকে মনের অন্তরালে পুরে রাখবার জন্যই 'উজ্জীবন ভারতে'র প্রয়াস। এর মূল সূত্র 'মনে বনে এক করি আমি'। এই সংসারের চক্রব্যূহে যারা অভিমন্যুর মত প্রবেশ করতেই জানেন, বের হবার কৌশল যাদের শেখবার সৌভাগ্য হয় নি, নিশ্চয় মৃত্যুর হাত থেকে তাদের উদ্ধার করবে কে?

আজ যে সোজাসুজি ও সোজাসুজির অসুবিধা হচ্ছে তারও একমাত্র কারণ গৃহের মাঝে ঐ আপনা আপনির বসবাস। বেদান্ত-ভাগবত মনোধর্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করবে, রাজনীতি সমাজ-নীতি হবে তারই অনুবর্তিনী; এদের বিরোধে আমরা আজ সংকটের আবর্তে এসে দাঁড়িয়েছি। এই যুগল মিলনের পথে দুইএর সাধনা গ্রহণ করবার লোক জেগেছে আজ এই 'উজ্জীবন ভারতে'র। যে মন দিয়ে আমরা সংসার করি ও যে মন দিয়ে ধর্ম করি, সেই দুই আলাদা মনকে এতদিন আলাদা রেখেই সংসারে চলতে অভ্যাস করেছি। ঠাকুর ঘরে ও রাজনীতিক্ষেত্রে যে আমরা একই মানুষ—এ তত্ত্ব ত কেউ তেমন করে আমাদের সামনে ধরে নি। হয় আমরা সংসারের বাঁধা পথে, নয় ধর্মের বাঁধা পথে, নয় ত কখনও বা সংসারে, কখনও বা ধর্মে বিচরণ করছি। ঘরে বাইরে দুইজন হ'য়েই আমরা যে ব্যবসায়-বুদ্ধিশূন্য, প্রতি পদে তার পরিচয় দিচ্ছি। ঘর যদি ঠিক থাকত, বাইর ঠিক হত; আবার বাইর যদি ঠিক থাকত

যদও ঠিক হত। কোন একটার উপর বেশী জোর বা কোন একটা আগে ধরে নিলেই বিপদ। যেখানে দাঁড়িয়ে ধন ও বাইর দুইয়ের সংস্কার একই সাধনায় সম্ভব হবে, সেই ক্ষেত্রের সহিত পরিচিত হওয়াই 'উজ্জীবন-ভারতে'-র সাধনা। সংসার করতে হলে লক্ষ্মীর কৃপা চাই, অথচ ঠাকুর ঘরে বসে সেই লক্ষ্মীর সৌভগ্য মূর্তি কত ভক্তি বিনিয়ে বিনিয়েই না অঙ্কিত করছি! বিষ্ণুর স্তর থেকে দেখলে লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠতার জননী, সেই বিষ্ণুর ক্ষেত্রের সহিত পরিচয় না হলে বিষ্ণুতেই সংসার-আশ্রমে লক্ষ্মী ফিরে আসবে না। বিষ্ণু না থাকলে সংসার করতেও যে গোল লাগবে। বিষ্ণু যে আমার practical necessity ধর্মও ত নাই। ধর্ম থাকলে পুলিশের ভয়, উপন্যাসের ভয় আমাদিগকে এত তাড়া করতে পারত না। যে মন দিয়ে সংসার করি, ও যে মন নিয়ে ধর্ম-সাধনা করি সেই দুই ফাঁকা মনের পিছনে যে বাস্তব ভারতীয় একটী উজ্জীবন মন রয়েছে, সেইখানে বিশ্রাম লাভ করেই ভারত বাঁচাই হবে।..."

—এই ছিল সেদিনের উজ্জীবনভারতের কথা—আজকের উজ্জীবনভারতের কথাও তাই। আজকের অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের উজ্জীবনভারত যেন বহেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আজ থেকে চল্লিশ বৎসর আগে। উনিশ বৎসর পর্যন্ত পত্রিকাটী মাসিক চলার পর লোকাভাব ও অর্থাভাবের জন্য দ্বিমাসিক করা হয়। আর নানা অসুবিধার মধ্যেও পত্রিকাটী শ্রীশ্রীবিভাগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের অনুপ্রেরণাতেই এবং গ্রাহক অনুগ্রাহকদের সাহায্য ও সহযোগিতা যতটুকু কুড়িয়ে নিতে পেরেছে তাই দিয়ে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের এই মাঘ মাসে পঁচিশ বৎসরের যাত্রা আরম্ভ করল। এই যাত্রারম্ভ ক্ষণে পত্রিকার প্রাণ-পুরুষ শ্রীশ্রীবিভাগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে জানাই ভূয়ো ভূয়ো প্রণাম, আর শ্রদ্ধা ও প্রীতি-নমস্কার জানাই তাঁদের যাঁরা এই পত্রিকাকে ভালবেসে আজও তাকে ছাড়েন নি আর সেই জন্য তার চলার পথকে সুগম করে দিয়েছেন। নূতন দিনে সকলের অধিকতর সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি—অধিকতর আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা ভিক্ষা চাই।

আজ নূতন বৎসরে আর একজন মানুষের কথা মনে পড়ায় দেরনা বোধ করছি। যিনি উজ্জীবনভারত তথা নরনারায়ণ আশ্রমকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে আপনার করে নিয়েছিলেন, পরলোকগত সেই আমাদের 'সমপ্রাণ সখামত' পার্থসারথি বিশ্বাসের অনুপস্থিতি আমাদের কেবল বেদনাই দিচ্ছে না—আমাদের কাজেরও অসুবিধা ঘটাচ্ছে। পত্রিকার এই নূতন যাত্রাপথে তাঁকে আমাদের আনন্দ-সম্ভাষণ জানাই, তাঁর বিদেহী আত্মা আমাদের এগিয়ে চলবার পথে প্রেরণা যোগাবে।

'উজ্জীবনভারতে'-র কথা আজকের নূতন দিনে আবার একবার অনুচিন্তাধারা শুদ্ধিনার করি—

মানুষের বাস্তব জীবন ও আদর্শ জীবনের একটা সামঞ্জস্যক সর্বাঙ্গীণ সুস্থতার রূপের খোঁজ করেছে এই পত্রিকায়। একটা নূতন জীবন-চেতনালোকে, বুদ্ধির ঘুণ-ধরা সমাজের পরিবর্তে একটা নূতন প্রাণের সমাজ তৈরী করবার দার্শনিক ভিত্তিকে রেখে গেছেন পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর এই উজ্জীবনভারতে। রবীন্দ্রনাথের মতই উজ্জীবন-ভারতেরও কথা—

'এত কথা আছে, এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর'।

জীবনের সকল জটিলতা কুটিলতার ভেতরে কেমন করে ঐ প্রাণকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে জটিলতম পরিস্থিতিতে কি করে প্রাণের স্তর থেকে সমাধান আনা যায় ও বাস্তবের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে স্থিতিলাভ করা যায় তারই পথের খোঁজ দিয়েছে উজ্জীবন ভারত। কোন একটা শক্ত একপেশে মতবাদের মধ্যে জীবনকে আটকে না ফেলে কেমন করে বিভিন্ন মতবাদ জীবনে পরিপাক করে জীবনকে আরও ব্যাপক, আরও গভীর করা যায় তার খোঁজ পাওয়া যাবে এই পত্রিকায়। সর্ব সৃষ্টিতত্ত্ব সমন্বিত, প্রজ্ঞাপ্রাণ সমন্বিত, স্থিতিগতি সমন্বিত এই সুস্থ জীবনের

ভাষা ও চলার পথের কথা আজও উজ্জয়ভারত বলে চলবে, নূতন সমুদ্র-তীরে প্রাণের তরী নিয়ে পাড়ি দেবে। এই নূতন সমাজ-রচনায় সকলের অবিচলিত সহযোগিতা কি সে পাবে না? মানুষ মানুষকে ভালবাসবে প্রাণের তাগিদে, মানুষ মানুষকে স্বীকৃতি দেবে, মর্যাদা দেবে, উচ্চ নীচতার দৃষ্টিতে দেখে নিজেকেই ছোট করবে না প্রাণের তাগিদে। অন্তরে মর্যাদা না দিলে, সমতার দৃষ্টির অভাব হলে আমার বিনয় হতে পারে, অথবা আমার সুবিধা না হতে পারে—নূতন যুগের সমাজ রচনা, মানুষে মানুষে সম্পর্ক এই calculating বুদ্ধি দিয়ে স্থিরীকৃত হবে না—স্থিরীকৃত হবে প্রাণের প্রত্যয়তা দিয়ে যা কালমন্থ সব কিছুকে চলন করে এগিয়ে যেতে পারে। ভারতবর্ষ দেখেছে একান্ত স্থিতিধর্মী চিন্তা-ধারার, যা জগৎ ও জীবনকে গৌণ করে নেপথ্যে রেখেছিল, তাকে সুস্থ রাখতে পারেনি, তারের ধাক্কায় পাশ্চাত্যের গতিধর্মী সভ্যতা—সবশেষে বস্তুনিষ্ঠতার ঐকান্তিকতার নগ্নতা—তাকে কবলিত করেছে। আজও সে পর্যন্ত করে নি কি যে অতীতের একান্ত স্থিতিধর্মী জীবন বা বর্তমানের স্থিতিহীন গতির ঐকান্তিকতা কোনটাই তাকে সুস্থতা দিতে পারবে না? অতীতের চিন্তাধারার ক্লীবত্বে বাস্তবের ক্ষেত্রে সে পরের জুতো বয়েছে, বর্তমানের গতিধর্ম তাকে ঘরছাড়া করে একটা বিশৃঙ্খল শূন্যতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যে ভারতবর্ষে স্থিতি গতি, প্রাণ প্রজ্ঞা একটা পরিমিত মাত্রায় মিলিত হয়ে মহাপ্রাণ বা মহান প্রাণের সৃষ্টি করে তুলবে—সেই ভারতবর্ষকে জন্ম দেওয়াই 'উজ্জয়ভারত' পত্রিকার সাধনা। এই ভারতবর্ষেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণের যোগেশ্বরত্ব আর অর্জুনের ধনুর্ধরত্বের যুগ্ম সাধনা সম্মিলিত হয়ে নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয় দান করবে। এই কৃষ্টিতে আর্য-অনার্য, হিন্দু মুসলমান, বুদ্ধ শঙ্কর, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সব কৃষ্টি সম্মিলিত হয়েই উজ্জয় ভারত, উজ্জয় বিশ্বের সৃষ্টি করে তুলবে। 'উজ্জয়ভারত' পত্রিকা এই কৃষ্টির সাধনাই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব-জীবনে ছড়িয়ে দেবার ব্রত নিয়ে আবার তার যাত্রা আরম্ভ করল।

'উজ্জয় ভারত' কোন্ প্রাণের কথা বলে? প্রজ্ঞাপ্রধান বর্ণাশ্রমীয় ভারতের বুকে যেদিন উচ্চ নীচ শ্রেণিতন্ত্রের শোষণে মানুষ জর্জরিত, সেদিন বহিরাগত ভীরধর্মী দল শ্রেণী-সংগ্রামের পথে শোষণের সমাধান দিতে এগিয়ে এল। সেখানে মানুষ গেল তলিয়ে। জাতি-বিভাগের ছন্দহীন চালে মুসলমান ধর্ম-যুদ্ধের নামে পাকিস্তান সৃষ্টি করে 'মানুষ' মুসলমান না হয়ে 'ধর্মীয়' মুসলমান করে সকল সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের সৃষ্টি হল, লক্ষ লক্ষ হিন্দু জন্মভূমি ত্যাগ করল—ছিন্নমূল হয়ে পড়ল। কিন্তু তাদের ভগ্ন শাসনে একান্ত কোনকিছুই যে দিয়ে অচল তা প্রমাণিত হয়ে গেল বর্তমান বাংলাদেশের মাটিতে। হিন্দু যার মানুষ হিন্দু না হয়ে জাতিতে হিন্দু হয়, তাহলে বর্তমান বিশ্বে সুস্থ হয়ে তার বাঁচবার পথ নেই। মুসলমানও যদি মানুষ মুসলমান না হয়ে জাতিতে মুসলমান হয়, তারও জীবন-পথ রুদ্ধ আজকের দিনে হতে হবে মানুষ—জাতি ধর্ম বর্ণ শিক্ষা সম্পদ যার যাই হোক না কেন। এই মানুষ হবে প্রাণবান—কেবল বুদ্ধিমান নয়; অর্থাৎ সেই বুদ্ধিমান নয় যা হৃদয়-স্পর্শরহিত, যা অপরকে অপমান করতে পারে, ছোট মনে করতে পারে—এই 'মানুষের' কাছে বর্ণ-কৌলীন্য ধন-কৌলীন্য, বিদ্যা-কৌলীন্য, বল-কৌলীন্যের অবসর কোথায়?

যাইহোক, নূতন জগতে নূতন সমাজে নূতন মানুষ তৈরীর কথা নিয়ে উজ্জয়ভারত চলেছে—তার চলার পথে মানুষের সহযোগিতা যেমন পেয়েছে, বাধাও পেয়েছে কম নয়; কাজের লোকের যেমন অভাব আছে, অর্থাভাবও প্রচুর; এক একবার মনে হয় আর বুঝি চলা গেল না—তবু আবারও এই পঁচিশতম বৎসরে যে রওনা হল তার সংকল্পে দৃঢ় থেকে। তার এই প্রাণ প্রজ্ঞা সমন্বিত, বাস্তব আদর্শ সমন্বিত জীবন-দর্শন যাদের ভাল লাগে তাদের সহযোগিতায় এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষদের আশীর্বাদে এই প্রদীপ জ্বলন থাকবে এই আশা নিয়েই সে রওনা হল। জয়—নূতন সমাজে নূতন মানুষের জয়—জয় নিত্যগোপালের জয়।

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

['লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা' নরনারায়ণ আশ্রম তথা 'উজ্জয়ন্তভারতে'র পতাকা। প্রতি বৎসর যাত্রারম্ভে ক্ষণে আমরা ইহাকে অভিবাদন জানাই। তাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেদিন সংকেতে ইহার যে অর্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা প্রতিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া উহা এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। সকলের সাথে মিলিত হইয়া একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান—গৈরিক যাহার চিহ্ন—আর একদিকে বাস্তব জগতের অভ্যুদয়—লাঙ্গল যাহার দ্যোতক—এই সমন্বয়ঘন তত্ত্ব-প্রকাশক এই পতাকাকে নূতন দিনের যাত্রাপথে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি। ভবিষ্যৎ ভারত তথা ভবিষ্যৎ বিশ্ব একই সঙ্গে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং 'আমি বিশ্বনাগরিক' এই দুই-ই আস্বাদন করিবে। —সঃ—উঃ ভাঃ]

বিশ্বসঙ্ঘ রচনার শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'কাল'-চক্র ও চক্রী 'পুরুষে'র সমন্বয় করিয়া দিয়া একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষপ্রধান ভারতীয় কৃষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাশ্চাত্ত্যের কালপ্রধান সভ্যতা চকমকি ঠুকিয়ে মন্বন্তররাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও একটি একান্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথা স্থানে ও মানে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া অন্তর ও বাহিরের স্বরূপলক্ষ্য হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোষ্ঠে মাঠে স্বরাজ-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রামরাজ্যমূর্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজেই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্যায়ত্ত রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়েই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষী-রাজর্ষি ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম্ হজম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপসখাবৃত। কৃষি-ক্ষেত্র-বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্'-ধাতু হইতে 'কৃষ্টি' 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত হইবে হলধরেরই দেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা 'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'।

উজ্জয়ন্তভারতের প্রজ্ঞাপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা অনন্ত মস্তকে তাহাকে অভিবাদন জানাইতেছি।

সমন্বয়ের অগ্রদূত শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

[উদ্বোধনের বিগত সংখ্যা (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৮) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশ করিবার জরুরী প্রয়োজন থাকায় বর্তমান প্রবন্ধটী প্রেস হইতে ফেরত আনিতে হইয়াছিল। এজন্য লেখকের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া বেদনা জ্ঞাপন করিতেছি —সম্পাদিকা উদ্বোধন]

শ্রীমদ্ভাগবত ঘোষণা করেছেন—"অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" যুগে যুগে ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন বহু অবতার— শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, তথাগত বুদ্ধ। ভগবানরূপে মানবের হৃদয় দেউলে আজো এঁরা নিত্য পূজিত সন্ন্যাসী তাপী যুগাচার্যের সংখ্যাও কম নয়। কলিযুগের শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, ভগবান নিতাগোপাল, পুরুষোত্তমানন্দ প্রমুখ সাধক আচার্যগণের আবির্ভাবে ধরিত্রী ধন্য হয়েছে। শেষোক্ত আচার্যের জীবনবেদ আলোচনা আমার বিষয়বস্তু। " কিন্তু যিনি সন্ন্যাসী, সাধক, স্বদেশপ্রেমিক, সমাজ-জগতে যুগান্তকারী বিপ্লবী, সুধী সংসারী, অসাধারণ বাগ্মী তাঁর ভাগবত জীবন-কথা কি আমার লেখনী প্রকাশ করতে পারবে? কবি কুলোত্তম কালিদাসের অমূল্য শ্লোকটি তাই স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে—

ক সূর্যপ্রভবো বংশ ক চাল্প বিষয়া মতি
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুডুপেনাস্মি সাগরম্ ।

ভাবভাষা শব্দ সম্পদে আমি অতীব দরিদ্র। তবু মহৎ চরিত্র আলোচনা কল্যাণকর এই বোধে সেই মহাপুরুষের পাদপদ্মে প্রণতি জানিয়ে দুরূহ কর্মে ব্রতী হ'লাম।

ত্রিদিব তেয়াগি আসে কিনা আসে
নরের আলয়ে নারীর কোলে,
আজিও দেবতা নর জন্ম লয় ধরণীর গ্লানি গ্লানি করি ক্ষয়

আলোকের দিকে টানিয়া তোলে ॥

—কামিনী রায়

নরের আলয়ে নীলকমলের দেহে, নারীর কোলে মুক্ত-কেশীর অঙ্কে শরৎকুমার শরতের স্নিগ্ধ শশীর ন্যায় সমুদিত হয়েছিলেন আলোকের অমৃতের পথ-নির্দেশকরূপে। গৃহী হয়েও তিনি ছিলেন অগ্নিহোত্রী। আবরণ অন্যায়, অসত্য ও শোষণের বিরুদ্ধে তাই তাঁকে দেখি সংগ্রামী সৈনিকের মত। বৈশোরে পিতার নিষ্ঠা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃত শরৎকুমারের চিত্ত-ক্ষেত্রে যে বীজ উপ্ত হয়েছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনে তা মহামহীরুহে প্রতিভাত হয়।

স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের অন্তর-দেবতা ছিলেন যুগাবতার শ্রীনিতাগোপাল। কিন্তু মাতৃমুক্তি সাধনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন গান্ধীজীর আদর্শে। পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন ক'রতে তিনি খেলা দিলেন বৈশাখের রূপে। স্বরাজলাভ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য তিনি স্থানে স্থানে যুক্ত ভাষায় ভাষণ দিতে লাগলেন। জনমনকে উজ্জীবিত করার সে কী অনলস পরিশ্রম! দুর্মদ বৃটিশ ত্রিপুরকে বিতাড়িত ক'রতে সে যেন শিবের রুদ্রমূর্তি! তাঁর মত বাগ্মী সভাই সেদিন বাংলা দেশে বিরল ছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিই—কংগ্রেস তখন দ্বিধা বিভক্ত। একপক্ষ অসহযোগে বিশ্বাসী, অপর পক্ষে মতভেদ। এই অবস্থায় বরিশালে জেলা কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক অধিবেশনে দেশবন্ধু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হ'লেন। চিত্তরঞ্জন মহাশয় শরৎবাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, "শরৎবাবু, শুনেছি আপনার বক্তৃতায় নাকি সবাই ভেসে যায়, আমিও আজ আপনার বক্তৃতা শুনে ভেসে যেতে

এসেছি"। স্বামীজী বললেন, "আপনিও ভেসে যাবেন"। বক্তৃতা আরম্ভ হ'ল। শরৎকুমার দেশবন্ধুর সমস্ত যুক্তি অনবধানের দৃষ্টিভঙ্গিতে খণ্ডন ক'রলেন। মঞ্চের সি. আর. দাস মহাশয় প্রশ্রয়ে শরৎবাবুকে বুকে জড়িয়ে ধ'রলেন। সেই বক্তৃতার কথা শুনে মৃত্যু শয্যায় শুয়ে স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত ব'লেছিলেন "শরৎ, আমি দেখে গেলাম বরিশালের গৌরব তুমি রক্ষা ক'রবে"। তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল সত্যই তিনি একদিন বরিশালের মানুষের মনের সিংহাসনে মুকুটহীন সম্রাট রূপে সমাসীন হয়েছিলেন।

তিনি যে শুধু স্বাধীনতার সংগ্রামী সৈনিক সেজে রণিক শোষণমুক্ত ভারত দেখতে চেয়েছিলেন তাই নয়, সর্ব্বপ্রকারমুক্ত শোষণহীন সমাজ গড়ার ছিল স্বপ্ন-সাধনা। বর্ণের রাঙ্গা জীবনের উপর আত্মার শোষণ তিনি মেনে নিতে পারেন নি।

স তত্রনো পরাভাত্মা নিঃসঙ্গ সমদর্শনঃ
দদর্শ লোকে বিততমাত্মানং লোকমাত্মনি ॥

শ্রীমদ্ভাগবত

তিনি তত্রাবধি শান্ত অনাসক্ত ও সমদর্শী ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে ও পরমাত্মার সর্ব্বলোককে দর্শন ক'রতেন।

ভুলিও না—মুচি মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই

স্বামীজী ছিলেন আদর্শ গৃহী। উপনিষদের ভাষায় গৃহমেধী। অবধূত সন্ন্যাসী হয়েও আপন পুত্র কন্যার দুঃখে যেমন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন তেমনি অপরের দুঃখ বেদনাতেও অভিভূত হয়েছেন। মানব-দরদী শরৎকুমারের অস্পৃশ্যের প্রতিও ছিল অসীম মমতা। বৃন্দাবনে প্রিয়নাথ মৈত্র মশায়ের গৃহে থাকাকালীন তিনি লক্ষ্য ক'রলেন মানবের প্রতি মানবের উৎপীড়ন। নিম্নশ্রেণীদের উপর উচ্চবর্ণের ভীষণ শোষণ এবং সেই সঙ্গে দারুণ ঘৃণা। তাদের প্রতি করুণায় বিগলিত হলেন গৃহী সন্ন্যাসী। পুণ্য ক্ষেত্র বৃন্দাবনকে শোষণমুক্ত করার উদ্দেশ্যে শোষণহীন পুরুষোত্তম-মতবাদ প্রচার করার জন্য হিন্দী শিখতে আরম্ভ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের পদরজ-মণ্ডিত ব্রজের ধূলিগুলিতে মেথর, ডোম, মুচি প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির জল নেওয়ার অধিকার ছিল না। পুরুষোত্তমানন্দ এই অন্যায় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করলেন। সরল হিন্দী ভাষায় ব্রজবাসীকে রাধা-কৃষ্ণ, গৌরতত্ত্ব অমিয় কণ্ঠে শুনাতে লাগলেন। সেই সুধা কথা শ্রবণে বৈষ্ণবগণের পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে উঠল। বর্ণের বেড়া ভেঙ্গে গেল। মুচি, মেথর সকল জাতিই কৃষ্ণের-জল গ্রহণের সেদ অধিকার। তাইতো কবীন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়—

"অহঙ্কার ভাগে শুদ্ধ নিত্যানন্দ সেই মহাভূমি
হলে পূর্ণ করে দিলে তুমি "

পতিতাদের পতিত পাবন

শ্রীশ্রীনিতাগোপালের কৃপাকণা লাভ করে শরৎকুমার তখন পুরুষোত্তমানন্দ। সমাজের হিতার্থে কলকাতায় স্থাপন করেছেন নরনারায়ণ আশ্রম। সেই সময় স্বামীজীর পরিচিত এক ব্যক্তির পরিণীতা কন্যা পতিগৃহ ত্যাগ করে পূর্ব্বপ্রেমাসক্ত যুবকের সঙ্গে কলকাতায় এসে হাজির। বহু অনুসন্ধানের পর আত্মীয়গণ মেয়েটির সন্ধান পায়। কিন্তু সমস্যা কে এখন তাকে রক্ষা ক'রবে—কোথায় পাবে সে আশ্রয়? সঙ্কটহারী শ্রীমধুসূদন রূপে পুরুষোত্তমানন্দ স্বীয় আশ্রমে দিলেন আশ্রয়। কয়েক মাস কাছে কাছে রেখে স্বামীজী মেয়েটিকে দিলেন নানা উপদেশ। কন্যাটির কলুষ বিক্ষুব্ধ চিত্ত যেন সোনার কাঠির স্পর্শে সোনা হ'য়ে উঠল। তখন তিনি তার পিতা ও শ্বশুরের সঙ্গে পত্রালাপ করে তাদের কাছে তাকে পাঠিয়ে দিলেন। এইরূপ শত শত বিপথগামী নর নারীকে আশ্রয় দিয়ে শুদ্ধ পবিত্র ক'রে ছিলেন নরনারায়ণের সেবক স্বামী শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ। এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যে কথা বলে ছিলেন তা অনুধাবনযোগ্য—

ক্বচিৎ গুণোঽপি দোষ স্যাৎ দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ
গুণদোষার্থ নিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধতে
সমানকর্ম্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকম্
উৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গ ন শয়াঃ পতত্যধঃ ॥

জীব রসের বাজিকারে যতই পতিত হোক না কেন, পতিতের ঠাকুর রসরাজ রূপ গোপাদয় শ্রীকৃষ্ণ সকল

'পতিত' মানব জমিনকে আবাদ করে কর্ষণ করে সোনা ফলিয়েছিলেন।

পতিতাদেও এই পরম পুরুষের স্নেহ-বারি সম্পাতে সতত সঞ্চিত ছিল। বারবণিতারা যাতে পবিত্র ভাবে জীবন যাপন ক'রতে পারে তার জন্য স্বামীজির কী প্রাণপাত পরিশ্রম! যত কঠিন কাজই হোক না কেন তিনি পশ্চাদ্‌পদ হ'তেন না। তিনি ব'লতেন—"শ্রীনিতা গোপাল সঙ্গে থাকতেন ব'লে কোন ভয় আমার ছিল না—সকল ক্ষেত্রেই ঝাঁপিয়ে পড়েছি। তিনি রক্ষা করেছেন।" শ্রীগুরু বলে তাই তিনি বারবণিতাদের পল্লীতে যাতায়াত ক'রতেন। তাদের ভাগবত কথা শুনাতেন, সুতো কাটিয়ে খদ্দর পরিয়ে তাদেরকেও স্বাধীনতা সংগ্রামে পরোক্ষভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। কবিগুরুর ভাষায় বলা যায়—

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে সব হারাদের মাঝে।"

এক সময় বরিশালের কংগ্রেস কর্মীরা গান্ধীজীর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল শরৎবাবু বারবণিতাদের বাড়ী যাতায়াত করে। তা শুনে বাপুজী বলেছিলেন, "উহা শরৎ ঘোষেই সম্ভব, অন্য কেহ যেন সে পথের অনুসরণ না করে" শরৎ ঘোষ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর এমনি ছিল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। স্বামীজীর স্নেহ পতিতারা কোনদিন ভুলতে পারে নি। পতিতপাবন গৌরাঙ্গ জ্ঞানে তাই তারা তাঁরধ্যান করত। দুদিনের দৃশ্য তুলে ধরি—

১৩২৮ সনের ৮ই শ্রাবণ—রবিবার বৈকাল। অসহযোগ আন্দোলনে শরৎবাবু গ্রেপ্তার হ'লেন। জনমণ্ডলীর 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে যখন তিনি জেলের সম্মুখে পৌঁছলেন, তখন এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ সেই জনসায়রের পদতলে পড়ে তাঁর পথে যেতে বাধার কাতর মিনতি জানাল। সেই করুণ দৃশ্য দেখে পুলিস কর্মচারীগণ হতভম্ব হ'য়ে গেল। বরিশালের বারবণিতারা সেবে জেলের দরজায় লুটিয়ে পড়ে ব'লল "বাবাকে আমরা এবা জেলে যেতে দেব না—আমরাও জেলে যাব"। জেল দারোগা প্রমাদ গণলেন। জেলের দরজা খুলে জেলে নিতে পারলেন না। সন্ধ্যা যখন সমাগত তখন শরৎ কুমার সবাইকে বুঝিয়ে নিজেই জেলে প্রবেশ করলেন। ছয়মাস পরে যখন তিনি জেল থেকে ছাড়া পেলেন তখন আর এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। সহস্র সহস্র মানুষের বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। প্রায় পঞ্চাশজন বারবণিতা তাঁকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে কীর্ত্তন ক'রতে লাগল—"আমার নিতাই এল ঘরে আমার গৌর এল ঘরে"। এই ছয়মাস ধরে তারা যে সুতো সেটে ছিল তা দিয়ে তাঁকে কাপড় তৈরী করে দিয়েছিল।

বৈচিত্র্যময় স্বামীজীর জীবন। উপরিউক্ত ঘটনাবলী তাঁর ব্যক্তিত্বের বহিরঙ্গ মাত্র—তাঁর সত্য স্বরূপ আরও গভীরে নিহিত। শ্রীকৃষ্ণের সখা ও শিষ্য পার্থ, শ্রীচৈতন্যের সহচর নিত্যানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে নরেন্দ্রনাথ আর ভগবান শ্রীনিত্যগোপালের চরণে অর্পিতপ্রাণ শরৎকুমার। যেন তুষারমণ্ডিত হিমালয় আর ভাগীরথী বিগলিত করুণা। চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভায় পরমহংস দেবের বীর্য্যবান শিষ্য বিবেকানন্দের ভাষণ—

"Help and not fight', Assimilation and not destruction', Harmony and peace and not Dissension"—সংগ্রাম নয়, সহায়তা, ধ্বংস নয় স্বীকরণ, কলহ নয়, সমন্বয় ও শান্তি। ঠিক সেই সুরেই তুষার দ্বিতীয় বৈজয়ন্তী ধ্বজা উড্ডীন করলেন সমন্বয়-গুরু আমাদের পুরুষোত্তমানন্দ দেশে দেশান্তরে—বহিয়ে দিলেন প্রেমের অমৃত লহরী ভগবান নিত্যগোপালের আদেশে অনুপ্রাণিত করলেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে। তারা পেল আমাদের স্বামীজীর কাছে নতুন উজ্জীবনের মন্ত্র।

আজ সমাজে পচন ধরেছে। চলে দলে বাধছে দ্বন্দ্ব—জীবনে নাই নিরাপত্তা—মানুষ যেন সর্ব্বহারা। কিন্তু কে শুনাবে অভীমন্ত্র? কোথায় অভয় হস্ত? চিন্তাকুল যখন তখন প্রভু পুরুষোত্তমানন্দ! তোমার আশ্বাস বাণী প্রাণে জাগাচ্ছে মহতী শক্তি—"When I shall be no more, my spirit will remain with you.—

একদিন আমি তো থাকব না তখন আমার জীবন থাকবে তোমাদিগকে ঘিরে"। তাই বলো সমবয়স্কগণ, দুরু দুরু বক্ষে তোমার আকুল চরণে প্রার্থনা জানাই—

তব কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি
ঢেলে দিয়ে আনে শক্তি
সর্ব্ব প্রাণ কর সঞ্জীবিত;
হোক সর্ব্ব সংঘর্ষ
ধরাধূলি ভস্মসম
স্বপ্ন সাধ সবই কল্পান্বিত।

॥ শতবার্ষিকীর আলোকে অতুলপ্রসাদ ॥

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী।

বাঙালীর ঐতিহ্য সংস্কৃতির ইতিহাসে গীতিকাব্য একটা বড় জায়গা দখল করে আছে। তার সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে যাকে শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে গণ্য করা হয় সেটা হল গীতিকবিতা। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের কাব্য, তার পরের মঙ্গলকাব্য এবং তার পরে বিহারীলাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত বাংলাকাব্যের যা কিছু উল্লেখযোগ্য তা এই গীতিকাব্য। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা গীতিকাব্য যেমন নতুন রূপ ধরেছে তেমনি তাঁর অনুগামীদের প্রচেষ্টায় তা সার্থকতার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র সমসাময়িক গীতিকবিদের মধ্যে যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের নাম সবার আগেই মনে জাগে তেমনি রবীন্দ্র অনুসারী গীতিকবি বললে যাঁদের নাম আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তাঁদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ অগ্রগণ্য। অতুলপ্রসাদের গীতিকবিতা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বৈচিত্র্যপূর্ণ না হলেও তার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যা অনন্যসাধারণ। তাঁর কালে যাঁরা গীতিকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন তাঁরা সকলেই গীতিকাব্যকে সৃষ্টির অন্য রূপের সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের প্রয়োজনে গীতিকাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ একমাত্র ব্রতী যিনি গানকে অন্য নিরপেক্ষ সাহিত্যসৃষ্টির বাহনরূপে গ্রহণ করেছেন। অতুলপ্রসাদের গানই তাঁর সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন বা উপজীব্য।

এই প্রসঙ্গে তাঁর গান সম্পর্কে কিছু বলার আগে কবিজীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করলে আশা করি বিষয়টি সমীচীন হবে।

অতুলপ্রসাদের জন্ম হয় ১৮৭১ সালের ২০শে অক্টোবর ঢাকা শহরে। তাঁর বাবা ডাঃ রামপ্রসাদ সেন ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। তাঁর মাতা হেমঙ্গিনী ছিলেন একজন ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা। মাত্র তের বছর বয়সে বাবার আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে অতুলপ্রসাদ মাতামহ মহর্ষি কালীনারায়ণ গুপ্তের তত্ত্বাবধানে লালিত বর্দ্ধিত হন। বাল্যকালে অতুলপ্রসাদের কাব্যানুরাগ অপেক্ষা ছবি আঁকা, গান গাওয়া, বেহালা, এস্রাজ, তবলা ইত্যাদি বাজান যেন আকর্ষণীয় মনে হত। তাঁর এক মামার অভিনয়ও তাঁর মধ্যে অভিনয় করার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলত। অতুলপ্রসাদের মাতামহ ছিলেন স্বভাবকবি ছিলেন। তিনি কবিতা লিখে এবং গান রচনা করে পরিবারের সকল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে পড়ে শোনাতেন এবং গান গাইতেন। অতুলপ্রসাদের বাবাও ছিলেন একজন সঙ্গীত রচয়িতা ও স্বভাবগায়ক। প্রত্যহ প্রাতে তিনি ঘুম থেকে উঠে স্তবগান করতেন:

"অয়ি সুখময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল
বালার্ক সিন্দুর বিন্দু কে তোমার ভালে দিল?"

ইত্যাদি।

কিশোর বয়সে অতুলপ্রসাদ ঘরোয়া নিত্য স্তবগান এবং তাঁর রচিত অন্তত তেরটি গান শুনেছিলেন। পরে মাতামহর নিকট সান্নিধ্যে গান শুনে নিজের মধ্যে একটি স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করেন। মাতামহ এরপরে তাঁকে স্বরচিত 'ভাবসঙ্গীত' এখটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলেন, অতুল তোমাকে এমন গান লিখতে হবে। মাতামহর এই নির্দেশ শিরোধার্য করেও অতুলপ্রসাদ অনেকদিন গান রচনায় তেমনভ প্রচেষ্টাই করেননি। তাঁর সহপাঠীরা মাঝে মাঝে এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করেছেন কিন্তু অতুলপ্রসাদ তবুও কোন প্রেরণা অনুভব করেননি। পাখীর গান, ফুলের সুবাস, প্রকৃতির আনন্দময়ী মূর্তির দিকে তাকিয়েও তাঁর কাব্যপ্রেরণা জাগেনি। তারপর হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল। তাঁর স্নেহের ভাগ্নেকে সেন ভাগনীর (টুলা সেন) অন্নপ্রাশন উপলক্ষে একটা কবিতা লিখে উপহার দেওয়ার কথা বললেন তাঁরই জ্যেষ্ঠা কন্যা সত্যপ্রসাদ (তিনি তখন অতুলপ্রসাদের মাতুলালয়ে অবস্থান করছেন)। আর অতুলপ্রসাদ এমনিতে বসে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ ভেবে, বাইরের প্রকৃতির দিকে চোখ রেখে কবিতার আকারে লিখে ফেললেন :

"তোমারি উদ্যানে তোমারি ভবনে
উঠিল কুসুম ফুটিয়া
এ নবকলিকা হউক সুরভি
তোমারি সৌরভ লুটিয়া।"

অতুলপ্রসাদের জীবনে এটি যেমন একটি পরম শুভক্ষণ, বাংলা কাব্য সাহিত্যের তথা গীতিকাব্যের ইতিহাসেও এটি চরম মুহূর্ত। প্রত্যেক কবির কাব্যসৃষ্টির কি অবস্থায় হয়েছিল তা জানা না থাকলে কবি-জীবনের পরিচয়ে অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। সেই কারণে অতুলপ্রসাদের প্রথম কাব্য-সৃষ্টির ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর অতুলপ্রসাদ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় আসেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় চিত্তরঞ্জনও ছিলেন ঐ কলেজের বি. এ ক্লাসের ছাত্র। বি-এ পাশ করার পরই চিত্তরঞ্জন দাশ বিলেত চলে গেলেন। কিন্তু এক এ ক্লাসের ছাত্র অতুলপ্রসাদও বিলেত যাবার বাসনায় অস্থির হয়ে উঠলেন। অনেক চেষ্টার পর এক বিদেশী অধ্যাপকের সহযোগিতা লাভ করে অতুলপ্রসাদ ১৮৯০ সালে বিলাত যাত্রা করলেন। চার বছর পরে ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরলেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিশ সুরু করলেন। এই সময় কলকাতার অভিজাত সমাজের সঙ্গে—ঠাকুর পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও এই সময় তাঁর সাক্ষাৎ যোগাযোগ স্থাপিত হল। কলকাতার সঙ্গীতসমাজের সঙ্গেও অতুলপ্রসাদ ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি যেমন তাঁর গান শোনান, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও গান শুনে নিজের অন্তরের সুর-পিপাসা নিবারণ করেন। কিন্তু কলকাতায় তাঁর ব্যারিষ্টারীর পসার না হওয়ায় তিনি লখনৌয়ে চলে যান। সেখানেও সেই একই ব্যর্থতার পুনরুক্তি ঘটে এবং কলকাতায় ফিরে এসে অনিশ্চয়তার মধ্যে কিছুদিন কাটালেন। এই সময় তাঁর জীবনের পরিবর্তনের চরম মুহূর্ত এল। তিনি তাঁর মাতুল কন্যার (হেমন্তবালা) সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হলেন। বিবাহ অন্তে হল কাশীর হাইকোর্টে। তারপর তিনি লক্ষ্ণৌতে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করলেন। কিন্তু পিতার ইচ্ছা ছিল যেমন জীবন সর্বাংশে সার্থক ও রূপময় হয় না তেমনি তাঁর জীবন-সঙ্গিনীরূপে যাঁকে কবি গ্রহণ করলেন তিনি তাঁকে সুখী করতে পারলেন না। ফলে তাঁর সমস্ত জীবন যেমনার ব্যথায় বিষাদ হয়ে গেল। বিলাতে তাঁর অর্থসঙ্কট যেমনি ছিল। তাঁর ষষ্ঠ পুত্রের মধ্যে একটি বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করল। তারপর সন্তান-বিয়োগের আঘাত বহন করে অতুলপ্রসাদ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। তারপরে ফিরে নবীন সহর লক্ষ্ণৌয়ে নতুনভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করলেন। এখানে আইন ব্যবসায়ে তাঁর প্রতিষ্ঠা হল, অর্থসঙ্কট দূর হয়ে স্বচ্ছলতা এল, জনসাধারণের মধ্যে তিনি অধিনায়কত্ব অর্জন করলেন, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান তাঁকে কেন্দ্র করে সমৃদ্ধ লাভ করল—তবু তাঁর দাম্পত্যজীবনে সুখ বা শান্তির লেশমাত্র থাকল না। একদিকে সাফল্যের প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক প্রাচুর্য—অন্যদিকে গৃহজীবনের বিষাদবিরস শূন্যতা—এই বৈপরীত্যের মধ্যে তাঁর ব্যক্তি-জীবন ও কর্মজীবন আঘাত সংঘাতের মধ্যে অগ্রসর হতে লাগল। এই মানসিক দ্বন্দ্ব থেকেই কবি অতিরিক্ত মনস্বী হয়ে উঠলেন। তাঁর মনোবীণার সহীতের সুর

কণ্ঠস্থ হয়ে উঠল। হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের পীঠস্থান লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থান করায় সেখানকার উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের রাগ রাগিণী তাঁর গানে প্রবেশ করল। তিনি বাউলের নিজস্ব সুর কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে লালিত বর্দ্ধিত হয়েছিলেন তিনি এখানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সম্পদকে আহরণ করে বাংলা গানে অনুপ্রবিষ্ট করলেন। বাংলা গানে উত্তরভারতীয় ঠুংরি, গজল, কাজরী, দাউনী তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। এরপর তিনি পিতা ও মাতামহর হোলির গান শুনে সেই ধারায় গীতরচনার কথা চিন্তা করছিলেন, সেই অনুপ্রেরণায় উত্তরভারতীয় ভজন গানের অন্তর্নিহিত বসন্ত সন্ধ্যা, হোলি, ফাগুয়া, ঝুমরি, ঝুলা ইত্যাদি নিপুণভাবে অনুসৃত করেছেন।

অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, তথাপি রবীন্দ্রনাথকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করা তাঁর রীতি-বিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকালে যেমন পিতা-মাতামহকে তিনি সঙ্গীত-শিক্ষার গুরু হিসেবে লাভ করেছিলেন তেমনি রবীন্দ্রনাথের নিকট তিনি অনেক গান শিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মন সংস্কারমুক্ত থাকায় তিনি সঙ্গীতের যা কিছু নিঃশ্রেয়স তাকেই গ্রহণ করেছিলেন তুলসীদাস ও কবিরের দোঁহা, মীরাবাঈয়ের ভজন তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। তাঁর গানে ঠুংরীর চালের আধিক্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন : "আমার ছেলেবেলায় শোনা আগ্রা-নিবাসী কবি গোবিন্দ রায়ের সুরগুলি প্রভাবিত করেছে। গোবিন্দ রায়ের গান 'ভবভাল পরে আজি ভারত রে' ইত্যাদি শুনে আমি ঠুংরীর ভক্ত হয়ে উঠি, তারপর লক্ষ্ণৌয়ে এসে আরও ঠুংরী শোনবার সুযোগ হ'ল। তবে আমার ভালো লাগত ছেলেবেলা থেকেই বাউল, ভাটিয়ালী কীর্তন।"

ব্যক্তিগত জীবনে অতুলপ্রসাদ ছিলেন সদালাপী, পরহিতব্রতী এবং দানশীল। একসময় তাঁর বদান্যতার কোনও সীমা ছিল না। যে কোনও ধর্মাবলম্বী হোক সবলের প্রয়োজনেই তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। তিনি একজন রুচিবান পুরুষ ছিলেন। শুভ্র গোলাপের প্রতি ছিল তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ। নিজের গৃহ সংলগ্ন সুরম্য উদ্যানে তিনি এই ফুলের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য তিনি আপাতিরিক্ত উৎসাহ প্রদর্শন করতেন। তাঁর চেষ্টায় 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' গড়ে ওঠে, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রবাসী লেখকদের মুখপত্র 'উত্তরা' প্রকাশিত হয়। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সম্মানিত ছিলেন। সেখানকার সঙ্গীত শিক্ষায়তন যাঁদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ ছিল গোখেলের অনুগামী। অর্থাৎ স্বাধীন চিন্তা, নির্ভীক উক্তির আদর্শের অনুসরণ। অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন : 'অতুলপ্রসাদ ছিলেন সুসমন্বিত পুরুষ। অতএব ব্যারিস্টার, নেতা, সমাজসেবক, কর্মী, দাতা, কবি, সঙ্গীত-রচয়িতা একাধারে দুর্লভ।' বলা বাহুল্য এটি আদৌ অত্যুক্তি নয়।

অতুলপ্রসাদের গান আজ বাংলাদেশে বহুলপ্রচারিত ও জনপ্রিয়। কিন্তু কবির জীবদ্দশায় তাঁর গানের সঙ্গে অল্পসংখ্যক সঙ্গীতানুরাগী ছাড়া আর কেউই পরিচিত ছিল না। সেই কারণে কবিকে স্বয়ং তাঁর গানের প্রচারক হতে হয়েছিল। রবীন্দ্র কবিদের মত তিনি যেখানে গিয়েছেন কাব্যামোদী ও সুরানুরাগীর কাছে নিজের গান পরিবেশন করেছেন। অতুলপ্রসাদের —'উঠগো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি জগত জনপূজ্যা,' 'হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর,' 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা' অথবা 'বল বল বল সবে' —এই সকল গান আজ জানে না এমন মানুষ বাংলা দেশে খুব কমই আছেন। যাঁদের মধ্যে বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধের কিছু আছে তাঁরা কেউই এই সব গানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ না করে পারবেন না।

অতুলপ্রসাদ ছিলেন সুন্দরের উপাসক, মানব প্রেমের মূর্ত প্রকাশ ও মানব হিতৈষণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

'আজ আমার সুপ্রভাতে জাগিল সুন্দর', 'কে তুমি সুন্দর' অথবা 'সবারে বাসরে ভালো নইলে মনের কালো ঘুচবে নারে' প্রভৃতি গানগুলি রচনার মূলে তাঁর সৌন্দর্য-প্রীতি ও গভীর মানবতাবোধই ক্রিয়াশীল ছিল। বহির্জীবনের প্রেমের সুপ্রভাকে তিনি অন্তরের ভক্তি দিয়ে ভরিয়ে তুলেছেন। তাই তাঁর গান দুঃখের ব্যথা থেকে

উৎসারিত হয়েও হৃদয়ের অনুভূতিতে রঞ্জিত এবং তাঁর প্রেমসঙ্গীত দেহ-বাসনা মুক্ত হয়ে ভগবদ্‌ভক্তির শান্ত রসে মধুর। তিনি বিশ্বাস করতেন 'জীবনে ব্যক্তিটাই বড়। পথ চলা আর প্রাণ খুলে হাসা। জীবনে বিদ্বেষের প্রয়োজন নেই। বিদ্বেষ মন এবং অভিমান বৈষ আনে জীবনে। জীবনকে দুঃসহ করে তোলে'।

জীবনে এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই তিনি গানকে আশ্রয় করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'মিছে তুই কাঁদিস মন, তুই গান গেয়ে যা আজীবন।' সব কিছুই বিশ্ব-বিধাতার বিধানে মঙ্গলময়। তাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় প্রার্থনা—'কি আর চাহিব বলো, হে মোর প্রিয়, তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও' অথবা 'ক্ষমিয়ো হে বিধি, আর না কহিব—দুঃখ বিষাদে ব্যর্থ জীবন মম'।

অতুলপ্রসাদের গানে কথার সাবলীল ও সুরের সৌষ্ঠবে যেমন ঐশ্বর্য তেমনি মধুর। তাঁর বাউল সঙ্গীত —'কে তুমি ঘুম ভাঙ্গালে', 'আমারে এ আঁধারে', 'মনরে আমার তুই বেয়ে যা দাঁড়'—দেহাত্ম সঙ্গীত 'বঁধুয়া নিধ নাহি আঁখি পাতে,' শারদ সঙ্গীত—'শ্রাবণ কুসুমে বাদল হাতে তোরা আয় গো কে কুঁদবি আয়' বৈষ্ণবীসঙ্গীত—'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ,'

অথবা শুদ্ধরাগে রচিত 'তুমি মধুর আজে নাচো ছন্দের' অথবা লাউনি সঙ্গীত 'কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া' ইত্যাদির সঙ্গে আশাবরী রাগের 'ওগো নিঠুর দরদী কি বেদন অকারণ' অথবা দেশরাগের 'চাঁদনী রাতে কে গো আসিলে, উষল নয়নে কে গো হাসিলে' অথবা 'হেম হয়নার প্রেমতরী বায় কে ডাকে আমায় আয় গো আয়' অতুলপ্রসাদকে অতুলনীয় সঙ্গীত-স্রষ্টার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবনে তিনি মাত্র দুশ' পঞ্চাশটি গান রচনা করেছেন। তাঁর 'গীতিগুঞ্জ' নামক একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থে দুশ পাঁচটি স্থান পেয়েছে। বর্তমান বছর অতুলপ্রসাদের শতবর্ষ পূর্তির শুভবৎসর। এই উপলক্ষে যদি তাঁর মধুরতম প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনার একটি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হবে। জাতীয় কর্তব্যের এই ত্রুটি সংশোধনের সময় আসন্ন। বিলম্বে পাপের পসরা পরিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। শতবার্ষিকীতে সঙ্গীত জাতির অতুল-প্রসাদের স্বর্গত আত্মার আশীর্বাদে লাভ করার এটা একমাত্র উপায়।

দেশবন্ধুর সাহিত্য-সাধনা

॥ জনাব রেজাউল করীম ॥

'দেশবন্ধু' এই কথাটির সহিত এমন একজন মহান ব্যক্তির স্মৃতি জড়িত আছে যিনি এক যুগে ভারতের জাতীয় জীবনে একটি উচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দেশের স্বাধীনতার অন্যতম নেতা। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে দেশকে সত্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করতেন। মানুষ হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন একজন বিরাট মহান ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে ছিল বিবিধ প্রকার গুণের সমাবেশ। তাই দেশবাসী তাঁকে দেশবন্ধু আখ্যান দিয়ে তাঁর প্রতি তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল। কিন্তু এই সব গুণই তাঁর চরিত্রের ও বৈশিষ্ট্যের সব দিক নয়, তিনি ছিলেন একজন মরমী কবি, উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক, সমালোচক ও দরিদ্র সাহিত্যিকদের পরম হিতকামী বন্ধু ও পৃষ্ঠ-পোষক। তাঁর সাহিত্যিক দিকটা অন্যান্য দিক থেকে কোন অংশেই অল্প গরিমার বিষয় ছিল না। আজ এই প্রবন্ধে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর দানের কথা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী চিত্তরঞ্জনের কথা আজ

অনেকেই ভুলতে বসেছে। "দেশবন্ধু" বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মহিমার চাপে তাঁর অন্য দিকটা যেন কতকটা চাপা পড়েছে। হাইকোর্টে আইনের ব্যবসাবৃদ্ধি ও অন্যান্য নানাবিধ রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের মধ্যে সতত ব্যস্ত থেকেও তিনি কেমন ক'রে যে সাহিত্য-সেবার অবসর করে নিতেন আজ তা চিন্তা করে আমরা স্তম্ভিত হই। কিন্তু যাঁর মধ্যে সাহিত্য-রস আছে তিনি যে কাজে যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, ঐ রসে সাহিত্য-রস সর্ব্বদা সিক্ত না হয়ে যায় না। সবল প্রবাহ বাধের চাপ ঠেলে করে তা তার ভিতরের শক্তির প্রাবল্যে নিজস্ব উৎকর্ষপথে প্রবাহিত হবেই।

সে আজ অনেক দিনের কথা—তখন আমাদের এই বঙ্গদেশে প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল খুব কম। বাঙ্কিমের চিন্তাকের অভাব করলেন যে দেশ-বাসীর মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চা বৃদ্ধি করার জন্য আরও অধিক সংখ্যায় উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকার প্রয়োজন আছে। সে যুগে সাময়িক পত্রিকা-জগতে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির একচ্ছত্র আধিপত্য। তাঁর সম্পাদিত 'সাহিত্য' প্রবন্ধ ও সমা-লোচনার ক্ষেত্রে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেছিল। বিশেষ করে সমালোচনা সাহিত্যের এইটাই ছিল প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা। আজ এই পত্রিকার ইতিহাস বিস্তার বর্ষে বর্ষে কবিতা প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি থাকত। কিন্তু এর প্রধান আকর্ষণ ছিল সাহিত্য-সমালোচনা। সমাজ-পতি মহাশয় নিজে ছিলেন সুসাহিত্যিক। সেই সঙ্গে সাহিত্য-সমালোচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্মুখ। সমালোচনার সময় তিনি কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না। তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ-বাণে তিনি বহু যশস্বী লেখককে ধরাশায়ী করে দিতেন। তাঁর সমালোচনার তীব্র আঘাত সহ্য করতে হয় নি এমন লেখক ও কবি সে যুগে খুব কম ছিলেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত দিতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। বস্তুতঃ সমাজপতি মহাশয়ের "সাহিত্য"কে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ সাহিত্য-গোষ্ঠী রচিত হয়েছিল। বাঙ্গালী-জাতি তাঁদের নিকট অশেষ ঋণে আবদ্ধ। তাঁরা সাহিত্যের একটি ধারা প্রবাহিত করেছিলেন। কিন্তু এমন সর্ব্বজন বিদিত যে সাহিত্যিকগণ গোষ্ঠীবদ্ধ হলে তাতে কিছুটা ঘনীভাব প্রবেশ করে—একটি অভিজাততন্ত্র গড়ে উঠে। তাদের প্রভাবে বহু উদীয়মান লেখক ম্লান হয়ে পড়েন। তাছাড়া এই গোষ্ঠী-চেতনার ফলে গোষ্ঠীর বাইরের লেখক-গণ নিজেদেরকে কতকটা অসহায় মনে করতে লাগলেন। কোথায় গেলে, কার নিকট আশ্রয় নিলে তাঁরা সাহিত্যের দরবারে সম্মানে আশ্রয় লাভ করবেন, এই চিন্তা তাঁদের মনে উদিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সে যুগের বহু সাহিত্য-সেবীর মনের অবস্থা যখন এই রূপ ঠিক সেই সময় চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁদেরকে নিজের স্নেহ-ছায়াতলে আশ্রয় দান করলেন তাঁর সদ্য-প্রকাশিত "নারায়ণ" পত্রিকায়। চিত্তরঞ্জন নেতৃত্ব এঁদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় "নারায়ণ" হয়ে উঠলো একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-পত্রিকা।

দেশবন্ধু নিজে ছিলেন সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পী। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন কবি-শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহদাতা ও পরম হিতকারী বন্ধু। অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে যে দিন তিনি আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে একেবারে ফকীরের বেশে দেশকর্ম্মীরূপে দেশবাসীর নিকট উপস্থিত হলেন, সেই দিনই যে প্রথম ত্যাগব্রত গ্রহণ করলেন, তা নয়। তার বহু পূর্ব্ব থেকেই তিনি নানা উদ্দেশ্যে অকাতরে মুক্তহস্তে দান করতেন। তিনি যেমন দুহাতে রোজগার করতেন, তেমনি দুহাতেই খরচ করতেন। আর তাঁর দানের একটি মোটা অংশ বহু অভাবগ্রস্ত সাহিত্যিকদের হাতে পড়ত। কোন সাহিত্যিক তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে কখনও রিক্ত-হস্তে ফিরে যান নি। অল্প পরে কি কথা স্বয়ং সমাজপতি মহাশয়কেও তিনি অর্থ সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হন নি। কোন সাহিত্যিক তাঁর নিকট এসে আবেদন করলেন যে অর্থাভাবে তাঁর নিজের লেখা পুস্তক ছাপাতে পারছেন না। তৎক্ষণাৎ দেশবন্ধু তাঁকে পুস্তক মুদ্রণের সমুদয় খরচ দান করতেন। কোন ভাল পত্রিকা অর্থাভাবে বন্ধ হ'তে চলেছে, অমনি দেশবন্ধু অর্থ সাহায্য করে

সেই মৃতপ্রায় পত্রিকার পুনঃ মুদ্রণের ব্যবস্থা করতেন। এমন কি যাঁরা তাঁর নিজের রচনার উপর কঠোর সমালোচনা করতেন তাঁদেরকেও অকাতরে সাহায্য করতেন।

সাহিত্যিকদেরকে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করা সহজ কথা নয়। বহু অর্থশালী ব্যক্তি এ কাজ করতে পারেন না। উদাহরণ-স্বরূপ ডাঃ জনসন ও চেষ্টারফিল্ডের ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এক দিন সাহায্য লাভের আশায় দরিদ্র ডাঃ জনসন চেষ্টারফিল্ডের পাশের ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলেন কিন্তু লর্ড চেষ্টারফিল্ড তাঁর দিকে ভ্রূক্ষেপও করেননি। পরে যখন ডাঃ জনসনের বিখ্যাত "অভিধানটি" বহু কষ্টে প্রকাশিত হ'ল, তখন সেই চেষ্টারফিল্ডও তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। এবং তাঁর নিজের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলেন, কিন্তু বহু বিলম্ব হয়ে গেছে। ডাঃ জনসন তাঁকে সমুচিত উত্তরও দিয়েছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ কখনও কোন সাহিত্যিকের প্রতি ঐ ধরণের আচরণ বা দুর্ব্যবহার করেননি তিনি সকলকেই শ্রদ্ধা করতেন—তাঁরা যদি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতেন তবুও।

দেশবন্ধু নিজে ছিলেন স্বভাব কবি। বৈষ্ণব কবি-দের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য তাঁর কবিতার মধ্যে ছিল। তাঁর ছিল আন্তরিকতা। তাঁর বৈষ্ণবীয় কবি-মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি তাঁর বিবিধ কবিতায় ফুটে উঠেছে। তাঁর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না। তাঁর হৃদয়ের আকুতি ও কাতরতার মধ্যে কোনও প্রকার ভাকামি ছিল না, তাতে ছিল উল্লসিত হৃদয়ের সহজ আবেদন। তাঁর রচিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ বিদগ্ধ সমাজের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করেছিল। সাগর সঙ্গীত, মালঞ্চ, অন্তর্যামী তাঁর এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালী সাহিত্যের গৌরব স্বরূপ। ভাবের গাম্ভীর্য, বর্ণনার বিস্তার ও ভাষার আড়ম্বরহীন সরলতা তাঁর এই সব কবিতাকে একটা বিশিষ্টতা দান করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার আকুল অভিপ্রায় তাঁর বহু কবিতায় সুস্পষ্ট। তাঁর এই ভাবটা যেমি সাগর-সঙ্গীতের বহু কবিতায়। তাঁর অন্তর্যামী আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর। এ যুগে যখন কবিতার ভাষা ও বিষয়বস্তু সবই পরিবর্তিত হতে চলেছে, তখন চিত্তরঞ্জনের অপূর্ব কবিতাগুলি মনে দোলা দেয়, একটু মধুর সম্মোহন তার হৃদয়কে ভরে দেবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শুধু কবিই ছিলেন না—তিনি একজন বিচক্ষণ সমালোচকও ছিলেন। "নারায়ণের" সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। এ যুগে সাহিত্য-সমালোচনার বহু মান-দণ্ড নির্দ্ধারিত হয়েছে। তবুও নারায়ণের সমালোচনার মূল্য হ্রাস পায়নি বহু সভাসমিতিতে ও সাহিত্য-সভায় তখনও সভাপতি হিসাবে অথবা তখনও প্রধান বক্তা হিসাবে তিনি যে সব ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলি তাঁর সূক্ষ্ম সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দেয়। একটি প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলনের সভাতে তিনি বাংলা দেশের মর্ম্মগত ঐক্যের আদর্শ সম্বন্ধে যে সুবিখ্যাত ভাষণ দেন তা একটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-কীর্ত্তি। সেই রূপ কোন আর একটি সাহিত্য-সভায় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গলার গীতি-কবিতার সম্বন্ধে যে ভাষণ দেন তাতে গীতি-কবিতার মর্ম্মকথা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সাধারণতঃ বলা হয় যে ইতিহাসের ক্রম-বিকাশের ধারাবাহিকতার ফলে বাঙ্গলা গীত কবিতার উদ্ভব হয়েছে। তা সত্য। কিন্তু এইটুকু বলেই সব কথা বলা হয় না। দেশবন্ধু উক্ত ভাষণে দেখাতে চেয়েছেন বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার আকাশ বাতাস নদ-নদী মাঠ ঘাট পল্লী প্রান্তর সহজ সাধারণ ধর্ম্মভাব সব একসঙ্গে মিলিত হয়ে গীতি কবিতার সৃষ্টি হয়েছে। বাঙ্গলা দেশ ব্যতীত অন্য কোথাও এই ধরণের গীতি-কবিতার সৃষ্টি হয় নি। গীতি-কবিতার উৎস কোথায় এই প্রসঙ্গে উক্ত ভাষণে তিনি বলেছেন, "চণ্ডীদাসের লিখিত গীতি-কাব্য—ইহাই বাঙ্গলার যথার্থ গীতি-কাব্য। এই কাব্যগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গালার গীতি-কবিতার প্রাণ। বাঙ্গালী চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, রূপে রসে এ বিচিত্র ভুবন ভরিয়া আছে। কত কাল, কত যুগ

কোন্ অন্ধকারের অন্তরালে রসের খাস-মহল আমার বাঙালী আসিয়া দেখিল, ঊর্ধ্বে অনন্ত নীল, নীলের পর নীল, অতল ধারে কল-কল্লোলে সন্ধ্যা বহিয়া যায়। চরণতলে কলহাস্যময় ধরা সমুদ্র অনন্ত সুরে গাহিয়া উঠিয়াছে। তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে; শিরে হিমালয় তাহার ধ্যানে নিমগ্ন। বাঙালী দেখিল, তাহার আগে পাশে এত রূপ, এত সুর এত গান—মন-প্রাণ বিচিত্র রসে ভরিয়া উঠিল। তারা মনে, তারা প্রাণে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, প্রাণের ভিতর তাহার সাড়া, তাহার আকুল অনুরণন। তখন বাঙালীর কবি গাহিয়া উঠিল "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।"

অতঃপর চিত্তরঞ্জন এই সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে দেখাইলেন যে বাঙলা দেশই গীত-কবিতার উপযুক্ত স্থান। সর্বশেষে যে কথাটি বলে তাঁর ভাষণের উপসংহার করেছেন সেটুকু উদ্ধৃত করে প্রবন্ধ শেষ করব। "সকল সৌন্দর্যের মধ্যে বিশ্বের আত্মা জাগ্রত, মুখরিত, বিকশিত, সৌন্দর্য লীলায়িত। প্রকৃতি ও মানব উভয়ের ভিতরেই বিশ্বাত্মার সমান খেলা। সকলজীব, বৃক্ষ, লতাপাতা, অণু-পরমাণু সকলই প্রকৃতির মধ্যে। সাধারণ পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে তাহার নিজের মুখের ছায়া দেখে, তখন তাহার সত্য রূপ প্রকটিত হয়। সে দেখে তাহার সম্মুখে এক নূতন জগত—সেই জগতের ও তাহার এক নাড়ী—তাহার এক বিরাট হৃদয়। সেই বিরাট হৃদয়ের এই বিরাট প্রাণ-সত্তাকে বক্ষে ধরিয়া কালের ভিতর দিয়া অকালে যাইতেছে। তখন তাহার মন সেই বিরাটের রূপের রসে মজিয়া এক অভিনব রূপান্তর সৃষ্টি করে। সেই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহা-মিলনের অনাহত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে। বাঙলার গীতি কবিতায় আমি তাহারি সন্ধান পাইয়াছি।"

সকলকে স্বীকার করতে হবে চিত্তরঞ্জনের এই ভাষণটি বাঙলার গীতি-কবিতার উপর এক অসামান্য আলোকপাত করেছে।

"'অনির্বচনীয়তা'-বাদ যুক্তিক্ষেত্রে হোঁচট খাইবার মত বেশ একটা প্রকাণ্ড শক্ত বস্তুবিশেষ বটে। 'মায়া অনাদি, অনির্বচনীয়'—যুক্তির দফারফা। ব্রহ্মে মায়া আসিল কবে, কোথা হইতে? জীবই বা কবে মায়াগ্রস্ত হইল, কি করিয়া? প্রত্যক্ষ জগৎ দিতেছে 'বাধা', সেই বাধাকে হজম করিতে না-পারার ফলে বাধা-দানকারী বস্তুগুলি প্রতিভাত হইতেছে হেয়রূপে। একদল দোষ দিল বাহিরের বস্তুকে, আর একদল বলিল, 'না, হজম শক্তিই কমিয়া গিয়াছে'।...দুই-ই অর্ধ সত্য।...অন্ন কি স্বরূপতঃ বিষ? অন্নের বিষত্ব আপেক্ষিক ...।...রোগ থাকিবে অন্তরে বাহিরে দুই জায়গায়, কিম্বা কোনও এক জায়গায়ই নয়।...দুই দিক দিয়াই রোগ নির্ণয় দরকার। দুইয়েরই অতীত অথচ দুই-ই একাধারে এমন যে জীবনীশক্তি যাহা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের 'স্বরাশক্তি', তাহাই প্রজ্ঞা ও প্রাণের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। অনন্তপ্রসারিত জীবনের মধ্যে এমন কিছু সামঞ্জস্যের নিশ্চয়ই অভাব হইয়াছে, যাহার ফলে হজমশক্তি কমিল, অন্ন বাধা দিল। একটা সুস্থ জীবনকে ধরিতে না পারিলে কিছুতেই সাংখ্যমত ও বিবর্তবাদের ব্যাখ্যার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।"

—অদ্বৈতভাষ্য-ব্রহ্মসূত্র ১ম খণ্ড—পৃঃ ৯৩

বাংলাদেশের সংগঠন সমস্যা

॥ শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাস ॥

অনেক আশা-নিরাশার রক্তাক্ত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্ত হল। মুক্তির যোদ্ধারা বলেছিলেন, স্বাধীনতার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, এক নদী রক্ত দেব। এ আশা তাঁর অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। স্বাধীনতা তিনি পেয়েছেন, কিন্তু তা এক নদী রক্ত দেবার পর। ইতিহাসে দেখা গেছে যে, শহীদের রক্ত জাতিকে উর্বর করে, শক্তিশালী করে, স্বপ্নময় করে। সুতরাং এটা আশা করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশ যখন এমন অজিরতাড়া রক্তের বন্যা বইয়ে দিল, তখন তার উর্বরতাও অভূতপূর্ব হবে, যার ফলে যুগান্তর ঘটে যাবে। সম্ভবতঃ স্বাধীন বাংলাদেশ এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যা সমগ্র মানব সভ্যতাকে নতুন প্রগতির পথে এগিয়ে দেবে। সমগ্র বিংশ শতাব্দী ধরে যে সব যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে রেখেছে তা থেকে মুক্তির পথ হয়তো মিলবে বাংলাদেশের নতুন সংবিধান, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিক্ষাসংস্কৃতির নবরূপায়ণ থেকে।

সমগ্র ইতিহাসের প্রাণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীতে অনেক সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক ধারণার পরিবর্তন ঘটে গেছে। ব্যক্তির সুখ-শান্তি মঙ্গল বিধান করাই যদি রাষ্ট্রের ও অর্থনীতির উদ্দেশ্য হয় তা হলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে অনেক পুরাতন রাষ্ট্র-কাঠামো ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে অচলযুক্ত ও অক্ষম, তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং বাংলাদেশের সদ্য অর্জিত স্বাধীনতার সংজ্ঞা ঠিক পুরাতন দিনের স্বাধীনতার সংজ্ঞার সঙ্গে মিলবে না। সারা দুনিয়াতেই এখন রাজা বা জাতির গৌরব বৃদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে স্বাধীনতার মূল্য নিরূপিত হয় না। হয় ব্যক্তির সুখ শান্তি প্রগতির মাপকাঠি দিয়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্থও এ যুগে তাই হবে। তার মানে সাত কোটি মানুষের প্রত্যেকটি মানুষের হাতে পেটে খাবার উপায় তুলে দিতে হবে, তার মনের ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা করতে হবে, তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথ খুলে দিতে হবে।

গত মহাযুদ্ধের অবসান স্বরূপ পৃথিবীর সকল পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করে। আধুনিক সংবাদপত্র, সিনেমা, রেডিও, সুলভ পুস্তক পুস্তিকা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচারের ফলে পরাধীনতার শোষণ-শাসন থেকে মুক্তিযুক্ত মানুষরা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অবিলম্বে পূরণের দাবীতে মুখর ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু তারা জানত না কোন্ উপায়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। কমিউনিষ্টদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, ধনিক বিরোধিতা, শ্রেণী বিদ্বেষ, এই সব বহু যুগের নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত মানুষের নিকট খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। কমিউনিষ্ট রুশিয়ার নেতৃত্বে এই সব মুক্তিযুক্ত দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহের পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। কমিউনিজমের বন্যাকে রোধ করতে এই সব গণতান্ত্রিক দেশসমূহ আমেরিকার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। পৃথিবী দুই বিপরীতধর্মী শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। উভয় শিবিরই চেষ্টা করতে থাকে এক একটি দেশকে দলে টেনে নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করতে। মুক্তিযুক্ত দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাতে নিজেদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয় সে জন্য চেষ্টা চলতে থাকে। দুই পক্ষের সাহায্যপুষ্ট হয়ে দেশে দেশে চলতে থাকে অন্তর্দ্বন্দ্ব। যদি কোন দেশ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বেছে নেয় তা হলে, কমিউনিষ্ট শিবির তা ভেঙে ফেলতে চায়, আর কেউ যদি কমিউনিজম চায় তবে গণতান্ত্রিক শিবির তা নষ্ট করে ফেলতে

চায়। বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে দেখা গেল যে, পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে এক নতুন রূপের সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। এই নতুন রূপটি হল, প্রভাবাধীন সাম্রাজ্যবাদ—hegemonic imperialism। এই নতুন ধাঁচের সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য পূর্বের মতোই রক্তপাত করতে, যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ, পুনর্যুদ্ধ বাধাতে বাধো বাধছে না। ঠিক এই সময়েই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল। এখন তার নেতাদের ঠিক করতে হবে এই দুই শিবিরের মধ্যে তাঁরা কোন্ শিবিরটি বেছে নেবেন। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্র কিংবা কমিউনিস্ট ডিকটেটরশিপ ও রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র? কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে যে কোনটিকেই সে গ্রহণ করুক অপর পক্ষ তাকে ছেড়ে দেবে না। সুতরাং একটি রক্তনদী পার হলেও তার দুর্ভোগ কাটবে না, পুনরায় তাকে রক্তসাগরে সাঁতার দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

কিন্তু সে যদি পুনরায় রক্তপাতের পথে না গিয়ে তার মানুষকে সুখশান্তি প্রগতির পথে পরিচালিত করতে চায় তবে তাকে এই দুয়ের নাগালের উর্ধ্বে উঠে এক নতুন তৃতীয় পথ ধরতে হবে।

এই দুই শিবিরের মতবাদেরই দোষ ত্রুটি আছে। কিন্তু তা তাঁরা স্বীকার করেন না। সে জন্যেই তাঁরা নিজ নিজ মতবাদ সম্বন্ধে এত গোঁড়া। এখন বাংলাদেশের নেতাদের এই দুই মতবাদের ভালমন্দ, দোষ ত্রুটি বিচার করে দেখতে হবে, এবং যে তৃতীয় পথটি তাঁরা গ্রহণ করবেন সেটি যেন এই সব দোষ ত্রুটি মুক্ত হয় তাও দেখতে হবে।

ধনতন্ত্র সকল মানুষকে কাজ দিতে পারে না। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের রীতি হল মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা অনুসারে উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করা। যে পরিমাণ দ্রব্য লাভের সঙ্গে বাজারে বিক্রী করা সম্ভব হয় ঠিক সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করাই ধনতন্ত্রের নীতি। এই নীতি অনুসারে যারা দরিদ্র, যারা বেকার, যাদের কেনার পয়সা নেই তাদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করা হয় না। সুতরাং ধনতন্ত্রের উৎপাদন সমাজের প্রয়োজন অপেক্ষা কম হতে বাধ্য। তা ছাড়া ধনতন্ত্র যে পরিমাণ ধন উৎপাদন করে তাও ন্যায্য বণ্টন হয় না,—বাড়তি মূল্যের অধিকাংশই ধনীদের হাতে গিয়ে যায়। তা জনসাধারণের হাতে এসে তাদের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ায় না। সুতরাং ধনতন্ত্রে দেশের সকল মানুষ পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের দারিদ্র্য দূর করতে পারে না—একাংশ মাত্র পারে।

ধনতন্ত্র যে পরিমাণ অর্থবণ্টন করে মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ায়, জনসাধারণের উপভোগের মানও সেই অনুপাতে বাড়ে। এই অর্থবণ্টন হয় দুই প্রকারে। এক মজুরি বাবদে, আর এক কাঁচামালের মূল্য বাবদে। অর্থাৎ যে পরিমাণ উৎপাদন হয়, ঠিক সে অনুপাতেই মানুষের হাতে অর্থ আসে এবং সে অনুপাতেই তাদের ক্রয়-ক্ষমতা নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপক দারিদ্র্য ও বেকারত্বের জন্য জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা খুবই সীমিত। সুতরাং কুটির শিল্প ব্যতিরেকে যদি এত বেশী উৎপাদন করা সম্ভব হবে না যার ফলে সকল মানুষকে কাজ দেওয়া যাবে। বড়ের সাহায্যে তা যদি করা হয় তবে তা অধিক্রীত থাকবে, পয়সার অভাবে অভাবীরা তা কিনতে পারবে না।

এটা একটা দুষ্টচক্র—ভিসাস সার্কেল। এই 'দুষ্ট-চক্রই' হল ধনতন্ত্রের বনিয়াদ। আর এটাই হল ধনতন্ত্রের ত্রুটী।

বাংলাদেশের সকলকার দারিদ্র্য দূর করতে হলে —যা এ যুগে করতেই হবে—উৎপাদনের নীতি হবে, বাজারে বিক্রী করে লাভ করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন নয়, সকল মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব দূর করার জন্যে উৎপাদন। অর্থাৎ সকল মানুষকে আগেই কাজ দিতে হবে এমন সব প্রতিষ্ঠানে যে সব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য লাভের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা নয়, অর্থাৎ যারা বর্তমানে বেকার তাদেরই মালিকানাধীনে কুটির শিল্প গড়ে। যার ফলে তারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার মত পয়সা অর্জন করতে পারবে। সেটা অবশ্যই লাভ খাওয়ার অর্থনীতির দ্বারা হবে না, অন্যরূপ অর্থনীতির পরিকল্পনা করতে হবে।

যে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ হবে সকলে সাধ্যমত উৎপাদন করবে, এবং সকলে নিজ নিজ উৎপাদনের সম্পূর্ণ মালিক হবে। কেবল সেইরূপ অর্থনীতির দ্বারাই দেশের সকলপ্রকার দারিদ্র্য ও অভাব দূর হতে পারে। এ নীতি ধনতন্ত্র গ্রহণ করতে পারে না। লাভের ব্যবস্থাই যদি না রইল তবে আর ধনতন্ত্র থাকে কি করে?

কিন্তু ধনতন্ত্রের সীমিত উৎপাদনের নীতি সত্ত্বেও যন্ত্র-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের মাথাপিছু উৎপাদন-ক্ষমতা এতই বেড়ে গেছে যে, উন্নত দেশসমূহে বেতন বৃদ্ধির ফলে জন-সাধারণের অধিকাংশের মনে দারিদ্র্যের আশা অনেক কমে গেছে। সেই জন্য ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের তীব্রতাও অনেকটা শান্ত হয়েছে। এই যে যন্ত্রোৎপাদিত বিপুল পণ্যসামগ্রীর বিক্রয়-ব্যবস্থা এটা কিন্তু জন-সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। করে রাষ্ট্রীয় ক্রয়-ক্ষমতার ওপর। সমরোপকরণের জন্য, মহাকাশ গবেষণা ও গ্রহ উপগ্রহ অভিযানের জন্য ব্যয় করে ও অনুন্নত দেশসমূহকে ঋণে ঋণমুক্তি ও বদান্যতা সরবরাহ করে ধনতন্ত্রের এই গড়তি উৎপাদনটা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে লাভের অঙ্কটাকে টিকিয়ে রাখা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্রয়-ক্ষমতাও সীমিত। সেই জন্যে এই সব উন্নত দেশে বেকার, দারিদ্র্য ও বিক্ষোভ কম বেশী আছে এবং অনুন্নত দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিক্ষোভ বৃদ্ধির দিকে চলেছে।

অপর পক্ষে কমিউনিজমের রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র ও ডিকটেটরি রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ। সমস্তের যাবতীয় উৎপাদনের উপায় সমূহকে রাষ্ট্রীকরণ ক'রে, সকলের জন্য কর্মসৃষ্টি করা সম্ভব হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করে, মত প্রকাশের অধিকার, দল গড়ার অধিকার, পছন্দ মতো জীবন যাপনের অধিকার, সৃজনীশক্তি অনুশীলনের অধিকার কেড়ে নিয়ে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা যায় না। মানুষের শুধু পেটের ক্ষুধাই নেই, সেই সঙ্গে আছে মনের ক্ষুধা। কমিউনিজমে পেটের ক্ষুধা মিটলেও মনের ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা নেই বলে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ বছরের ওপর একটানা রাজত্ব করা সত্ত্বেও সে সব দেশের জনগণের মধ্যে কমিউনিজম বিরোধী মনোভাব এতই শক্তিশালী ও তীব্র যে সব দেশের জনসাধারণকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার, কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন পার্টিকে নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার দেওয়া সম্ভব হয় না; এক দৌহ-কঠিন স্বনির্ভরতার অন্তরালে ডিকটেটরী শাসন চালানো ছাড়া মুক্ত মানুষের দ্বারা গঠিত মুক্ত সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়া সম্ভব হয় না। কিন্তু এই সব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কমিউনিজমের ধ্বংসের সিদ্ধান্তে ভেঙ্গে, শ্রেণী বিদ্বেষের প্রেরণার জন্য এশিয়া আফ্রিকার দরিদ্র আশাহত অনুন্নত মানুষের কাছে কমিউনিজম বড়ই প্রিয়।

সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনায় এই দুই আদর্শের কোনটিই গ্রহণ করা যায় না। বাংলা দেশের নেতাদের এখন এই দুই পথের দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত এমন এক পরিকল্পনা রচনা করতে হবে যে পরিকল্পনা বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান করে সকলের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে অথচ ব্যক্তি-স্বাধীনতা হবে খণ্ডিত হবে না। সে রূপ পরিকল্পনা 'নিয়ন্ত্রিত' নীতির ওপর রচিত হতে পারে।

বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা প্রথম অবস্থায় তিন স্তরে বিভক্ত হোক। প্রথম স্তর হোক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, দ্বিতীয় স্তর হোক কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা; তৃতীয় স্তর হোক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।

ধনতন্ত্র সকলের জন্য কর্ম সংস্থান করতে পারে না সত্য, তথাপি প্রথম অবস্থায় ধনতন্ত্রকে একেবারে নির্বাসন দেওয়া সমীচীন হবে না। যে সব মানুষের সৃজনী ক্ষমতা সাধারণ অপেক্ষা বেশী থাকে তাদের প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই সৃজনী ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষেরই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। মানুষ ছাড়া এই সৃজনী শক্তি অন্য কোন জীবের নেই। এই ক্ষমতাই মানুষকে অন্য সব জীব থেকে পৃথক করেছে। অতএব এই ক্ষমতার অনুশীলনের ও বিকাশের ব্যবস্থা রাখা সকল স্বাধীন সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

ধনতন্ত্রে এই ক্ষমতার অনুশীলন চলে নিরঙ্কুশ গতিতে। ফলে এই ক্ষমতা সীমা লঙ্ঘন করে। তখন ব্যক্তির এই ক্ষমতা সমাজের সকল মানুষের উপকার না করে দুর্বলকে শোষণ করতে থাকে। অপরদিকে কমিউনিজম এই ক্ষমতাকে নিঃশেষে নির্বাসন দিয়ে সকল মানুষকে পার্টি নেতৃত্বের বিনীত দাসত্বের স্তরে অবনমিত করে। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে এই সৃজনী ক্ষমতার অনুশীলন ও তাকে বিকশিত করে তোলার কারো কোন উপায় ও ক্ষমতা থাকে না।

এই দুই চূড়ান্ত অবস্থার মধ্যস্থলে আছে প্রকৃত সমাধান। নিরঙ্কুশ ধনতন্ত্রে ধনীর সৃজনী ক্ষমতা লক্ষ্যহীন, মানুষ ছাড়ানো সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে দেরী করে না। রাষ্ট্র যদি ধনতন্ত্রের এই সমাজ-বিরোধী কাজ বন্ধকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তা হলে এইসব অসামাজিক সৃজনী শক্তিগুলের দ্বারা সমাজের ক্ষতি না হয়ে উপকারই হবে। এই নতুন তৃতীয় পন্থায়, রাষ্ট্র একদিকে যেমন নিরঙ্কুশ ধনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে, অন্যদিকে তেমন ব্যক্তি ও বেসরকারের হাতে উৎপাদনসমূহের মালিকানা দিয়ে উৎপাদনের মালিক করার ব্যবস্থা করে দেশের বেকার ও দারিদ্র্য সমস্যার পূর্ণ সমাধানের ব্যবস্থা করবে। সমাজের এক অংশের কর্মসংস্থান ধনিকরা করবে, আর সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা বাকি অংশের কর্মসংস্থান করবে। এই তৃতীয় পন্থায় প্রত্যেক মানুষ যেন তার পরম মূল্যবান সম্পদ যে সৃজনশীলতা তাকে অনুশীলিত ও বিকশিত করার সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা থাকবে।

ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার বাইরে যে সকল আংশিক ও পূর্ণ বেকার থাকবে তাদের সকলের জন্য সরকারকে কো-অপারেটিভ স্তর গড়ে তুলতে হবে। বেকারদের হাতে সরকারকে জমি বা কলকারখানা ও মূলধন দিতে হবে। এই কো-অপারেটিভ সংস্থাসমূহের নীতি হবে, উৎপাদকই উৎপাদনের মালিক হবে। উৎপাদকগণ নিজ নিজ উৎপাদন বাড়াবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে অর্থাৎ এক একটি সংস্থার কর্মীগণই সেই সেই সংস্থার যৌথ মালিক হবে এবং উৎপাদন করার যোগ্যতা অনুপাতে পারিশ্রমিক ও লভ্যাংশ বন্টিত হবে। এই সমবায়ী অর্থনীতির ক্ষেত্রে মালিক মজুর সম্পর্ক থাকবে না বলে মজুরি ও লাভের প্রশ্নও থাকবে না। সকল শ্রমিকই উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদনের মালিক হবেন। সেইজন্য এই সমবায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সকল উৎপাদনই যখন সকল উৎপাদকের মধ্যে ন্যায্য ভাবে বন্টিত হবে, তখন সকল উৎপাদনটাই উৎপাদকের মধ্যে যৌথ ভাবে বিক্রীত হয়ে যাবে। অর্থাৎ সমবায়ের মালিক উৎপাদকরাই নিজ নিজ উৎপাদনের ভোক্তা বা ক্রেতা হবে। সমাজের কিছু লোক ধনতন্ত্রের দ্বারা কর্মে নিযুক্ত থাকবে, আর বাকি লোক এই সমবায় স্তরে নিযুক্ত থাকবে—যার উৎপাদনের উদ্বৃত্ত বাজারে বিক্রী করে লাভ করা নয়, নিজ নিজ প্রয়োজন মেটানো। তখনই সমাজে বেকার সমস্যার ও দারিদ্র্য সমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভব হবে। শেষে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিযুক্ত শ্রমিকরা নিজ নিজ সংস্থাগুলির মালিকানা দাবী করে সমবায় পদ্ধতিতে চালিয়ে নিজেদের উৎপাদনের মালিক নিজেরাই হতে চাইবে। তখন সমাজে আর্থিক ব্যবস্থার আর তিনটি স্তর থাকবে না, কেবল মাত্র সমবায় স্তরটিই থাকবে, আর থাকবে সরকারের হাতে পরিকল্পনা রচনার ক্ষমতা ও সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা।

রাষ্ট্র যেন কোন কৃষি শিল্প আর্থিক সংস্থা আমলাদের দিয়ে পরিচালনার ব্যবস্থা না করে। তাতে রাষ্ট্রের লোকসান হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি হবে না; দেশে দারিদ্র্য-জাড়্যতা ও নৈরাজ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে মাত্র। এখানে মানুষের স্বভাবের বৈশিষ্ট্যটি স্মরণে রাখতে হবে। মানুষ স্বভাবতঃ অলস। হয় নিজ লাভের তাড়না, নয়তো মালিকের তাড়না, কিংবা কোন শ্রেষ্ঠ কৃত আদর্শবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ মনের তাড়না ছাড়া পরিশ্রম করতে চায় না। যে সরকারের উত্থান পতনে শ্রমিকদের কোটের মূল্য আছে, সেখানে সরকারী প্রতিষ্ঠানে তাদের কাজ করানো কঠিন। সেইজন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রায়ত্ত কাজ-কারবারে উৎপাদন অব্যাহত থাকে না, লোকসান হয়, তাল চলে না। কমিউনিষ্ট দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত কাজ-কারবারে উৎপাদন অব্যাহত থাকে, কারণ সেখানে

শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রভৃতি নিষিদ্ধ করে কঠোর হস্তে কাজ করানো হয়। সেখানে জনসাধারণের কারো ভোটেই পার্টি ডিক্টেটরদের উত্থান-পতন নির্ভর করে না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেশের সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থা, কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উৎপাদন, বণ্টন (পারিশ্রমিকের হার, জমির খাজনা ও কাঁচা মালের মূল্য) ও বিনিময়ের ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করবে। সেইজন্য ব্যাঙ্ক, বীমা সংস্থা প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত করবে। আর্থিক ব্যবস্থার প্রাইভেট সেকটর ও কো-অপারেটিভ সেকটরকে নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থাকে পরিচালনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করবে এবং তা যাতে সঠিক-ভাবে রূপায়িত হয় সে জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

এই ব্যবস্থাই হবে জনতন্ত্র ও কমিউনিষ্ট তন্ত্রের ঊর্ধ্বে মানবিক সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রের অর্থ সমাজের জাতীয় উৎপাদনের উপায়কে সমগ্র সমাজের আয়ত্তাধীনে আনা। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের যেমন আলো বাতাস জলের ওপর সমান অধিকার আছে, যার যতটুকু প্রয়োজন সে ততটুকু গ্রহণ করতে পারে, তেমনি ভূমি কলকারখানা সকলের জন্যেই উন্মুক্ত থাকবে; নিজ নিজ পরিশ্রমের দ্বারা যে যতটুকু উৎপাদন করবে সে ততটুকুর মালিক হবে। কিন্তু কমিউনিষ্টরা তাদের ডিক্টেটরি রাষ্ট্রকেই সমাজের সঙ্গে সমার্থক করে ভূমি-কলকারখানার রাষ্ট্রীয়করণকে পার্টিতন্ত্র না বলে সমাজতন্ত্র বলছেন। এটা জনগণকে ভুল বোঝান মাত্র, ফাঁকতা দিয়ে নিজেদের ডিক্টেটরি শাসন চালিয়ে যাবার কৌশল মাত্র।

কিন্তু এইরূপ মানবিক সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হলে অর্থনীতির ওপর জনগণের অধিকার কায়েম করলেই চলবে না; রাষ্ট্রের ওপরও জনগণের অধিকার রাখতে হবে। জনগণের সার্বভৌম অধিকারকে কেবল ভোট দেবার মধ্যেই সীমিত রাখলেই চলবে না। তা হলে বর্তমানের মতো তা গার্ডেনতন্ত্র হয়েই চলতে থাকবে। সংসদীয় গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে আছে বটে কিন্তু জনগণ যেন ভিন্ন নাবালক, সেই জন্য তারা নিজেরা সে ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে না, আইন-কানুন রচনায় তারা মতামত জানাতে পারে না, প্রতিনিধির মারফৎ তা ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং এই গার্ডেন-তন্ত্রের পরিবর্তে মানবিক সমাজতন্ত্রে ভোটারগণই তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিনিধির মারফৎ ব্যবহার না করে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করবে। সে ব্যবস্থা হতে পারবে গ্রামে গ্রামে ও সহরের পাড়ায়-পাড়ায় ভোটারদের সংগঠিত করে ভোটার পঞ্চায়েত গড়ে তুলে। এই ভোটার পঞ্চায়েতগুলি কেবল মানবিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলভিত্তিই হবে না, সেগুলি গণশিক্ষার এক একটি বিদ্যাপীঠও হবে। এই সব ভোটার পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন বিভাগ ও কার্য-পরিচালন বিভাগ পরিচালিত হতে থাকলে ক্রমে ক্রমে সাধারণ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি বিকশিত হয়ে উঠতে থাকবে, তখন আর জনসাধারণ বর্তমানের মতো মূক মূঢ় থাকবে না। তখন রাষ্ট্রের ওপর জনগণের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে এবং জনগণের নিজস্ব অর্থনীতি গড়ে তোলা ও তা রক্ষা করা সম্ভব হবে।

কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের দোষ ত্রুটি দূর হবে না, বা কমিউনিজমের ডিক্টেটরি জোরজুলুম প্রতিরোধক পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র নয়। এই উভয় ব্যবস্থাতেই ব্যক্তির সমস্যা যাচ্ছে যাই তাই রয়ে যায়। এই উভয় আদর্শের দোষ ত্রুটি দূর করে ব্যক্তির মুক্তি আনতে হলে উপরিউক্তভাবে পঞ্চায়েতি গণতন্ত্র ও সমন্বয়ী অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে।

সমযুক্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন সমস্যা হল: কোন্ উপায়ে বর্তমান পৃথিবীর দুই বিদ্যমান শিবিরের নাগপাশের ঊর্দ্ধে উঠে গিয়ে বাংলা দেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার ব্যবস্থা করা যায় তারই সমস্যা।

মানবিক সমাজতন্ত্র বা পঞ্চায়েতি গণতন্ত্র ও সমন্বয়ী অর্থনীতিই হবে বাংলাদেশকে এই দুই বিদ্যমান শিবিরের নাগপাশের ঊর্দ্ধে নিয়ে যাবার একমাত্র পথ—বাংলাদেশের পুনর্গঠন সমস্যার একমাত্র সমাধান।

সৃজনীশক্তি বিকাশের শিক্ষা

॥ শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত ॥

অতি অল্প বয়সেই শিশুদের বলতে শোনা যায় একটি কথা—আমি কিছু করব। সে বাবা-মা ভাই-বোন যাকে পায়, তার কাছেই সে তার নিজের দরকার পেশ করে। 'কিছু' কথাটার অর্থও কোন সাধারণ পাওয়া যায় না, তবু শিশুর ঐ কথাটা হতে শিশু স্বপ্রণোদিত হয়ে কিছু একটা করবে, তারই অর্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে। সুখী জীবনের একটি বিশেষ দিকই হচ্ছে কিছু সৃষ্টি করার আনন্দ। সৃজনীশক্তি বস্তুগত প্রতি মানুষই কিছু না কিছু সৃজনীল কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক মানুষই তার অনুনিহিত সৃজনীশক্তির পরিপূর্ণ রূপ দিতে সক্ষম হয়ে থাকে। অনুনিহিত সৃজনীশক্তির রূপায়নে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাদীক্ষার জীবনে কার্যকরী একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ সৃষ্টির আনন্দের পথের সূচনা শিক্ষার্থীর জীবনে না করে দিলে সে সৃষ্টি করবার সুযোগই বা কি করে পাবে। আর তার মনে যে অনুনিহিত আনন্দ রয়েছে তারই বা উপলব্ধি সে কি করে করবে? বিদ্যালয়ই সেই সৃষ্টির উৎসের সন্ধান দিতে পারে।

আমি এক্ষেত্রে একথা বলছি না যে শিক্ষার্থী অন্য কোন সূত্র হতে সৃজনীশক্তির প্রেরণা পাবে না। কিন্তু বিদ্যালয়ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্মশালা যেখানে সৃজনশক্তির বিশেষ অনুশীলন হতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে শিক্ষার্থী-দের দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিতের কথাও আমাদের উল্লেখ করতে হবে। আমরা শিক্ষকরা বিশেষ করে ভারতে সনাতন-পন্থতির শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীরা যে সৃজনাত্মক শিক্ষা লাভে সক্ষম, সে কথাও ভুলে গিয়েছি, এবং ফলে আমরা পথ-প্রদর্শক হিসাবেও যথার্থ কৌশলী নই।

আমাদের কথা এখন ছেড়ে দিয়ে শিশুদের প্রথম অবস্থার সৃজনাত্মক প্রচেষ্টা কেন অনুপস্থিত ও বিশৃঙ্খল তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। প্রথমতঃ শিশুদের জ্ঞানের ভাণ্ডার অত্যন্ত সীমিত, অভিজ্ঞতাও স্বল্প বলের উপর নির্ভর করে শিশু তার কাজের সমাধান করতে পারে। অতএব এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে শিশুর সৃজনাত্মক চিন্তাধারা তার বয়স বৃদ্ধির অনুপাতে, তার সংগৃহীত অভিজ্ঞতার দ্বারে প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতাই সৃজনীশক্তির ভিত্তিশক্তি।

সৃজনীশক্তি কল্পনাশক্তির সাহায্য নিয়ে থাকে। শিশু তার মনের পটভূমিকায় কি সৃষ্টি করবে তা বেশ দেখে তা রূপায়িত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সঠিক কি বস্তু সে সৃষ্টি করবে তার সঠিক পরিকল্পনা বা blue print তার থাকে না। সে সৃষ্টি করতে করতে এগিয়ে চলে। অন্ত তার সৃষ্টির পূর্বেই তার চিন্তাধারা বা কল্পনাপ্রসূত চিন্তা এগিয়ে যায়। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে শিশু সৃষ্টি করতে করতে তার সৃষ্টির সংশোধনও করে থাকে। শিশুর কল্পনাপ্রসূত ভাবধারাকে বাস্তবে রূপায়িত করা তখনই সম্ভব যখন শিশু উৎসাহ পায়, কিন্তু ক্রটি সমা-লোচনা শিশুকে কর্মে অনুৎসাহী করে তোলে। এজন্যই প্রথম শ্রেণীতে প্রাথমিক অবস্থার সংসর্গেই শিশুদের সৃজন-প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দান করা হয়। আমাদের শিক্ষক-দের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস শিশুদের প্রথম অবস্থা থেকেই স্বচ্ছন্দতা বা যাথার্থ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু এ ভুল পন্থা। শিশুদের অঙ্গুলী চালনা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। তার কাছে নিখুঁত কার্যক্রম দাবী করলে চলবে কেন? অতএব শিশুদের যে কোন কর্ম-প্রচেষ্টাকেই যদি প্রশংসা করা যায় তাহলে তার উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে, সে কাজ করতে আত্মপ্রবোধ করবে।

শিক্ষকগণ অনেক সময় বলে থাকেন যে শিশুদের কাজের মধ্যে উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তার

মধ্যে উদ্দেশ্য না থাকলেও যদি তাকে উদ্দেশ্যের রূপ দেওয়া যেতে পারে তাহলেই তা শিশুর কাছে উদ্দেশ্যপূর্ণ হবে এবং শিশু কাজ করতে আরও বেশি আগ্রহী হবে। কারণ কাজটি হচ্ছে তারই। কাজটি হয়ত অন্যের চোখে সে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেনি, কিন্তু তার কাছে কাজটা অপরূপ সুন্দর কারণ সৃষ্টিকালে তার অপূর্ব অনুভূতি তার কাজকে উদ্দীপ্ত করে থাকে। যেখানে শিশু শিক্ষকের কাজকে শুধু অনুকরণ করে, সেখানে শিশুর উদ্দেশ্য থাকে না এবং শিশুর সৃজনীশক্তি সেখানে হয় অবদমিত। সৃজনকাজে অনুকরণের স্থান যে একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু শিশুর সৃজনক্ষমতাকে অনুকরণের সাথে সাথে শিশুর নিজস্ব সৃজনশক্তি দ্বারা তা পরিপুষ্ট করতে হবে।

শিশুর সৃজনীশক্তি তখনই প্রতিভাত হয় যখন সে নিজের ক্ষমতায় কিছু সৃষ্টি করে, নূতন ধ্যানধারণার উপর নির্ভর করে কিছু রচনা করে, পারিপার্শ্বিক ধারণা থেকে একটি মূর্ত অঙ্কন করে কিছু গড়ে, উদ্ভাবন রচনা করে বা অন্যের নির্দেশ ব্যতিরেকেও কিছু বলতে সক্ষম হয় বা কোন কিছু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। সৃজনী ক্ষমতার এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া চলে।

সৃজনী শক্তি রসবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে এ দুটি অবিচ্ছেদ্য। তাঁরা বলেন যে, কোন ব্যক্তি কোন জিনিসের সৌন্দর্যের রস-অনুভব করতে পারে না, যদি না সে ঐ পরিসীমার মধ্যে সৃজন প্রতিভার পরিচয় না দিতে পারে। অবশ্য এ তথ্যটি সাধারণ সূত্রের আওতায় পড়ে না বলেই অনেক শিক্ষাবিদ মত পোষণ করে থাকেন। কারণ এক ব্যক্তি হয়ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, অথচ তিনি ঐ নৈসর্গিক বিবরণ সঠিক ভাবে দিতে পারেন না। কিংবা এক ব্যক্তি হয়ত স্থাপত্য শিল্পের অনুরাগী হতে পারেন, কিন্তু তিনি সাধারণ ঘরবাড়ি তৈরি করার কলা-কৌশল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন চারুকলার ক্ষেত্রে, চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে, ব্যক্তির সৃজনী প্রচেষ্টা বড় বড় প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীদের কলা-কৌশল হৃদয়ঙ্গম করতে তাকে সাহায্য করে থাকে।

এবার সৃজনশীলতার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কয়েকজন শিক্ষাবিদ বলেন যে সৃজনীশক্তি বিকাশে চারটি স্তর রয়েছে, এবং স্তরগুলি হচ্ছে প্রস্তুতি, সুপ্তাবস্থা, অনুপ্রেরণা এবং সত্য প্রাতিভাসন। প্রস্তুতি স্তরটিকে আবার তিনটি নিম্নস্তরে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে কিছু সময় ধরে পঠনের দ্বারা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন, দ্বিতীয় হচ্ছে আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তু সংযোজন, এবং তৃতীয় হচ্ছে সম্ভাবনা-সীমা অধিকার। উদাহরণ স্বরূপ শিশুর একটী অলঙ্কৃত পাত্র তৈরি করার প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করা যেতে পারে। শিশু প্রথমে বিভিন্ন ধরণের অলঙ্কৃত পাত্র, পাত্রের ছবি যথা লম্বা, খাটো, ছোট মুখওয়ালা, বড় মুখওয়ালা, সরু সরু, সরু মোটা, সেট সরু, সেট মোটা, ওলটানো বিস্তৃত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কৃত পাত্র পরীক্ষা করে দেখতে পারে। এই পরীক্ষাগার হতে অলঙ্কৃত পাত্র সম্বন্ধে সে প্রকৃত তথ্য আহরণ করে। স্মরণ থাকতে পারে যাদু আলোচনা থেকেই সৃজনী শক্তি ধারা বেয়ে ওঠে।

আগ্রহী শিশু মনের তখন সুপ্তাবস্থা। এই সুপ্তাবস্থার মধ্যে শিশুর মনে যে নূতন আদর্শ সংস্থাপিত হয়েছে, তাকেই রূপ দিতে সে অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়াটা সাক্ষাৎ নয়, সে চুপ করে তখনও ভাবে। অনেক শিক্ষক বলেন যে শিশু এই অবস্থায় স্বপ্নরাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। এ সময় শিশু মনঃচক্ষে বা অন্তর্দৃষ্টিতে সে যে অলঙ্কৃত পাত্র তৈরী করবে তার আকৃতি কাঠামো মনে মনে তৈরি করে। এ রূপ চিন্তা করার মধ্য দিয়ে শিশু সম্পূর্ণ একটী নূতন আদর্শ রচনা করে ফেলতে পারে। কোন কোন শিক্ষাবিদ এই অবস্থাকে অবচেতন মনের প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা দিয়েছেন।

এরূপ ভাবে যখন নূতন কোন পরিবর্তনা, কল্পনা, বা আদর্শ শিশু-মনে উদয় হয়, তখন শিশু অনুপ্রেরণা লাভ করে। পরবর্তী স্তরে শিশু তার সৃজনী প্রতিভা বিকাশে প্রবৃত্ত হয়।

এবার শিশুদের সৃজনী প্রতিভা বিকাশের জন্য

শিক্ষক কি করতে পারেন, তা চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। শিশুর সৃজনীশক্তির বিকাশে বিভিন্ন ধারা অবলম্বন করে হতে পারে। যথা—চিত্রাঙ্কনে, সৃজনাত্মক রচনায়, সঙ্গীত পরিবেশনে, খেলায়, অভিনয় নৃত্যাদিতে। শিক্ষকের একটি কথা বিশেষ ভাবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে। শিক্ষার্থীর সৃজনী প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা যে ধারাই অবলম্বন করুক না কেন শিক্ষক শিক্ষার্থী সমাবেশে তার পূর্বাহ্ন আলোচনা চলবে, কত সময় কর্মসম্পাদনে প্রয়োজন হবে এই স্তর হতে আরম্ভ করে যে যে প্রয়োজনীয় জিনিষের আবশ্যক, এবং কি কি কলা কৌশল তাদের প্রয়োজন হবে সবই আলোচনার বিষয়বস্তু হবে। শিক্ষক প্রয়োজন হলে কোন বিষয় প্রয়োগ-কৌশল প্রদর্শন করতে পারেন, তিনি আদর্শ দেখাতে পারেন, কিংবা রচনাকালে বিষয়-বস্তু পরিষ্কার ও পরিস্ফুট করবার যেসব কলাকৌশল অবলম্বন করতে হয় সবই প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু তিনি শিক্ষার্থীদের ওঁকে নকল করবার মত কোনও সুযোগ করে দেবেন না। আলোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারা যেন তাদের প্রকাশ করে বলে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে, এতে ভাবের আদান প্রদান হবে এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-ভাণ্ডার যত বেশি সমৃদ্ধ হবে, ততই তাদের সৃজনী প্রতিভার বিকাশ হবে।

এর পরের স্তর হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সৃজনীশক্তি বিকাশের প্রত্যক্ষ কর্ম। শিক্ষক উৎসাহ দেবেন কিন্তু তিনি কি আঁকতে হবে, বা লিখতে হবে, বা কিভাবে কাজ করতে হবে তা কখনও বলে দেবেন না, শুধু প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদিগকে প্রশ্ন-জটের বাইরে পৌঁছে দিতে পারেন।

সর্বশেষ স্তরে সৃজনাত্মক কাজের মূল্যায়ন। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রতিটি কাজের বা প্রতিটি প্রচেষ্টার গুণ ও যোগ্যতা সম্বন্ধে বলবেন। তিনি কোন কিছুর তীব্র সমালোচনা করবেন না। তীব্র সমালোচনায় শিক্ষার্থী ঘুমে যেতে পারে। পক্ষান্তরে শুধু গুণ সম্বন্ধে বেশি গুরুত্ব আরোপ করাও অনুচিত, তাতে শিক্ষার্থীর বৃদ্ধও বাধিত হবে। শিক্ষার্থীকে জানাতে হবে সে সাধারণের কতটুকু প্রশংসার যোগ্য।

ধ্যানের ভারত

॥ শ্রীক্ষেত্র মোহন চক্রবর্তী ॥

হীনতম জন ভাবিবে যেথায় ভারত তাহারি দেশ,
রবে না উচ্চ নাহি রবে নীচ, রবে না দারিদ্র্য-ক্লেশ ;
নীচতা হীনতা রবে না যেথায় অস্পৃশ্যতা অভিশাপ,
রবেনা বিলাস ধনের যেথায় মত্ত-মাতকতা পাপ।
নারী ও পুরুষে ভেদ রহিবে না—রবে সম অধিকার ;
দুর্বল সেথা সহিবে না আর প্রবল-অত্যাচার।
দুঃখ যেথায় রবে না লুকায়ে—সুখের প্রাসাদ কেহ।
রবে না বৈভব ; দুখীর অন্ন কাড়িয়া নিবে না কেহ।
কেহ ফিরে প্রম, সুখদ-বৃষ্টি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ঋদ্ধি।
সবারে সবার সেবায় আনিবে নব সমাজের সিদ্ধি।
সমাজে ধর্মে আচারে বিচারে থাকিবে না কোন দ্বন্দ্ব।
হৃদয়ে হৃদয়ে করাবে যেথা মিলন মধুর ছন্দ।
রবে না শোষণ, শাসন পীড়ন—নাহি যেথা অবিচার।
শ্রেণীহীন সে মোর ধ্যানের ভারতে সবারি অধিকার।

একখানি উদ্দীপ্ত ও করুণ পত্র

['উজ্জয়ন্তভারত' পত্রিকা বন্ধ হতে পারে এ সংবাদ 'উজ্জয়ন্তভারতে'-র মারফৎ জেনে দেহে বয়ঃকীর্ণ অথচ প্রাণে আজও উজ্জ্বল প্রাচীন বিপ্লবী শ্রীনলিনীকিশোর গুহ মহাশয় যে করুণ ও উদ্দীপ্ত পত্রখানি লিখেছিলেন, অনুপ্রেরণার প্রদাতা বলিয়া গভীর কৃতজ্ঞতায় সে পত্রখানি এইখানে প্রকাশ করিলাম। শ্রীযুত নলিনীবাবুকে আমাদের প্রণাম জানাই।

সম্পাদিকা—উজ্জয়ন্তভারত ২০. ৮. ৭১]

বন্যাণীষা,

স্নেহের রেণু, চৈত্র-আষাঢ় ১৩৭৮, চতুর্বিংশ ৩য় সংখ্যা উজ্জয়ন্তভারত পেয়েছি। "একটি কথা" পড়ে তোমার বেদনার মতো আমার নিজের বেদনা ; বেদনার অধিক লজ্জায় স্থির থাকতে পারিনি ; এ যে জাতীয় লজ্জা ! বিপক্ষের ঘরে উজ্জয়ন্তভারত যে মহান সামগ্রিক সমন্বয়ের ঐশ্বরিক আদর্শ ও বাণী প্রচার করে চলছিল তা আমাদের সকলের কার্যাকরী সহযোগিতার অভাবে বন্ধ হবার মতো সংকটে পড়েছে—পড়েছে অর্থ ও লোক-বলের অভাবে। আমাদের এই দুর্গতি ও লজ্জার বেদনা আমাকে এমনই অস্থির করে তুলছে যে, একেবারে শয্যাশায়ী থেকেও—সমবেদনা না জানিয়ে পারছি না। চোখ প্রায় গেছে—একটু strain হলেই মাথাঘোরে বড় বেশী। Strain না করেও উপায় নেই। কিন্তু আজ আর পারছি না।

২৮।৮।৭১

'উজ্জয়ন্তভারতে' পুরুষোত্তমানন্দের—'প্রার্থনাকালীন-ভাষণ', 'পুরুষোত্তমানন্দের ডাইরী'—এতো জাতির নব-জীবনলাভের সঞ্জীবনী সুধা, নিত্যানন্দোদ্বেল...র্ষ সংঘর্ষ : 'আমি বিশ্ব-পথিক', 'এই বিশ্বই আমার মহাদেশ'—এই অমৃত-বাণীর তাৎপর্য্য, জীবনোন্মুখতা ও জীবন-মুখিতা—এই দুইয়ের যুগোপযোগী সামঞ্জস্য সাধনের পথ ও পন্থাই তোমরা উজ্জয়ন্তভারতে প্রচার করে এসেছো। বিস্মিত হই—দ্বাদশ বৎসরের বেশীকাল, পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মরদেহে জীবিত নেই, তাঁর অবর্তমানে তাঁর আদর্শের উজ্জয়ন্ত-ভারতকে তুমি বিন্দুমাত্র ম্লান হতে দেওনি—তোমার এই সৃজন-শক্তি বিস্ময়কর ! কোথায়—কার শক্তিতে তুমি এই শক্তি পেলে—বিস্মিত হয়ে ভাবি। আর ভাবি—সমগ্র কোটি কোটি টাকা কত কাজে যায় বরাদ্দ করছেন—পৌরসভার ঘাটতি পূরণে করছেন বিপুল অর্থ দিয়ে—আর জাতির প্রকৃত মঙ্গল সাধনে ব্রতী 'উজ্জয়ন্ত-ভারত' অর্থাভাবে বন্ধ হবে !

৩১।৭১

রেণু, বলতে ইচ্ছে ছিল আরো অনেক কিছু—কিন্তু পারছিনা। ছিন্নভাবে, ছিন্নদিনে এটুকুও লিখে আমার লজ্জাহত সমবেদনা জানালাম। তোমাদেরই—

অক্ষম—শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

দূরদৃষ্টি—পাকিস্তান সম্বন্ধে

[একুশ বৎসর আগে লিখিত]

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ॥

[উদ্বোধন হইতে পুনর্মুদ্রিত]

...পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে হিন্দু-বিদ্বেষ ছিল, ইহা বাস্তব সত্য। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে এই বিদ্বেষ কিছুমাত্র সাহায্য করে নাই, পরন্তু অনন্ত বাধারই সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা ইতিহাসের ছাত্র-মাত্রেরই জানা কথা। আজ এই বিদ্বেষ ধীরে ধীরে হিন্দুদের ছাড়িয়া মুসলমানদের মধ্যেও সংক্রামিত হইতে চলিয়াছে—পাঞ্জাবী উর্দু লইয়া, মুসলীগ কি কংগ্রেস কমিটীর রিপোর্ট লইয়া নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। যতই ছিন্নভিন্ন-অঙ্গ উৎপাটনীল সমর্থনকারীগণ হিন্দু বিদ্বেষকে জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেন, ব্যাপার ততই জটিল হইয়া উঠিবে। বিদ্বেষের ভিতর দিয়া কিছু সৃষ্টি হইতে পারিলেও সৃষ্ট বস্তুর রক্ষার ক্ষমতা বিদ্বেষের নাই। রক্ষা করিতে হইলে চাই সাত্ত্বিকতার স্নিগ্ধ ভূমি। সৃষ্টিকর্ত্তা হইতেছেন রজোগুণ-মূর্ত্তি, ব্রহ্মা। কিন্তু পালন কর্ত্তা হইবেন সত্ত্বমূর্ত্তি বিষ্ণু। পাকিস্তানকে আজ বৈষ্ণবী সাধনাকেই বরণ করিতে হইবে, যদি পাকিস্তান-প্রষ্টাগণ সত্য সত্যই পাকিস্তানকে পুষ্ট করিতে চান। পাকিস্তানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইলে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সংখ্যালঘুকে পাকা করিতেই হইবে। তাহাদের মেসা ছিল যে পাকিস্তান হইতে হিন্দুদের সরাইয়া দিয়া মুসলমানেরাই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সেখানে স্থাপন করিবেন, তাহাদের সে মেসা ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবজজ মহোদয়ের সুস্পষ্ট সরল ভাষণ হইতে নিশ্চয়ই কাটিয়া যাইবে।

বিশ্বেশ্বরের বিশ্বে যদি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, উচ্চজাতি নিম্নজাতি বলিয়া কিছু থাকিত তবে হিন্দুরাজ, মুসলমান-রাজ, খ্রীষ্টানরাজ হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু বিশ্বনাথ সৃষ্টি করিয়াছেন বিশ্বমানব; এবং সেই বিশ্ব-মানবেরই অনন্ত অংশ আমরা বিশ্বেশ্বরী মানবকুল। যদি বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে, বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াইয়া না পড়িবার কোন ইচ্ছাই আমাদের থাকে, আমাদিগকে হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব প্রভৃতি উপাধির উপরে উঠিয়া, উপাধি-বিনির্মুক্ত হইয়া বিশ্বমানব বনিয়া যাইতেই হইবে। মনুষ্যত্বের যে স্তরে আজ বিশ্ব আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে কোনও theocratic state চলিতে পারিবে না। প্রতি জাতিকে আজ বিশ্ব-মানব হইতে হইবে, প্রতি দেশকে বিশ্ব-দেশ হইতে হইবে। আজই তাই বিশ্ব-ভারত হইবার জন্যেই আকুলি-বিকুলি করিতেছে। এইখানেই আন্তর্জাতিক সব জটিল সমস্যার সমাধান মিলিবে।

এই বিশ্ব-মানবতার দৃষ্টি লইয়াই ভারত ও পাকিস্তানকে উভয়ের দিকে চাহিতে হইবে। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়া-টাকেই যাহারা মহান অনর্থ বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহাদের বলিব—ভগবানের বিধান এড়াইয়া যদি একটী পাতাও বৃক্ষ হইতে পতিত হইবার সামর্থ্য না রাখে, তবে পাকিস্তান সৃষ্টি শুধু কি মানুষেরই সৃষ্টি? হিন্দুদের একান্ত দুর্ব্বলতারই ফল? হিন্দুর দুর্ব্বলতা পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু এই দুর্ব্বলতার পিছনে ভগবানের একটী নিগূঢ় ইচ্ছাও যে রহিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। সেই ইচ্ছা কি এবং সেই ইচ্ছা কোন্ পথে হিন্দু মুসলমানকে এক মহামিলনের পথে আগাইয়া নিয়া চলিয়াছে আজ তাহা ধরিবার ছুঁইবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতবর্ষ গোড়ায় হিন্দুদের দেশ হইলেও যে কোন কারণেই হউক এ দেশে মোগলরাজ পাঠানরাজ আশ্রয়ে মুসলমানও এ দেশের অধিবাসী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের উপর দায়ী তাই বহু শতাব্দী হইতেই দ্বিধা বিভক্ত। হিন্দুরা মুসলমানকে বিদেশাগত মনে করিয়া এবং তাহাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি গৃঢ় প্রয়োজনকে যথাযথ ভাবে পরিপাক করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে দূরেই সরাইয়া রাখিয়াছে। ইহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহাকে কোটী কোটী হিন্দুকে 'পরের' করিয়া দিতে হইয়াছে। নানক কবীর গৌরাঙ্গ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যোগসূত্র রূপে এ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু সে যোগসূত্রও আমরা ছিন্ন করিয়াছি। আমরা যুক্ত হই নাই। মুসলমানদের অভিযোগ তাহাদের 'রাজদাই' ইংরেজ কাড়িয়া লইয়াছে; তাহারা ইংরেজদের কাছে বারবার হৃত রাজ্য ফিরিয়া পাইবার দাবীও করিয়াছে। ইংরেজ তখন হিন্দুদের চাপিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মুসলমানদের উস্কানি দিয়া হিন্দু-বিদ্বেষ কায়েম করিয়া রাখিয়াছিল। পুরাতন দখলদার হিন্দু এবং নূতন দখলদার মুসলমানদের তাই ভারত-রাজ লইয়া এই কাড়াকাড়ি। তাহারও দাবী যখন একান্ত ভাবে আর অস্বীকার করার সম্ভাবনা রহিল না, তখন প্রশ্নেই শুরু হইল গোজামিল দ্বারা 'অখণ্ড' ভারতের অখণ্ড রাজ বজায় রাখা। কিন্তু diarchey সম্ভব হইল না। কেহই ছাড়িয়া রাখিতে চাহিল না। প্রত্যেকে চাহিয়াছে অপরকে 'বাঁধিয়া রাখিতে'। মুখে মুখে মিলনের কথা থাকিলেও প্রাণ খোলা মিলনের জন্য কেহই বদ্ধপরিকর ছিলেন না। মহাত্মা গান্ধীই শুধু চাহিয়াছিলেন সহজ সরল ভাবে মুসলমানদের দাবী মানিয়া লইয়াই হিন্দু মুসলমান মিলন।

মহাত্মাজী যখন সত্য বাস্তব মিলনে ব্যর্থ হইলেন, তখনই তিনি কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইলেন। যে বিভেদ ছিল প্রাণে প্রাণে, সেই বিভেদ ফুটিয়া উঠিল রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে, অবশ্য ইংরেজদের কূটনৈতিক চালবাজীর অপ্রত্যাশী ফল স্বরূপেই। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইল। যে বিভেদ ছিল ভিতরে ভিতরে, সেটা স্পষ্ট হইয়া পড়িল। হিন্দুরা শিহরিয়া উঠিল কিন্তু বিশ্বনাথ এখানেও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। স্বয়ং বিশ্বনাথই হিন্দু মুসলমান-এক্যান্তিত ভাঙিয়া দিয়া সংঘর্ষের পথে পৃথক করিয়া দিলেন। আর হিন্দু মুসলমান আলাদা আলাদা রাষ্ট্র-গড়ার স্বপ্ন করিয়াছে। এখনও একদল হিন্দু চাহিতেছে হিন্দু রাষ্ট্র-গড়ার অর্থে হিন্দু পরিবেশন, মুসলমান চাহিতেছে মুসলমান রাষ্ট্র-গড়ার অর্থে মুসলমান পরিবেশন। 'একান্ত' তাহারা কিছুতেই হইবে না। একত্রে থাকিয়া নিত্য ছড়াছড়ি, কাড়াকাড়ি করার চেয়ে পৃথক অন্ন হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা কি ভাল নয়? নানা কারণেই ইহা সঙ্গত। একান্তবর্তী থাকিলে কেহই নিজের শক্তির ওজন টের পায় না, 'খোলে হরিবোল' দিয়া চলিতে পারে। যতদিন হিন্দু মুসলমান ইংরেজ রাজ্যে একান্তবর্তী ছিল, ততদিন ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে প্রধানতঃ হিন্দুরাই। কিন্তু যেহেতু হিন্দু মুসলমান একান্তবর্তী, সেই হেতুই ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করিয়া যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহাতে মুসলমানেরাও সমান ভাবে অংশীদার রহিবে। অর্জনে তাহারা সহযোগী না হইলেও প্রাপ্তির বেলায় তাহারা নিশ্চয়ই সম অংশীদার। একান্তবর্তী সংসারের স্বার্থান্বেষী দল এমনি করিয়াই এতদিন বুড়া মহাশয়ের উপার্জিত অর্থ তাসপাশা খেলাইয়া ভোগ করিয়াছে, যেন আজ তাদের সঙ্গে বড়া ভাগ হইল না বলিয়া বুড়ীমাকে ঘমসাইয়াছে। বুড়া মহাশয়েরা যদি এইভাবে একান্তবর্তিত্বের মোহে দীর্ঘ দিন চলিতে থাকেন, তবে একদল অপদার্থ সৃষ্টি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। প্রকৃতির বিধানে তখন 'ভিন্ন-গড়ী' করার প্রয়োজন হয়। এই তাগিদেই ভারতবর্ষের একান্তবর্তিত্ব ভাঙিয়া গিয়াছে; রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের একান্তবর্তিত্বও তাই আজ চলিতে পারে না।

কিন্তু হইয়াছে, বেশ হইয়াছে। এইবার বিশ্বপ্রকৃতি শক্তি পরীক্ষার জন্য সকলকেই আহ্বান দিয়াছেন, হিন্দুকে মুসলমানকেও। দাবিত্ব না লইয়া আজ আর কাহারও পথের মাঝায় হাত বুলাইয়া ভোগ করা চলিবে না। 'সুযোগ' আদায় করিবার পথ বিশ্বনাথ আজ নিজ হাতেই মুছিয়া ফেলিয়াছেন। আজ প্রত্যেককেই সমান ভাবে সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে। পৃথকভাবে সুযোগ সৃষ্টিতে

সম্ভব হওয়ার পর যদি বুদ্ধিতে ধরা পড়ে যে হিন্দু বা মুসলমান কাহারও এরই ইতিহাসের মধ্যে, এরই ভূগোলের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া একান্ত পৃথক থাকা কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব হইবে না, তখনই মুসলমান বুঝিবে হিন্দুর মূল্য, হিন্দুও বুঝিবে মুসলমানের মূল্য। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হিন্দু ও মুসলমানের অন্তরে তখন স্বতঃই হইবে সত্যিকার মিলনের আকাঙ্ক্ষা। প্রাকৃতিক চাপ আজ সকল দিক হইতেই নব গঠিত মুসলমান রাষ্ট্রের উপর পড়িয়াছে; তাই প্রাণ খুলিয়া আজ সেখানে জন্ম্যাজিষ্টেট হিন্দুদের আহ্বান জানাইতেছেন। স্ত্রী পুত্রের দায়িত্ব দাদার উপর ফেলিয়া দাদার সঙ্গে লড়াই সহজ, কিন্তু একই উঠানে পৃথক হইয়া এবং স্ত্রী পুত্রের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে লইয়া ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করা ভাইয়ের পক্ষে অসম্ভব। পাকিস্তানকে আজ নিজ রাষ্ট্র রক্ষার তাগিদেই ইতিহাস ভূগোলের মর্যাদা দিতে হইবে; হিন্দুস্থানকে আপন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহারই পূর্বাভাস দিকে দিকে সূচিত হইতেছে।

ভারত বিভাগ স্বীকার করিয়া কংগ্রেস ভুল করিয়াছে ঠিকই, কিন্তু ভগবান ভুল করেন নাই। সকল ভুলকে শুদ্ধ করিবার যোগ্যতা যাহার আছে, তিনিই যে ভগবান। সেদিন যদি ভারতবর্ষ দ্বিধা বিভক্ত না হইত, হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ ভারতময় ছড়াইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে থাকিত। কিন্তু ভারত ইউনিয়নে হিন্দু সংখ্যাধিক্য থাকায় ভবিষ্যতে এখানে রাষ্ট্র প্রধানতঃ হিন্দুদের হাতেই। এখানে মুসলমানেরা গায়ের জোরেও সংঘর্ষে জিতিয়া উঠিতে পারিবে না। বিশেষতঃ হিন্দুরা বহুদিন হইতে রামকৃষ্ণ নিতাগোপাল বিজয়কৃষ্ণের মাধ্যমে সমন্বয় দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছে। তাহারা আল্লা, যীশু, শিব, কালী—গান গাহিয়া একযোগে নাচিবার জন্য প্রস্তুতও হইতেছে। আজ সমগ্র ভারতের হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া পাকিস্তানেই কেন্দ্রীভূত, সমস্ত ভারতের মেঘ পূর্বকোণে পুঞ্জীভূত। পশ্চিম পাকিস্তান হিন্দু বিতাড়ন শেষ করিয়া একরূপ ইসলামরাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তাহা আর সম্ভব হইল না। পাকিস্তান প্রাপ্তির পর ৩ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখনও পূর্ব পাকিস্তানে ৮০ ৯০ লক্ষ হিন্দু রহিয়াছে। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি হিন্দু বিতাড়ন পূর্ণ হয় নাই। 'ওভার নাইট'। ঘিয়াক্তি তত্ত্বে বিশ্বাসীদের কাছে হিন্দু বিতাড়ন রূপ এই শুভ কার্যটি এতই দেরী হইয়াছে যে উহা আর হইবে না। কালই এসে অন্তরায়। বিশ্বাস-মালেক সত্তর, প্রকাশ্য তদন্ত, বিশ্বময় ছোট ঘটনাটিরও প্রচার—ইত্যাদি ঘটনা যে বাধার সৃষ্টি করিতেছে ও করিবে, তাহা উল্লঙ্ঘন করা আর সম্ভব হইবে না। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট আর দাঙ্গা সমর্থন করিতে পারেন না আন্তর্জাতিক তাগিদেই। হাজার বছরের যে ক্ষত আজ পূর্ব পাকিস্তানে জমাট বাঁধিয়াছে, পূর্ব যজ্ঞেই তাহার মীমাংসা হইবে। পূর্ব বঙ্গ আবার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেদিন দূরেও নয়।

ঘরিয়ালে দেখিয়াছি, কেমন করিয়া পানাগুলি পুষ্করিণী সাফ করিতে হয়। কলার ভেলা ভাসাগুলি বাঁধিয়া বাঁধিয়া লম্বা করিয়া পুষ্করিণীর সব পানাকে ঠেলিয়া এক কোণায় জড় করা হয়; তখন এক কোণায় জড় করা পানাকে পরিষ্কার করা সহজসাধ্য হয়। সারা ভারত রাষ্ট্রের হিন্দু মুসলমানের ঝগড়াকেও তেমনি মানুষের দুর্বলতার ফাঁক দিয়া ভারতের পূর্ব সীমান্তে বিধাতা তাহার অপূর্ব বিধানে জড় করিয়াছেন। এইবার সেইখান হইতেই হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষ তাঁর দূর করিবেন। মুসলমান যতই নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে চাহিবে, চেষ্টা করিবে ও সক্ষম হইবে, ততই হিন্দুর সঙ্গে মিলনে তাহাদের আগ্রহও জন্মিবে, এবং তাহা মর্যাদাপূর্ণও হইবে। গায়ের জোরে টানাটানি করিয়া কিংবা লড়াইবাজ পাকিস্তানকে ভাঙিয়া চুরিয়া অখণ্ড ভারত গড়িবার প্রচেষ্টার মধ্যে রহিয়াছে হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষের আরও পাকা হওয়ার সম্ভাবনাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আজ হিন্দুদের সাধনা চলিবে মুসলমানদের 'ছাড়িয়া রাখার' পথে। 'ছাড়িয়া রাখিয়া' যে 'পাওয়া', তাহাই হয় উভয়ের পক্ষে সম্মানজনক 'পাওয়া'।

এ সংসারে আর যাহারা আমায় ভালবাসে।
তারা সবাই ঘরে রাখে বেঁধে কঠিন পাশে।
তোমায় স্নেহ যে সবার বাড়া তাই তোমারি নূতন ধারা।
বাঁধ নাকো শুধিয়ে থাকো ছেড়েই রাখো দাসে।

গীতাঞ্জলি।

জীবনে 'ছাড়িয়া রাখার' পথই তিনি নির্দেশ দিয়াছেন। জীবনে তিনি অটোনমি দিয়াই পাইতে চাহেন। আজ হিন্দুরাও মুসলমানদের autonomy প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিয়া মুসলমানকে 'রাখিয়া', 'পাইবে'। 'অধিক 'বাঁধিয়া' রাখার সাধনা দিয়ে আজ অভ্যস্ত। আজ নিজেকে স্বাধীনকে ছাড়িয়া রাখার সাধনাতেই ব্রতী করিয়া লইতে হইবে।

আজ সঞ্চয় করুন

স্বল্প সঞ্চয়ের প্রকল্পগুলি জানুন

আয় বৃদ্ধি করুন

- ১, ৩, ৫, বছর মেয়াদী পোষ্ট অফিস টাইম ডিপোজিট প্রকল্প।
- বার্ষিক সুদ ৬%, ৭% এবং ৭½%।
- পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট—
- চক্রবৃদ্ধি হারে করমুক্ত বার্ষিক সুদ ৬%। সমগ্র আর্থিক বছরে ন্যূনতম ১০০ টাকা জমায় ৪½% ও ২ বছরে বন্ধ আমানতে ৪½%।
- ৫, ১০, ১৫ বছর মেয়াদী কিউমুলেটিভ টাইম ডিপোজিট প্রকল্প—করমুক্ত বার্ষিক সুদ ৪%
- ১৫ বছর মেয়াদী পাবলিক প্রভিডেন্টফাণ্ড প্রকল্প—কর-মুক্ত চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ ৪%।

কিউমুলেটিভ টাইম ডিপোজিট এবং ১৫ বছর মেয়াদী পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রকল্পে আয় করের রিবেটও পাওয়া যায়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী পোষ্ট অফিস, জেলা সঞ্চয় সংগঠনের সংগে যোগাযোগ করুন।

॥ জেলাতথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত ॥

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম গ্রাম বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

UJJWAL BHARAT

FORM IV

(See Rule 8)

	Place of Publication	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
		Bi-monthly.
3.	Printer's Name Nationality Address	Renu Mitra M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
	Publisher's Name Nationality Address	Renu Mitra M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
5.	Editor's Name Nationality Address	Renu Mitra M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	Renu Mitra M. A. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.

I, Renu Mitra, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 21st February, 1972.

Sd. Renu Mitra,
Signature of the Publisher.

গতি শক্তি সঞ্চারক

দ্রুত পদক্ষেপ আর জয়ের আনন্দে—এই অভিপ্রায়ে খাটায় খেলার জুতোর বৈশিষ্ট্যগুলি রাখা হয়েছে। ফুলন ভাট ও ইনসোল আঘাতের আঘাত থেকে রক্ষা করে। অনেকটা সন্দিহানের টেকসই বাদামী, ভারী বাদামের চেয়ারে। চলাই লোক আর ট্রিল এমন স্কোপালে তৈরি যা পায়ের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। সব মিলিয়ে অসাধারণ সমন্বয়।

সুপার স্লিপার ১৯
সাইজ ৩-১১
৯.৫০

ট্রেনিং সেলনার ১৩
সাইজ ৩-১১
১৫.২৫

স্নিকার ১৩
সাইজ ৩-১১
১২.২৫

জগ্‌স ৭৫'
সাইজ ৪-১১
২৩.২৫

হাইকার ৯৮
সাইজ ৩-১২
২০.২৫

Bata

Central Regd. No. R. N. 2571/57 Phone No. 57-2540 UJJWALBHARAT

সূচীপত্র

আমাদের কথা	১
লাঞ্ছিত বৈদিক পতাকা	৪
সংঘরত্নের অমৃতবাণী শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫
শ্রীহরপ্রসন্ন ভাবতীর্থ	
শত সাহিত্যিক আলোকে অতুলপ্রসাদ	৮
শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী	
দেশবন্ধুর সাহিত্য-সাধনা	১১
জনাব রেজাউল করীম	
বাংলাদেশের সংগঠন সমস্যা	১৫
শ্রীবাসবেন্দ্রনাথ দাস	
স্বরলীপি-কি বিদ্যালয়ের শিক্ষা	২০
শ্রীসুরোধকুমার সেনগুপ্ত	
ধ্যানের ফসল (কবিতা)	
শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্তী	
এসকানি উদ্দীপ্ত একদল পত্র	২৩
দৃষ্টি—পাঠকের সমীক্ষা	২৫
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	

16 MAR 1972

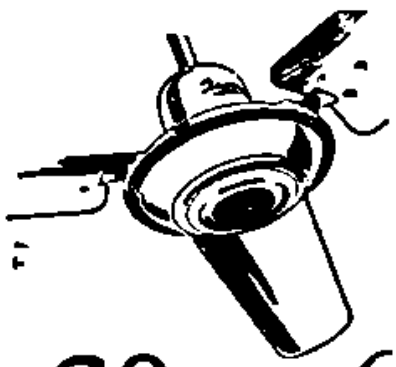

ট্রপিক্যাল

ডি লুক্স্

মাস্টার্স

ভারত ইলেক্ট্রিক্যাল

ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

এজেন্ট

বি ওভারসীজ মার্কেণ্টাইল কোং লিঃ

কলিকাতা ● বোম্বাই ● দিল্লী ● মাদ্রাজ কানপুর

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৮·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৩·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

বাংলার বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
বাংলার ঋষি	৩·৫০
বাংলার বিদুষী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৫০
জীবন গড়া	·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	২·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

উজ্জীবনের প্রতি সংখ্যা ·৮০, বার্ষিক ৫·০০

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক

"এই বিশ্বই আমার মহান

চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৮-৭৯, ১৯৭২ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র পঞ্চবিংশ বর্ষ, ২য়সংখ্যা

"তরুণ-সম্প্রদায়ের প্রতি, আধুনিক সম্প্রদায়ের প্রতিই রয়েছে আমার গভীর বিশ্বাস। তাঁদের মধ্য থেকেই আসবেন আমার কর্মীবৃন্দ। সিংহতুল্য সাহস নিয়ে তাঁরাই সমস্ত সমস্যার সমাধান করবেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ

সুভাষ লাইব্রেরী

৯২, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র উজ্জ্বলভারত চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৮-৭৯

১। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
শ্রীসুনীতি সান্যাল

২। নীলাম্বর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ৩২
শ্রীসুন্দররঞ্জন কাব্যতীর্থ

৩। প্রার্থনাকালীন ভাষণ ৩৫
শ্রীশ্রী পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত

৪। দ্বার খোলার (কবিতা) ৩৯
শ্রীআশুতোষ পাল

৫। সাধকের স্বধর্মায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
শ্রীরেণু মিত্র

৬। পক্ষত্রাতা (কবিতা) ৪২
শ্রীজ্ঞানপ্রিয় চক্রবর্তী

বিশ্ব সমবায়-আন্দোলনে ব্রিটেনের অবদান ৪৩
শ্রীঅজেশরঞ্জন দাস

৮। গ্রন্থ-পরিক্রমা ৫১
গ্রন্থাগারিক শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

অপ্রচলিত রাগিনী ৫৪
শ্রীমান

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

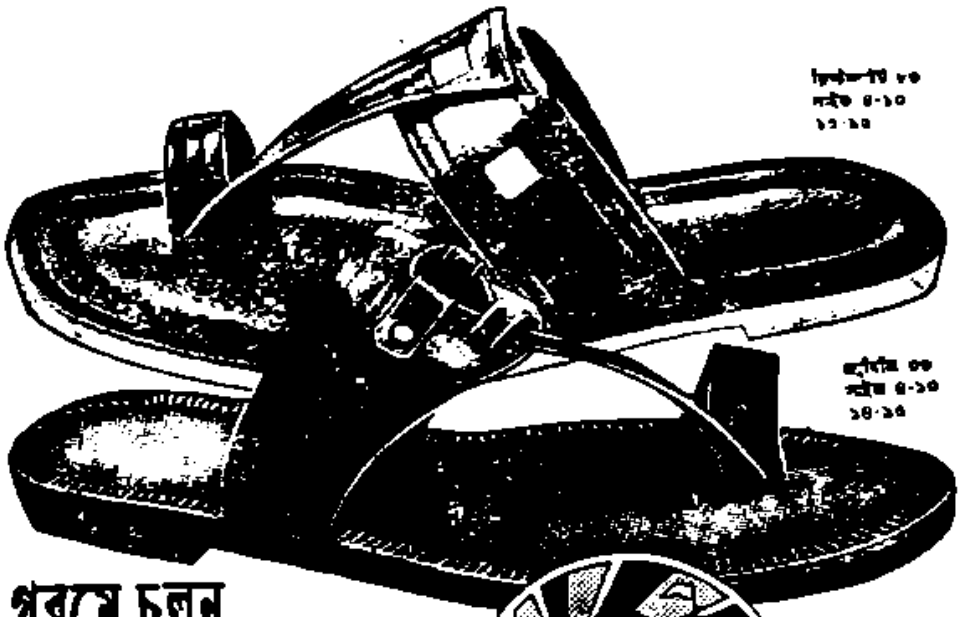

গরমে চলুন হালকা পায়ে

বাটার চপ্পলগুলির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া খেলতে পারে যাতে সারাদিন পায়ে লেগে থাকে এক হোলসমের ও চিলাব আরামে। সুশ্রী ডিজাইনে গড়ন—দেখেই বুঝবেন পায়ের আরামের কথা মনে রেখেই তৈরি। আসুনে না, একবার পরে দেখুন।

Bata

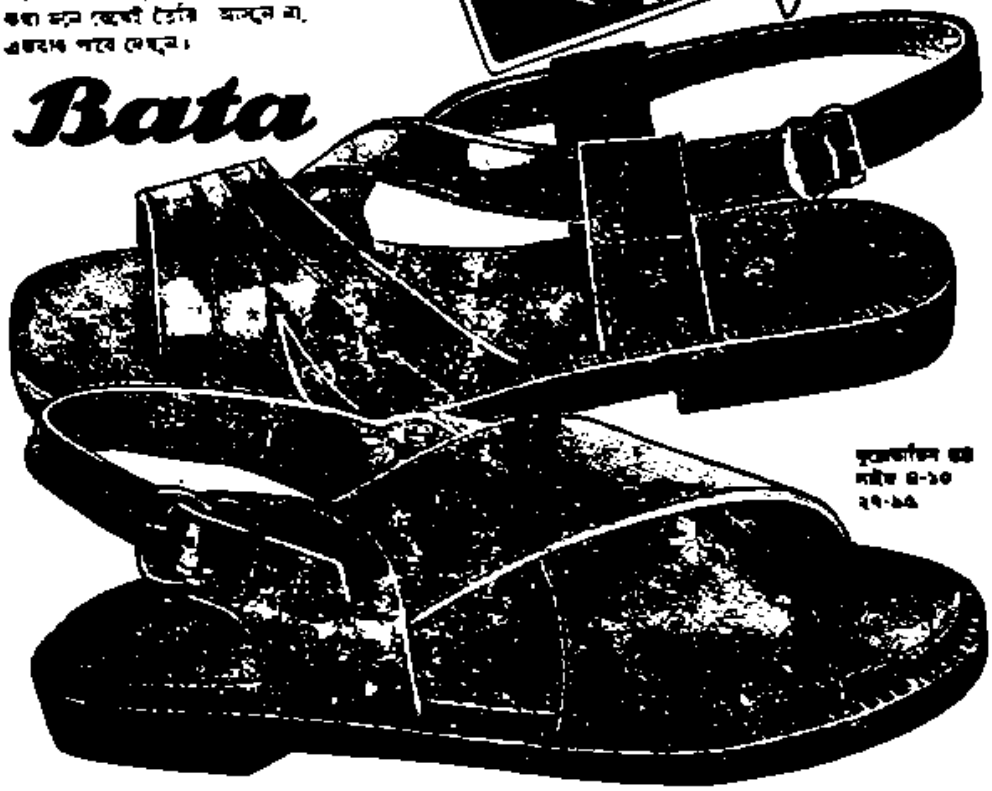

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৮·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৩·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·৫০
বাংলার বিদুষী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৫০
জীবন গড়া	·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	২·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

॥ সুলেখা মানেই উৎকর্ষ • উৎকর্ষ মানেই সুলেখা ॥

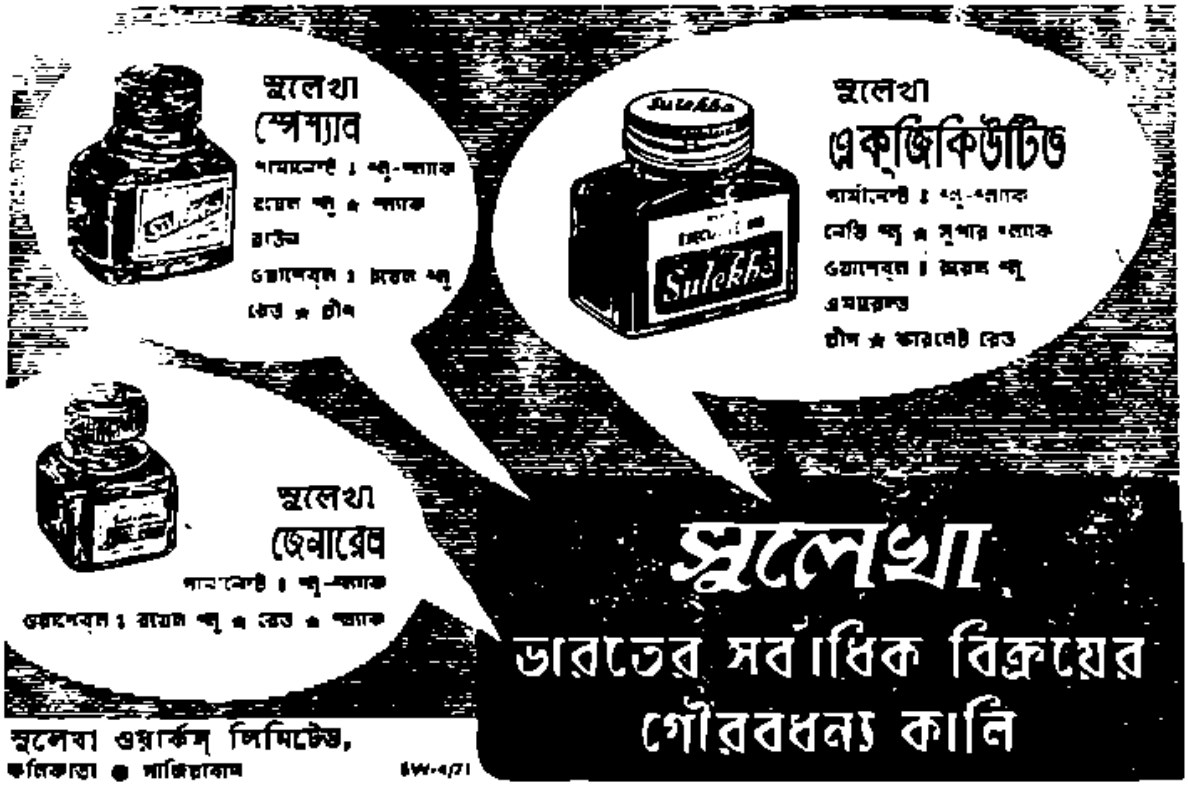

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড,
কলিকাতা ● মাদ্রিরাকাম

উদ্বোধন

চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৮-৭৯ বঙ্গাব্দ, খ্রী: ১৯৭২ পঞ্চবিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীসুনীতি সান্যাল ॥

বিশ্বের সকল দল নিয়ে যার অখণ্ড দল, যিনি সমাধিস্থ পুরুষ হয়েও মানুষের জীবনে বিশ্ব-নাগরিকত্বের কৌশল তত্ত্ব শিক্ষা দেবার কথা বলে গেছেন, সেই ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে মাটীর জগতে অবতরণ করে ছিলেন আজ থেকে ১১৭ বৎসর আগে। আজকের বাসন্তী অষ্টমী ক্ষণে তাঁকে আমরা বার বার স্মরণ করব, প্রাণের শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁকে সকলে মিলে প্রণাম জানাব।

শ্রীনিত্যগোপাল এসেছিলেন শত বৎসর পার হয়ে গেছে। আমরা জানি অবতারগণ, মহাপুরুষগণ বিশ্বের কল্যাণ করবার জন্য যুগে যুগে অবতরণ করেন। বিশ্বের মানুষের চিরন্তন চাহিদা মানুষের মত বেঁচে থাকব, আনন্দে থাকব, সুখে থাকব। কিন্তু কয়েক হাজার বছর ধরে আমাদের ধর্মীয় চিন্তাধারায় বিশেষ করে ভারতীয় চিন্তাধারায় ইহ জীবনের রূপ রসকে হেয় জ্ঞান করে তা হতে বিরত থাকাটাকেই পরমার্থ আখ্যা দেওয়া হত। মানুষের অন্তরের কান্না, তার ইন্দ্রিয় বৃত্তির কান্না এই ধর্মীয় প্রলাপে বাঁধ মানল না—ধীরে ধীরে সমাজের ভেতরে বিপর্যয় দেখা দিল। পাশ্চাত্যের চোখ ঝলসানো সভ্যতায় ভারতের মানুষ বিহ্বল—ধর্মীয় অনুশাসন ভেসে গেল—ব্রহ্মবাদ, অদ্বয়বাদ, আদর্শবাদ—সব যেন অন্তর্হিত হতে লাগল। যুগের এই সন্ধিক্ষণে শ্রীনিত্যগোপাল নেমে এলেন—নিয়ে এলেন বিশ্বের মানুষের জন্য প্রাণ-দর্শন। যদিও ভারতীয় চিন্তাধারায় এই প্রাণ-দর্শন একান্ত নূতন নয়, কিন্তু কালের প্রভাবে এই প্রাণ-দর্শনকে মানুষ ভুলে গিয়েছিল। শ্রীনিত্যগোপাল এই প্রাণকেই মূল্য করে তাঁর জীবনের কার্য্য প্রণালী দিয়ে, তাঁর অমিয় লেখনী দিয়ে মানুষের কাছে দিয়ে গেলেন।

তাঁরই স্বপ্নদ্রষ্ট শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত এই প্রাণ-দর্শনকে বিশ্বের মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, প্রাণবান মানুষ গড়বার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন আমার মত ক্ষুদ্র মানুষটীর বুকের মাঝে যিনি শ্রীনিত্যগোপালের আসন পেতে দিয়েছেন সেই পুরুষোত্তমানন্দকে স্মরণ করে আমি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হই এবং আজকের দিনে তাঁকেও আমার সহস্র সহস্র প্রণাম জানাই।

শ্রীনিত্যগোপাল এসেছিলেন ১১৭ বৎসর আগে—অথচ ভারতবর্ষের মানুষ শ্রীনিত্যগোপালকে জানে আজও এমন সংখ্যা বোধ হয় হাতে গোণা যায়। কত কত অবতার এই ভারতের মাটীতে এসেছেন—আমরা ভাবি কেন তিনি এত অপরিচিত? তিনি নিজেও স্বামী বিবেকানন্দকে একদিন বলেছিলেন "আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাঁথা মুড়ি দিয়েই যাব"। তাঁর এই কাঁথা মুড়ি দেবার তাৎপর্য্য ধরতে পেরেছিলেন শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ, তাই শ্রীনিত্যগোপালের সুন্দর সহজ মূরতিখানি বিশ্বের কাছে উদ্ঘাটিত হওয়ার পথ কেটে রেখে গেছেন। কী সুন্দর সেই মূরতি! নারী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, কুলীন-অকুলীন সকলেরই আরাধ্য মূরতি তিনি। জগতে যত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত মতবাদের যথাযথ মূল্য দিয়ে তিনি তাদের মহামিলনের কৌশল রেখে গেছেন। তাই ত তিনি সমন্বয় আচার্য্য। তিনি ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র মন্থন করে অনেক দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করে

সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য করে সাধারণ মানুষকেও উচ্চতম শিখরে পৌঁছে দিয়ে গেছেন অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন—জগতের সত্যতার প্রমাণে তিনি জাগতিক সব কিছুকে সগৌরবে মর্যাদায় স্বীকার করেছেন—মান দিয়েছেন; তাই ত দেখেছি যারা সংসারের মধ্যে পতিত, অপাংক্তেয় তারা শ্রীনিত্যগোপালের কোলে আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছে।

শ্রীনিত্যগোপালের সন্ন্যাস আশ্রমের নাম শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত। অবধূতের লক্ষণ তিনি বলছেন, 'অবধূত যোগীর ন্যায় যোগ নিয়মের অধীভূত নহেন জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নহেন, বীরের ন্যায় বল প্রকাশক নহেন, ধীরের ন্যায় সংযমাভ্যাসী নহেন, জপ তপাদি মন্ত্র-সাধকও নহেন। তিনি কোন উপাসক সম্প্রদায়ের নিয়ম নিষেধের অনুবর্ত্তী বা বিধেয়ও নহেন। তিনি শাক্ত নহেন, শৈব নহেন, বৈষ্ণব নহেন; তিনি পরমানন্দ স্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করেন'। শ্রীনিত্যগোপাল ছিলেন এই লক্ষণগুলির সাক্ষাৎ মূর্তি। তিনি শাক্ত ছিলেন না, শৈব ছিলেন না, বৈষ্ণব ছিলেন না, আবার এর প্রতিটী রূপই মানুষ তাঁর মধ্যে দেখেছে। আবার এর থেকে অতীত অবস্থা নির্বিকল্প সমাধিও যে তাঁর জীবনে কত কত বার ঘটেছে তার সংখ্যা নেই। মসজিদের সামনে দিয়ে যেতে কোরাণ শুনে সেই খানেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন, একটি উর্দুই গ্রন্থ পাঠ শুনতে শুনতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়ছেন—এমনি কত। তিনি কিছুই ছিলেন না, আবার সবই ছিলেন তিনি। অবধূত সন্ন্যাসী হয়েও আবার গার্হস্থ্য ধর্মের যাবতীয় গুণ তাঁর মধ্যে দেখা যেত রান্না করা, কুটনো কাটা ইত্যাদি কত ঘটনাতেই তাঁর জীবনের নৈপুণ্য মানুষকে মুগ্ধ করেছে। ধনীর ছেলে ছিলেন নিত্যগোপাল, কিন্তু কী আশ্চর্য্য—কোন রকম কষ্ট সহ্য করতে তিনি এতটুকু অসহায় ছিলেন না। তাঁর আশ্রমের শুধু মশলার কোনও শ্রীনিত্যগোপাল সকলের সাথে বসে গ্রহণ করেছেন—আর আমরা একটা পারি—একটা পারি না- এই ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে জীবনটাকে একেবারে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছি!

ভাগ্যিস আজকের এই দিনটিতে আমরা সকলে আবার নতুন করে ভাববার সংকল্প গ্রহণ করব। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীনিত্যগোপালের আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়ের বীজ এই নর-নারায়ণ আশ্রমে প্রোথিত করে গেছেন, আমরা তাঁদের এই আরব্ধ কর্মধারাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রত্যেককে প্রত্যেকে তৈরী করব; আশ্রম-দেবতাকে ভালবাসব, আশ্রম-সংঘকে ভালবাসব, বাংলাকে ভালবাসব, ভারতকে ভালবাসব, বিশ্বকে ভালবাসব। কেমন করে ভালবাসব? যে মন্ত্র ত পেয়েছি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শ্রীনিত্যগোপালের কাছে। আমরা সকলে মিলে তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবন-তরী নতুন করে ভাসাব। আমরা শ্রীনিত্যগোপালের কাছ থেকে কী শিখব? শিখব ব্রহ্ম-জ্ঞান, শিখব সংসার-জ্ঞান ভারতবর্ষের মানুষ হয়ে আমরা কী অবাক হই না একজন অবধূত সন্ন্যাসী যার জীবনে কত সহস্র বার নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে তাঁর কাছ থেকে সংসার-জ্ঞান শিখব? কিন্তু বিংশ-শ্রেনিক শ্রীনিত্য গোপালের অধ্যাত্মবাদে গার্হস্থ্য-বাদকে বাদ দিয়ে ছিল না। এক কথায় জীবনের কোন সত্তাকেই তিনি অস্বীকার ত করেনই নি, ব্রহ্ম-মূল্যে তার মূল্য প্রমাণ করে গেছেন।

ভারতবর্ষে মৃদুঙ্গ মঠ মন্দিরের অভাব নেই। আর শ্রীনিত্যগোপালের ভাষায় "ভারতবর্ষ ত সাধুর খনি"। কত বিভূতি কত ঐশ্বর্য্য কত অলৌকিকত্বের খবর আমরা সদা সর্বদা পেয়ে থাকি। কিন্তু বেদনার কথা, আমরা প্রচলিত শিক্ষার ধারাতে যতই শিক্ষা প্রাপ্ত হই না কেন—কোন্ সন্ন্যাসী কতখানি বিভূতিমান্ কতখানি অলৌকিক জগতে বিচরণ করতে সক্ষম আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষ মুগ্ধ হয়ে তারই হিসেব করি, আর তারই ওপর আরোপ করি ভগবত্তার চরম প্রলেপ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বর্তমান যুগ হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণের যুগ—সাম্যবাদের যুগ। এই যুগের মানুষ হয়ে এই চিন্তাধারাকে সমর্থন করে কী করে আবার বিভূতিমানতা, ঐশ্বর্য্যমানতাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা চরম অবস্থা বলে মনে করি? এতে কী আমরা বাস্তব জীবনের চিন্তাধারা আর অধ্যাত্মজীবনের চিন্তাধারার মধ্যে ব্যভিচার সৃষ্টি করছি না? এই রকম করেই

আমরা কয়েক হাজার বছর ধরে জীবনের গতিপথে চলে অভ্যস্ত হয়েছি। তাই বাস্তব জীবনে হিংসা, বিদ্বেষ, আসক্তি যাই থাকুক না কেন তাতে আমাদের জপ তপ ধ্যান ধারণা আটকে যায় না। কোটি টাকার মালিক হয়েও সন্ন্যাসীত্ব জগৎ মিথ্যাত্বের আদর্শ প্রচারে ব্যাঘাত ঘটে মানুষকে এই বিভ্রান্তির পথ থেকে টেনে তুলে আসল মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন বোধ করলেন শ্রীনিত্যগোপাল নেমে এলেন সামগ্রিক জীবন খানি নিয়ে ধরার মাটিতে। বললেন এই বিশ্বই আমার মহানন্দ। এই অবধূত সন্ন্যাসী তাঁর অন্যান্য জীবনকে ছাড়িয়েও সমাজনীতি, রাজনীতি ক্ষেত্রেও পঙ্কিলমুক্ত করবার জন্য মানুষের কাছে রেখে গেলেন সুস্থ সমাজ নীতির আদর্শ।

তাঁর জীবনেও বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের অন্ত ছিল না কিন্তু এই ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি কেমন করে বিশ্বপ্রেমের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে হয়, কেমন করে তার বিসর্জন ভাবতে হয় সেই ব্যবহার তিনি নিজ জীবনে প্রমাণ করে মানুষের কাছে পথের নিশানা রেখে গেছেন। সেদিনের একজন মানুষই তাঁকে চিনেছিলেন—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন "আরও গুটিকতক নিত্যগোপাল হ'ত"! তিনি বুঝেছিলেন শ্রীনিত্যগোপাল জীবন-দর্শন বর্ত্তমান বিশ্বের সকল মানুষের সমাধান দিতে পারবে। মহাপুরুষগণ যুগে যুগে আসেন মানুষকে প্রকৃত পথ দেখাতে। তাই শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন "তুই এসেছিস্ আমিও এসেছি"। তাঁরা দুজনে মিলিত হয়েই এসেছিলেন সমন্বয়ের পথ বিশ্বকে দেখাতে। গন্তব্যস্থলের সমন্বয়-তত্ত্ব বিশ্বকে দিয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, জটিল কুটিল পথের সমন্বয়ের কৌশল শেখাবার দায়িত্ব নিলেন সমন্বয়াচার্য্য শ্রীনিত্যগোপাল। আজ আমরা পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছি মানুষের চলার পথের ছন্দ তার আদর্শ জীবন থেকে একেবারে বিপরীত বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাই দেখতে পাই যারা জড়বাদই একমাত্র কথা প্রচার করেন তাঁদেরও আবশ্য দিনান্তে অন্তত ব্রহ্মের নাম জপ করতে আটকায় না, আটকায় না কোন বিভূতিমান সন্ন্যাসীর বিভূতি দর্শনে মুগ্ধ হতে। আবারও দেখি যারা মুখে বলেন ব্রহ্মই সত্য এ জগৎ মরীচিকা, দু'দিন বই ত নয়, এ জগতে আমরা যেন পান্থশালার পথিক—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় তারাই যেন তেন প্রকারেণ জাগতিক সুখৈশ্বর্য্য ভোগের জন্য মনুষ্যত্বলোপকারী যে কোন বৃত্তি গ্রহণে কুণ্ঠিত হন না। এই যে চলার পথের বিষম অবস্থা এরই সংশোধনের গুরুদায়িত্ব নিয়ে শ্রীনিত্যগোপাল এলেন পথ-বিভ্রান্ত মানুষের কাছে। পথের মাঝেই যদি পরস্পর পরস্পরের গায়ে ধুলো ছড়িয়ে দিই, তাহলে ধূলি-সমাকীর্ণ পথে গন্তব্যস্থল ত আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবেই। শ্রীনিত্যগোপাল তাই মায়ের মত করে ধুলো ঝাড়ার কাজটি নিলেন। তাই ত শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন "নিত্য কী আর বেছেগুছে নেবে? নিত্য পচা গোবরে ঘুঁটে দেবে" তাই ত জারজ সন্তান তারাপদ রায় শ্রীনিত্যগোপালের কোলে স্থান পায়—যাকে শ্রীরামকৃষ্ণও পরিত্যাগ করেছিলেন, পতিতা সুন্দর গোয়ালিনীও শ্রীনিত্যগোপালের স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়নি। এ রকম যে কত দৃষ্টান্ত আছে তা সামান্য লেখনীতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আবার পূর্বের কথায় ফিরে বলি—ভারতবর্ষ আত্মধর্ম্ম অজড়বাদের ধারাকে হয়ত রাখতেও পারেনি, আবার পুরাপুরি জড়বাদের ধারাকেও সামগ্রিক জীবনে ধরে রাখতে পারছে না—দুটো বাদকেই যেন ভারতীয় মানুষ সুবিধাবাদেই কুক্ষিগত করেছে। তাই নিদিষ্ট সময়ে আমরা নাম জপ সারি, স্থানে অস্থানে ঠাকুর দেবতার সম্মানার্থে প্রণামী দিতে দ্বিধা করি না, কোথাও কোন দেবতার 'ভর' হয়েছে শুনলে দলে দলে ভীড় করি, অথচ আমরা কিন্তু আসনে বসনে চলা ফেরায় একেবারে পুরোপুরি জড়বাদী! শুধু তাই-ই নয়—পাশ্চাত্ত্য জড়বাদীর জীবনে যেসব গুণ, যেসব সৌন্দর্য্য আছে, যেমন নিরলস কর্ম্মোদ্যম, সময়ানুবর্ত্তিতা, শৃঙ্খলা ইত্যাদি—অধিকাংশ আমরা এ সবের ধার ধারিনা। তাই নাম জপ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে উৎকট জড়বাদী চিন্তাধারাকে আলাদা করে রেখে জীবনকে সম্পূর্ণ অগোছালো এলোমেলো করে ফেলেছি যাকে বলে 'ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ'। এইখানেই শ্রীনিত্যগোপালের প্রয়োজন। জড়বাদের

যতখানি মূল্য দেওয়া উচিত ততখানিই সৌন্দর্যের সঙ্গে জীবনে গ্রহণ করে আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারা গীতা, উপনিষদ ভাগবতের সূত্রের মালা দিয়ে তাকে গ্রথিত করে সমগ্র জীবন-ধারার তাকে রূপ দেওয়ার ধারণা ও কৌশল-মূর্তি হলেন শ্রীনিত্যগোপাল। এই দুটো ধারা সমন্বিত হয়ে যে একটী তৃতীয় ধারা সৃষ্টি হয়ে ওঠে, সেই তৃতীয় ধারা শ্রীনিত্যগোপালে। এই খানেই তাঁর আবির্ভাবের তাৎপর্য ধরা পড়বে। তাই তিনি ভারতীয় শাস্ত্র মন্থন করে বৈদান্তিক চিন্তাধারা রেখে গেলেন অগণিত লেখার মাধ্যমে, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তো বটেই, পরেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত সকলের চোখের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন—বলে গেলেন 'আমার ফেরী করো না'। এমন জটিল কুটিল জীবনধর্ম পরিপাককারী শ্রীনিত্যগোপাল-জীবন আজ সর্ব পথহারা বিশ্বের পরম প্রয়োজন। আজ তাঁরই জন্ম-বাসরে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে আমার সকল সত্তা দিয়ে প্রণাম জানাই। তিনি বিশ্ব-জীবনে অন্তর্যুক্ত হোন। শ্রীনিত্যগোপাল বলেছেন—আমি সর্ব সম্প্রদায়ী। আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রীষ্টান—আমি বিশ্ব-নাগরিক, আমি শাক্ত আমি বৈষ্ণব, আমি নাস্তিক, আমি আস্তিক। আমি যেন বিশেষ দলের নই অথচ সকল দলের সাধুরাই আমাকে প্রেম ভক্তি ভিক্ষা দিয়া থাকেন। তাই বলি আজকের এই One world-এর যুগে এবং There is one man whose name is All men, there is one woman whose name is All women-এর যুগে শ্রীনিত্যগোপাল-দর্শনে জীবন ও দর্শন না নেলালে one world-এর স্বপ্ন ব্যর্থ।

লীলাময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

যেবতার লীলানিকেতন ও অধ্যাত্ম সাধনার পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষ। যুগপরিবর্তনে ধর্মক্ষেত্রে যখন দেখা দেয় গ্লানিস্ত তখনই অবতারবৃন্দের কৃপাবতরণ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—

"এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥"

'ইহারা (অবতারগণ) কেহ কেহ পুরুষের (ভগবানের) অংশ ও কেহ কেহ পুরুষের কলা কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। এই অবতারগণ যুগে যুগে অসুরপীড়িত ভুবনকে সুখী করেন।' সত্যই সভ্যতা সংস্কৃতির সাধনার বহুমুখী ধারাকে উজান ক'রে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ। কলুষকুহেলী দূরীভূত করে এঁরা এনেছিলেন অবনীতে অরুণোদয়। যখন 'বণিকের মানদণ্ড পহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে', সমাজে ধর্মক্ষেত্রে যখন মহাবিপর্যয়, বিশ্বের মননশক্তি ব্যর্থকাম শ্রান্ত ক্লান্ত, নতুন তত্ত্ব নিয়ে মর্ত্যে তখন নেমে এলেন তত্ত্বমূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল। পবিত্র হ'ল পাণিহাটীর মাটি, সার্থক হ'ল অন্নেজনের জন্ম, ধন্য হ'ল মাতা গৌরী দেবীর অঙ্ক। জন্মগ্রহণ ক'রল চম্পক ও গলিত সুবর্ণের তুল্য সুন্দর কান্তি শিশু—বুঝি নব গৌরাঙ্গ—এ যেন সেই বৈষ্ণব কবির ধ্যানের মূর্তি—

চম্পক শোণ কুসুমকনকাচল
জিতল গৌর তনু লাবনীরে।
উরত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনমোহন ভাঙ্গনীরে॥

অবতারদের লীলায় নিত্য নতুন অঘটন দেখা যায়।

ভগবান্ নিত্যগোপালের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভগবানের নাম যেমন অনন্ত, শুনতে পাই শ্রীগোপালের নামও তেমনি অনেক,—মায়ের দেওয়া নাম কালীকুমার, কাশীর বীরেশ্বরের প্রসাদে প্রাপ্ত বলে নাম বীরেশ্বর, কেউ দিলেন প্রসন্নকুমার, বলভদ্র, আর মাতামহী নাম রাখলেন নিত্যগোপাল—এই নামেই তিনি সর্বত্র বিদিত

যখন প্রভু মাত্র আড়াই বৎসরের শিশু তখন হঠাৎ এক অঘটন ঘটল—রোগ নাই অথচ হস্তপদ হিম-শীতল, দেহ নিস্পন্দ! মাতা মাতামহী সকলে গোপালের অকাল-প্রয়াণে আলুথালু দিশেহারা। পাড়ার প্রতিবেশী যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগী, হঠাৎ সেই সময় এক সৌম্য-সন্ন্যাসী এসে অঙ্গনে দণ্ডায়মান; তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা ক'রলেন—"শিশুর তো মৃত্যু হয় নি, এ নির্বিকল্প সমাধি" তপস্বীর কথায় মাতা মাতামহী দেহে প্রাণ পেলেন। তিন দিন পরে সেই শিশু সহাস্যবদনে উঠে বসল। অপর একদিনের ঘটনা—শিশু দোলনায় শয্যায় সুপ্ত; সূর্যের রশ্মি তার চাঁদবদনে এসে প'ড়ছে—একটী নাগ তার বিশাল ফণার ছত্র ধ'রে সেই আতপ নিবারণ ক'রছে:

'তোমায় পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল?'—রবীন্দ্রনাথ

লীলাময় নিত্যগোপালের লীলা অনন্ত। একদিনের পরিণত বয়সের দৃশ্য তুলে ধরি—এক রাত্রে চন্দ্রহরি মালী ঠাকুরের মস্তকে মুকুট, কণ্ঠে ফুলের মালা ও মুণ্ডমালা প্রভৃতির পুষ্পভূষণে মনোমোহন সাজে সাজিয়ে দিল; কিন্তু মুহূর্তপরে এক অলৌকিক দৃশ্য ফুটে উঠল। ঠাকুরের কর্ষিতকাঞ্চন-তুল্য তনু ধীরে ধীরে কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত হল—মুখে লোল-রসনা—আলম্বিত মুক্তকেশ—মালীর মুকুটের পরিবর্তে দিব্য মুকুট—চতুর্ভুজ জ্ঞানমূর্তি—আবার পরক্ষণেই দুর্গামূর্তি। ভক্ত সতীশবাবুর সাক্ষাতে এই দিব্যদর্শন।

অপর দিবসের আর একখানি চিত্র—লীলাময় নিত্যগোপাল আপন গৃহকক্ষে বিশ্রাম ক'রছেন। এমন সময় তাঁর সেবক লাটু এসে নিবেদন ক'রল, "একজন সাহেব আপনার দর্শন-প্রার্থী"। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবেশের অনুমতি দিলেন। পরক্ষণেই সাহেব উইলিয়ম সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ ক'রলেন; কিন্তু তিনি যা দর্শন করলেন তাতে তাঁর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করলেন তাঁর আরাধ্য দেব যীশুখৃষ্ট পাদপদ্মোপরি উপবিষ্ট। প্রেমাশ্রুপূরিত নয়নে শ্রীনিত্যদেবের পদপ্রান্তে পতিত হয়ে বার বার চরণ চুম্বন ক'রতে লাগলেন। শেষে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ব'ললেন—"Here is my Jesus."

লোকশিক্ষা প্রচারেতে ভক্তরূপ ধরি
করিলা অপূর্বলীলা আশ্চর্য মাধুরী।

—শ্রীশ্রীভক্তমাল

পশু, কীট, পতঙ্গের প্রতি ঠাকুরের স্নেহ ছিল অসীম। বাগবাজারের বলরামবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের ছিলেন পরম ভক্ত আবার ঠাকুর শ্রীনিত্যগোপালকেও নারায়ণের অবতার জ্ঞানে মনোমন্দিরে পূজা ক'রতেন। বলরামবাবু একদিন মনের সাধে সুস্বাদু বাস্তুহরো শ্রীগোপালের সেবা করাচ্ছেন হঠাৎ রবাট বলে তাঁর একটি দুরন্ত পোষা কুকুর ঠাকুরের পাতে খেতে আরম্ভ করে দিল। বলরামবাবু হায় হায় ক'রে উঠলেন কিন্তু পরম দয়াল শ্রীনিত্যগোপাল পরম স্নেহে রবাটকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে একসঙ্গে বিমলানন্দে ভোজন ক'রতে লাগলেন।

আর একদিনের ঘটনা: ঠাকুর স্বীয় কক্ষে প্রবেশ ক'রছেন এমন সময় ঘরের চাল থেকে একটি টিকটিকি তাঁর পাদপদ্মে প'ড়ে দেহত্যাগ ক'রল; সেই সঙ্গে এক অদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্ট হ'ল। ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গোপরি একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুচিত্র চিহ্নিত হয়েছে শ্রীনিত্যগোপালের ইচ্ছায় তুলসীতলার পবিত্র মৃত্তিকায় টিকটিকির সমাধি দেওয়া হ'ল—আর সেই সঙ্গে হ'ল দৈ চিঁড়ার মহোৎসব। সন্ন্যাস-কণ্টক ছায়াপোষ ধারণেও তিনি কোনদিন প্রয়াসী হননি। কুসুমকোমল দেহে মশক দংশন ক'রলেও তিনি থাকতেন নির্বিকার। উপনিষদীয় সর্বাত্মবাদ প্রাণের অন্নের দৃষ্টান্ত তাঁর জীবন খাতার পাতায় পাতায়—"আ খল্বঃ আ শকুনিভ্যঃ……"।

পাপী তাপীর প্রতিও ভগবান নিত্যগোপালের স্নেহ মমতার অন্ত ছিল না। একটি দৃষ্টান্ত দিই—ঠাকুরের শীতল

চরণ ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেও তাঁর এক ভক্ত পতিতালয় গমনের প্রবৃত্তি দূর করতে পারেন নি। একদিন বারবণিতার গৃহে যামিনী যাপন করে ঠাকুর দর্শনের জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি রাত্রির শেষেই কিছু অমৃতি সঙ্গে করে সোজা দক্ষিণেশ্বর আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ঠাকুরের কক্ষের দ্বার যখন উন্মুক্ত হল তখন ভক্তটি এসে একে প্রণাম করলেন; উক্ত ভক্তটির কিন্তু সাহস হলনা। ঠাকুর স্বয়ং তখন তাঁকে আহ্বান করলেন। সেই ভক্ত ভক্তিভরে প্রণাম জানালে বটে কিন্তু অমৃতি নিবেদনে ভীত হয়ে পড়ল। কাতর কণ্ঠে বললেন, "প্রভু, আমি যে পতিতালয়ের পতিতালয়ের পরিচ্ছদে রয়েছি" পতিতপাবন শ্রীনিত্যগোপাল ভক্তটীর ঠোঙ্গার অমৃতি অমৃতবৎ বোধ করেকটি ভক্ষণ করলেন। ভক্ত ঠাকুরের স্নেহস্পর্শ লাভে অভিভূত হয়ে পড়লেন; তাঁর যুগল নয়নে আনন্দাশ্রুর পুণ্য প্রবাহ প্রবাহিত হল পতিতা গোলাপ গোয়ালিনীকেও ঠাকুর এই ভাবে আশ্রমে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

"Believe! Believe! Fear not, for the greatest sin is fear. Say not you are weak. The spirit is omenipotent. Say not man is sinner, tell him that he is a God." বহুবর্ষ পূর্বেই স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীর রূপায়ণ আমরা শ্রীনিত্যগোপাল দেবের জীবনে ও দর্শনে দর্শন করি।

শ্রীনিত্যগোপালের আড়াই বৎসর বয়ঃক্রম কালে যে নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল, সারাজীবনে দেহের ভাগ সমস্তই সেই অবস্থাতেই কেটেছিল।

প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী।

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীগৌরাঙ্গের মত হ্লাদিনী রসচোর শ্রীরাধাভাবে বিভোর ছিলেন আমাদের ঠাকুর। মহাভাব তাঁর কোন্ স্তরে উন্নীত হয়েছিল সে প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করি—একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন ভক্ত ভাবাবেশে আত্মহারা হন, তাঁদের পরণের বসনের অস্তিত্ব ঘটে। সেই দৃশ্য দর্শনে পরমহংসদেব বলেছিলেন, "নিত্যগোপালের ভাব মহাভাব হয়, তাতে তার কোনদিকে কাপড় খসে না। তোদের ছটাক নটাক কি একটু হয়েছে, আর তোরা ন্যাংটো হয়ে নাচ সুরু করেছিস; পর, পালারা, কাপড় পর"। শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল এমনি ধারণা। "তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।" মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের তুল্য সূক্ষ্ম জগতে পরিভ্রমণ করে সূক্ষ্ম জগৎসমূহ মনন করে যা দেখেছেন, পেয়েছেন তাই তিনি আমাদের দিয়েছেন।

আজ কোথাও শুনি শ্রেণী সংগ্রামের ধ্বনি, কোথাও শুনি বিপ্লবের তূর্য নিনাদ, আবার মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরাজীর মুখে ধ্বনিত হচ্ছে গরীবী হটাও—অথচ 'আজি হ'তে শতবর্ষ আগে' বিপ্লবের ঠাকুর শ্রীনিত্যগোপাল সে বাণী লিখে রেখে গেছেন। তিনি ঘোষণা করে গেছেন শ্রেণী সংগ্রামের পথ প্রকৃত সমাধানের পথ নয়। সংঘর্ষ-মূলক মনোবৃত্তি সমাজ-ব্যবস্থার গোড়া থেকে উৎপাটিত করতে হবে। তিনি আমাদের সম্মুখে কুসংস্কার মুক্ত এমন একটি জীবনবাদ স্থাপন করে গেছেন যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই বরং উন্নততর পরিবারে সমাজ রাষ্ট্রজীবন রক্ষিত হ'য়ে একটি সুস্থ সভ্যতা গড়ে উঠবে মানুষ যার জন্য আজ আকুলি বিকুলি করছে।

কবিগুরু জানিয়েছেন, "নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধন নয়, আত্ম-পীড়ন নয়,- সত্যই তপস্যা, দান তপস্যা, সংযম তপস্যা। ক্রিয়াকাণ্ড স্বভাবতই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ, সে সকলের নয়; সে বিশেষ দলের অনুষ্ঠান। যে ধর্ম শুধু বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে শৃঙ্খলিত, তাতে কার কি প্রয়োজন! অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আপনার প্রাণ আহুতি দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ যে অদ্ভুত কর্ম করল তাতে আর কি এল গেল! কিন্তু যিনি সত্যকার যোগী সকলের সঙ্গে যোগে তিনি বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত; তিনি বলেন যা কিছু মঙ্গল, যা সকলের ভালর জন্য, তাই তপস্যা।—এই কথা স্বীকার করবা মাত্র সত্যতার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়"। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের মহৎ জীবনে এ সত্য সার্থক হয়েছিল—তাঁর কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল "আমি বিশ্ব-নাগরিক; এই বিশ্বই আমার মহাগৃহ"। তাইতো তাঁর

চরণ সরোজে আজি নিবেদন করি—
যুগে যুগে তুমি আসিবে দেবতা
ভক্তের কাছে দিয়েছ তো কথা
দেশ দুর্দিনে এস এস অবতরি ;
কিবা সুধা পুণঃ হয় উচ্চারিত
নিখিলের প্রাণ হোক উজ্জীবিত
পরাশান্তিতে উঠুক ভুবন ভরি

প্রার্থনাকালীন ভাষণ
শ্রীশ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত--

৮০

৫. ৫৭—(পরবর্তী অংশ)

এই তাপ তপস্যা···একটা আদর্শের জন্য যে দেহ-মন-প্রাণ জ্বলে যায় সেটা তো নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতেই পাই···। লোহাকে গলাবার মত তাপ যদি সৃষ্টি করা যায়, তাহলে আদর্শের জন্য নিজেকে গড়ে তুলবার জন্য তাপ সৃষ্টি করা যাবে না কেন? সেই রকম আদর্শভাবিত হলে স্ত্রী নূতন স্ত্রী রূপে দেখা দেয়, পুত্র নূতন পুত্র রূপে দেখা দেয়···। ওটাই তো regeneration—দিব্য জন্ম, পুনর্জন্ম···। নিত্যগোপাল সেই জীবন দান করতে এসেছেন।···তখনই ধরার ধূলিই ব্রহ্ম, ধরার মানুষই ব্রহ্ম···।

২৩. ৪. ৫৭। ওঁ···ওঁ। শ্রীনিত্যগোপাল মায়া ব্রহ্মের সমন্বয়মূর্তি—তিনি নিজ জীবনে ও দর্শনে এই দুয়ের সমন্বয় আস্বাদন করে গেছেন। মায়া-ক্ষেত্র ও ব্রহ্ম-ক্ষেত্র দুই জায়গায়ই তিনি বিচরণ করে গেছেন। মায়াব্রহ্মের সমন্বয়ই বাস্তব আদর্শের সমন্বয়।···যারা মায়া বা বাস্তব ক্ষেত্রে চলে, তারা আদর্শের প্রয়োজন মনে করে না কিন্তু যখন সঙ্ঘাতে সঙ্ঘাতে পীড়িত হতে হয়, তখন আদর্শ দিয়ে বাস্তবকে বিশুদ্ধ করতে হয়।···আমার অতীত আমি জানি না, বর্তমান অল্প জানি, ভবিষ্যৎও জানি না। অথচ··· অতীত না জানলে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যা করা যায় না···। আমার চিন্তায় অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মেলে না অথচ জীবনের মধ্যে তিনটা কাল না মিললেই বা চলে কি করে?···জ্যামিতির বিন্দু আঁকতে কেউ পারে না·· সেটা আদর্শ। তবু আঁকতে হয়···। বিন্দু জ্যামিতিতে শুধু অবস্থিতি···। এই অবস্থিতি দর্শনে স্থিতি —সৎ আদর্শের ক্ষেত্রে এই সৎ-কে তিন কালেই রক্ষা করতে হবে···। শঙ্করের আদর্শ কালের সঙ্গে adopt করতে পারে না।·· নিত্যগোপাল যে আদর্শ আনলেন তা এমন নয় যা বাস্তবের সঙ্গে মেলে না—এইখানে তিনি অদ্বিতীয়। নিত্যগোপালের আদর্শ তিন কালের বাস্তবের সঙ্গে মিলতে পারে···যে আদর্শ কলিযুগে শুদ্ধ, সব যুগেই তাকে adopt করানো যাবে···প্রত্যেক ঘটনা পরিপাক করে।···

আমি এমনভাবে আদর্শবাদী যাতে তিন কালে একটা একটানা জীবন চলে···যাদের বাস্তবের ক্ষেত্রে সব ভেঙে গেছে আদর্শ তাদের সব চেয়ে দরকার।···ভাগবত বলে এই পৃথিবীতে যখন তাপ ওঠে···ঋষিরা তখন স্বঃ ভুবঃস্বনঃ জনসত্য লোকে আশ্রয় নেন। এ তাপ সহ্য করার ক্ষমতা তাঁদের নেই ···আবার ভাগবত এক অবতরণের কথাও বলেছেন···। সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে লিখছেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বাস্তবের ক্ষেত্রে বিদ্যামায়ার স্তরে পদার্পণ করেন, অ-বিদ্যামায়া পর্যন্ত

আসিলেন না কিংবা জগদম্বা তাঁহাকে আসিতে দিলেন না। শ্রীনিত্যগোপালের স্থান ঠিক করতে এটা আমি উদ্বোধনে তুলেছি···। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অবিদ্যা মায়ার ক্ষেত্রের কোন ঘটনা সহ্য করতে পারতেন না —কেশবকে পায়ে হাত দিতে দিতেন না, তাঁহার স্পর্শে তাঁর কষ্ট হতো। শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যামায়ার সম্বন্ধ করেছেন সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহা পেছনে ঘুটে দেন সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের চতুর্দিকে বিদ্বানদের সমাবেশ- কেশব সেন প্রভৃতি...। আর নিত্যগোপালের চতুর্দিকে অমৃত, ঘানীবাবু, গোলাপ গয়লানী,···তারপর আর আমাদের মত কতক-গুলি অপদার্থ; তাতে আছে ফেলে ছেপুর, আছে একদল মেয়ে···। কাঞ্চনও তাঁর ছিল। অথচ তিনি ব্রহ্ম, ক্ষণে ক্ষণে সমাধিস্থ। এত মানুষের অত্যাচার পেয়ে উঠতেন না সহ্য করতে, তবু তিনি ভালবাসতেন।··· এতবড় দর্শন তিনি লিখে গেলেন, আলোচনা করে গেলেন না কারো সঙ্গে।·····অবিদ্যা স্তরের, কর্মের স্তরের মানুষের যা কিছু হতে হবে, তার নিশানা রেখে গেলেন।··· বিবেকানন্দের স্তর অর্থাৎ কর্মের স্তর···। ধীরেন মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, নিত্যগোপালের দর্শন দিয়েই বিবেকানন্দকে ব্যাখ্যা করা যায়।·· বিবেকানন্দকে নিত্য-গোপাল বড় ভালবাসতেন, তাঁকে বলেছিলেন, বিলে আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে যাব। বিবেকানন্দের মৃত্যুতে শ্রীনিত্য-গোপাল হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন···মানুষের কল্যাণ হতো যাকে দিয়ে এমন একজন চলে গেলেন—এই কথা তিনি বলেছিলেন।···নিত্যগোপালের মাসতুতো ভাই রামচন্দ্রর কাছে শুনেছি আমরা একথা।···দীন আমি, তবু আমার জীবনে সেই অবিদ্যামায়ার খেলাই খেলছেন।··· কৃষ্ণ তো শুধু দেবালয়েরই ঠাকুর নন —তিনি যে বেশ্যালয়েরও; যেখানে যে কাঁদছে সেখানেই ছুটে যাবার ঠাকুর তিনি শ্রীনিত্যগোপালও তাই—তাই তাঁকে পেয়ে ধন্য হয়ে গেছি আমি।···শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে অনেক বড়লোক, পণ্ডিত লোক মথুরবাবু প্রভৃতিরা ছিলেন। আর নিত্যগোপালকে ঘিরে ছিল যত অপণ্ডিত, যত মূর্খ, যত বোকা···। এই অবিদ্যাক্ষেত্রে বিচরণ করবার গুরু দায়িত্ব নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম নিত্যগোপালের কাছ থেকে ···নূতন সমাজ নূতন মানুষ তৈরী করবার ইচ্ছা ছিল। একদিন সারা বারোমাস যে রকম মনে করেছি, তাই করেছি; সবলেই তা গ্রহণ করেছে আজ এই ৫টি আশ্রমকে নিয়ে ঘড়োঘড়ি করতে হচ্ছে কর, তাদের তো নিত্যগোপাল-তত্ত্ব বোঝাতে পারলাম না? নিত্যগোপাল, তুমি আমার জীবনে যে তত্ত্ব প্রকাশ করেছ, কাউকে তো তোমার সে তত্ত্বকে জানাতে পারলাম না। তুমি বিদ্যাপতি, তুমি অবিদ্যাপতিও, তুমি ভক্ত-বৎসল, তুমি অভক্তবৎসলও···। আমি দীন— আমার অহংকার নিঃশেষ করে দাও ।···জগন্নাথকে দেখ, মন্দির গাত্রের তামসিক ছবিগুলি দেখো না··। তেমনি নিত্যগোপালকে দেখ, তাঁর চতুর্দিকের তামসিকতাকে দেখো না।·· ইচ্ছা হয় I will fall upon the society as a tounderbolt···সেদিন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে বলেছিলাম বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদরের মত আমি তাঁর নূতন সমাজ তৈরীর কাজ নেব।

২৪. ৪, ৫৭—উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে—ন তত্র সূর্য ভাতি, ন চন্দ্র তারকম্, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নি! তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্ তস্য ভাসা সর্বমেব বিভাতি—সেখানে সূর্য আলো দেয় না, চন্দ্র তারকা দেয় না, অগ্নি আর কোথা থেকে দেবে? তিনি আলো দেন বলে এই সমস্ত যা কিছু প্রতিভাত হচ্ছে...। যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করেছেন গার্গীকে—সূর্য অস্তমিত হলে কে পথ দেখায়?—চন্দ্র। চন্দ্র গেলে?—তারকা। যেদিন মেঘবাদলে তারকাও থাকে না?—অগ্নি। মেঘে আগুন নিভে গেলে?—বাক্য, শব্দবাক্য। তাঁর প্রকাশে বিশ্ব প্রকাশিত। পথ চলার সুযোগ যখন মানুষের বন্ধ হয়ে যায়, তখন কে পথ দেখাবে?—শব্দবাক্য। সূর্য উঠলে আমির সঙ্গে পথ চলার অনেক সুযোগ। সূর্য যখন নেবে? জীবনে চাঁদও যেদিন ওঠে না? জীবনে এমন দিনও তো আসে?···দিনে নিজে পথ দেখে শুনে নিতে পারি, এক পথ ভুল করলে আর এক পথ ধরি—কিন্তু যেদিন জীবনে অন্ধকার নেমে আসে? সে অন্ধকারে, আমার আমি ঘিরে তো আর পথ চিনে নিতে পারি না?···তারকা, অগ্নি

পর্যন্ত সব আমির প্রকাশের সুযোগ।...কোনো সুযোগ সেখানে নেই...সেখানে পথ দেখাবে কে?—গুরুবাক্য। নিজের জীবনে দেখেছি সব সুযোগ হারিয়েছি অর্থাৎ নেই নি—একদিক দিয়ে খুব বিপদ...আবার দেখি পথ খুলে যাওয়ার সুযোগ হয়ে গেল। কলিতে এই সুযোগ—আমিত্বের প্রকাশের সব সুযোগ—শুরু! মনে হয় নিরন্ধ্র অন্ধকার...তখন কোথা থেকে ভেসে এল, 'পথিক, এই দিকে পথ'।...এই বাক্য আসে—যুগে যুগে এসেছে—এই বাক্যেই বাঁচার স্বপ্ন, এই বাক্যই গুরু-বাক্য। ঐ রকম অসহায় অবস্থা মানুষের আসে, কিন্তু মানুষ বোঝে না ওরই ফাঁক দিয়ে আবার তিনি নেমে আসেন।...চতুর্দিকে যেদিন আশা করবার আর কোন কারণ নেই, কোন পথ নেই, সেদিন স্বর্গের দুয়ার খুলে গেল। বাইরের কড় আসে 'আমি'-টাকে শেষ করে দেবার জন্য। সমস্ত সুযোগ নষ্ট হয়ে গেলেই গুরুর দয়া আসবার পথ হয়। এ রকম অসহায় অবস্থায় একটা স্থানে বিশ্বাস করতে না পারলে—এমন স্থানে যেটা মহৎ প্রাণের ঔদার্যে, বিবেচনার বিস্তারে বড়—এমন একটা স্থানে বিশ্বাস করতে না পারলে পথ আসে না ...রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ,...'ঘরে আমার মা আছে রে শমন আমায় নিতে পারবি না রে'...এ রকম বিশ্বাস বড় একটা স্থানে রাখতে হবে।...সমস্ত কিছুর বাইরে নিত্যগোপালের সেই কথাটা আমাকে সারা জীবন আশ্রয় দিয়েছে—সেই মন্ত্র, নিত্যগোপালের মুখ দিয়ে নিজের কানে শোনা সেই মন্ত্র—'ভয় কি, টেনে তুলব'।...কেমন লেগে গেল—রাজনীতিতে বলেছি আমি সাগরে ডুবে গেলেও সেখানে চড়া পড়বে।...বুদ্ধির অহংকারের চাপ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ এ বিশ্বাস, এ নির্ভরতা আসে না।...দ্রৌপদীর সেদিন কোথাও সুযোগ ছিল না, ভীষ্মের মত আলোও দ্রৌপদীর কাছে সেদিন নিভে গিয়েছিল—রাজা স্বামীরা তো গেছেই—নিজের বস্ত্রখানা পর্যন্ত কেড়ে নিচ্ছে—কী কল্পনাতীত দুর্যোগ—তখন দুই হাত তুলে দ্রৌপদী বললেন, গোবিন্দ, গোবিন্দ!—করুণা নেমে এল।...হরপাড়ার কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলেছিলেন, দীননাথ বলি—আমরা কি দীন হয়েছি? আমাদের বুদ্ধি আছে, অহংকার আছে...কিছু থাকা পর্যন্তই তো দীন হওয়া হয় না।...'আমার সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব করিতে চূর'।...যাদের জীবনে যত করুণা, তাদের জীবনে তত সর্বনাশ হয়ে যায়'...আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্য বিবর্জনম্ ...রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ তৎ ক্রিয়াসু আত্মনিক্ষেপনম্। সংকল্প মানে স্বীকার করে নেওয়া...তুমি আমার রক্ষক এই বলে তাঁকে বরণ করব। আত্মসমর্পণ করব—একটা বড়র মধ্যে, ব্যাপকতা গভীরতার মধ্যে নিজেকে প্রস্থাপন করব। ...ভয় নেই, আমি তাঁর—এই বুদ্ধি বা বিশ্বাস যদি এসে যায় তাহলেই নিশ্চিন্ত ...জীবনের সর্বাবস্থায়ই কোলে করে রাখবার লোক থাকে...যেখান থেকে বাঁশীর আহ্বান আসে। ...বর্তমান যুগের মানুষের চরম অসহায়তার মধ্যে পথ দেখাতে নিত্যগোপাল এসে দাঁড়িয়ে আছেন—যদি কেউ তাঁকে ডাকে, যদি কেউ তাঁর ডাক শুনতে পায় এখনও যারা আমায় ভিক্ষে দেয় তারাও বন্ধ করল প্রায়...। নিত্যগোপাল, এখনও পরীক্ষা করতে চাও? করে দেখো। ...তোমার চরণতলে পড়ে থাকব—তখন মুছে যাওয়া পথ আবার ভেসে উঠবে। নিত্যগোপাল-বাণী জাগ্রত হোক, সেই বাণীর কাছে আমরা সকলে আত্মসমর্পণ করব।

২৫, ৪, ৪৭ উপনিষদে আছে—প্রশ্ন হল—কস্মিন্ সত্যম্ প্রতিষ্ঠিতম্?—সত্য কার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত? উত্তর এল—হৃদয়ের মধ্যে। হৃদয়েতেই সত্য তার আসন কায়েম করে বসেছে। কলিযুগের ঠাকুর হৃদয়রঞ্জন—তেনে ব্রহ্ম হৃদা—যত কিছু বড় সব হৃদয়ের ভিতর দিয়াই পুরুষোত্তম বিস্তার করেছেন। উদ্ধব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিং সত্যম্—শ্রীকৃষ্ণ জবাব দিলেন সত্যং চ সমদর্শনম্। সমদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয় হৃদয়ের মধ্যে।...হৃদয়ের মজাই সে সকলের দাবী সম ভাবে দেখে—নরনারায়ণে সংসার সন্ন্যাসে, শুচি অশুচিতে, তোমার প্রয়োজনে আমার প্রয়োজনে সম দৃষ্টি... হৃদয় দিয়ে মনের রোগ কাম দূরীভূত হয়...আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি হল কাম—রাসলীলা শুনলে কাম দমন হয়.....স্ত্রীকে অগ্রাহ্য করা কাম, আবার নিজের অস্তিত্ব লোপ করে স্ত্রীকে দেখা কাম...।...স্ত্রী পুরুষে সম দর্শন।...কামের তিনটী অধিষ্ঠান—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি। কৃষ্ণ

বলছেন, অর্জুন, বুদ্ধি তুমি আমার মধ্যে ডুবিয়ে দাও—আমি হৃদয় কাকে বলে আর একজনের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করে নিজের দৃষ্টিতে দেখা।...রাজা চেপে ধরেছিল প্রজাকে··· তার প্রতিক্রিয়ায় প্রজা চেপে আজ ধরেছে রাজাকে···দুই-ই বুদ্ধির খেলা—কোনটাই সুস্থ অবস্থা নয়।···আজ হৃদয় দিয়ে সমাজ গড়তে হবে—হৃদয়ের কথা হল তুমি না হলে আমি বাঁচি না, আমি না হলে তুমি বাঁচ না। সকলের সম্বন্ধেই এই হৃদয়, এই প্রাণ, এই বুদ্ধি এলেই সমাজে শান্তি আসবে সুস্থতা আসবে। তখন পরস্পর পরস্পরকে মর্যাদা দেবে, তার অস্তিত্বকে লোপ করে দেবার অভিসন্ধি করবে না। শুচির ওপর বেশী জোর দেওয়া হৃদয়-ধর্ম নয়—ওটা বুদ্ধিরই খেলা।···সমগ্র জীবনের স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে হলে অশুচিতাকে ঘৃণা করা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবই হবে না। ···বুদ্ধির তিনটা স্তর করেছে বর্ণাশ্রম—তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী।···সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে সকলকে সব করার মত একটা বুদ্ধিগত প্রসেস আছে বটে কিন্তু হৃদয়ের স্পর্শ না থাকায় সেটা বাইরের শোভামাত্রে পর্যবসিত হয়।···পচা গোবর আর মাছের জলও সার যদি তাহলে তাদের যথাস্থানে তাদের মূল্য স্বীকার করতেই হবে।···কিন্তু বুদ্ধি যখন ঐকান্তিক হয় তখন পচা গোবর আর মাছের জল সার হয়, পুরুষ প্রকৃতি সমান···এসব কথা বুদ্ধিতে বোঝে, কিন্তু হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছায় না ...বুদ্ধি একটাকে বড় করে দেখে, অন্যগুলিকে চাপা দেয়।...আমি এ কাজ পারি না—দায়িত্ব আছে, পার না কি রকম? বুদ্ধি বদলালেই পার—অহংকার ছাড়তে পারলেই পারবে। নিজের অহংকার থেকে এক তিল নড়তে চাও না বলে পার না, নিজের প্রকৃতিকে একটুও বদলাতে চাও না তাই বলছ পারি না—পারবার সাধনা নিলে অনেকখানিই পারবে অনেক মানুষ অনেক জিনিষই পারে না, আবার ঠেকলে পারে, দায়িত্ব বোধ থাকলে পারে, উচ্চ জীবন যাপনের সংকল্প নিলে পারে ··। নিত্যগোপাল হৃদয়ের ভাষা দিতে এসেছেন।··· ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচর, কিন্তু মহাবাঙ্মনসের অগোচর নহেন ···বুদ্ধির কচকচানিতে তিনি আসেন না···তিনি মহাবাক্যের গোচরে আসেন—বুদ্ধির ভাষায় তাঁকে ধরা যায় না।···পারি না এটা কর্তৃতন্ত্র, বস্তুতন্ত্র নয়।···হৃদয়ের সাধনা নিলে অনেক কিছু অনেক মানুষ পারে···হৃদয়ের সাধনা গ্রহণ কর দুজন একত্র হয়ে থাকতে পারবে না? বোকা গেল হৃদয় আসে নি।···মানুষ নিজের কথা বলতেই ব্যস্ত···হৃদয় জাগ্রত হলে অন্যের কথাই শুনবার ভাবনায় আসতো...You must rise above yourself—above your intellect, above your convention ··। এসেছে আদেশ বন্ধের বন্ধনকাল এবারের মত শেষ। বন্ধন হচ্ছে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধির আশ্রয়··অর্জুন তো পারি না বলে কত কথাই বলেছিলেন—অর্জুনের বুদ্ধিতে পারেন না—কৃষ্ণের বুদ্ধি নিলেই পারেন—পেরেও ছিলেন অর্জুন।···সংসারে থাকতে হলে অনেক কিছু পারতে হয়···। ছেলেমানুষী অনেক করেছ, এখন জীবন সম্বন্ধে সচেতন হও।···আর সময় নেই সময় নষ্ট করার মত···। সত্য খুঁজে দেখ..। কে অপরের কথা ভেবে থেকে?···কোন্ স্বামী স্ত্রীর চোখের জলের খোঁজ রাখত আগেকার দিনে? এখনো অনেকটা তাই; আবার একদল হয়েছে স্ত্রীর কথায় ওঠে বসে—ভালমন্দ বিচারবুদ্ধি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। মর্যাদা দেব, স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করব আবার আমার অমর্যাদাও হতে দেব না—আমার স্বাতন্ত্র্যও নষ্ট হতে দেব না—এই দৃষ্টি ও ব্যবহার আনতে হবে।···কৃষ্ণ-রাধা-তত্ত্ব এই সমদর্শনের তত্ত্ব।···মুক্ত না হলে সমদর্শন হয় না।···ব্যতিরেক সাধনা—একজনকে ছেড়ে আর একজনের সুখ ও আনন্দে থাকার সাধনা—নিতেই হবে···আবার একত্রও থাকতে হবে।···এ না হলে সমদর্শন আসবে না ···সমাজের চতুর্দিকে পুঞ্জিত কালো মেঘ—প্রয়োজন একটা ঝড়ের···হৃদয়ের ঝড় বইয়ে দিতে হবে...। ঝড় এসেছে—বন্যা নেই···। সমগ্র সমাজ পুতি-গন্ধময়···একটা ঝড় চাই, বিপ্লব-প্লাবন—হৃদয়ের প্লাবন...। নিজের কথা বলো না—বিশ্বের কথা কও।···হৃদয় দিয়ে মিলতে শেখো।...সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগেই বুদ্ধির সাধনা করেছে মানুষ—আজ কলি যুগে হৃদয়ের সাধনা নেবে সমাজের সকল মানুষ।···বুদ্ধি বুর্জোয়া···টাকা বুদ্ধি এক জাতীয় জিনিষ সত্যিকারের প্রলেটারিয়েট যদি

হতে চাও, হৃদয়বান হও, হৃদয়ের উপর জোর দাও ....বুদ্ধি লয় কর....। তোমার পক্ষে যা অশুচি, গাছের তা পাত্র .. সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ..তোমায় কে কেমন করে ব্রহ্ম তার খোঁজ কর....। ঝড় নেমে আসুক, হাওয়া পবিত্র হোক ...ভুলে যাও নিজের অভিমান, ভুলে যাও তুমি দীন হীন.... অপমান ও সম্মান—এ দুয়ের অপ ও দম কাটা যাক, বিশ্বে থাক শুধু মান ..superiority complex, inferiority complex দুই থেকেই মানুষ মুক্ত হোক 'হৃদয় নিয়ে দেখ না ভুবনখানা'—হৃদয়ের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হও—ব্রজলীলা জীবনে স্ফূর্তিলাভ করুক

হায় বাঙলায়

॥ শ্রীআশুতোষ পাল ॥

(বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে লেখা)

কুলু কুলু গান গেয়ে একদিন যে রূপোলী নদী
বয়ে যেতো এইখানে, বেতস ঝোপের তলে তলে
পাখীর কূজনে ঘুম ভেঙে যেতো, নবদূর্বাদলে
শিশিরের অশ্রুকণা নব সূর্যোদয়ে নিরবধি
ছড়াত হাসির আলো, আকাশের চন্দ্রাতপে যদি
ফুটতো তারার ফুল, এই ভরা বুকের অতলে
কী গভীর ভালোবাসা দিয়ে তারে গোপনে, সবলে
একান্ত আপন করে রেখে দিত আনন্দিত নদী।

হায়, বাঙলায় মেঘে ঘন অন্ধকার নেমে আসে,
এ নদীর ক্ষুদ্র বুকে নাচে না তারার ফুল, ঘুম
ভাঙে না পাখীর গানে, শিশিরের হাসি নিঃশেষিত—
রোমাঞ্চিত এই রাত্রি তন্দ্রাহীন, নিশ্চুপ, নিঝুম।
একটু আলোর শিখা পূর্বাচলে ফুটবে, তৃষিত
দুই চোখে ক্ষীণ আশা—যদিও বা কেঁপে কেঁপে উঠি ত্রাসে—।

সামঞ্জস্যের সুষমায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

মানুষ আনন্দের প্রয়াসী, কিন্তু আনন্দ কি করে পেতে হয় তা তার জানা নেই। আসক্তি বিদ্বেষ লোভ ঘৃণা বিরক্তি ভয় হিংসা দুর্ভাবনা, ভাবে লাগা মন্দ লাগার তীব্রতা, এটা পাওয়া সেটা না পাওয়ার fixity—তা কি দেহের কি মনের—মানুষকে বিশ্বসত্তার আনন্দ-রস থেকে বঞ্চিত করে। বস্তুর স্বরূপকে ধরতে না পারলে বস্তু থেকে আনন্দ পাওয়া যাবে কি করে? প্রত্যেক মানুষ তার তার আমি দিয়েই বস্তুকে পেতে চাইবে, এ যেমন ঠিক—তেমনি মানুষ যার যার মত করেই বস্তুকে পুরোপুরি পাচ্ছেও না তাও ঠিক, তবু কিছু পাচ্ছেই। সব মিলিয়ে এইটেই প্রমাণিত হয় বস্তুর নিজস্ব একটা রূপ আছে। আমরা বস্তুর সেই নিজরূপ ধরতে পারি না বলেই বস্তুকে পাওয়ার চেষ্টায় আমরা নাজেহাল হই। বিশ্বের রস-সত্তাকে পেতে চাওয়াটাই নাজেহাল হওয়া নয়—আমরা ভুল পথে পেতে চেষ্টা করি বলে নাজেহাল হই। বস্তু স্বাধীন, আমার রস-আস্বাদন প্রবণতাও স্বাধীন—দুই স্বাধীন সত্তার মিলনের পথ একজন দাস, আর একজন প্রভু হলে মিলনের যে পথ হত তার থেকে নিশ্চয়ই আলাদা কিছু। রাজায় রাজায় ব্যবহার যেমন রাজায় প্রজায় ব্যবহার থেকে আলাদা—তেমনি স্বাধীনে স্বাধীনে প্রেম নিশ্চয়ই স্বাধীনে অধীনে প্রেমের থেকে আলাদা। এ বিশ্বে প্রত্যেকে স্বাধীন, প্রত্যেক মানুষ যেমন স্বাধীন, প্রতি বস্তু-সত্তাও স্বাধীন—আবার যেহেতু একে অপরকে পেতে চাইছে সেইহেতু একে অপরের অধীনও বটে। এই যে দুটো অবস্থা—এ দুটো অবস্থাকে বজায় রাখতে পারলেই বস্তুর রসাস্বাদন সম্ভব—'তখনই ভুবন হয় মধুময়'। মধুময় বিশ্বের মধু-আস্বাদন করতেই এ বিশ্বে মানুষের অন্তরে বাহিরে আহ্বান—কিন্তু তার ছন্দ না জানায় দুর্গতি ভোগ করে কতেরা দেয়—বস্তু বিশ্ব, তা উচ্চ জীবনে সর্বথা পরিত্যাজ্য।

আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিশ্বের ঐ মধু আস্বাদন করবার ছন্দ রেখে গেলেন সুন্দর সহজ মানুষ ভগবান নরনারায়ণ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল। রস কেবল বাইরের বস্তুতেই নেই, রস আছে অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়ে ধ্যানস্থ হওয়ার মধ্যেও। শ্রীনিত্যগোপাল অন্তরের গভীরতম স্তরে ডুব দিয়ে আত্মস্থ হওয়ায়, নিজের মধ্যে নিজে তৃপ্ত থাকবার, আনন্দিত থাকবার কথা যেমন তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, আবার বাইরের জগতে প্রকৃতির মধ্যে কেমন করে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেও আনন্দিত থাকা যায়—আসক্তি বিদ্বেষের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে হাবুডুবু খেতে হয় না, তার পথও রেখে গেছেন। কোনো ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতে আটকে যান নি বলে নিত্যগোপাল একজন সহজ সুন্দর মানুষ-ভগবান। প্রকৃতির মধ্যে বিশ্ব-নাগরিক হয়ে বিচরণ করেন তিনি তাই তিনি মানুষ, আবার আত্মানন্দে বিভোর হয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হতেও তিনি পারঙ্গম যেমন, তেমনি প্রকৃতির ক্ষেত্রে থেকেও তিনি মুক্ত থাকতে পারেন—তাই তিনি ভগবানও। রূপে অরূপে, বাস্তবে আদর্শে, সীমায় অসীমে মিলিয়ে তিনি একখানি মুক্ত সত্তা—আনন্দিত সত্তা—যিনি একক আবার যিনি ছোট বড় সকলের মধ্যে। এই যে সহজ মুক্ত জীবন এইটে আজ মানুষের সত্তা চাইছে—কোন কিছু দিয়ে নিজেকে আটকে রাখতে আজকের মানুষের পছন্দ নয়—কোন ভাল দিয়েও নয়, কোন মন্দ দিয়েও নয়। অথচ এই সঙ্গে থাকতে হবে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধে কল্যাণ-বুদ্ধি, সেবা বুদ্ধি—এই মুক্তি অথচ বিশ্বকল্যাণ-বুদ্ধি শ্রীনিত্যগোপালকে সন্ন্যাসী-গৃহী সকলের প্রিয় করেছে, আরাধ্য করেছে এবং এইজন্যই আজকের মানুষের ওঁকে প্রয়োজন। এই সর্বসংস্কার মুক্তিই যে মানুষের অন্তরাত্মা চায় সেটা মানুষ ঠিক জানে না—অথচ তার ঘরে বাইরের

সকল প্রচেষ্টার মধ্যে এই খোঁজারই ছাপ—তাই শ্রীনিত্যগোপাল আজও মানুষের কাছে তেমন পরিচিত নন। ভবিষ্যৎ মানুষের দেবতা শ্রীনিত্যগোপাল। আজকের মানুষের মধ্যের অসঙ্গতি অনেক কেন না সে ঘরে বাইরে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র বিচরণ করবার আহ্বান যেমন শুনছে, তেমনি পথের খোঁজও পেয়েছে—কেবল মেলাতে পারছে না—ঘরের সঙ্গে বাইরেকে, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টিকে নিজের ভোগাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ-বোধকে মিলিয়ে নিতে পারছে না। অর্থাৎ মানুষ দেখছে তার ভিতরে বাইরে পরস্পর-বিপরীত কতকগুলি বৃত্তি বা প্রবণতা প্রকাশ পাচ্ছে—বড় করে দেখতে গেলে, গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্রদৃষ্টি পরিত্যাগ করলে ঐসব পরস্পর-বিপরীত প্রবণতাগুলি যে আমাদের প্রয়োজন তা-ও মানুষ বুঝতে পারছে—কিন্তু মেলাতে পারছে না। এই মেলাবার বুদ্ধি আজ শিখতে হবে—মেলাবার বুদ্ধি নেই বলেই তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত উৎকর্ষের মধ্যেও মানুষ শান্তি পেল না, অপরকে হনন করে নিজের ভোগ বাড়ানর বুদ্ধি মানুষ ছাড়তে পারল না—তাই চাঁদের পথে অহং কল্পনাতীত বেগে ছুটে চলেছে যে যানখানি তার বহিরঙ্গের ক্ষত সারাতে একটী মানুষ শূন্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঐ যানের সঙ্গে সমান বেগে ছুটেও দ্বিত হয়ে নিজের কাজ করে যাচ্ছে—অথচ এই মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষাই অপরের স্বাধীনতা হরণ করে তার উপরে বোমাবর্ষণ করতেও এতটুকু লজ্জিত হয় না—এই যে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কল্যাণবুদ্ধির সঙ্গে, হৃদয়ের ঔদার্য ও বিস্তারের প্রেমধর্মের সঙ্গে মেলাতে পারল না—এইখানেই তো মানুষের পরাজয়। শ্রীনিত্যগোপাল এই পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত করবার জন্য ব্যক্তি সমষ্টি জীবনের প্রথম থেকেই দ্বিমুখী সাধনা নিতে বললেন—একদিকে অহং ব্রহ্মাস্মি—আর একদিকে আমি বিশ্ব-নাগরিক। মানুষের মধ্যেকার ব্রহ্মবোধ না জাগালে কল্যাণ-বুদ্ধি আসে না, কল্যাণ-বুদ্ধি না আসলে বিশ্বের মানুষ ও বস্তুর প্রতি সেবাবুদ্ধি জাগ্রত হয় না, সেবাবুদ্ধি জাগ্রত না হলে অহংসর্বস্ব মন দিয়ে যা হয় তাতে জড়বাদ একান্ত হয়ে পড়ে, আর তার ভারে মানুষের শান্তি সুখ চাপা পড়ে যায়। আজ বিশ্বে চলছে এই অবস্থা! আর প্রতি মানুষই যে বিশ্ব-নাগরিক এ বোধ না জাগাতে পারলে ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হয় না—ভোগাকাঙ্ক্ষাকে যদি বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে না পারি, আমার ভোগ তখনই সত্য ও সুন্দর যখন তা অপরের ভোগকে রক্ষিত করে হয় না—আমি বিশ্বের একজন হয়েই আমি সত্য আমি—এ বোধ জাগাতে না পারলে মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষার সামঞ্জস্য বিধান হয় না। তখন ব্যক্তি বা দলের ধাই-ধাই বন্ধ হয় না বলেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শত উন্নতি সত্ত্বেও শান্তির সন্ধান কোথাও মেলে না। ভগবান মানুষকে ভাল গুণও অনেক দিয়েছেন, আবার সেই মানুষের মধ্যে দোষও অনেক দিয়েছেন, এমনি বিপরীত ধর্মগুলি তার মধ্যে দিয়ে তাকে এই স্বাধীনতাটুকু দিয়ে দিয়েছেন যে, এই ভাল ও মন্দ বৃত্তিগুলিকে সে যেভাবে খুশি প্রয়োগ করতে পারে—যদি সে দোষগুলিকে বাড়তে না দিয়ে তার ভেতরের গুণগুলিকে বাড়িয়ে তুলে যাতে তার ব্যক্তির ও তার সমষ্টির কল্যাণ হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে চলে—তাহলেই হল মানুষ জীবনের সার্থকতা। আর দোষগুলি বাড়তে চায় বলেই যদি বাড়তে দেই তাহলে শেষ পর্যন্ত নিজেও ধ্বংস হই, সমাজকেও বিষাক্ত করি। এই যে দুই রকম প্রবৃত্তি এদের সামঞ্জস্য করা যায় কিভাবে তারই দৃষ্টান্ত শ্রীনিত্যগোপাল। তাই সামঞ্জস্যের সুষমায় তিনি সহজ মানুষ, পরম সুন্দর। সহজ হওয়াতেই সৌন্দর্য—ভগবান-প্রদত্ত বৃত্তিগুলির অযথা কোনটাকে একান্তভাবে বাড়িয়ে কোনটাকে বা অযথা একান্তভাবে চেপে দেওয়াতে জীবনের সহজভাব নষ্ট হয়ে যায়। তাতেই জীবনের মধ্যে বিকৃতি আসে। এই বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পেতেই নিত্যগোপাল বার বার সমন্বয় করতে বলেছেন, সমন্বয় করতে পারলেই জীবন সহজ হয়। আজকের দিনে চাই সহজ জীবন যার মূল হচ্ছে যে কোন বিষয়ে অতি-মানসিকতা থেকে আত্মরক্ষা করে সব ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য করার প্রচেষ্টা। শ্রীনিত্য-গোপালের জীবনে তাই পাই—একদিকে অন্তরের গভীর

হতে গভীরতম স্তরে ডুব দিয়ে তিনি একত্ব, সমাধিত্ব — আর একদিকে আবেষ্টনকে নিয়ে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, নিপুণতা ও সামগ্রিক কল্যাণবুদ্ধি সেবাবুদ্ধির প্রাণ নিয়ে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের সঙ্গেও বিচরণশীল। তাদের সঙ্গে মিলে মিশে প্রাণের আঁচ দিয়ে তাদের উপরে তুলবার যেমন তাঁর প্রচেষ্টা, তেমনি আসক্তি বিদ্বেষ অহংকার ক্রোধ হিংসা দিয়ে যারা আচ্ছন্ন, কিংবা অন্ধ অশিক্ষিত এদের কারোকেই ঘৃণে সরিয়ে রাখা ধার্মনিক ভাবেই আজ যে আর সম্ভব নয়—এটাও নিত্যগোপাল ধার্মনিক ভাবেই প্রমাণ করে গেছেন। তাই তিনি বর্তমান যুগে-দেবতা। আজ তাঁর ১১৭-তম জন্মদিনে তাঁকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম, সকল সত্তা দিয়ে প্রণাম; আর সেই সঙ্গে এই সংকল্প আজ গ্রহণ করি যে নূতন মানুষ হব, নূতন মানুষ নূতন সমাজ গড়ে তুলব।

পঞ্চভ্রাতা

॥ শ্রীজ্ঞানপ্রিয় চক্রবর্তী ॥

বালেশ্বরের বনে-জঙ্গলে, বুড়ীবালামের তীরে,
শুরু হ'লো যবে গুলি বিনিময়, সেদিন দ্বি-প্রহরে,
বুঝিল 'টেগার্ড' কারে কয় রণ
যোদ্ধা কাহারে কয়;
প্রণাম জানাল 'পঞ্চ ভ্রাতায়'
গাহিল তাদের জয়—
গাহিল তাদের জয়!

কাঁপিয়া উঠিল বন জঙ্গল
উথলি উঠিল সিন্ধুর জল,
উঠিল হাসিয়া নিষ্ঠুরা নিয়তি
যুদ্ধ হইল শেষ;
তৃষিতা ধরণী তৃষ্ণা মিটালো
রুধিরে রাঙ্গালো কেশ—
যুদ্ধ হইল শেষ!

ধন্য তুমি গো রত্নগর্ভা, ধন্য বঙ্গমাতা!
ধর্ম যুদ্ধে পাঠায়ে তনয়ে—
থাকি অলক্ষ্যে—ললাট চুমিয়ে,
কোলে তুলে নিলে 'পঞ্চ পুত্রে'
তুমি গো জগদ্ধাত্রী!
বলে গেল যারা—"আসিব আবার—
ঘুচাবো তিমির রাত্রি"।
মনে জাগে আজ তাঁহাদেরি কথা,
পারি না ভুলিতে বুকে বাজে ব্যথা,
মন-বিহঙ্গ কেবলই শুধায়—
"কোথা সে দুর্বাদল!
আসিবে না কি গো!
আসিবে না আর?
ঝরে যে নয়ন জল"!

বিশ্বসমবায় আন্দোলনে ব্রিটেনের অবদান

॥ শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাস ॥

(উত্তরপাড়া ওয়েষ্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউটে প্রদত্ত ভাষণ—৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১)

গ্রেট ব্রিটেনের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বিশ্বসমবায় আন্দোলনে তার অবদান ও স্বরূপটি জানতে হলে যে পটভূমিকার ওপর এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধে কিছু জানার প্রয়োজন আছে। নতুবা এই অবদানের মূল্যটি ঠিক বোঝা যাবে না।

সমবায়ের সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীতে। সে সময় ব্রিটেন যে যুগে বাস করত সে যুগের আরম্ভ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। ঐতিহাসিকেরা এই যুগের নাম দিয়েছেন রেনেসাঁসের যুগ। আধুনিক যুগের সূত্রপাত তখন থেকেই।

রেনেসাঁসের আদর্শ ছিল চার্চ ও রাজাদের কবল থেকে ব্যক্তি মানুষের মানসিক ও দৈহিক বন্ধনের মুক্তি। সেই আদর্শ লাভের সাধনা ও প্রচেষ্টার ফলে প্রায় চারশ' বছর পরে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রমুখ পশ্চিম ইউরোপে যে বিপ্লব ঘটে তাকে রাজনীতির পরিভাষায় বলা হয় বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লব, আর অর্থনীতির পরিভাষায় বলা হয় এগ্রেরিয়ান রেভলিউশন—কৃষিবিপ্লব। ব্রিটেন প্রমুখ দেশে শিল্পবিপ্লব ঘটতেই পারত না যদি না তার আগে এই কৃষিবিপ্লব ঘটে মানুষকে ভূদাসত্ব—সার্ফডম—থেকে মুক্ত করে শ্রমিকের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করত, এবং কৃষকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে ক্রমবর্ধমান বাজারের সৃষ্টি করত।

প্রাক্ কৃষি বিপ্লবের যুগে, অর্থাৎ ফিউডারী যুগে অভিজাত সম্প্রদায় ও চার্চের পাদ্রী-পুরোহিত ছাড়া সকল মানুষই কোন না কোন প্রকার দাস ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ থাকত। নগরাঞ্চলে যাঁরা শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য করতেন তাঁদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক থাকতেন রাজা, জমিদার, পাদ্রীপুরুতরা; ব্যবসাদারদের কর্মচারীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা থাকতেন নিয়োগকর্তারা; গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্য করত ভূ-দাসেরা। গ্রামের ভালো মন্দ মাঝারি শ্রেণীর কিছু কিছু খণ্ড-বিখণ্ড মাঠময় ছড়ানো জমি নিয়ে বৃষ্টিনির্ভর কৃষিকার্য করতে হত এক একজন ভূ-দাসকে। সেট না করলে বা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জমি ইস্তফা দিয়ে অন্যত্র চলে যাবার অধিকার তাদের ছিল না। জেল পলাতক আসামীর মতোই ধরে এনে সাজা দেবার অধিকার জমিদারদের ছিল। দেশের সকল শ্রমশীল মানুষ যখন এইভাবে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ, তখন শিল্পবিপ্লবের জন্য শ্রমিক পাবে কোথায়? কৃষিবিপ্লবের ফলে যখন জমিদার পাদ্রী পুরোহিতের অধিকার লুপ্ত হয়ে জমির ওপর কৃষকের, শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর শিল্পপতি (বুর্জোয়া) ব্যবসাদারদের মালিকানা বর্তালো, সকল মানুষের জীবনের মর্যাদা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হল, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হল তখনই প্রত্যেক মানুষের উৎপাদনী ক্ষমতা দ্রুত বেড়ে সকল মানুষের জীবন ধারণের মান উন্নত হয়ে চলল, জমিদারদের তৈরী খণ্ড-বিখণ্ড মাঠময় ছড়ানো জোতকে ভেঙে নতুন সরকার এক একটি জোতকে লাভজনক জোতে পরিণত করে, এক জায়গায় চকবন্দি আকার (consolidation of holding) দেবার ফলে কৃষকের জোত আর কেবল বৃষ্টিনির্ভর রইল না। কৃষক তার সকল জমি এক জায়গায় পাবার ফলে ও তা লাভজনক জোতে পরিণত হওয়ার (economic holding) সে তার জোতে বারো মাস সেচের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হ'ল, যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকে আধুনিকীকরণ করে উৎপাদন বাড়াবার সুযোগ পেল। তখনকার সর্বপ্রধান উৎপাদনের উপায় ছিল কৃষি। কৃষকের উৎপাদন-ক্ষমতা ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাজার সৃষ্টি হল। সেই বাজারের চাহিদা মেটাতে শিল্প বাণিজ্য

দ্রুতগতিতে বেড়ে চলল।

ক্রমবর্ধমান বাজারের চাহিদা পূরণ করতে যে নিত্য নতুন কলকারখানা নির্মাণের প্রয়োজন হল তার মূলধন সংগৃহীত হতে থাকল শ্রমিক শোষণ করে। শুধু পরের দিন খাটার মতো শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অন্ন বস্ত্রের মূল্যের মাপকাঠি দিয়ে মজুরীর হার ধার্য হল। সেই স্বল্প পরিমাণ আয় থেকে দুটো একটা পেনি বাঁচাতে পারলেও তা থেকে জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনের বিন্দুটা মেটে। সেটাও তো কম আকর্ষণীয় নয়, তখনকার শিল্প পতিদের নির্মম শোষণের বহ্নিজ্বালাকে যতটুকু যায়া যায় লাঘব করার মনোভাব ও প্রচেষ্টা থেকেই ব্রিটেন তথা ইউরোপে সমবায় আন্দোলনের সুরু। কিন্তু এটুকু চিন্তাও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়নি, এর পিছনে দীর্ঘ চার শ' বছরের রেণেসাঁসী চিন্তা ও দর্শনের প্রস্তুতি ছিল।

বলেছি যে, রেণেসাঁসের অঙ্গীকার ছিল মানুষকে মানসিক ও দৈহিক দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করার। ব্রিটেনের শ্রমিকদের স্বাবলম্বন স্পৃহা ও পারস্পরিক সহযোগিতার সাহায্যে নিজেদের কিছু আয় বাড়াবার এই প্রচেষ্টা সেই মানসিক বাঁধন ছেঁড়ার সাধনেরই অবদান। দুঃখ দারিদ্র্য শোষণ উৎপীড়ন থাকলেও সকল মানুষের সব সময় সে সম্বন্ধে বোধ পর্যন্ত থাকে না, তা নিবারণ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া তো দূরের কথা। এরই নাম মানসিক জড়ত্ব ও দাসত্ব। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই চার শ' বছর ধরে রেণেসাঁসের ও জ্ঞানদীপ্তির যুগের (Age of Enlightenment) ভাব ও ভাবনা ইউরোপে যে মানসিক বিপ্লব নিয়ে আসে তারই ফলে মানুষের মনের জড়ত্ব ও দাসত্ব ও জীবন-বিমুখতা কেটে গিয়ে জীবনমুখী হয়ে ওঠে। জীবনের সুখ দুঃখের প্রতি অনীহা ও নিঃস্পৃহতার পরিবর্তে জেগে ওঠে দুঃখ বোধ, সুখ সম্ভোগেচ্ছা। এই জাগরণের ফলেই রাজা চার্চ জমিদারদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কৃষিবিপ্লব ও বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লব ঘটে গণতান্ত্রিক যুগের আবির্ভাব হয়। যে সব শ্রমিক মানসিক বন্ধন কাটিয়ে ধনিক শোষণের ব্যথা-বেদনা অনুভব করতে থাকে, আত্মচেতনার ফলে নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে চায়, তাদের মধ্য থেকেই সুরু হয় সেই কথা বেদনা মুখ করে জীবনকে যথাসম্ভব সম্ভোগ করে তোলার সজ্ঞান সক্রিয় প্রচেষ্টা।

ইংলণ্ডে ১৭৬৭ সালেরও পূর্ব থেকে শ্রমিকদের মধ্যে ধনিক শোষণের হাত থেকে বাঁচার উপায় খোঁজা সুরু হয়। দেখা যায় যে, এই সময় শ্রমিকদের যৌথ মানিবানার মহাজন গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, পাইকারী দরে জিনিষপত্র কিনে শ্রমিকদের নিকট সস্তায় বিক্রয়ের উদ্যোগ আয়োজন চলেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্কটল্যাণ্ডেও অনুরূপ প্রচেষ্টা সুরু হয় এবং কেনউইক উইভার্স সোসাইটি প্রমুখ কয়েকটি ক্রেতা ভাণ্ডার সমিতি গড়ে উঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই সমবায় আন্দোলন একটা পরিপূর্ণ রূপ নেয়। স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহযোগিতা—self-help and mutual aid-নীতির সাহায্যে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য একটা আন্দোলন সুরু হয়ে যায়। রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) ১৮২০ সালে এসব সংস্থার নাম দেন "কো-অপারেটিভ্"। ১৮২৮ থেকে উইলিয়াম কিং এই আন্দোলনের মুখপত্র রূপে "কো-অপারেটর" নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন, পত্রিকাখানি সমবায় আন্দোলনের ভাব ও ভাবনাকে শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে থাকে। ওয়েন, কিং প্রমুখ নেতাদের চেষ্টার প্রথম ফলশ্রুতি সুসংবদ্ধ বিধিবদ্ধভাবে গড়ে ওঠে ১৮৪৪ সালে ম্যানচেষ্টারের নিকট রকডেল অঞ্চলের একটি কাপড় কলের আটাশ জন শ্রমিকের দ্বারা গঠিত বিশ্ববিখ্যাত রকডেল ইকুইটেবল- পাইওনিয়ার্স সোসাইটি। রেনেসাঁসের মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই যে ইউরোপের কৃষিবিপ্লব, গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছিল তা ঐ সময়ের ইতিহাস থেকে দেখতে পাই। ঐ রকম আদর্শ লাভ করতেই যে সমবায় আন্দোলন সুরু হয়েছিল তার প্রমাণ রকডেল পাইওনিয়ার্সদের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের মধ্যেই পাচ্ছি :

(১) এই সমিতির উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা হল যে, এই

সমিতির সভ্যগণের আর্থিক সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার উন্নতিকল্পে প্রত্যেক সভ্যের নিকট থেকে এক পাউণ্ড মূলধন বাবদ সংগ্রহ করে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাকে রূপ দেওয়া—

(২) সভ্যদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য একটি ভাণ্ডার স্থাপন করবে ;

(৩) যে সকল সভ্য তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের উন্নতি চান তাদের বসবাসের জন্য কয়েকটি বাসগৃহ নির্মাণ বা ক্রয় করবে ;

(৪) যে সকল সভ্য বেকার বা কর্মনাগত ছাঁটাই ও মজুরী হ্রাসের ফলে দুঃস্থ তাদের কাজ দেবার উদ্দেশ্যে সমিতির বিবেচনা মতো যে কোন পণ্য উৎপাদনের জন্য কলকারখানা স্থাপনের চেষ্টা করবে ;

(৫) যে সকল সভ্য বেকার হয়েছে বা হবে কিংবা যাদের আয় কম তাদের জীবনে আরো কিছু নিরাপত্তা আনতে সমিতি চাষের জমি ক্রয় বা লিজ গ্রহণ করবে ;

(৬) এই প্রকার সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি, শিল্প ও উপনিবেশসমূহ স্থাপন করতে এবং সমাজের উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থায়, শিক্ষা ব্যবস্থায় ও শাসন ব্যবস্থায় সমবায় নীতি ও পদ্ধতি যথাসম্ভব শীঘ্র প্রয়োগ করতে এই সমিতি চেষ্টা করে চলবে ;

(৭) এই সমিতির প্রভাব ও প্রসার বিস্তার করে এই সমিতির কোন একটি গৃহে যথা সম্ভব শীঘ্র একটি মাদক দ্রব্য বর্জিত হোটেল স্থাপন করবে।

রকডেল অগ্রদূতগণের উদ্দেশ্য থেকে দেখা গেল যে তাঁরা জীবনকে সম্ভোগ করার পথে যে সব বাধা ছিল তা দূর করতে চেয়েছিলেন।

অর্থনৈতিক শোষণ ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচতে সুরু হল আত্মসচেতন, সুখ-দুঃখ বোধে সংবেদনশীল জীবনপ্রেমিক স্বাবলম্বী, স্বপ্নবিভোর মানুষদের সমবেত প্রচেষ্টা। তাঁদের সেই সীমিত সামর্থ্যের চেষ্টা ফলবতী হয়ে উঠতে দেরী হল না। ভাগ্যক্রমে তাঁরা সীমিত পরিচালনার জন্য যেসব নিয়ম পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন তারই জাদু স্পর্শে তাঁদের প্রচেষ্টা ক্রমে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে লাগল। মূলধন ও অংশের পরিমাণ নিরপেক্ষ প্রত্যেক সভ্যের একটি মাত্র ভোট, খাঁটি মাল সঠিক ওজনে বাজার দরেই বিক্রয় ব্যবস্থা, কিন্তু পরে ক্রয়ের পরিমাণের ওপর লভ্যাংশ বিতরণের ব্যবস্থাই হ'ল সমবায় ভাণ্ডারগুলির সেই যাদু দণ্ড এই নিয়মগুলিই সমবায় সমিতিসমূহকে ধনীদের দোকান অপেক্ষা একটি পৃথক মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করল। শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী দলে দলে সমবায় সমিতিসমূহে যোগ দিতে থাকল। সমবায় একটি আন্দোলনের আকার ধারণ করল। শীঘ্রই জীবনবীমা, ঋণদান, স্বাস্থ্য রক্ষা, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সমবায়ের কর্মপ্রচেষ্টা সম্প্রসারিত হল। পাইকারী হারে কিনে খুচরো সমিতিগুলিকে সরবরাহ করার জন্য ১৮৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডে ও ১৮৬৮ সালে স্কটল্যাণ্ডে পাইকারী সমবায় স্থাপিত হল। সমবায় নীতির প্রসার কল্পে ও সর্বপ্রকার সমিতিগুলির মধ্যে একটা যোগাযোগ রেখে সমগ্র দেশে সমবায়ের অবস্থা গড়ার জন্য ১৮৬৯ সালে গঠিত হল ব্রিটিশ কো অপারেটিভ ইউনিয়ন।

ইউরোপের যে সব দেশে কৃষি-বিপ্লব সংগঠিত হয়ে কৃষককুলকে ভূ-দাসত্ব থেকে মুক্ত করে ক্ষেত খামারের মালিকানা দিতে, জোতকে চকবন্দি করে তাদের উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়িয়েছিল, উৎপাদনের নিশ্চয়তা বিধান করে শিল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে শ্রমিক শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল, সে সব দেশেও, ব্রিটেনে সমবায়ের এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ব্রিটেনেরই অনুকরণে দ্রুত গড়ে উঠতে লাগল ক্রেতা-সমবায়, উৎপাদক-সমবায়, কৃষি-বিপণন সমবায়, সমবায়-ব্যাঙ্ক, বীমা-সমবায় প্রভৃতি, এবং সাফল্যের সঙ্গে চলতেও থাকল। সেই সঙ্গে সমবায় আন্দোলনের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক মৈত্রী গড়ে উঠল সমিতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যবসায়িক লেন-দেন সুরু হয়ে গেল। ১৮৯৫ সালে গঠিত হল ইনটারন্যাশন্যাল কো-অপারেটিভ এলায়েন্স।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পা দিয়েই দেখা গেল যে, ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সমবায় খুব কম ক্ষেত্রেই প্রবেশ করতে পেরেছে। কেবল যারা

খাদ্য দ্রব্যের ও কিছু পোষাক পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রেই সফলীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ব্রিটেনের সমবায় ভাণ্ডারগুলিও সভ্যদের সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করতে পারে না।

তা ছাড়া সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার সকল দিকের ওপর সমবায় নীতি প্রযুক্ত হয়ে পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন না হওয়ার ফলে উৎপাদক সমিতি-সমূহের সঙ্গে ক্রেতা সমবায়সমূহের বিরোধ, সমবায় সমিতিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সঙ্গে সমিতির পরিচালকবর্গের বিরোধ লেগেই থাকল।

এই সব তথ্য থেকে বোঝা গেল যে, সমবায়ের নীতিকে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে না পারলে এই দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রতি-যোগিতা বন্ধ হবে না; এবং সেটা পারে একমাত্র রাষ্ট্র। অতএব রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রয়োজনীয়তা যে আছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই চিন্তা থেকে ১৯১৭ সালে ব্রিটেনে গড়ে উঠল 'কো-অপারেটিভ্ পার্টি।' গঠিত হবার কিছু দিনের মধ্যেই এই পার্টি পার্লামেন্টে তাদের ন' জন প্রতিনিধি পাঠাতে সক্ষম হলেন; লেবার পার্টির সঙ্গে স্থায়ী সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করলেন। সেই চুক্তিতে লেবার পার্টির মন্ত্রী-সভায় সমবায় পার্টির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস থেকে দেখা গেল যে, যে সব দেশে সমবায় আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কেবল তারাই ব্যক্তি-মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আদর্শের জন্যে একটি শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা চালাতে সক্ষম হচ্ছে। অন্যত্র তা মাত্র নামেই বেঁচে আছে, সমাজ জীবনে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। ব্রিটেনের সমবায় আন্দোলন সেখানকার ট্রেডইউনিয়ান ও লেবার পার্টির অঙ্গ হিসাবেই এইখানি শক্তি সঞ্চয় করতে ও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে; ডেনমার্কের শক্তিশালী Folk School Movement-এর নেতাগণই সেখানকার সমবায় আন্দোলন পরিচালনা করেন; বেলজিয়ামের সমবায় সেখানকার সোস্যালিষ্ট পার্টির একটি অঙ্গ; রুশিয়া প্রমুখ কমিউনিষ্ট দেশসমূহে কমিউনিষ্ট পার্টির অঙ্গ হিসাবেই সমবায় টিকে থাকতে সক্ষম হচ্ছে।

ব্রিটেন ও ইউরোপের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস থেকে দেখা গেল যে: প্রথমতঃ যে সব দেশে কৃষি-বিপ্লব ও সেই সঙ্গে শিল্প-বিপ্লব ঘটে উৎপাদকের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে, উৎপাদনের নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব হয়েছে, সেখানেই সমবায় আন্দোলন সুরু থেকেই সাফল্যের সঙ্গে চলেছে।

শ্রমিকদের উৎপাদন হল তাদের নিয়মিত বেতন। এই বাঁধা মাহিনায় নিশ্চয়তা ও মানসিক জড়ত্ব থেকে মুক্ত, জীবনমুখী ভাব ও ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ব্রিটিশ শ্রমিকদের গঠিত ক্রেতা-সমবায় চলেছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জারমেনি, স্কেণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি ইউরোপের দেশসমূহে ও অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে কৃষিবিপ্লব ও কৃষির যান্ত্রিক-করণ ঘটেছিল এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছিল, সেই সঙ্গে নিশ্চয়তা বিধানও হয়েছিল। এই সব দেশে কৃষি-বিপণন ও ঋণদান সমবায়সমূহ প্রথম থেকেই সাফল্যের সঙ্গে চলেছে। দেখা গেল যে, ক্রেতা-সমবায়ের একটা মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন থাকলেও ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ক্ষমতা ও উৎপাদনের নিরাপত্তাই হল কৃষি শিল্প সমবায়ের সাফল্যের প্রধান সর্ত।

দ্বিতীয়তঃ এটাও দেখা গেল যে, সমবায়ের যে নীতি ও উদ্দেশ্য রবডেল পাইওনিয়ার্স গ্রহণ করেছিলেন, সেই "সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি শিল্প ও উপনিবেশসমূহ স্থাপন করতে এবং সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায়, বণ্টন ব্যবস্থায়, শিক্ষা ব্যবস্থায় ও শাসন ব্যবস্থায় সমবায় নীতি ও পদ্ধতি যথাসম্ভব শীঘ্র প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে চলবে" তা সফল হবে না যদি রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করা না যায়।

ব্রিটেন তথা ইউরোপের সমবায় সমিতিসমূহের নাম ধাম সভ্য সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ, প্রতিষ্ঠার ও অগ্রগতির স্থান তারিখ বাদ দিয়ে এই তো হল সেখানকার

সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও শিক্ষা। এখন ইতিহাসের এই শিক্ষাটিকে যদি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে ও সমাজ গড়ার কাজে লাগাতে না পারি তবে ইতিহাস জানারই বা কি মূল্য আছে?

আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলনের সুরু যদিও বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এবং সরকারী আওতায় থেকে সরকারী সাহায্যপুষ্ট হয়েই চলেছে, তথাপি বলতে বাধা নেই যে, সমবায় আন্দোলন নিজ ক্ষমতায় জোরে সাফল্যের সঙ্গে চলছে না। কেন যে চলছে না তার কারণ ব্রিটেন তথা ইউরোপের ইতিহাস থেকেই পাওয়া যাচ্ছে কারণটি হল: ইউরোপের মতো ভারতে কৃষিবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব ঘটেনি। তার ফলে কৃষকের জোত চকবন্দি হয়নি; তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়েনি; তার ফসলের নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব হয় নি; তার কৃষি আজো বৃষ্টি-নির্ভর হয়েই আছে। সেই জন্য কৃষি ঋণ দাদনের নিরাপত্তা থাকে না বলে পল্লী অঞ্চলের সমবায় ভাল চলে না। শিল্পক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাঁচা মালের অভাবে ও উচিৎ মূল্যে বিপণনের ব্যবস্থা না থাকাতে শিল্প সমবায়ও ভাল চলে না।

রেবেসাঁদের আদর্শে ভারতে ভাববিপ্লব, কৃষিবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব না ঘটাতে শ্রমিক শ্রেণীর মানসিক দাসত্ব কাটেনি, জীবনবিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি দূর হয়ে জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি। জামা কাপড় আর একটু পরিষ্কার, ঘরদোর আর একটু পরিচ্ছন্ন, দেহ আর একটু সুন্দর হলে ভাল হয় এ বোধ এখনো অধিকাংশ শ্রমশীল নরনারীর মনে জাগেনি। তা জাগেনি বলেই ধনীর দোকান থেকে না কিনে সমবায়ের দোকান থেকে কিনলেই যে এই বাড়তি খরচটা ফাউ হিসাবে পাওয়া যায় তা মাথায় আসেনি। এখনো তারা মনের দিক থেকে মধ্যযুগে বাস করছে। কেরাণীকুলের মনোভাবও সেই মধ্যযুগীয়। পুরাতন সংস্কার ও অভ্যাস থেকে, মানসিক জড়তা থেকে মধ্যবিত্তের সংসার আজো মুক্ত নয়। সেইজন্য ক্রেতা-সমবায় সাফল্যের সঙ্গে চলে না। সভ্যরা তাদের মানসিক জড়তা ও ডিসিপ্লিনের অভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাদেরই সমবায় ভাণ্ডার থেকে সব সময় কেনে না, দেখে না, খোঁজ খবর নেয় না। ইউরোপে সমবায়ের সভ্যরা তাদের সমিতিকে যে দৃষ্টিতে দেখে, সে দৃষ্টি দিয়ে এখানে কেউ দেখে না। চলে মাত্র আফিস অঞ্চলের ঋণদান সমিতিগুলি। কারণ সেখানে সভ্যদের উৎপাদনের (বেতনের) নিশ্চয়তা আছে, আর আছে নিত্য মধ্যবিত্তের নিত্য অভাবের চাবুক। অতএব এ সব ঋণদান সমিতিতে দাদনের নিরাপত্তা আছে।

ভারতেও সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তন করা হয়েছিল ধনী মহাজনদের অতি উচ্চহারের সুদের নির্মম শোষণ থেকে কৃষিজীবীদের একটুখানি বাঁচাবার উদ্দেশ্যে। আজ এই বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে যখন এশিয়া আফ্রিকার তমসাচ্ছন্ন যুগের অবসান ঘটেছে, যখন পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রগামী দেশের সঙ্গেও এই দুই মহাদেশের সকল মানুষ সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় জেগে চঞ্চল ও উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে তখন আর রবডেল পাইওনিয়ার্সদের মতো সিঁপড়ের লেজ টিপে গুড় সংগ্রহ করার পদ্ধতি দিয়ে সকল মানুষের সব আশা অবিলম্বে পূরণ করা যাবে না। প্রযুক্তি বিদ্যার যখন এতই উন্নতি হয়েছে তখন জনগণের অন্নবস্ত্রের অভাব অনতিবিলম্বে পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সম্যক প্রয়োগ সম্ভব হবে না যদি এদেশে কৃষি-বিপ্লব সম্পূর্ণ না হয়। এদেশে ভাববিপ্লব না ঘটার ফলে ওপর থেকে এটা ঘটাতে হবে—তলা থেকে হবে না। ভাব-বিপ্লবও ওপর থেকে ঘটাতে হয়। ভাব-বিপ্লব ঘটবার পর রবডেল পাইওনিয়ার্সদের মতো তলা থেকে, দু একটা গ্রামে বা সহরের কোন কোন পাড়ায় সেরূপ আদর্শ সমিতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। নতুবা তা hot house plantএর মতো অতি ব্যয়বহুল কৃত্রিম প্রচেষ্টা হবে মাত্র—যেমন হচ্ছে "সমবায়িকা"গুলিতে। ইউরোপে ভাব-বিপ্লবের পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটেছিল। এখানে উল্টোভাবে এটা ঘটবে। অর্থনৈতিক বিপ্লবের পর ভাববিপ্লব ঘটবে। এশিয়া-আফ্রিকার সকল দেশের সম্বন্ধেই আজ এই কথা খাটে। ভারতের সমবায় আন্দোলনের নেতারা কৃষিবিপ্লবের কাজটিকে ত্বরান্বিত

করার নেতৃত্ব নিতে পারেন।

ব্রিটিশ শাসকবর্গ নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই ওপর থেকে এ কাজটি করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন যে, এ দেশে কৃষি-বিপ্লব যখন ঘটানো হয় নি তখন সমবায় আন্দোলনের কোন ভবিষ্যৎ নেই। সেই জন্য তাঁরা প্রথম দু'ই দশক ধরে এর প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টি দেন নি। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েই তাঁরা বুঝে-ছিলেন যে, আধুনিক যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড থেকে সৈন্য জাহাজে পাঠিয়ে ভারত রক্ষা করা যাবে না। ভারতেই সে সব নির্মাণ করতে হবে, ভারতকে শিল্প-সজ্জিত করতে হবে, কিন্তু শিল্পায়ন সম্ভব হবে না যদি কৃষি-বিপ্লব না ঘটানো যায়। তাঁরা আইনের দ্বারা ভারতে কৃষি-বিপ্লবের নীতি গ্রহণ করেন, এবং ১৯১৯ সালের ভারত রিফর্ম এ্যাক্টে ভারতকে শিল্পোন্নত করার জন্য ক্ষমতা দেন। কৃষি-বিপ্লব ঘটাবার উদ্দেশ্যে যে রয়েল কমিশন অন্ এগ্রিকালচার নিয়োগ করা হয় তাঁদের রিপোর্টে তাঁরা বলেন যে, কৃষকের ক্ষেত চকবন্দি করে দিতে হবে। কিন্তু এই অতিশয় প্রয়োজনীয় জনপ্রিয় ব্যবস্থাটা ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত চেষ্টা করা সত্ত্বেও জমিদারদের বাধার জন্য গ্রহণ করা গেল না। এই ক্ষেত চকবন্দি করার ব্যবস্থাটি যে কৃষকদের কতখানি কাম্য ছিল তা তদানীন্তন বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের বোর্ড অব ইকনমিক এনকোয়ারির ৭ বি, পুস্তিকায় নিম্নলিখিত ভাষায় লেখা আছে :

"... that consolidation has been undertaken in the Punjab and in the Central Provinces, In the latter case it is believed with no expense to Government as the cultivators were so enthusiastic in the matter that they gladly paid fees which covered the cost of the operation..."

তারপর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে বাংলার শের ফজলুল হকের মুখ্য মন্ত্রীত্বে ১৯৩৭ সালে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল সে সরকার কৃষি-বিপ্লব ঘটাবার উদ্দেশ্যেই তার ক্রান্তিদর্শী নেতার সভাপতিত্বে ল্যাণ্ড রেভি-নিউ কমিশন বসালেন। কমিশনের রিপোর্টে তাঁরা বললেন : জমির ওপর কৃষকের মালিকানা দেবার জন্য জমিদারী প্রথার অবসান ঘটিয়ে রায়তী প্রথার প্রবর্তন করতে হবে, তারপর নিম্নলিখিত চারটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই কৃষকের অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকবে :

প্রথমত: কৃষকের ক্ষেতকে চকবন্দি করতে হবে —the consolidation of holding।

দ্বিতীয়ত:—ক্ষুদ্র অলাভজনক ক্ষেতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে লাভজনক ক্ষেতে পরিণত করে দিতে হবে—the restoration of an economic holding।

তৃতীয়ত:—প্রতি গ্রামে গোচরের ব্যবস্থা করে দিতে হবে—the proportion of grazing land।

চতুর্থত:—অকৃষকের হাতে জমির হস্তান্তর নিষিদ্ধ করতে হবে—the prevention of transfer of land to non-agriculturists।

এই রিপোর্ট দাখিলের পরই মহাযুদ্ধ বাধে। হক মন্ত্রী সভারও পতন ঘটে। জমিদার-পুষ্ট নাজিমুদ্দিন মন্ত্রী-সভার হাতে শাসনভার যাওয়ার ফলে যুদ্ধের অজুহাতে তখনকার মতো এই প্রচেষ্টা স্থগিত থাকে।

যুদ্ধকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করল। স্বাধীন ভারতের শাসক পার্টি ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ মতো জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারী প্রথার অবসান ঘটিয়ে রায়তী প্রথার প্রবর্তন করলেন বটে কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধের জন্য জমিদারী প্রথা তোলার সুপারিশ সেই চারটি উদ্দেশ্যের কোনটিই সম্পাদন করলেন না। কৃষি-বিপ্লব ঘটিয়ে দেশের শিল্প-বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করা আর হল না। বোঝা গেল যে, তদানীন্তন শাসক পার্টি দেশে কৃষি-বিপ্লব ঘটাতে চান না, দেশের দারিদ্র্য দূর করতে চান না, দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করতে চান না।

অথচ একই ভারতের অন্যতম রাজ্য পাঞ্জাব-হরিয়ানা এই চকবন্দির কাজটি কয়েক বছর পূর্বেই সম্পূর্ণ করেছেন, ফলে সেখানে আজ কৃষি-বিপ্লব ঘটে শিল্পায়ন হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পাকা রাস্তা করা সম্ভব হচ্ছে এবং সারা ভারতের মধ্যে সর্ব প্রথম এই দুই রাজ্যেই "গরীবী হটাও"

লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে; সমবায় আন্দোলনও অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা ভালভাবে চলতে সুরু করেছে। বম্বাই প্রভৃতি রাজ্যেও এই চকবন্দির কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। সেই জন্য এই সব রাজ্যেও সমবায় সাফল্যের সঙ্গে চলতে সুরু করেছে। কেবল পশ্চিম বঙ্গে এই চকবন্দির কাজটি মোটে সুরু করাই হয়নি।

এই হতভাগ্য অভিশপ্ত রাজ্যে সেদিনকার শাসক পার্টিই যে শুধু তা নয়, দেশের ছোট বড় কোন পার্টিই যে তা চায় নি তার প্রমাণ তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে তখনো দেখা গেছে আজও দেখা যাচ্ছে। অবশ্য সম্প্রতি এর ব্যতিক্রম দেখছি দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা "জোতদার খতম" করে "কৃষি-বিপ্লব" ঘটাবার শ্লোগান থেকে। দুঃখের বিষয় এই সব তরুণদের কেউ বলে দেয় নি যে জোতদার খুন করলেই কৃষি-বিপ্লব আসে না। জমিদারদের পরিবর্তে লাভজনক জোতের মালিক সৃষ্টি করার জন্যেই কৃষি-বিপ্লব ঘটাতে হয়। ইউরোপে তাই ঘটেছে, অন্যেও তাই লেখে, ইতিহাসও তাই বলে, যুক্তিও তাই সমর্থন করে।

ফ্লাউড কমিশনের উক্ত চারটি ব্যবস্থা করতে এক ফোঁটা রক্তপাতও করতে হবে না; কয়েক ফোঁটা কালি খরচ করেই এটা হতে পারে। উক্ত চারটি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি আইন পাশ করে দিলেই হয়ে যাবে কৃষি-বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব, বেকার সমস্যার সমাধান, দারিদ্র্য দূরীকরণ। যখন সকল মানুষের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করেছেন তখন ভোটাররা সচেতন হয়ে প্রতিনিধিকে ঐরূপ আইন প্রণয়নের নির্দেশ দিলে এটি সহজেই হতে পারে।

অবশ্য গ্রামের সকলকে লাভজনক জোত দেওয়া যাবে না, কারণ সে পরিমাণ জমি দেশে নেই। এই সব ভূমিহীনদের ক্ষুদ্র শিল্প দিতে হবে, তাতে জমির চেয়ে বেশী আয় হবে। কলিকাতা, হাওড়া প্রভৃতি সহরাঞ্চলের ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে গ্রামে গ্রামে বিকেন্দ্রিত করে দিতে হবে। তাতে কলিকাতা হাওড়ার ভিড় কমে সহরগুলি বাঁচবে, অফুরন্ত ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম-বাংলাও শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে। নতুন শত C. M. D. A-এর দায় নেই পশ্চিমবাংলার আটত্রিশ হাজার গ্রামকে অনুন্নত রেখে কেবল কলকাতার উন্নতি করার। এরই সঙ্গে গ্রাম ও নগর বাংলার উন্নয়ন পরিকল্পনা নিতে হবে বিদ্যুৎ, পাকা রাস্তা, কাঁচামাল সরবরাহ ও বিপণনের দায়িত্ব সরকার নিলেই যে কোন ক্ষুদ্র শিল্প যে কোন পল্লীতে চলতে পারে। এই প্রস্তাবিত আইনে এই সব ব্যবস্থা করার ক্ষমতাও দিতে হবে।

একটু হিসেব করলেই দেখা যাবে যে, পশ্চিমবাংলার বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান করে দারিদ্র্য দূর করতে পাঁচ দশ বছরের বেশী লাগার কথা নয় পশ্চিমবাংলার এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষের মতো কৃষিযোগ্য জমির মধ্যে যদি এক কোটি একর জমিকে চকবন্দি করে বারোমাস সেচের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে অধিক ফলনশীল বীজের চাষে বর্তমান অপেক্ষা চারগুণ থেকে দশগুণ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটবে। তখন একর প্রতি যে বাড়তি উৎপাদন হবে তাতে লোকের কর্মসংস্থান হতে থাকবে। অর্থাৎ প্রতি বছর চল্লিশ লক্ষ মানুষের জন্য নতুন কর্ম সৃষ্টি হতে থাকবে। আমাদের দেশে এত বেশী বেকার নেই। অথচ প্রতি বছর এই পরিমাণ সৃষ্টি হতে থাকলে যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে, তখন মানুষের উৎপাদনী ক্ষমতা বেড়ে সকল মানুষের জীবনের মান বেড়ে চলবে।

এখন কথা হল: এই অতীব প্রয়োজনীয় কৃষি-বিপ্লব ঘটাবার জন্যে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশটি গ্রহণ করতে সরকারকে অবহিত করবে কে? দেশের ভোটারদের নিকট থেকে চাপ সৃষ্টি না হলে কী সরকার সচেতন হবেন?

স্মরণ রাখতে হবে যে, সমবায় আন্দোলনের মূল আদর্শ ও অঙ্গীকার হল সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায়, বণ্টন ব্যবস্থায়, শিক্ষা-ব্যবস্থায় ও শাসন-ব্যবস্থায় সমবায়ের নীতি ও পদ্ধতির প্রয়োগ। রবডেল পাইওনিয়ার্সরা সেই আদর্শ সম্মুখে রেখেই তাঁদের যাত্রা সুরু করেছিলেন। সে আদর্শ এখনো সমবায় আন্দোলন লাভ করতে পারে নি। সে আদর্শ থেকে ভারতীয় সমবায় আন্দোলন যদি বিচ্যুত হতে না চায়, সে অঙ্গীকার যদি ফুরতে না চায় তবে আজ এই বহু

বিলম্বিত বিপ্লবটি ঘটিয়ে সমবায় আন্দোলনের পাদপীঠটি প্রস্তুত করার ঘটকালিটি সমবায় আন্দোলনকেই করতে হবে। সেই সঙ্গে এও স্মরণ রাখতে হবে যে সে যুগের সমবায়ের স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি আর এ যুগে কেবলমাত্র একটি ক্রেতা-সমবায়ের মধ্যে আবদ্ধ রেখেই সন্তুষ্ট থাকতে চাইবে না, সমগ্র রাষ্ট্র ও আর্থিক ব্যবস্থাকে গ্রাস করতে চাইবে। সেইজন্য এ যুগের সার্বভৌম স্বাবলম্বী ও সমবায়ী মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষাকে পূরণের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষি-বিপ্লব ও বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লবকে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে সমবায়ী ও পঞ্চায়েতী বিপ্লবের রূপ নিতে হবে; তবেই এ যুগের বাকি মানুষ তাদের অভাব-অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবে, স্বাবলম্বন ও সহযোগিতার দ্বারা নিজেরাই নিজেদের সৌভাগ্য গড়ে তুলে আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম হবে; তখনই রেণেসাঁসের অপূর্ণ অঙ্গীকার পূর্ণ হবে।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায়ের নেতারা কৃষিবিপ্লব ঘটানোর এই দাবীটি পূরণের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। কারণ কৃষি-বিপ্লবই হল সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার একমাত্র পাদপীঠ, পূর্বসর্ত। সেইজন্য সমবায় আন্দোলনের একমাত্র কর্মসূচী হল এই পূর্বসর্তটি পূরণ করা, পাদপীঠটি নির্মাণ করা।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ইউনিয়ন যখন এই রাজ্যে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গঠিত হয়েছে তখন আইন অনুসারে ও যুক্তিসঙ্গতভাবে এই কর্মসূচীটী রূপায়ণের দায়িত্ব তাঁদের। সামর্থ্যও তাঁদের আছে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ তাঁদের কোটী কোটী অনাদায়ী টাকা উদ্ধারের স্বার্থে এবং অবিলম্বে দশ বিশ গুণ উন্নতির নিশ্চিত আশায় এই কৃষি-বিপ্লব ঘটাবার ঘটকালিটি করতে পারেন। সহায় সম্পদ তাঁদের কম নয়—প্রতি জেলা, মহকুমা ও গ্রামে গ্রামে তাঁদের শাখা প্রশাখা শত শত ছড়িয়ে আছে।

এঁরা যদি এঁদের কর্তব্য কর্মটি সামর্থ্য থাকতেও না করেন, তা হলে, 'সমবায়ের নীতি পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগ ছাড়া এ যুগে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না' এই নীতিতে যাঁরা বিশ্বাসী এবং উৎসর্গিত-প্রাণ, তাঁরাই তাঁদের নিষ্ঠাটিকে সম্বল করে এ কাজ করার চেষ্টা করে চলবেন। হয়তো তাতে সরকারের জড়তা কাটবে না, চোখ খুলবে না। তাই যদি হয় তবে দেশের ক্রমবর্ধমান আশাহত বেকার ক্ষুধার্ত ক্রোধোন্মত্ত যুবকদের মরণের পথে ছোটা বেড়ে চলবে। সরকার নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে এই সব ক্ষুদ্র হিংসাকে বৃহৎ হিংসার দ্বারা শুদ্ধ করে চলবেন। সেই সঙ্গে বৎসরান্তে সমবায়ের জয়ন্তী উৎসব অতি বর্ণাঢ্য সমারোহে পালিত হয়ে চলবে।

গ্রন্থ-পরিক্রমা

॥ গ্রন্থাগারিক শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ ॥

[নারী ও সামাজিক অবিচার প্রসঙ্গে গান্ধিজী]

ইতিহাসে আলোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশের মেয়েরাও প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত জ্ঞান-গরিমা, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও মাধুর্যের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। আবার, তারই পাশাপাশি মেয়েদের নিতান্ত অবমাননার জীবনের কথাও আমাদের অজানা নয়। তাই, গার্গী মৈত্রেয়ী নামগুলির খুব কাছাকাছি পতিতা বারাঙ্গনা ও দেবদাসীদের অসামাজিক ও রহস্যময় জীবন যাপনের কথাও প্রত্যক্ষ সত্য। এই পরস্পর বিরোধী সামাজিক অবস্থা, তথা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বালবৈধব্য ইত্যাদির ফলশ্রুতি হিসাবে নানা অন্যায় অবিচার অত্যাচার ও সমস্যা জর্জরিত নারী সমাজের শোচনীয় অবস্থার কথাও অস্বীকার করা যায় না। আইন সংস্কার শাস্ত্র ও ধর্মের নামে শতাব্দীর পর শতাব্দী মেয়েদের উপর অন্যায় অবিচার চলে আসছে—এ কথাও যেমন সত্য, তেমন সহানুভূতিশীল অনেক শাস্ত্রকারও এই সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার নির্দেশ করে গেছেন—এ কথাও সত্য। তাই দেখা যায়, যে ধর্ম শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ধর্মের নামে মেয়েদের উপর অন্যায় অবিচার চলে, সেই শাস্ত্র মন্থন করেই আমাদের সমাজের মঙ্গলকামীরা তার প্রতিকারের পথ খুঁজেছেন, এবং মেয়েদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে জীবনপাত করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদেশের মহাপুরুষদের মতো আমাদের দেশেও প্রাচীন কাল অবধি একালের স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা নারীর স্বাধিকার অর্জনে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। স্বাধীন ভারতে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সহশিক্ষা, স্বাধীন জীবিকায় সমানাধিকার, প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকার ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর মর্যাদা ও মহিমা শক্ত ও মজবুত ভিত্তিতে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। নবীন ভারতের স্রষ্টারও নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণায় সোচ্চার।

স্বাধীন ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টাদের অন্যতম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও সমগ্র নারী সমাজের স্বপক্ষে এই রকম ঘোষণা করেছেন বারবার, যথেষ্ট আন্তরিকতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে। আমরা দেখেছি, যেখানেই অন্যায় ও অবিচার—সেখানেই গান্ধিজী তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে প্রতিকারের পথ নির্দেশ করে গেছেন। এবং এই অভিমত অনুযায়ী তিনি আপন জীবনেও আচরণ করে স্বীয় বক্তব্যের প্রতি যথোচিত মর্যাদা দিয়ে আন্তরিকতার প্রমাণ রেখে গেছেন।

কেবল তাই নয়। আইন, ধর্ম ও সংস্কারের নামে এদেশের নারী সমাজের উপর যে অন্যায় চলে আসছে, সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ স্মৃতির সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি। কেন না, স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর মর্যাদা যেমন স্বীকৃত হয়েছে, তেমন তারই পাশাপাশি এমন সমস্ত উক্তি এই শাস্ত্রে স্থান পেয়েছে—যা সমাজের মঙ্গলকামীরা একবাক্যে মেনে নিতে পারেন নি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, বশিষ্ঠ। আঙ্গিরস ইত্যাদি স্মৃতি শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল, যা থেকে বোঝা যাবে উক্তিগুলি নারীর মর্যাদা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ আছে। যথা—

মনু : স্বামী চরিত্রহীন লম্পট এবং চরিত্রগত সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী না হলেও স্ত্রী সর্বদাই তাকে দেবতার মতো

ভক্তি করবে। পৃথকভাবে কোন আচার অনুষ্ঠান পালন, অথবা উপবাস করবার অধিকার স্ত্রীর নেই। স্বামীর সেবা করলেই তার অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে। যে স্ত্রী পিতৃগর্বে গর্বিত হয়ে স্বামীকে অবজ্ঞা করে, প্রকাশ্য জনসমক্ষে তার মাংস কুকুরের দ্বারা খাওয়ানো উচিত। স্বামী কু-অভ্যাসের দ্বারা পরিচালিত, পানাসক্ত বা শারীরিক অসুস্থ হলেও স্ত্রী যদি তাঁকে অবজ্ঞা করে, তাহলে তিন মাসের জন্যে সে মূল্যবান বস্ত্র ও অলংকারাদি থেকে বঞ্চিত হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য : স্ত্রীর উচিত স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা। এই-ই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

অত্রি : স্বামীর জীবদ্দশায় উপবাস করলে, অথবা অন্য আচার অনুষ্ঠান পালন করলে স্বামীর আয়ুক্ষয় হয়; স্ত্রী নরকে যায়। স্বামীর পাদপ্রক্ষালন, অথবা সর্বাঙ্গ মার্জনা করে, সেই জল পান করলে স্ত্রীর অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়।

বশিষ্ঠ : স্বামীর সংসার অপেক্ষা স্ত্রীর কাছে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নয়। যে স্ত্রী স্বামীর অসন্তুষ্টির কারণ হয়, মৃত্যুর পর সে স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে যেতে পারে না। সুতরাং তার উচিত কখনো স্বামীকে অসন্তুষ্ট না করা।

আঙ্গিরস : যে স্ত্রী স্বামীকে অবজ্ঞা করে, তার দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। ওই জাতীয় স্ত্রীলোক লম্পট বলে' অভিহিত হবে।

বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রের এই উক্তিগুলি সমাজের মঙ্গলকামী অন্যান্যদের মতো গান্ধীজীও প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারেন নি। তাই, বেজওয়াদা থেকে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান স্বরাজ' পত্রিকার একটি সংখ্যায় স্মৃতিশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত উক্তিগুলি প্রকাশিত হলে গান্ধীজী রীতিমতো দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, স্মৃতিশাস্ত্রের এই ধরণের উক্তি পাঠের পর, স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ও স্ত্রীলোকদের জাতির জননী বলে' যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের পক্ষে স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত উক্তিকে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ ধর্মের অবিচ্ছেদ্য বলে' মনে করেন ও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। অথচ দেখা যায়, এই ধরণের উক্তির পাশাপাশি স্মৃতিশাস্ত্রে নারীকে যোগ্য মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হয়েছে।

তাহলে, স্মৃতিশাস্ত্রে প্রকাশিত এই রকম পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সম্পর্কে আমাদের কি কর্তব্য? এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছেন—"ধর্মের নামে যা কিছু মুদ্রিত হোক না কেন, তাকে শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত অভ্রান্ত বেদবাক্য বলে' মনে করবার কোন সংগত কারণ নেই"। তবে, সকলের পক্ষে তো কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক, কোন্‌টা আবার প্রক্ষিপ্ত এ সমস্ত বুঝে ওঠা বা বিচার করে' নেওয়া সম্ভবপর নয়! তাই গান্ধীজী বলেছিলেন, ধর্মের নামে প্রচলিত সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থকেই যুক্তিতর্কপরায়ণ সহৃদয়হৃদ্‌বিচক্ষণ সুপণ্ডিতদের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। অতঃপর যে শাস্ত্রগুলির কোন নৈতিক মূল্য নেই, অথবা যেগুলি ধর্মের মূলনীতির বিরোধী বলে' বিবেচিত হবে, সেগুলিকে হিন্দুসমাজ যেন বর্জন করেন। এইভাবে হিন্দুদের জন্যে একটি নতুন সংহিতা রচিত হবে। তবে, সমস্ত হিন্দুরাই যে এই নতুন সংহিতা একবাক্যে মেনে নেবেন, এমনটা নাও হতে পারে। কিন্তু, এইরকম সৎ-প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবারও কোন সংগত কারণ নেই। কেন না, আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে' গেলে শেষ পর্যন্ত একদিন অবশ্যই তার প্রভাব সকলের উপর এসে পড়বেই।

॥ দুই ॥

এদেশে নারীর প্রতি সামাজিক অবিচারের প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যায়, আইন সংস্কার ও ধর্মের নামে নারীর অধিকারকে দমন করে রাখা হয়েছে। এজন্যে পুরুষই দায়ী। কারণ আইন সংস্কার ও ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদির নির্দেশ রচনায় নারীর কোন হাত ছিলো না। গান্ধীজীর মতে, অহিংসার ভিত্তিতে নিজের জীবন গঠনের ক্ষেত্রে পুরুষের মতো নারীরও সমান অধিকার আছে। অহিংস সমাজব্যবস্থায় কর্তব্য ও অধিকার নির্দেশের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও বোঝাপড়ার অর্থাৎ সহ-যোগিতার পথে চলতে হবে। বাইরে থেকে তা কেউ চাপিয়ে দিতে পারবে না, বা পুরুষকে নারীর উপর

আধিপত্য করতে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। নারীর সঙ্গে আচরণে পুরুষকে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে এবং মেনে চলতে হবে। বরাবরের মতো তাদের স্বামী বা সর্বময় প্রভু এই মনোভাব পরিত্যাগ করে পুরুষ প্রকৃতপক্ষে নারীর বিশ্বস্ত সুহৃদ্ এবং সহকর্মী—এই মনোভাবটি গড়ে তুলতে হবে। পুরুষের কর্তব্যই হলো দেশের নারী-সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে আন্তরিকভাবে কাজ করা। আমাদের সমাজে নারীরা, বলতে গেলে, ক্রীতদাসীর জীবন যাপন করে। তারা জানেই না যে, এই অবস্থা থেকে তাদের মুক্ত করার জন্যে নারীর প্রতি পুরুষের কোন কর্তব্য আছে কি না। নারী-সমাজ অশিক্ষা ও দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হলে পুরুষের লাভ ছাড়া লোকসান কিছুই নয়। কিন্তু এদেশের নারীকে পুরুষের ক্রীতদাসী ভাবতেই শেখানো হয়েছে। তাই পুরুষকেই নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সক্রিয় আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে যাতে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পুরুষেরই সমান দায়িত্ব পালন করতে পারে।

কিন্তু নারীকে স্মরণ রাখতে হবে সে যেন নিজেকে পুরুষের ক্রীড়নক বা ভোগের সামগ্রী বলে মনে না করে। এদেশের চিরাচরিত সমাজ-ব্যবস্থায় এটা রীতিমতো বিদ্রোহের সামিল হবে। মন যদি তৈরী থাকে এ বিদ্রোহ সহজেই হতে পারে! তাই এই বিদ্রোহের প্রস্তুতি বা পরীক্ষা প্রথমে নিজেদের ঘরেই হোক না কেন! নারীকে ক্রীড়নক বা ভোগের সামগ্রী হিসেবে না দেখে তাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের যোগ্য সঙ্গিনী হিসেবেই দেখা উচিত। এর জন্যে নারীর উদার মানসিক শিক্ষা ও প্রস্তুতি চাই। যার তা নেই, তাকে তার স্বামীই এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। আমাদের দেশের মেয়েরা যে কতো অসহায় এবং তাদের এই অবস্থার যে প্রতিকার অবশ্যই কাম্য, এ কথাটা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে।

গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের মাতৃস্বরূপা নারীজাতির সমস্যা-সমাধান না করে বা তাদের অবস্থার উন্নতি না করে জাতির গঠনমূলক কোন কাজ বা কোন পরিবর্তনই কার্যকরী করা সম্ভব নয়। দেশকে সুসংগঠিত করতে হলে' নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার দিতে হবে গান্ধীজীর এই উপলব্ধির মূল্য স্বাধীনতা-লাভের পর দেশের চিন্তাশীল মনীষীদের কাছে সশ্রদ্ধ আন্তরিকতার সঙ্গেই স্বীকৃত হয়েছে। দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন, কেবল আইনগত ভাবে নয়, নারী ও পুরুষের সমানাধিকার কার্যক্ষেত্রে স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত দেশের মঙ্গল নেই। তাই, বিভিন্ন সময়ে গান্ধীজী নারী ও পুরুষের সেই আকাঙ্ক্ষিত সম-মর্যাদার কথা বলেছেন তাঁর নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ ও ভাষণাদির মাধ্যমে। এই সমস্ত রচনাবলীর ছত্রে ছত্রে, দেশের নারীসমাজ সম্পর্কে গান্ধীজীর গভীর চিন্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। গান্ধীজীর এই সমৃদ্ধ চিন্তার পরিচয় জনসাধারণের মধ্যে উপযুক্তভাবে প্রবেশ ও প্রচার করা যায়, তবে জনসমাজ নানাভাবে উপকৃত হবে, একথা সংগতভাবেই বিশ্বাস করা যায়। জনসাধারণ যদি মনোযোগ সহকারে গান্ধীজীর এই সমস্ত রচনা পাঠ করে, তবে পাঠকমাত্রেই একথা স্বীকার করবেন। দেশের অবহেলিত নারীসমাজ সম্পর্কে গান্ধীজীর আগ্রহ ছিলো গভীর আন্তরিকতায় ভরা, এবং নারীকে তার যোগ্য স্বাধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিলো সুতীব্র।

তিন।

যাই হোক, ধর্মশাস্ত্র ও সংস্কার ইত্যাদির নামে নারীর উপর যে সামাজিক অন্যায় অবিচার চলে' আসছে আমাদের দেশে, সেই প্রসঙ্গে গান্ধিজী তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ মতামত প্রকাশ করে গেছেন তাঁর সম্পাদিত হরিজন, নবজীবন, ইয়ং ইণ্ডিয়া ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায়। পরবর্তীকালে এই আলোচনাগুলির অধিকাংশ সংকলিত হয়েছে হিন্দোরাণী (করাচী), নবজীবন ট্রাস্ট (আমেদাবাদ), ও বিদ্যাভবন (বোম্বে) প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থে (উল্লিখিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই এখন ভারতের কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত ও সুলভ মূল্যে প্রচারিত হয়েছে জনসাধারণের সুবিধার্থে। দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এগুলি সহজেই পাওয়া যাবে পড়ার জন্যে।) এই রকম পাঁচখানি

গ্রন্থ ও বিষয়বস্তুর পরিচয় সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করা গেল। যথা—

1. TO THE WOMEN (Hingorani 1941)—এই গ্রন্থখানিতে ভারতের নারীসমাজের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ গান্ধীজীর রচনা ও ভাষণাদি থেকে এমনভাবে সংকলিত হয়েছে, যাতে দেশের নারীসমাজের নানা প্রয়োজন ও সমস্যা সম্পর্কে পাঠকের একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। শুধু তাই নয়, এই আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থখানি থেকে ভারতের নারীসমাজ তাদের নানা জটিল সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত ও পথনির্দেশ পাবেন। (গ্রন্থখানি A. T. Hingorani-প্রকাশিত 'Gandhi Series'-এর অন্তর্গত, এবং ক্রমিক সংখ্যা—২)।

2. Women & Social Injustice, (Navajivan, 1942)—আইন সংস্কার ও ধর্মের নামে আমাদের সমাজে প্রাচীনকাল থেকে মেয়েদের উপর যে অন্যায় অবিচার চলে আসছে, সে সম্পর্কে গান্ধিজী তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ও নানা সমস্যা প্রসঙ্গে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, এবং নতুন আলোক পাত করেছেন এই বইখানিতে॥

3. Women. (Navajivan, 1958)—এদেশের মেয়েরা যে সমস্ত সমস্যা ও অন্যায় অবিচারের মধ্যে দিন কাটায়, এবং কিভাবে এই অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সেই সম্পর্কে গান্ধিজী অধিকতর মনোযোগ ও সহানুভূতির সঙ্গে এই বইখানিতে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন॥

4. Woman's role in Society (Navajivan, 1959)—মেয়েরা তাঁদের নানা সমস্যা ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নিভীকভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে যথাযথভাবে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে কি ভাবে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন, জাতিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে প্রত্যক্ষ ও বলিষ্ঠভাবে সাহায্য করতে পারেন, এবং সমাজে নিজেকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, সে সম্পর্কে গান্ধিজী গল্পের মতো সংক্ষেপে অথচ চমৎকারভাবে এই ছোট্ট বইখানিতে আলোচনা করেছেন।

5. The Role of Women. (Vidya Bhavan, 1964)—বর্তমান গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষে পূর্ব-প্রকাশিত 'To The Women'-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। গান্ধিজীর রচনা ও ভাষণাদি থেকে নারীসমাজের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এমনভাবে সংকলিত হয়েছে, যাতে দেশের নারীসমাজের নানা সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে পাঠকের একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। এই সংক্ষিপ্ত সংকলনটি থেকে পাঠক ভারতের নারীসমাজের নানা সমস্যা সমাধানের গান্ধিজী-কথিত প্রতিকার নির্দেশ পাঠে উপকৃত হবেন, আশা করা যায়। (গ্রন্থখানি ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বে, প্রকাশিত 'পকেট গান্ধী সিরিজ'-এর অন্তরগত।)

—এই বইগুলিতে গান্ধিজী নারীজীবনের প্রায় যাবতীয় সমস্যার আলোচনা-পর্যালোচনা করে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয়-মূলক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি ছিলেন পুরোপুরি-ভাবে স্ত্রী-স্বাধীনতার ও নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। গান্ধী বলেছিলেন, নারীর স্বাধীনতা বাদ দিয়ে যে সমাজ, সে সমাজ পূর্ণাঙ্গ নয়, পঙ্গু; সে স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ নয়, অর্ধসমাপ্ত। তাই তিনি নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামগ্রিক পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিশ্বাসের ফলশ্রুতি পূর্বোক্ত গ্রন্থ পাঁচখানি।

এই গ্রন্থ কয়খানিতে এক কথায়, গান্ধিজী সমাজে নারীর স্থান, নারীর কর্তব্য, দাম্পত্যজীবন, পারিবারিক জীবনের সুবিধা-অসুবিধা থেকে শুরু করে' পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল-বিধবা; পতিতা বারাঙ্গনা ও দেবদাসী; নারী ও কর্ম, নারী ও অস্পৃশ্যতা; জুয়াখেলা ও মদ্যপাওয়ার ফল; সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে নারী, নারী ও অলংকার—ইত্যাদি নারীজীবনের প্রায় সামগ্রিক দিক দিয়ে বিশেষ অর্থপূর্ণ আলোচনা করেছেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রীদেরও তিনি কর্তব্যপথের নির্দেশ দিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত গান্ধিজী সমগ্র নারীজাতিকে ধর্মপথে অবিচল থেকে কর্তব্যপরায়ণ ও সাহসী হতে উপদেশ দিয়ে গেছেন। কারণ, নৈতিক বলে পবিত্র ও পূতচরিত্র নারী অবশ্যই পুরুষের চেয়েও শক্তিমতী। এই রকম শক্তিমতী নারীর পবিত্রতার তেজের কাছে তার প্রতিপক্ষ পুরুষ

নতি স্বীকার করতে বাধ্য। তাই, গান্ধিজী বলেছেন, নারী যদি সেবা, আত্মোৎসর্গ ও পবিত্রতার শক্তিতে শক্তিমতী না হয়, তবে সে নারীর কোনই মূল্য নেই।

গ্রন্থ পাঁচখানিতে সংকলিত নারীসমাজের সমস্যা-সমাধান ও তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনায় রচিত গান্ধিজীর বাণী মানবসমাজের মঙ্গলকামী প্রতিটি মানুষের মনেই সহানুভূতির উদ্রেক করবে। এমন কি, ঘোর রক্ষণশীল ব্যক্তিও গান্ধিজীর এই সমস্ত বাণীপাঠে বিচলিত বোধ করবেন বলেই মনে হয়। কেন না, এই সমস্ত বাণী প্রধানত নারীসমাজের উদ্দেশেই কথিত ও লিখিত হলেও এগুলির একটা সার্বিক আবেদন আছে। নারীজীবনের প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গেই এই উক্তিগুলির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। নানা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের মধ্যেও নারীকে তার লক্ষ্যপথে ও গন্তব্যে উপনীত হতে এই বাণীগুলি অনিবার্য-ভাবেই সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

সর্বোপরি, গান্ধিজীর এই সমস্ত বাণী নারীকে তার আপন সম্প্রদায়, সমাজ ও দেশের মানুষ মাত্রেরই প্রতি সেবার ও কর্তব্যের দায়িত্ব ঐকান্তিকতার সঙ্গে পালনের আহ্বান জানাচ্ছে। সেবা ও কর্তব্য পালনের মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই গ্রন্থখানি পাঠ করে এবং দৈনন্দিন আচরণে তা' মেনে চলার চেষ্টা করেই দেশের নারীসমাজ নিশ্চয়ই উপকৃত হবে, এবং গ্রন্থে সংকলিত উক্তিগুলির সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে। এইভাবে নারী যদি জ্ঞানে ও শক্তিতে ভালো-মন্দ বিচার করে প্রকৃত মঙ্গলকর বিষয়াদি বেছে নিতে পারে, তবে গান্ধিজীর মতে নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে আবার সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী ও দ্রৌপদীর মতো পবিত্র ও পুতচরিত্র, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আত্মসংযমী নারীর আবির্ভাব হবে এবং এইভাবে অতীতের মতো একালের নারীরাও অমর আদর্শ স্থাপন করে' সমাজের ও দেশের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করতে সমর্থ হবেন।

অপ্রচলিত রাগিনী

॥ শ্রীমান ॥

রবিবার ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ।

হাওড়া ষ্টেশন-এর ৮নং প্ল্যাটফরম থেকে ১০৩ নং শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত ট্রেনটি ৯-৪৫ মিনিটে ছাড়বে।

যাত্রীবহুল প্ল্যাটফরম। এক বয়স্ক ভদ্রলোক—কাঁধে ঝোলা আর হাতে একটি মাঝারি গোছের চামড়ার ব্যাগ—ধীরে ধীরে ২নং কোচের দরজা ঠেলে ঢুকলেন। সিটনং ২০। খুঁজে পেতে দেরি হল না।

সিটে জিনিষ দুটো রেখে বের হয়ে এলেন ভদ্রলোক। ট্রেন ছাড়তে তখনও ২৫ মিনিট বাকী। বন্ধ ট্রেন কামরায় বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। তার চেয়ে প্ল্যাটফরমে ঘুরে বেড়ান ভাল।

ভদ্রলোক দুটি খবরের কাগজ কিনলেন, কিনলেন একটি টাইম টেবিল। যাবেন বেশি দূরে নয়—পাটনা পর্যন্ত। কিন্তু পড়বার মত কিছু বোধকে দরকার। তাই খবরের কাগজ ও টাইম-টেবিল। বিশেষ করে খবরের কাগজ দরকার। পূর্ব-পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের কাছে ১৬ তারিখ আত্মসমর্পণ করেছে আর ১৭ তারিখে পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ বিরতি মেনে নিয়েছে। কত খবর কাগজে! পড়ে পড়ে কোনওরকমে কেটে যাবে ৮ ঘণ্টা সময়। ঘুমোবারও উপায় নেই, চেয়ারে হেলান দিয়ে যা কতটুকু ঘুমান যায়! তবুও শিক্ষকতা করতে গিয়ে অবসর সময়ে কিছুটা বিমুনি যে অভ্যাস না হয়েছে তা নয়।

গাড়ী ছাড়বার সময় হল। বৃদ্ধ শিক্ষক সিটে গিয়ে জিনিষগুলো র‍্যাকে উঠালেন, বসলেন খবরের কাগজ খুলে। ২০নং সিট জানালার ধারে। কিন্তু জানালা খাবলে কি হবে খোলা যায় না। শীততাপনিয়ন্ত্রিত অভিজাত ট্রেন। জানালা দিয়ে বাইরের সব দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরের কিছু দেখা যায় না এমনিভাবে জানালার কাঁচের সন্নিবেশ।

২০নং সিটের পাশে ১৮নং ও ১৯নম্বরে বসে আছেন দুটি যুবক যুবতী। প্রায় সমবয়সী। যুবতী খুবই সুন্দরী। অনুপাতে যুবক বেমানান ; সামান্য grace থাকলে কি হবে, পোশাকে পরিচ্ছদে পারিপাট্যহীন, মোটেই স্মার্ট নয়। কোট ও ট্রাউজারে যে শুধু রং এর মিল নেই, তা নয় দুটোই এমনি ভাঁজ ইস্ত্রীবিহীন যে ঐ সুন্দরী মহিলার পাশে যুবককে মোটেই মানাচ্ছিল না। তবু তারা বসেছিল।

যুবতী বৃদ্ধের দিকে আড় চোখে তাকালেন। স্বগতোক্তি হল, কি জ্বালা !

বয়স্ক ভদ্রলোক যুবতীর টিপ্পনী শুনলেন বটে, কিন্তু সেদিকে ফিরে তাকালেন না। খবরের কাগজ খুলে বসলেন। আর অল্প সময়ের মধ্যে ডুবে গেলেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের শৌর্য বীর্য ও পরাক্রমের বিবৃতি পড়তে।

যুবতী বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন ট্রেনের গন্তব্যস্থল অবধি যাবেন কি ?

বৃদ্ধ ততক্ষণ খবরের মধ্যে ডুবে গেছেন, কথাটি খেয়াল করে শুনতে পান নি।

মহিলা বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। যুবকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, রুনু, তোমাকে কয়টি কথা বলব বলে আজ তোমাকে এ ট্রেনে ডেকে এনেছি।

যুবক বললেন, নিশ্চয়ই গোপন কথা, কিন্তু পাশে যে বুড়ো ভদ্রলোক রয়েছেন।

—বুড়ো বদ্ধ কালা আমি হলফ করে বলতে পারি। অতএব তাতে কোনও অসুবিধা হবে না।

—জরুরি কথা ত কলকাতায়ও বলতে পারতে। ট্রেনে কেন ? কালকে যখন বললে পাটনা হয়ে রাজগীর যেতে হবে আনন্দিত হয়েছিলুম খুব। কথাগুলো ত রাজগীরে গিয়েও বলতে পারবে। এত তাড়া কেন ?

—তাড়া আছে নিশ্চয়ই। তাই রাজগীর যাওয়ার আগেই কাজ শেষ করব। রাজগীর কেন, পাটনা কেন, বাঁকা পৌঁছুবার আগেই কাজ শেষ করতে হবে।

—এত তাড়া ?

—হ্যাঁ, তাড়া আছে বইকি ?

—বল, তোমার কথা।

গাড়ি তখন দ্রুতবেগে চলছিল। গাড়ির শব্দ কম, উভয়ের কথাগুলি সবটাই শুনতে পাচ্ছিলেন বৃদ্ধ। বুড়ো বদ্ধ কালা কথাটা বৃদ্ধের কানে হঠাৎ গিয়ে ধাক্কা লেগেছিল, তাই শুনতে না চাইলেও যুবক যুবতীর কথাগুলি বৃদ্ধের কানে অনুপ্রবেশ করছিল। ওদের কথা শোনবার ইচ্ছা বৃদ্ধের মোটেও নেই, কিন্তু কানের কাছে জোরে জোরে কথা বললে, না শুনেই বা উপায় কি।

ভদ্রলোক খবরের কাগজে চোখ নিবদ্ধ করলেন।

কানে এল যুবক বললেন, রীণা, কি তোমার এমন জরুরী কথা যে বাঁকা-র আগেই তা শেষ করতে হবে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

যুবতী বললেন, বলছি আমার কথা। তারপর জোর করে নিজেকে যেন কিছুটা এগিয়ে দিয়েই বললেন, শোন রুনু, আমি আমার সিদ্ধান্ত সর্বাগ্রে তোমার কাছে উপস্থিত করছি, তারপর প্রয়োজন হলে সিদ্ধান্তে আসার স্তরগুলি বিবৃত করব।

—বল। আমি মন দিয়ে শুনব।

যুবতী একটু থেমে বললেন—আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আমার ও তোমার সম্পর্কের ছেদ আজ এখানেই টানতে হবে।

—আমি কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে তুমি ঠিকই পারছ রুনু, আমি আকারে ইঙ্গিতে আমার বক্তব্য তোমার কাছে অনেকবার রেখেছি। কিন্তু তুমি এমনি বোকা যে সোজা ভাষায় না বললে তুমি কিছুই বুঝতে পার না। তাই ছেদ না টেনে আজ সোজা সহজ সরল ভাষায় তোমাকে বলছি আজ

থেকে আমার ও তোমার সম্পর্কের ইতি। এবার বুঝতে পারছ ত?

—অতি সরল ভাষায় বলেছ, বুঝতে না পারার কিছু নেই। হিংটিং-ছটের বাংলা দেশের পণ্ডিতও বোধ হয় এত সরল ভাষায় বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে পারেন নি।

—ঠাট্টা রাখ কনু, তুমি কি বলতে চাও আমার মনের কথা তুমি আগে বোঝনি, আর আজও বুঝতে পারছিলে না?

—আজ বুঝতে পারছি, কিন্তু আগে বুঝতে পারিনি।

—কারণ?

—কারণ, এত সহজে যে একটা সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে তা আমি ভাবতে পারিনি। জেনেছি মতদ্বৈধতা পারস্পরিক নিয়ম। যাদের মনের সম্বন্ধ অতি নিকট তাদের আচরণে বৈপরীত্য থাকবেই।

—আর এখন কি ভাবছ?

—ভাবছি অনেক কথা।

—কি কথা?

—সে কথা তোমার শোনবার মত নয়।

—শোন কনু, বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে হবে। অতএব দুঃখ যদি তোমার মনে আসে, সহজভাবে স্বীকার করে নাও। আমাদের দু'জনের বয়সই ত্রিশের কাছাকাছি। জীবনে বহুদিন এখনও সম্মুখের দিকে পড়ে রয়েছে অতএব জোড়াতাড়ি দিয়ে চলার চেষ্টা না করাই ভাল। বিচ্ছেদ যদি আসে, হাসিমুখে তাকে গ্রহণ কর।

—বল, বলে যাও।

—আমরা দু'জনে একসাথে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছি। কিন্তু কোনওদিন তুমি আমাকে অতিক্রম করনি। আমি সর্বদাই তোমার চাইতে উঁচু স্থান অধিকার করে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে গেছি।

—তারপর?

—তারপর চাকুরী করছি একই ফার্মে। আমি অফিসার, আর তুমি আমার অনেক নীচে নগণ্য কেরানী।

—যথার্থ বলেছ, তারপর।

—নারী চায় জীবনে এমন একজনকে সঙ্গী করতে চায়, যার কাছে সে পরাজিত হতে পারে। সেদিক দিয়ে তুমি অনভিপ্রেত।

—অতিশয় ঠিক কথা। কিন্তু তবু একসময়ে আমাদের দুটো মন একই প্রেমে গিয়ে বাসা বেঁধেছিল।

—সে আমার ছেলেমানুষি! আমি লজ্জার সাথে তা স্মরণ করছি। তোমার সরলতা ও ভালমানুষি আমাকে ভুলিয়েছিল। সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু এখন দেখছি, আমার সে ধারণা ভুল। তোমার বাইরের খোলসের সাথে তোমার মন খাপ খেয়ে চলছে না।

- উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না, তবু জিজ্ঞেস করি। কোনও যথার্থ অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আছে কি?

- অনেক, অনেক অভিযোগ। সবচেয়ে বড় অভিযোগ তুমি একেবারে অচল। আমাদের জীবনের গতির সাথে তোমার কোন মিল নেই।

যুবক কোন কথা বললেন না।

যুবতী বললেন—কি, কোন কথা বলছ না যে?

—সঠিক অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনতে পার নি বলে।

—অভিযোগ অনেক, কটা বলব তবু নমুনা দিচ্ছি। তুমি আত্মকেন্দ্রিক। আমার কোন কাজ তুমি মনোযোগ দিয়ে সম্পন্ন করতে এগিয়ে আস না। নিজের কাজই কর। আমার নিতান্ত জরুরি কাজে তোমার একদিন উপস্থিতি প্রার্থনা করেছিলুম। তুমি হাজিরা দিয়েই চলে গিয়েছিলে। আমার সাথে ভাল করে দেখা করেও আসনি।

—অভিযোগ দৃঢ়ভিত্তিক নয়। মানুষেরই কাজ থাকে, সে করে। প্রয়োজন মত অন্যের কাজও করে দেয়, প্রিয়জনের ত বটেই। তোমার কাজকে আমি কখনো উপেক্ষা করেছি মনে হয় না। আর যে দিনের কথা তুমি উল্লেখ করলে, সেদিন তোমার জন্য আমি পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করে চলে এসেছি। তুমি কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলে, তবু আসবার সময় বলে এসেছি। যাক, তোমার মন যখন একবার ভেঙেছে, তখন যুক্তি দিয়ে তোমাকে বুঝাতে পারব না। তবু তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। তুমি কি সত্যি বিচ্ছেদ চাও।

—হ্যাঁ চাই! এরকম ভাবে দিন চলতে পারে না।

তাছাড়া, আমি এও জানি তোমার মন অন্যত্র ঝুঁকে পড়েছে। বিচ্ছেদের অন্যতম কারণও তাই।

—তোমার যুক্তি অনেকটা নেকড়ে ও ছাগলছানার গল্পের মত। তোমার মন যখন একান্তই বিচ্ছেদবর্মী, তখন আমি আর কি বলব বল।

—তুমি অস্বীকার করবে, তোমার মন কোথাও ঝুঁকে পড়েনি?

—একান্ত ভাবেই অস্বীকার করব। এ তোমার উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তি মাত্র।

—সত্যকে অস্বীকার মুচড়াই করে, এ তোমায় বলে রাখলাম রুদ্র। সত্য একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবেই।

—আমারও ভরসা সত্য। সত্যাসত্য একদিন প্রমাণিত হবেই।

—আমিও সেই ভরসাতেই রইলুম, রুদ্র। রইলুম মানে, আমি এতদূর নিশ্চিত যে আমি তোমার জীবনের ভবিষ্যতকে অবিসংবাদিত সত্য বলেই ধরে নিচ্ছি। দরকার হলে শ্রীকরা নাম ঠিকানা লিখে রেখে যেতে পারি।

—অতি উত্তম। কিন্তু আজকের যাত্রার ইতি কোথায় টানতে হবে, সে কথা স্পষ্ট করে বল। কাকা আসতে খুব বেশি বাকী বোধ হয় নেই, কারণ ঘণ্টিটি এই মাত্র ছাড়ালুম।

—হ্যাঁ, বাস্তব প্রস্তাব আছে বই কি?

—কি প্রস্তাব?

যুবতী ব্যাগ হতে বের করে দুটি টাইপ করা দরখাস্ত যুবকের কাছে ধরলেন। বললেন

—তোমার জন্য দুটি রেজিগনেশনের চিঠি টাইপ করে এনেছি। Advance কপিতে সই করে আমাকে দাও। আমি ম্যানেজিং ডিরেকটারকে দিয়ে দেব। আর অন্যটি তুমি সই করে তোমার উপরস্থ কর্মচারীকে দাও, অর্থাৎ আমাকে দাও, আমি যথাস্থানে পাঠিয়ে দেব।

—রেজিগনেশনের প্রয়োজন কেন?

—তুমি বুদ্ধু, তাই বুঝতে পার না, প্রয়োজন কোথায়। সই করে দাও এখুনি বলছি। আর জীবনে তোমার সাথে দেখা হবে না, বুঝলে।

যুবক সই করে দিলেন।

যুবতী বললেন—কাকা এসে গেল। তারপর ব্যাগ থেকে একটি টিকেট বের করে বললেন—এই নাও ডার্লিং দিল্লি এক্সপ্রেসের পাটনা থেকে কলকাতায় ফেরবার টিকিট। থ্রি-টায়ারে শোয়ার বার্থ রিজার্ভ করা আছে, তাতে চলে যাও। পাটনাতে এক ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হবে না।

একটু অপেক্ষা করে আবার বললেন শোন, চাকরী চলে যাবে বলে কষ্ট হচ্ছে? তোমার ও কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। কাজ পেয়ে যাবে। ব্রিটিশ কোম্পানী জেরালডিনাতে যেও। Mr Macdonold কে বলো। তোমার মত একটি কাজের লোক তিনি চাইছিলেন। হয়ত মাইনে বেশি পাবে। যাক্, কাকা এসে গেল। তুমি ১ নং কোচে চলে যাও, ওখানে অনেক সিট খালি আছে।

…আমার চাকরীর জন্য চিন্তা করতে হবে না রীণা দেবী। যা হোক একটা ব্যবস্থা হবেই। আচ্ছা, এখন আমি চললুম।

এই বলে যুবক উঠে দাঁড়ালেন।

রীণা দেবী বললেন—টিকিটটা নিয়ে যাও!

—টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে খন। আপনি ব্যস্ত হবেন না। চাকরী যখন নেই, আর ছুটির প্রশ্নও যখন আসছে না, তখন পাটনাতে ২।১ দিন থেকেই যাব না হয়।

এই বলে যুবকটি চলে গেলেন।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ যাবৎ চোখ বুজে ছিলেন। এবার চোখ মেলে তাকালেন। যুবকের দৃষ্টিতে বেদনা ও ক্লান্তি। যুবক একবার যুবতীর দিকে তাকিয়ে সোজা চলে গেলেন ১ নং কোচের দিকে।

রিফ্রেশমেণ্ট কার ভর্তি। একদল উঠে যেতেই বৃদ্ধ একটি চেয়ার দখল করে বসলেন। বসতেই দেখলেন রীণা দেবীও তার পাশে এসে বসে পড়লেন।

অদ্ভুত যোগাযোগ। বৃদ্ধ বেয়ারাকে ডেকে বললেন দু পট চা ও কিছু খাবার নিয়ে এস।

তারপর রীণা দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মানা

করবেন না কেন। প্রায় ছ ঘণ্টা এক সাথে এসেছি – পাশাপাশি বসে এসেছি। বন্ধুত্ব হয়ে গেছে বলতে পারেন। অতএব চা-এর আকারে বিরক্ত বোধ করবেন না।

রীণা দেবী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বললেন আশ্চর্য, আপনি কালা নন। তবে কথা শুনতে পান?

—পাই বই কি?

—তবে কালার ভান করে কাগজ দেখছিলেন কেন?

—ভান করিনি ত, কাগজ দেখিনি, পড়ছিলাম। কেন, আপনার কোন অসুবিধা হয়েছে কি?

—অসুবিধা হয় নি বলব কি করে? আপনি আমাদের কথাগুলি সব শুনেছেন ত?

—শুনেছি বই কি? অত জোরে জোরে কথা বললে পাশের লোক শুনতে পাবে এতে আর আশ্চর্য কি?

বেয়ারা চা ও খাবার নিয়ে এল। রীণা দেবী খাবার গুছিয়ে চা পরিবেশন করলেন।

পরে ভ্রু কুঁচকে বললেন—আপনার দেওয়া চা খাবার না খাওয়াই উচিত ছিল। বৃদ্ধ হয়ে ছলের আবরণে আমাদের সব কথা শুনলেন? তবু খাচ্ছি, কথা বলবার লোক পেয়েছি বলে।

—আপনি রাগ করবেন না রীণা দেবী। কি লাভ আমার আপনাদের কথা শুনে বলুন। লাভ ত হয়ই নি। বরঞ্চ বিমোনটা ভাল ভাবে হয় নি এই ক্ষতি হয়েছে। আর ক্ষতি হয়েছে, মনটা ভারাক্রান্ত করেছি বলে।

—আমাদের এমন কি কথা হল, যাতে আপনার মন ভারাক্রান্ত হতে পারে? অবশ্য যদি অতীতের কোন কথা স্মরণ করে হয়ে থাকে, তাহলে আমি কিছু বলতে পারব না।

—অতীতের কথা নয় রীণা দেবী। আমাদের যৌবনের ভুল ও আপনাদের যৌবনের ভুলে কতই না পার্থক্য। সেই অতীত যুগের ম্লান ধারণা মনে করে আসছি বলেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছে।

—আপনাকে কি বলে সম্বোধন করব জানি না। ওঃ, ঐ ত আপনার নাম ব্যাগে লেখা। শ্রীসুশোভন সরকার আপনার মনটা ভারাক্রান্ত হল কেন, সত্যি করে বলুন দেখি।

চায়ের কাপে বড় রকমের একটা চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে মিঃ সরকার বললেন, ভাবছিলাম, এত সহজে আপনি রুদ্রর সাথে ছেদ টানলেন কি করে?

—মনের মিল না হলে শুধু শুধু ভারী মন নিয়ে ঘরে বেড়ানটাই কি ভাল?

—কিন্তু এতে ত মন ক্ষত বিক্ষত হয়।

—না হয় না। আপনি আগের যুগ হতে বের হয়ে আসুন মিঃ সরকার। দেখবেন কোন জটিলতা নেই। মানুষ আজ মহাকাশ জয় করেছে। চাঁদের পিঠে ঘুরে বেড়িয়েছে। অতএব বর্তমানে অতীতকে আঁকড়ে ধরে রাখলে চলবে কেন? পৃথিবী কত অগ্রসর হয়েছে। ভারতই বা কম কি? ভারতের ইতিহাসে ভারত যুদ্ধে শুধু পরাজয় বরণই করেছে। কোনকালে বহিঃশত্রুর আক্রমণে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে নি আর এবার? ভারতের সর্বত্র জয় জয়কার রব। গতির যুগে স্থিতিকে আঁকড়ে আমি ধরে রাখব না। অতএব রুদ্রর সাথে বিচ্ছেদে আমরা উভয়েই উপকৃত হব, আমার স্থির বিশ্বাস। সতেজ, সুস্থ মন নিয়ে কাজ করলে মন ক্ষত বিক্ষত হয় না, বরং আরও সবল হয়ে ওঠে। কর্মক্ষমতা তার বেড়ে যায়। মনের ক্লান্তি ত থাকেই না, বরং ক্লান্তির অপনোদন হয়।

—আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না রীণা দেবী!

—দাঁড়ান, দাঁড়ান মিঃ সরকার, আপনি আমাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করবেন না। আপনার বয়সের অর্ধেকের চেয়েও কম বয়স আমার। আমাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করবেন।

—কথাটা শুনে খুশি হলাম। কিন্তু রুদ্রর সঙ্গে তোমার কথাগুলি বা ঘটনাটা আমি বুঝতে পারছি না। চা খেতে আমাকে সঙ্গ দিয়েছ, তাতে অসংখ্য ধন্যবাদ।

কথা শেষ না হতেই ইউরোপীয় পোষাকে নিখুঁতভাবে সজ্জিত এক ভদ্রলোক এসে রীণা দেবীকে বললেন, পাটনা সিটি পার হয়ে গেল রীণা। এবার পাটনা জংশন। শীগ্‌গীর এসো, নামতে হবে। সারা পথ ত

তোমার নির্দেশে তোমায় দেখাই পেলাম না। এখন চল একত্র নামি।

রীণা দেবী ঐ ভদ্রলোকের সাথে এগিয়ে যেতে যেতে মিঃ সরকারকে বলে গেলেন, আচ্ছা, চলি মিঃ সরকার, অনর্থক মন খারাপ করবেন না মনে রাখবেন আজ বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক চলছে, অতীতের লিলিত চর্বণের যুগ এ নয়। সামনে এগিয়ে চলার যুগ

পাটনা জংশনে এসে গাড়ি থামল

বৃদ্ধ সরকার ধীরে ধীরে নিজ কামরার দিকে এগিয়ে চললেন। রীণা দেবীর সেই 'অতীতের লিলিত চর্বণের যুগ চলে গেছে' কথাটি মিঃ সরকারের মনকে বার বার নাড়া দিচ্ছিল। রীণা দেবীর অনেক কথাই যেন তাঁর কানে বাজতে থাকে। সংবাদপত্রখানা হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে নিজের মনকেই প্রশ্ন করতে লাগলেন। রীণা দেবীর যুগ আর তাঁর ঠাকুরমা দিদিমার যুগের কথা তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কোন যুগকেই তাঁর কাছে সুস্থ বলে মনে হল না। ধর্মীয় সংস্কারের প্রলেপে ঠাকুরমাদের যুগের নারী-জীবনের স্থিতিভূমি যেমন ছিল জড়ত্ব, আবার বর্তমানের রীণাদেবীদের মত নারী-জীবনে পাশ্চাত্ত্যের একান্ত গতিধর্মও কি সুস্থ? একান্ত অন্তর্মুখী ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই সুস্থ ছিল না, কিন্তু রীণাদেবীদের জীবন যে গতিধর্মের নেশায় ছুটেছে, তাও কি কল্যাণকর হবে? জীবনে গতি যেমন সত্য, সত্যকে লাভ করবার জন্য অতীতকে ছিঁড়ে ফেলা যেমন সত্য, তেমনি সেটা শুধু ধ্বংসাত্মক না হয়, সেটা আমার খেয়ালখুশির প্রলাপ না হয় তাও তো দেখতে হবে? রীণাদেবীরা যে শিক্ষায় শিক্ষিত তা কি তাদের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক কল্যাণবুদ্ধি, সামাজিক সংহতি সম্বন্ধে সচেতন রাখতে পারছে? Free mixing-এর যুগে প্রথম পরিচয় থেকেই আরও বিচারবিবেচনা করে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা ছেলেমেয়ে উভয়কেই দিতে হবে। মিঃ সরকারের মনে পড়ল বৈদিক যুগের কথা—সে কালে তো নারীরা পতি নির্বাচনের অধিকারী ছিলেন—কিন্তু সে নির্বাচন আর এই রীণার নির্বাচন কি এক হল? নির্বাচনের মাপকাঠি হওয়া উচিত মনুষ্যত্ব—জামাকাপড়ের পারিপাটা, চাকুরীর উচ্চনীচতা, দৈহিক সৌন্দর্যের কমবেশী কি সে নির্বাচনে খুব একটা বড় কথা? রীণার যুক্তিজালের পিছনে কি গতিধর্মের মোহে উচ্ছৃঙ্খলতা নেই? Free Mixing-এর যুগে লেখাপড়া যদি সত্যিই শেখা হয়ে থাকে তাহলে নির্বাচনের সময়ই আরও বিচার করতে হত না কি? রীণা বলেছিল মেয়েরা পুরুষের কাছে পরাজিত হতেই খুশী হয়—কিন্তু এটা কি একটা সুস্থ চিন্তা হল? রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা তো তার প্রেমিকের কাছে পরাজিত হতে চায় নি, তাকেও পরাজিত করতেও চায় নি। বৃদ্ধ মনে মনে আওড়াতে লাগলেন—

'নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী;
পূজা করি মোরে রাখিবে উর্ধ্বে
সে নহি নহি।
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সংকটে বিপদে
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে'।

আজকাল কঠিন ব্রত বলে কারো কিছু নেই? সেই নিকষে যদি বিচার হত? রীণা বলেছে—আমার স্ত্রী কেমী, আমি অফিসার, তুমি কেরানী—সুবক সোষাকে পারিপাটো স্মার্ট নয়—এ বিচার প্রথমে কোথায় ছিল—তখন শুধু দেখেই মুগ্ধ হলে কেন? মিঃ সরকার ভাবতে লাগলেন। বিচার কি শুরু হল? জোর করে কেবল একত্র থাকা ঠিক নয়, অন্তঃসারশূন্যতাকে চিরদিন ধরে বহন করাও যেমন উচিত নয়, তেমনি যে হিসাব নিকাশে এ বিচ্ছেদ টানা হল তা কি শুদ্ধ হল? এ ছিনেবে হৃদয়ের সত্যতা কি প্রেমের মাদকতার কাছে পরাজিত হল না? বর্তমান নারী তথা সমগ্র সমাজের কাছে সমস্যা এটাও—অধ্যাপক ভাবতে লাগলেন।

আজ সঞ্চয় করুন

স্বল্প সঞ্চয়ের প্রকল্পগুলি জানুন

আয় বৃদ্ধি করুন

- ১, ৩, ৫, বছর মেয়াদী পোষ্ট অফিস টাইম ডিপোজিট প্রকল্প।
- বার্ষিক সুদ ৬%, ৭% এবং ৭½%।
- পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট—
- চক্রবৃদ্ধি হারে করমুক্ত বার্ষিক সুদ ৪%। সমগ্র আর্থিক বছরে ন্যূনতম ১০০ টাকা জমায় ৪½% ও ২ বছরে বদ্ধ আমানতে ৪½%।
- ৫, ১০, ১৫ বছর মেয়াদী কিউমুলেটিভ টাইম ডিপোজিট প্রকল্প—করমুক্ত বার্ষিক সুদ ৪%।
- ১৫ বছর মেয়াদী পাবলিক প্রভিডেণ্টফাণ্ড প্রকল্প—কর-মুক্ত চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ ৪%।

কিউমুলেটিভ টাইম ডিপোজিট এবং ১৫ বছর মেয়াদী পাবলিক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রকল্পে আয় করের রিবেটও পাওয়া যায়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্ত্তী পোষ্ট অফিস, জেলা সঞ্চয় সংগঠনের সংগে যোগাযোগ করুন।

॥ জেলাতথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত ॥

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই
বিশুদ্ধ
মাখন ও ঘৃত

●

বিশুদ্ধ প্রতিষ্ঠান

সরকার ডায়েরী
ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক
৩২, ভূপেন বসু এভিনিউ
কলিকাতা-৪

ট্রপিক্যাল
ডি লুক্স্
ব্যাটারী
ভারত ইলেকট্রিক্যাল
ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ
এজেন্ট:
বি ওভারসীজ মার্কেণ্টাইল কোং লিঃ
কলিকাতা ● বোম্বাই ● দিল্লী ● কানপুর মাদ্রাজ

16 MAY 1972

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধি করিলে তবেই ভূমির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। ভূমাতে একত্ব ও বহুর সামঞ্জস্যের সার্বভৌম চরিত্রধর্মতা যে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে। 'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এ-জগৎ গড়ার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১। ভূমসুত্র (অখণ্ড কাণ্ড)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)
২। ঈশোপনিষৎ
৩। কেনোপনিষৎ
৪। কঠোপনিষৎ
৫। প্রশ্নোপনিষৎ
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ
১১। গীতাবয়তী
১২। উদ্বোধনবাণী (পুস্তিকা)
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২·০৯

পাণ্ডুলিপি

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী, ভাষণ ইত্যাদি

প্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির ভ্রমকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিত্যগোপাল
ও শিক্ষা সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়ঋষি শ্রীনিত্যগোপাল	০·৬২
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২·০০
শরৎচন্দ্রের পথের দাবী	৩·০০
রবীন্দ্র-কাব্য	৫·০০
প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (তারা—দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা

উদ্বোধনবাণী প্রতি সংখ্যা ০·৮০, বার্ষিক ৫·০০

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীবিদ্যাগোপাল-স্বামী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আস্তিক-নিরাস্তিক সমন্বয়।
আকার-নিরাকার-নিরাকার সমন্বয়।
ভক্ত-অভক্ত সমন্বয়। [illegible]
অদ্বৈত সমন্বয়। দ্বৈত
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক" "এই বিশ্বই আমার মহাপীঠ"

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৯, ১৯৭২ — প্রকাশিকা—রেণু মিত্র — পঞ্চবিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

রেকারিং ডিপজিট স্কীম

ইউবিআই-তে

সুদের হার বাড়লো

১লা মার্চ ১৯৭২ থেকে ইউবিআই-এর রেকারিং ডিপজিট স্কীমে টাকা জমানো আরও লাভজনক। আপনার সুবিধেমত ৪৮, ৬০ অথবা ৮০ মাসের কিস্তিতে জমাতে পারেন।

- আপনার সঞ্চয় চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে বাড়ে।
- সঞ্চয় করতে কষ্ট হয় না। ৫ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে যে কোন নির্দিষ্ট টাকাই মাসে মাসে জমাতে পারেন। টাকা অবশ্য পাঁচের গুণিতক হওয়া চাই।
- অপ্রয়োজনে যে টাকা থাকেও না আবার কাজেও লাগে না সেটা মাসে মাসে জমালেই মোটা টাকা পাবেন। সত্যিকার প্রয়োজন মিটবে।
- কয়েক মাসের মেয়াদে কেন্টিভাজে আকাউন্ট খোলা যায়। উৎসব পার্বণে খরচের ধাক্কা সামলাতে কাজে লাগে।

মাসিক কিস্তি টাকা	মেয়াদ শেষে আপনি পাবেন		
	৪৮ মাস টাকা	৬০ মাস টাকা	৮০ মাস টাকা
৫	২৭৭	৩৬০	৫১৮
১০	৫৫৪	৭২০	১০৩৬
২০	১১০৮	১৪৪০	২০৭২
২৫	১৩৮৫	১৮০০	২৫৯০
৫০	২৭৭০	৩৬০০	৫১৮০

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBF-38-72

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নবনারায়ণ আশ্রম গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

VIVEKA

উদ্বোধন

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭২ পঞ্চবিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

ভগবান বুদ্ধ ও ভগবান শঙ্করাচার্য্য

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ॥

[উনিশ বৎসর আগে লেখা প্রবন্ধটী আজও সমান প্রয়োজন নূতন সমাজ নূতন রাষ্ট্র গঠনে। গোড়ায় দার্শনিক চিন্তাধারার বদল না হইলে গতিধর্মের দিতা ভগবান বুদ্ধকে আমাদের ভারতীয় রক্তে যে প্রবেশ করানো যাইবে না, অথচ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে, কম্যুনিজমকে আত্মস্থ করিয়া, হজম করিয়া তাহাকে সমাজের মধ্যে সুস্থ রূপ দিতে গেলে যে বুদ্ধদেবের গতিধর্ম আমাদের পরম প্রয়োজন সেই সব কথা আজও আমাদের বুঝিতে হইবে। তাই এ প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।—সঃ, উদ্বোধন]

ভগবান বুদ্ধ ছাড়া ভারত ভারত হয় না, আচার্য্য শঙ্কর ছাড়াও ভারতবর্ষ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। শঙ্কর ভারতের চারি প্রান্ত ঘিরিয়া ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া স্থিত। বুদ্ধ বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় পতাকাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। আজ দুইকেই চাই। কাহাকেও একান্তভাবে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ দুইয়ের মধ্যে রহিয়াছে মৌলিক প্রভেদ দার্শনিক ক্ষেত্রে, সমাজ-ব্যবস্থায়। বেদান্তের সকল ভাষ্যকার বৌদ্ধমতকে অবৈদিক বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, অভিধানে পাষণ্ড বলিতে বৌদ্ধকে বুঝা যায়; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়াছেন, 'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় নাস্তিক'। বৌদ্ধ মত 'বেদ' নামক পুস্তক খানির উপর স্থাপিত হয় নাই। এইরূপে খণ্ডিত, ধিক্কৃত বৌদ্ধ-মতকে কি করিয়া বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ও সমাজ প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিবে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যে-বৈষ্ণবদের কাছে বেদের মত সম্মান পায়, তাঁহারা কি করিয়া বুদ্ধকে শ্রদ্ধা করিবেন? অথচ বুদ্ধকে বাদ দেওয়াও তো সম্ভব হইবে না। তাঁহাকে স্বীকার না-করার অর্থ বাস্তবকে অস্বীকার করা, বাস্তব হইতে মুখ ফিরাইয়া নিজের কল্পনার মধ্যে বিচরণ করা।

দর্শনের ক্ষেত্রে বুদ্ধ ও শঙ্কর এমন বিপরীত মতবাদ প্রচার করিয়াছেন যে তাহা অবগত হইলে তাঁহাদের মধ্যে যে কস্মিন্ কালেও মিলন সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। বৌদ্ধমতে 'ক্ষণিকেষু অপি একত্ত্ব-বিভ্রান্তিঃ অবিদ্যা'—ক্ষণিকসমূহের মধ্যে যে এক, স্থির বা নিত্য অপরিণামী কিছু আছে বলিয়া 'ভ্রান্তি', তাহাই অবিদ্যা। এই বিশ্ব ক্ষণিকের মেলা। ক্ষণ ক্ষণই; ক্ষণসমূহের মধ্যে একত্ব কোথায়? ক্ষণ তো বহু। ক্ষণ সর্ব্বদাই অস্থির, তাহাদের মধ্যে আবার স্থিরত্ব কোথায়? ক্ষণ পরিণামী, তাহার মধ্যে অপরিণামীর স্থান কোথায়? বাল্য একটী ক্ষণ, তাহা সত্য; কৈশোর একটী ক্ষণ, তাহাও সত্য; যৌবনও একটী ক্ষণ; তাহাও সত্য। 'যৎ ক্ষণিকং তৎ সত্যম্।' ইহার মধ্যে 'এক আত্মার' আবিষ্কার করিয়া তাহার পিছনে ছোটা তাই 'অবিদ্যা।' এই একত্বদর্শন, স্থিরত্বদর্শন বা নিত্যদর্শনরূপ অবিদ্যার নির্ব্বাণই জীবের সাধ্য। অথচ ক্ষণিকসমূহের মধ্যে একটী 'একত্বের' আরোপ না করিলে সংসার-ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। বহু যদি একান্ত বহুই থাকিত, তবে কেমন করিয়া অতীতের স্মৃতি বর্ত্তমানে সম্ভব হয়, কেমন করিয়াই বা বর্ত্তমানের বুকে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের পরিকল্পনা মানুষ করে? বাল্য যদি বাল্যই থাকিত, তবে বাল্যকে আর কিশোর বয়সে স্মরণ করা সম্ভব হইবে না, লোকব্যবহারই অসম্ভব হইবে, কোনও

ক্রমবিবর্তনের ধারাই বজায় থাকিবে না। তাই একত্ব-দর্শনরূপ ভ্রান্তির অবসান হইলে সংসার-ব্যবহার বিলুপ্ত হয়।

আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে এই দর্শনই অবিদ্যা, চঞ্চলতাই অবিদ্যা, পরিণামই অবিদ্যার খেলা। তাঁহার মতে একত্বদর্শনই বিদ্যা। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। চঞ্চল-পরিণাম ছাড়া যখন সংসারই হয় না, তখন একমেবা-দ্বিতীয়ম্-এর জ্ঞানে সংসারদর্শনরূপ ভ্রান্তির অবসান অবশ্যম্ভাবী। শঙ্কর ও বুদ্ধ উভয়ের কাছেই নির্ব্বাণাবস্থায় 'সংসার' নাই। শঙ্কর বলেন—যেহেতু একত্বই পারমার্থিক সত্য, সেই হেতু বহুর লীলাভূমি এই সংসার মিথ্যা হইতে বাধ্য। বুদ্ধ বলেন—যেহেতু ক্ষণিকত্বই পারমার্থিক সত্য, সেই হেতু একত্ব দর্শনের যে জগৎ, সেই জগৎ মিথ্যা না হইয়া যায় না। একান্ত একত্বেও সংসার প্রতিষ্ঠিত হয় না, একান্ত বহুত্বেও সংসার দাঁড়ায় না। সংসার আছে একত্ব ও বহুত্বের অন্যোন্যমৈথুনের উপর ভিত্তি করিয়া। একত্ব ও অনেকত্বের অন্যোন্যমৈথুনকে বুদ্ধির শাণিত ক্ষুরিকাঘাতে কাটিয়া একান্ত এক ও একান্ত অনেকের বিভাগ রক্ষা করিলে দুই-ই যে ব্র্যাডলীর (Bradley) ভাষায় bloodless category-তে পরিণত হয়, তাহা সেই যুগে ধরা পড়ে নাই। একান্ত 'একে'র সংসারও মিথ্যা, একান্ত 'অনেকে'র সংসারও মিথ্যা। তাই বৌদ্ধদর্শন বা শঙ্করদর্শন সংসারকে পার-মার্থিক রূপে স্বীকার করেন নাই, করিতে পারেন না। যদি কোন পুরুষ একত্ব-অনেকত্বের সমন্বয়-দর্শন আস্বাদন করিতে পারেন, তবে তিনিই শুধু এই সংসারকে ব্রহ্মমূলে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। যতদিন বুদ্ধ ও শঙ্কর দুই দুই থাকিয়া এক না হইতেছেন, যতদিন বুদ্ধের একত্ব-দর্শন রূপ অবিদ্যা ও শঙ্করের বহুত্ব-দর্শন রূপ অবিদ্যা পরস্পরের মধ্যে গলিয়া না যাইতেছে, ততদিন ভারতবর্ষ কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিবে না। বুদ্ধ শঙ্করের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব (কাড়া) মৈথুনে গড়িয়া না উঠিলে ভারতবর্ষ কিছুতেই স্বরূপ আস্বাদন করিতে পারিবে না। বুদ্ধের বিদ্যা শঙ্করের বিদ্যা, বুদ্ধের অবিদ্যা ও শঙ্করের অবিদ্যার সমন্বয় যিনি বিধান করিবেন, তিনিই বর্ত্তমান যুগের 'পুরুষোত্তম'। পাঁচ হাজার বৎসর আগের সর্ব্ববাদবিবাদ-প্রতিরূপশীল পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই এই সমন্বয়বাদ ধরার মাটীতে বপন করিয়া যান। পাঁচ হাজার বৎসর পরে আজ পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল এই মতবাদের একটী সম্পূর্ণ ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীনিত্যগোপাল এইখানে দাঁড়াইয়াই এক ও বহুর, নিত্য ও অনিত্যের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। শঙ্করের 'এক' ও বুদ্ধের 'বহু', শঙ্করের 'নিত্য' ও বুদ্ধের 'অনিত্যে'র সমন্বয়ই শ্রীনিত্যগোপালের লক্ষ্য। এক ও বহুর সমন্বয় তাঁহার জীবনের আস্বাদ বলিয়া এই সংসার তাঁহার দৃষ্টিতে পার-মার্থিকভাবে সত্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'আমি অভেদ-বাদীও বটে, প্রভেদবাদীও বটে'। তিনি যখন অভেদবাদী, তখন তিনি শঙ্কর, যখন তিনি প্রভেদবাদী, বহুবাদী, তখন তিনি বুদ্ধ। শ্রীনিত্যগোপাল আরও লিখিতেছেন, 'আমাদের বিবেচনায় শ্রীভগবান এক ও বহুর অতীতও বটেন'। শ্রীভগবান একও বটেন, বহুও বটেন, এক ও বহুর অতীতও বটেন—ইহাই শ্রীনিত্যগোপাল-সিদ্ধান্ত। শ্রীনিত্যগোপাল আমার নবীন বুদ্ধ, নবীন শঙ্কর। এতদিন শঙ্কর-বুদ্ধ পারস্পরিক সম্বন্ধে লিপ্ত ছিলেন, এইবার শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনে তাঁহারা মিলিত হইয়া আত্মস্থ হইলেন, পূর্ণ হইলেন, নিজেকে প্রত্যেকে পূর্ণ করিয়া পাইলেন।

ভগবান শঙ্করের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা যে বর্ণে বর্ণে প্রকাণ্ড ভেদের প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়া সমাজদেহের চলাচল বন্ধ করিয়া সমাজকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে—যাহারই ফলে মহাকালের বিচারে সে ব্যবস্থার আজ ভাঙন ধরিয়াছে—তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে একত্বের উপর অতিমাত্রায় জোর দেওয়া, একটা সিঁড়ি-তন্ত্রের প্রবর্ত্তন করা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র একটি অখণ্ড সমাজজীবনের খণ্ড খণ্ড 'অঙ্গ' ছাড়া কিছু নয়। সিঁড়িতন্ত্র প্রবর্ত্তনের ফলে ইহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে ইহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র হইয়াও পরতন্ত্র (independent and interdependent)। ভগবান বুদ্ধ প্রচার করিয়া গিয়াছেন প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্ব। তাই তাঁহার ধর্ম্ম

ছিল প্রত্যেকের জন্য। পক্ষান্তরে শঙ্করের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বর্ণ ছিল সিঁড়িতন্ত্র ব্যবস্থায় যাহারা উচ্চবর্ণ তাহাদের জন্য। নিম্নবর্ণীয়েরা শুধু উচ্চবর্ণীয়দের সেবা করিয়া ধার্মিক হইবেন। একটি সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থা গড়িতে হইলে শুধু শঙ্করের বর্ণাশ্রমব্যবস্থায় কিংবা আধার বুদ্ধের সব মানুষের 'সমান-অধিকারে'র ব্যবস্থায় কুলাইবে না। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় 'যোগ্য' মানুষ গড়িয়া উঠে, কিন্তু সঙ্ঘগঠনে বাধার সৃষ্টি হয়। বুদ্ধের দর্শনে সঙ্ঘসৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া আছে। বৌদ্ধদর্শন নরকে কেন্দ্র করিয়া আর বর্ণাশ্রম দর্শন নারায়ণকে কেন্দ্র করিয়া স্ফুরিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল-প্রস্তাবিত নর-নারায়ণ দর্শন বা পুরুষোত্তম-দর্শন নর ও নারায়ণের সমন্বয় প্রবর্তন করিয়া যোগ্য-অযোগ্যের মিলিত 'চলা'র পথ আঁকিয়া দিবে। বৌদ্ধদর্শন দিয়াছে চলার উপর জোর, শঙ্কর-দর্শন দিয়াছে 'অচলে'র উপর জোর। চল-অচলের সমন্বয় করিয়া ভারতবর্ষকে নূতন বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার জন্য 'দিতে হবে পাড়ি,' 'তরঙ্গের সাথে লড়ি বাহিয়া চলিতে হবে তরী'। বর্তমান বিশ্বের আদি মানব শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন, তাঁহার ঘরে শঙ্কর-বুদ্ধ জয়যুক্ত হউন, বৈশাখী পূর্ণিমার বুদ্ধ-আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক। বুদ্ধ-শঙ্করের সমন্বয়ে বিশ্ব এক-বিশ্বে গড়িয়া উঠিবে, ধরার ধূলি হইবে ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হইবে ব্রহ্ম-মানুষ। বন্দেনাতরম্।

আজকের আমি

।। শ্রীশান্তশীল দাশ ।।

দিনগুলো কেটে যায় এক একটি করে :
সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, আলো-আঁধারের
মালা গেঁথে গেঁথে ;
কখনো বা নির্বিকার নিরাসক্ত হয়ে।

আসছে প্রচণ্ড ঝড়, সমগ্র বিনাশের
আশঙ্কা, নিঃশব্দে গোণা শেষ মুহূর্তের ;
আবার প্রসন্ন মূর্তি আকাশের তলে
স্নিগ্ধ-শান্ত জীবনের উদার আশ্বাস !

অজস্র চোখের জল ঝরে পড়ে কখনো দু'চোখে ;
বেদনার প্রস্রবণ, জীবনের অতৃপ্ত হাহাকার ;
গভীর তৃপ্তির আলো কখনো বা সমগ্র সত্তায়,
নানা উপাচার দিয়ে জীবন-বাড়ানো।
ঘর-বাঁধা অন্তরঙ্গ প্রিয়জন সাথে,
মধুর আলাপ, তীব্র জীবন-পিপাসা ;
আবার মুহূর্তে শেষ সেই আকর্ষণ,
কী বিতৃষ্ণা জীবনের পরে !

এমনি করেই কাটে একটি একটি দিন,
মাস, বর্ষ শেষ হয়ে যায়,
ঘুরে থেকে দেখি সব—কান্না হাসি, জীবন-মৃত্যুর
অপরূপ লীলা এই আলো-আঁধারের।

কখনো হারিয়ে ফেলি এ খেলার সাথে
নিজেকেও—চোখে জল ঝরে, কাঁদি তীব্র বেদনায়,
আনন্দে কখনো ভুলি, হাসি প্রাণ খুলে,
অজ্ঞাতে জড়িয়ে পড়ি এই হাসি-কান্নার খেলায়।
দর্শক তখন আর নই আমি, রঙ্গমঞ্চে সহ-অভিনেতা,
তাদের চোখের জলে মিশে যায় আমার বেদনা,
তাদের হাসিতে হাসি, যোগ দিই আনন্দ-উৎসবে।

আবার সহসা সরে যাই, ঘুরে সরে যাই
দূর থেকে চেয়ে দেখি নিরাসক্ত হয়ে,
এই হাসি, এই কান্না, এই গান, এই হাহাকার ;
এতটুকু মনে দাগ পড়ে নাও, প্রাণহীন যেন
হয়ে যাই ; মনে-প্রাণে কোন অনুভূতি
নেই যেন, পাষাণ প্রতিমা !

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৪১)

১২৫ টাকা কুমারকে আমিই দিতেছি। ১ মাসের মধ্যে আসিয়া সে উজ্জলভারতের কাজে লাগিবে এইরূপ কথা। কত জনের জন্য কত দিয়াছি, কুমারের জন্য ১২৫ টাকা জলে ফেলিলেও অন্যায় হয় না। নীলু আসে ২ • টার পর। রাত্রিটা থাকিয়া যায়। রেণু প্রেসে গিয়া সব প্রুফ দেখিয়া আসে। পরশু পাঠাইয়া দিবে। নীলুরও 'আসা'র কথা বলিলাম। একা একা মীমাংসা হইবে না। এদিকে ১৫ টাকার ঘর পাইলে সেখানে আসিয়া কাজে লাগা উচিত। আসিতে পারিলে সে-ও বাঁচিবে। আমি কাহার ভরসায় ঝাঁপ দিয়াছিলাম? কাহার মুখের দিকে চাহিয়া ৪টী সন্তানসহ এক স্ত্রীকে ফেলিয়া বৃন্দাবন গিয়াছিলাম? ভরাডুবি হয় নাই 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'। ৪টায় মঠে যাই। সন্ধ্যার পর নিত্যগোপালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নগেন ও — সরকার এখানে আসিয়া আমাকে না পাইয়া মঠে যায় কালনা মঠে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিতে। আমি আমার উপর নির্যাতনের কথা, শেষে দিয়াড়াপাড়া মঠের ব্যবহারের কথা বলিয়া যাইবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করি। উহারা বলে, আপনি ছাড়া নিত্যগোপালের কথা কে বলিবে? রমাপতিবাবু নীলরতনবাবু কিতীশ খগেনবাবু কালো প্রভৃতি ছিলেন। আমি একাই রহিব, আর কেউ নয়। রাজি না হইয়া পারিলাম না। ২ খানা নিত্যগোপাল দর্শনে জীবনে কিনিয়া নেয়। শৈলপতি মুখার্জী প্রধান অতিথি। ..

১লা ডিসেম্বর

শ্রীনিত্যগোপাল, .. তোমা হইতেই প্রাণদর্শন স্ফুরিত হইতেছে।...তোমাতে প্রাণদর্শন মূর্ত্ত। তুমি তাই বর্ত্তমান যুগের প্রাণ-পুরুষ। 'পুর্ অগ্রগমনে'—যিনি অগ্রগামী, তিনিই পুরুষ। প্রাণ সর্বাঙ্গ, সর্বরস, সর্বগন্ধ, সর্বস্পর্শ, সর্ব সাম্প্রদায়িক।...প্রাণই রসায়ন—মরা গাঙে যান ডাকে প্রাণের উদয়ে। প্রাণ জরা-বিধ্বংসী, জরাগ্রস্ত জাতির তারুণ্য আনয়ন করিতে পারে একমাত্র প্রাণ, মন নয়। ...মায়াবাদ কবিত্ব নয়। কবি জড়কে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া দেখে...'জগৎ মিথ্যা'-বাদের উপর কি কবিত্ব দাঁড়ায়? তোমার জয় হউক। ৯টায় নকুলেশ্বরবাবু আসেন কয়েকটী কমলা ও আপেল লইয়া। অনেক কথা হয়—'অনিত্যের' নিত্য নাচ', প্রতিটী অংশের পূর্ণতা ও এইরূপ অনন্ত পূর্ণ অংশের সমন্বয়ে গড়া 'সমগ্র' আস্বাদনের কথা, মনের স্তরে অতি মানসের অবতরণের কথা, ascent ও descent এর পৃথকত্ব না থাকার কথা; এই বিশ্বের বুকে অবতীর্ণ অতিমানস ও ব্রহ্মের ছড়াইয়া থাকিবার কথা। তাঁহাকে বিশ্ববাসীর কাছে ধরাইয়া দিবার কথা; বর্ত্তমান পদার্থ বিদ্যার আবিষ্কারের ফলেই মননধর্মীন জড়ের বুকে অতিমানসের নামিয়া আসিবার কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়। তিনি যে মনে মনে তাঁহার রাজভোগ খাওয়ার কালে আমার কথা স্মরণ করেন, আমার সেই 'ভাগ' না নিয়া আসা লইয়া কৌতুক করা হয়। ঠাকুরও এমনি একদিন কুমারেশের ভাগ বিশ্ববন্ধুকে দিয়াছিলেন। কুমার ১২টায় আসে। তাহাকে লইয়া ৪টার পর মঠে যাই। বৈকালী প্রসাদ পায়। ছয়টায় পূর্বে ফিরি। এখানে খাইয়া ৬। • টায় যায়। ১২৫ টাকা দেই। নীলু দক্ষিণেশ্বর যায়। তাহার এখানে থাকার কথাই বলি।...প্রভাস সরকার আসে, ১৫ টাকা দিয়া যায় সন্ধ্যার পর। নকুল বাবু নিত্যগোপাল দর্শনে জীবনে ১॥• টাকা দিয়া নেন।

২রা ডিসেম্বর

নিত্যগোপাল, আমার প্রাণ পুরুষ, আমার মনবুদ্ধি অহংকার তোমার মাঝে লয় হউক। সমগ্রকে piece meal—টুকরা টুকরা করিয়া—দেখার মনোবৃত্তি মুছিয়া যাউক। আমার বাহিরে সবই অজানা অচেনা। সেই অজানার রাজ্য পাড়ি দিতে মন অক্ষম, সেখানে দাঁড়াইয়া আছে শুধু প্রাণ। তুমি 'মধ্যম প্রাণ'—সকল দলের ওপারে অথচ সকল দলকে আলিঙ্গন করাইয়া। সকল দল মিলাইয়া তোমার যে এক 'অখণ্ড দল' সেই দলে আমাকে প্রবেশাধিকার দেও। বিশ্বের যেখানে যে দেশে যে-কিছু তোমার প্রকাশ, সব কিছুকে আস্বাদন করিবার প্রাণ আমাকে দেও। দেও আগাইয়া যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প, সরল বিশ্বাস, নির্ভরতা। সব রসই তোমার রস। আমি সর্ব রসের রসিক হব। জীবনের পক্ষে প্রত্যেকটী অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়। উচ্চ নীচ এই বিশ্বে নাই। প্রত্যেকেই যে যাহার সত্তা লইয়া অদ্বিতীয়। আমি বিশ্ব প্রদক্ষিণ করিয়া সব আস্বাদন করিব জন্ম হইতে জন্মান্তরে।···রেণু বাহির হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় ও শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (16th edition) আনে। সেখানেও 'তুই এসেছিস? আমিও এসেছি' আছে। গোপাল জন্ম মহাভারত আনে। রেণু দেবীর সঙ্গে দেখা করে ও নীলুর চাকুরীর কথা বলে। আমি ৩টার পর হরিদাসীর বাসায় যাই।···সেখান হইতে মঠে আসি।···বি, কে, পাল আজ আসেন নাই।···তারিণীবাবু কাল আসিয়াছেন। গুরুভ্রাতা ও প্রশিষ্যদের সঙ্গে আমার যে মৌলিক বিরোধ চলিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কি করণীয়, তাহা আলোচনা করিব। তিনিই বা কি করিবেন সোজাসুজি জানা দরকার।

৩রা ডিসেম্বর

ঠাকুর, আমার নিত্যগোপাল আর ওদের নিত্যগোপাল কত পৃথক। আমার নিত্যগোপাল বিশ্বরূপ জগন্নাথ। ওদের নিত্যগোপাল ঠাকুর বাড়ীর নিত্যগোপাল অর্থাৎ ব্যক্তিগত। সেই ব্যক্তিগত নিত্যগোপাল লইয়াও ওরা যদি শুচি, শুদ্ধ, পবিত্র জীবন যাপন করিতেন, স্বরূপ বিশ্বরূপ লইয়া বিরোধ আসিত না। ওরা মঠ হইতে লুকাইয়া 'চালিতা' ইত্যাদি নিয়া যায় (ওরাই বলেন), আমি কেমন করিয়া ইহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া গুরু-বলা করি? আমি ইহাদের সঙ্গে non violent non cooperation বুঝি। তথাপি প্রশ্রয় আমি দিব না। ভিতরে তিক্ততা বাহিরে খুব প্রীতির ভাব দেখানো—এইরূপ ভাবের ঘরে চুরি আমাকে দিয়া চলিবে না ঠাকুর, পথ দেখাইয়া দেও। ওখান হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া আমার প্রাণের ঠাকুরকে লইয়া আলাদা হইয়া চলিব? বুদ্ধি দেও। সকালে মঠে যাই। তারিণীবাবু বাহিরে যান। এখন হইতে না নামিলে কাজ হইবে না। ৪টী মাস মাত্র বাকি। কাজ অফুরন্ত ওরা পৌষ কালনায় সভা, ১০ই পৌষ কি করিয়া হুগলীতে হইবে যদি এখনই তাহার বন্দোবস্ত না করা যায়? আমার মঠে যাওয়ার পর বাকী উজ্জলভারত দিয়া যায়। সেগুলি মুড়িয়া ১০৷৷ টায় রেণু পোষ্টাফিসে দিয়া আসে। ৩টার পর তারিণীবাবু আসে। অতুল···দু'বেলাই খায়। তারিণীবাবুর সঙ্গে মঠে যাই। ঠাকুরের সম্বন্ধে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখার আলোচনা হয়। খগেনবাবু আমার সম্বন্ধে কিতীশবাবুদের কাছে বলিয়াছেন, 'পুরুষোত্তমানন্দ বিবেকানন্দের চেয়ে বড়, তাহার মৌলিকতা আছে। অহংকার ছাড়িলেই বড় হইবেন'। আমি অহংকারী এ অপবাদ আজিকার নয়। সরল দত্ত দুর্গামোহনবাবুরাও বলিতেন। শীতল মুখোপাধ্যায় জেলে ইহার উত্তরে দুর্গামোহনবাবুকে বলিয়াছিলেন, 'শরৎবাবু বিদ্যায় বয়সে কুলে অর্থে পদমর্যাদায় আমা হইতে ছোট। তবুও সেই নেতা। শরৎ সকল স্নেহ দিয়া রক্ত দিয়া কথা বলে—তাই উহা অহংকার বলিয়া বোধ হয়। সে যাহা উপলব্ধি করে, তাহা জোর দিয়া বলে'। আমি মহাত্মাজীকে বলিয়াছিলাম—I will fight with Gandhi in order to maintain his Gandhism। এ 'আমি' ঠাকুরের 'আমি'। আমার আমি হইলে ডুবিয়া যাইতাম। সুধাংশু আসে দুপুরে।

৪ঠা ডিসেম্বর

ঠাকুর, সর্বপ্রদানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম প্রদান 'অভয়-প্রদান' একথা তুমি শুনাইয়া গেলে বিশ্বাসীর প্রাণের কানে। 'ভয় কি? টেনে তুলবো'—ইহাই বিশ্বের কাছে তোমার

অভয়বাণী। 'ন গোপ্রদানং ন মহীপ্রদানং ন চান্নদানং তথা প্রদানং। যথা বদন্তীহ বুধঃ প্রদানং। সর্বপ্রদানেষু-ত্তমপ্রদানম্।' তুমি এই 'অভয়-মন্ত্র' প্রদান করিয়া তুমি এই যুগের শ্রেষ্ঠ দাতা। আমি তোমার এই 'অভী-মন্ত্র' বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছাইব। এই আশীর্বাদ কর, সেই শক্তি দেও, সহস্র কণ্ঠ দেও, প্রাণে বলাধান কর। কি জটিলতায় মজা দিয়াই না চলিয়াছি, তুমি টানিয়া তুলিয়াছ, না হইলে কোথায় তলাইয়া যাইতাম। তোমার টানে কামিনী কাঞ্চন আমার কিছুই করিতে পারে নাই। তুমি ধন্য। আবার আমি তোমার 'আমি'র রূপে রূপবান, তোমার 'আমি'র মাঝেই আমার 'আমি' সত্য। তুমি সৎ, আমি অসৎ, তুমি আতপ, আমি ছায়া। প্রিয়নাথ সেন (খুলনা) আসেন। সত্যব্রতর কথা তোলে। ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে কিছু খায় নাই। তাহার পর নাম জপে কিছু হইতেছে না বলে। নাম জপের কৌশল নিহিত রহিয়াছে 'প্রথমং কীর্তনং' ইত্যাদি শ্লোক ও 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের মাঝে। সাধনার সুরু তিনি হইতে, তাঁহার করুণা হইতে, 'পাইয়াছি', হইতে। পাওয়ার আস্বাদনের নাম সাধনা। 'পাওয়া' নিত্যসিদ্ধ, সাধ্য বস্তু নয়। সে জন্য চাই 'বর্তমান ভজন'—সাক্ষাৎ কোনও মানুষ হইতে রওয়ানা হওয়া।···Activity method—সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া শেখান। রাঁধুনীর হাতের নাড়া দেখিয়া রান্না শেখার মত। একখানি 'শ্রীনিত্য-গোপাল দর্শনে ও জীবনে' দেই। অতুল ২ বেলাই খায়। হরেন ডাক্তারের দোকান হইতে উদ্বোধনের ৮ টাকার মধ্যে ৫ টাকা নিয়া আসে। ৩॥ টার পর মঠে যাই। বীরেনবাবু দেরী করিয়া আসেন—'যুগাচরিত' পাঠ আরম্ভ-মাত্র হয়।···মনি বাগচী আসিয়াছিল। যমুনা আসিয়াছিল ১০॥ টায়, যায় ২॥ টায়। মাখনবাবু আসিয়াছিল। বীরেন সিংহের নিকট রেণু ৩য় পোষ্টকার্ড দেয় নিজেদের অসুখের কথা লিখিয়া। ৫ই ডিসেম্বর

শুক্লা একাদশী—গীতার জন্মদিন ও গোপার জন্মদিন

ঠাকুর, তুমি ৫ হাজার বৎসর পূর্বে তোমার মুখ হইতে কুরুক্ষেত্রের বুকে অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী গীতাবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলে। কিন্তু এতদিন তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে মনের স্তর হইতে। তোমার গীতার ব্যাখ্যা আজ তুমি নিজে প্রাণের ভাষায়—জড়াজড় সমন্বয়ের ভাষায় ব্যাখ্যা কর। তোমার প্রাণ, তোমার করুণা আমার সেই ব্রজমোহন স্কুলের ৪০ টাকার মাষ্টারকে কোথায় আনিয়াছে, তাহা কি জানি না? তোমার আদরের, তোমার করুণার যেন অপমান না করি। আমি 'কৃতজ্ঞ' থাকিব, তোমার 'আমি'র মাঝে আমি ডুবাইয়া দিয়া তোমার গরবে গরব করিব। অনন্ত শক্তি তুমি। আমি তোমারই। গোপাকে তুমি সুন্দর কর, তোমারই চরণে তাহাকে আমি নিবেদন করি। সে যেন মানুষ হয়। তোমার কৃপায় সে আসিয়াছে। তোমার আশীর্বাদ তাহার শিরে সতত বর্ষিত হউক। ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা হয়। গোপা আমার পায়ে ফুল-চন্দন দেয়, গলায় মালা দেয়। 'মহাভারত' কিছুটা পড়ে। তাহার মায়ের নিকট পত্র দেয়। প্রতিভা ক্যালকাটা কেমিক্যাল ও প্রেসে যায়। সেখান হইতে মঠে। বাকী আমরা ও উষাজিণী ৪টার পর মঠে যাই। ঠিক ৫টায় আলোচনা আরম্ভ হয়—'শ্রীনিত্যগোপাল জীবনালোকে গীতা'। গীতার দেশ যুদ্ধ ক্ষেত্র, কাল কলির গোড়ায়—'আত্মানাং চানুশোচামি' ইত্যাদি, বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা অর্জুন। 'বক্তুরভিপ্রায়াং অর্থান্তরকল্পনা বাকছলম্,—অভিপ্রায় বুঝিলে এই জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয়। 'মন্মনাং অপনিঃ' ইত্যাদি; শ্রীকৃষ্ণ জীবন সমগ্র জীবন—'ক্ষেত্রজ্ঞ-ঞাপি মাং বিদ্ধি'। সর্বরসকদম্বমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ। সর্বগুণসমন্বয় সর্বাশ্রমসমন্বয়, সর্বমতবাদ সমন্বয়। যিনি গীতার বক্তা তিনিই আজ শ্রীনিত্যগোপালরূপে গীতার ব্যাখ্যাতা। শ্রীনিত্যগোপাল-স্পর্শে আজ অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, আস্তিক্য-বাদ নাস্তিক্যবাদ প্রেমে ভরপুর হইয়া পরস্পর আলিঙ্গনের জন্য উন্মাদ। 'বহুদিন শ্রবণে শুনেছি ঐ নাম' ইত্যাদি। শ্রীনিত্যগোপাল অভয় দান করিতে আসিয়াছেন—'সর্ব-প্রদানেষু অভয়প্রদানম্'। ভীত জড়বাদী, ভীত অজড়-বাদীদের জন্য আনিয়াছেন, 'ভয় কি? টেনে তুলব' বাণী। ১ ঘণ্টা ২৮ মিঃ আলোচনা হয়। আমি ও প্রতিভা পরে পরে আসি। পূর্ণেন্দু ঘোষ আধ ঘণ্টা ছিলেন। ভাল

লাগিয়াছে। মঠের' তারিণীবাবু ছাড়া কেহই ছিল না বলা চলে। নকুলেশ্বরবাবু সভায় ছিলেন। অতুল আছে। বীরেন সিংহের পোষ্টকার্ড আসে। মিহির ওষুধের নাম দিয়াছে।

৬ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, সেই বলে ১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী পথে নামিয়াছি। সেইদিন হইতে পথ-চলা সুরু করিয়াছি কত মানুষ এল, কত গেল। আমি চলিয়াছি ঝড়ের বুক চিরিয়া। এই ঝড়ের মাঝে যখন সবাই ঘরে আশ্রয় নিল, তুমি আর আমি পথ বহিয়া চলিয়াছি বুকে বুক মিলাইয়া— কেউ দেখিবে না, গোপনে অতি গোপনে তুমি আর আমি। ওগো আমার অন্তরতম, আমি তোমাময় হইয়া তুমি আমাময় হইয়া চলিয়াছি। আমার একাবিত্বের, কৈবল্যের পতি তুমি—কৈবল্যপতয়ে নমঃ। মধ্যমপ্রাণ আশ্রয় করিয়া চলিয়াছি। দুকূল জড়াইয়া, দুকূল ভাঙিয়া প্রাণের পথ ধরিয়া চলিয়াছি। প্রাণবল্লভ প্রাণের ঠাকুর, তোমার জয় হউক।···আমি প্রায় ৪টায় মঠে যাই। মঠে কেউ নাই। কালো ঠাকুরের ২।১ টা কথা বলে। ৭ টার মধ্যেই চলিয়া আসি। তারিণীবাবু কারবাইকেলে দাশরথি-বাবুকে দেখিবার জন্য গিয়াছে। হুগলীতে সভার ব্যাপারে বিনোদ চম্পটি ও বটুপালের সঙ্গে দেখা করার কথা। সন্ধ্যার পরে প্রকাশ ও অবনী আসে। নিমন্ত্রণপত্র দেয়। রেণুকে যাইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করে। উষাঙ্গিনীকে বিমলা, নীহারিকা, কুসুম ও কুমারের চিঠি পড়িয়া শুনানো হয়। কুমারের চিঠি আজ আসিয়াছে। চিঠি বেশ মধুর হইয়াছে। ২৭ বছরের পাতা মন উল্টাইতেছে। আসিতে লিখিয়াছে। আমি তো কবেই ডাক দিয়াছি ২৭ বৎসর পরে সেই ডাক শুনিল। শান্তিও নাকি বলিয়াছে: আমিও ডাকের প্রতীক্ষায় আছি। ইহারাই তো আমার প্রথম শিষ্য। শান্তিকে গীতা পড়াইয়াছিলাম কিসের জন্য? পাইবার জন্য নয়। ডাক তো সেই সময়ই দিয়া রাখিয়াছি। এমনই হয়। ঠাকুরের যে ডাক আসিয়াছিল প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে ঠাকুর ভাবাবেশে বলিলেন, সবং মনোহরপুর এসে থাকুক' তাহা সফল করিবার জন্য কত নগর জনপদ, কত সহস্র সহস্র লোকের সঙ্গে মিশিলাম, আজও তো মনোহরপুর মঠে স্থান হইল না। স্থান পাওয়া কি সহজ? ডাক আসে অনেক পূর্বে, তাহার ফল ফলে অনেক ঘোরাঘুরির পর। যাক, আসিলেই ভাল। অনেকের কপালে ২৭ বৎসর আর পাওয়া যাইবে না। কে নবদ্বীপ যাইবে তাহাই সমস্যা। তুকারাম ১৮ই ডিসেম্বর বাহিরে যাইবে, তাহা হইলে উষাঙ্গিনীর যাওয়া সম্ভব হইবে না। মিহির যাওয়া সম্ভব নয়, সেলাই আসিতে পারে। খরচও তো বটে। বক্তৃতা শুনাইবার জন্য আর টাকা খরচ করা যায় না।

৭ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, তোমার 'সর্ব'—এর ক্ষেত্র বিচরণ করিয়া 'ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য' —ভূতে ভূতে মধু বিচয়ন করিয়া, আহরণ করিয়া আজ মধুসূদন তোমাকে তাহা পান করাইবার জন্য তোমার নিকট উপনীত হইয়াছি। যাহা-কিছু আহরণ করিয়াছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। আমি দল বাঁধি নাই, সব সম্প্রদায়েই আপনার বলিয়া মিশিয়াছি, হিন্দু-মুসলমান নমঃশূদ্র বাছি নাই, দেবালয়-বেশ্যালয় বিচার করি নাই, আমার ঘরে কুলের বৌ ও বাজারের মেয়ে সমান ভাবে স্থান পাইয়াছে, কংগ্রেস-কুম্ভমেলা কেন করি নাই, কোনও ক্ষেত্রবিচার আমার ছিল না। 'সকল দল মিলাইয়া আমার যে এক অখণ্ড দল' তাহাই আমি খুঁজিয়াছি, নির্বিচারে যাহাকে পাইয়াছি, বুকে মাথায় তুলিয়া লইয়াছি, পাপী পুণ্যাত্মা বাছি নাই, বেশ্যালয়ে ভাগবত পড়িয়াছি, ঠাকুর মন্দিরে পড়িয়াছি। তোমার সেবার নৈবেদ্যরূপ মানুষ চাহিয়াছি। দেখা দেও, তোমার প্রতীক্ষায় নয়ন স্থাপন করিয়া আছি। গাঙ্গার বামাচরণ ঘোষের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আগামী রবিবার ২নং রাসবিহারী এভিনিউতে সন্ধ্যায় যাইবার জন্য তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমন্ত্রণ জানাইয়া যায়। রেণু ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া প্রতিভার কাছে দিয়া রাইটার্স বিল্ডিং, অরবিন্দ রডুয়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া ৪-৩০ এ ফেরে। বৈকালে মায়ার পুত্র তাহাদের পাচকসহ আসে, আনে ২টি ফুলকপি ২টি বাঁধাকপি ২টি শালগম মূলা বেগুন আলু পালংশাক কলাইশুটি ইত্যাদি। শুরু

আসে তাহার যোন সহ। জামা দেওয়া হয়। ৪৷৷০ টার পর আমি মঠে যাই। কালো ও সুধাংশুর সঙ্গে কথা হয়। তারিণীবাবু দোকানঘর রেডিী করিতে গিয়াছেন। ৬। টা পর্যন্ত ফেরেন নাই। আরতির পরে আমি চলিয়া আসি। সুধাংশুর ওখান হইতে হিপার সানফার খাই। কয়েকদিন হইল প্রস্রাবের উষ্ণো বাড়িয়াছে। মঙ্গলবার রাত্রিতে তো ৪।৫ বার প্রস্রাব করিয়াছি। অনেকদিন পর ধীরেন ডাক্তার আসে ৮।০ টার পর। একান্ত ভাবে ঠাকুরকে নিয়া থাকিবার মত অবসর কাহার আছে? সকলেই কাজে ব্যস্ত। কাহার কাজ বুঝিতেছি না। যে কাজ ঠেলিয়া করিতে হয়, যে কাজে আনন্দ নাই, সার্বজনীনতা নাই, সে কাজ কি তাঁহার কাজ? তিনি যে cosmopolitan। মঠের লোকেরা স্বরূপ লইয়া থাকিলেও তো চলিত। কেননা সেখানেও তো চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন আছে? আমার সঙ্গে তাহা হইলেও তো কোন বিরোধ থাকিত না। কোথায় চিত্তশুদ্ধি? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিসন্ধি লইয়া কি বিরোধই না ওখানে হয়? বেদনা বোধ হয়। কি করিব?

৮ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, তোমার জীবন-দর্শন লইয়া পড়িয়া থাকিবার অবসর কাহার আছে? কে তোমার? তুমি একাই আসিয়াছিলে। একা একা বই লিখিয়া রাখিয়া গেলে, একা চলিয়া গেলে। সেই বই-ই বা কে পড়িল? তোমার কেহ নাই। অথচ লোকের তো অভাব নাই। তুমি আমার লাগিয়া আসিয়া ছিলে। আমি তোমার হইব। সকল দেহপ্রাণমন দিয়া তোমাকে 'স্থান' দিব, আমার হৃদয়ের রাজা, আমার স্বামী। তোমাকে কেউ তো স্থান দিল না? অনাদৃত তুমি, আমি তোমাকে আদর করিব। তোমাকে লইয়া জীবন কাটাইব। তুমি আমার, আমি তোমার। তোমার সম্প্রদায়ও তোমার নয়। তাহারা তোমাকে একরূপ বাদ দিয়া চলিয়াছে। কোথায় তুমি? দেখা দেও আমার জীবনে। তোমাকে লইয়া আমি জীবন গোঁয়াইব। তুমি ছাড়া আমার কিছু নাই। সকলের কত কি আছে? তারিণীবাবু ১টার পর আসে। ইহার পূর্বে আসে সেবানন্দ। চিদানন্দ আদা-জল খাইয়া নাকি আমার বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। কালী-পদানন্দ 'সন্ন্যাস-গার্হস্থ্য' এক হওয়ার কথা তারিণীবাবুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আমার সঙ্গে কথা বলিতে তারিণীবাবু বলিয়াছে। চৈতন্য নাকি 'ট্রাষ্টী'দের কাছে দরখাস্ত করিবে তাহারা কোন্ কথা শুনিবে। বেশ কথা। জড় ও অজড়ের সগুণ-নির্গুণের সমন্বয়ের মাঝেই সংসার সন্ন্যাসের সমন্বয় রহিয়াছে। মায়া ছাড়িয়া ব্রহ্ম, প্রকৃতি ছাড়িয়া পুরুষ, পথ ছাড়িয়া গন্তব্যস্থল—এই সাধনায় না সন্ন্যাসের প্রয়োজন? গন্তব্যস্থল যেখানে পথের বুকে, পথের প্রত্যেক স্থানটীতে যেখানে গন্তব্যস্থল, তাহার পথ হারাইবার সম্ভাবনা কোথায়? যেখানে পথ সেইখানেই তো গন্তব্যস্থল। 'সর্বথা বর্তমানোঽপি সঃ যোগী ময়ি বর্ততে।' যেখানে প্রবৃত্তির রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিবৃত্তি, সেখানে প্রবৃত্তি ছাড়িবার অর্থ কি? যেখানে প্রকৃতির প্রতি স্পন্দনের বুকে আত্মবৃত্তি পরিণাম ধরিয়া উঠিতেছে, সেখানেই না গার্হস্থ্য-সন্ন্যাসের সমন্বয়? নিত্যগোপাল এই সমন্বয়ের সূত্র দিতে গিয়াই না ফর্মুলা দিলেন—নিত্য-অনিত্য সমন্বয়, আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়, চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়, জড়-অজড় সমন্বয়। এই 'co-existence'-এর নীতি, মহামৈত্রীর নীতি কে শুনাইয়াছেন? জড় অজড়ের মাঝে প্রবর্তিত হইতেছে রাসলীলা। শ্রীনিত্যগোপাল বর্তমান যুগসৃষ্টির 'বীজপ্রণ পিতা'—জড় অজড় সমন্বয়ই বীজ। ২ দিন বাবা গরম হওয়ায় পথ হারাইবার স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন তো বড় দেখি না। গন্তব্যস্থল যাহার পথের বুকে, তাহার পথ হারাইবার অবসর কোথায়? পথই যাহার গৃহ, সে পথের দুধারের যে-কোনও গৃহে আশ্রয় নিবে। 'The world is my home'. পথের বুকে আজ গন্তব্যস্থল বাসা বাঁধিয়াছে, পথের বুকে আজ আমার নিবাস। মঠে আজ আর বৈকালে যাই না। দুপুরে জ্ঞানবাবু আসেন। রেণু তাহার গাড়িতে দমদম সন্তোষ-বাবু, বাসন্তী কটন, শান্তবাবুর ওখানে ঘুরিয়া ৬টার পর ফেরে।

৯ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, সারা জীবন তুমি আমাকে আগলিয়া রহিয়াছ, যেদিন (সেই অসহযোগের যুগে) প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ আমাকে 'street loafer' বলিয়া আমার মাথা দিবার জন্য চক্রান্ত করিয়াছিল সেদিনও যে তুমি, সেই তুমিই আবার বরিশালে কংগ্রেসের 'Note of census', C. R. Das-এর বিক্রমপুরের সভায় দাঁড়াইয়া আমি C. R. Das এর কাছ হইতে টাকা খাইয়াছি বলিয়া কুৎসা রটনার মাঝে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিলে তোমার আবরণ শক্তিদ্বারা। আমার বিরোধীদের সব সময় তুমি বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছ, সংহত হইতে দাও নাই তোমার বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা। আজও রক্ষা করিবে জানি। তুমি আমার সখা বন্ধু গোপ্তা। তোমাকে সঙ্গে লইয়াই আমি পথ চলি। তুমি নিজে 'বিষ' খাইয়াছ, কিন্তু আমার সকল 'বিষ' তুমি অমৃত করিয়া দিয়াছ।...৩. টার পর মঠের অরুণ খবর দিয়া যায় যে, দাশরথিবাবু (আমাদের গুরুভ্রাতা) গত রাত্রিতে ২॥ টায় মারা গিয়াছেন। তাঁহার শব নিয়া মঠের ভক্তগণ আসিতেছেন। আমিও সঙ্গে যাই। তারিণীবাবু প্রভৃতি ছিলেন। কিছু পরে ফিরিয়া আসি। নীলরতনবাবু পরে আসেন, শ্মশানে দেখিয়া আসেন। সন্ধ্যার পর ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন। রবিবার দুপুর ২৷৷০ টায় টাক্সী আসিবে। তাঁহার সঙ্গে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের নিত্যগোপাল সম্বন্ধে কুৎসা রটনা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। তিনি মৌন বসিয়া থাকেন। আমার হৃদয়ের আবেদনও তাঁহার মুখ হইতে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের লেখা সম্বন্ধে কোনও প্রতিবাদ বাক্য বাহির করিতে পারে নাই। তাঁহাকে বলিলাম, 'অনেক আশা লইয়া রবীন্দ্র গীতাপ্রচার প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলাম। পর মনে করি নাই, নিজের নামও চাই নাই। আপনার প্রাণের দিকে চাহিয়া চলিয়া ছিলাম। গীতার নূতন কথা আপনি শুনাইবেন আশা ছিল। আমাকে আর উহার মধ্যে টানাটানি কেন'? জ্ঞানকুমার চট্টোপাধ্যায় আসে। ...জ্ঞানবাবুকে ঠিক বুঝিতেছি না। সে বলে তাহার পিতা নিত্যগোপালের গুরুভাই। কোনও দিন তো শুনি নাই। চিন্তার মধ্যে কোথায়ও কোন অসামঞ্জস্য আছে মনে আজ আর মঠে যাওয়া হয় নাই রাত্রিতে শোবার ও বার উঠি। বি কে পাল আসেন নাই। রেণু খুব সকালে আমার প্রস্রাব ধীরেনের বাসায় দিয়া আসে। আজ পরীক্ষা হয় নাই। কাল ধীরেন আবার নিয়া যাইবে। সে সন্ধ্যার পর আসিয়াছিল। নিত্যগোপালকে লইয়া কি করিব? কেউ তো আমার সঙ্গে নাই। ঠাকুর, ঠাকুর, পথ দেও।

১০ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি আমার সনপ্রাণ সখা, অত্যাগসহন বন্ধু। তুমি আমার ত্যাগ সহ্য করিতে পার না, আমিও যেন তোমাকে ত্যাগ করিয়া জীবন সহ্য না করি। তোমাকে ত্যাগ করিয়া আমি কি নিয়া রহিব? আমি সত্যম্, চিন্ময়ম্, আনন্দময়ম্। তুমি আছ, তাই আমি আছি। তোমার আনন্দে আমার আনন্দ। তুমিই আমার 'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'। তুমি আমি এক, তুমি আমি দুই। আমি তোমার মাঝে আমাকে হারাইয়া গিয়া পাইব। তুমিও তোমার মাঝে আমার মাঝে বিশ্বের মাঝে হারাইয়া গিয়া পাইবে। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ, আমিও তোমাকে সৃষ্টি করিব। তোমাকে বিশ্বের বুকে 'জগন্নাথ' রূপে প্রতিষ্ঠা করিব।...পথ যেখানে বিভিন্ন, জীবনের উদ্দেশ্য যেখানে পৃথক, সেখানের দাবী পূরণ করা অসম্ভব রেণু ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ' (সঞ্জীবচন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রনাথ লিখিত) খুঁজিতে গিয়াছিল। সেখানে আছে—কিন্তু কার্ড না থাকায় তাহা আনা হয় নাই। ৪।০ টার পর সুরেন রায়ের বাসায় বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসে। আমি ৪টার পর মঠে যাই। আজ শতবার্ষিকীর কার্যকরী সমিতির সভা। চিদানন্দ ছাড়া প্রায় সব নেই। আমি, তারিণীবাবু, যতীনবাবু, নীলরতনবাবু, রমাপতিবাবু, কিতীশবাবু, নগেন প্রামাণিক ও শেষে হরিস্বরূপানন্দ মাত্র উপস্থিত ছিলাম। অমূল্য চৌধুরীও ছিল। টাকা না থাকিলে কি করিয়া কাজ হইবে? —ইহাই হইল সুর। যতীনবাবুর হাতে ৪০।৪৫ টাকা আছে, ব্যাঙ্কে ২৫ টাকা। গত

বছরের দেনা সব শোধ। হুগলীতে বর্তমানে হইবে না। বড় দিনের সময় সেখানে অনেক লোক যায়। কে এত লোকের খাবার দায়িত্ব নিবে? বলিলাম, আমি প্রাণপণ করিব। কাজ আগে, টাকা পরে। মারোয়াড়ীর কাজ এখানে কি করিয়া হইবে? কলিকাতার সভার ভার আমি নিব, আমার প্রাণ থাকিতে আমি কাজ নষ্ট হইতে দিব না। তারিণীবাবু এই ৩।৪ মাস অনন্তকর্মা হইয়া খাটুন, দেখিব কিছু করিতে পারি কি না। টাকা না আসিলে খরচ করিব না। প্রথমে ইহারা অসহযোগ (non cooperation) করিয়াছে, এখন বাধা দিতেছে, পরে যখন দেখিবে যে কাজ হইয়া যাইতেছে তখন আত্ম রক্ষার প্রয়োজনে আসিয়া যোগ দিবে। প্রয়োজন হইলে আমি ৫০০ টাকা দিব। আমার সামনে দিয়া কাজ নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা আমি সহ্য করিব না। কি কৈফিয়ৎ ঠাকুরের কাছে দিব? আমি আমার দায়িত্বের মর্যাদা সর্বদা রক্ষা করিব। ৯টার পর ফিরি। ধীরেন প্রস্রাব পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়া আসিয়াছিল।...প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের ইনজেকসান দিতে বলে।

১১ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, 'তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি। সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিচয় হইনু দাসী।' আমার দেহ লও, প্রাণ লও, মনবুদ্ধি অহঙ্কার লও। কি সার্থকতা আমার দেহপ্রাণের যদি তোমার আনন্দ-লাভের সাধনায় না লাগিল? যদি আমার সকল কিছুতে তুমি প্রকাশিত না হইলে? আমাকে স্বীকার কর, তোমার 'স্ব প্রকৃতি' করিয়া লও, অঙ্গীকার কর। কি আমার আছে, কে আমার আছে তুমি ছাড়া? 'ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে তুমি ছাড়া কেহ নাহি আর?' 'তোমার গৌরবে গরবিণী হাম রূপসী তোমার রূপে।' যতক্ষণ আমার মাথা তোমার পাদপদ্মে, ততক্ষণ আমার মাথা নোয়ায় কে? আমার গর্ব তুমি রক্ষা করিয়াছ, আজও তুমি করিবে। প্রাণবল্লভ আমার, আমার 'প্রাণ' তোমার। প্রাণ বাঁচাইয়া তোমার কাজ পণ্ড হইতে দিব না। প্রাণ যায় যাক তোমার সেবায়। তোমার 'প্রাণ' তোমার সেবায় লাগুক। প্রাণ সার্থক হউক। ৮টায় গাড়ীর রামচরণ ঘোষের শ্রাদ্ধের খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ১নং রাসবিহারী এভিনিউ ঘুরিয়া আসি। ১১টার পর তারিণীবাবু আসে। এই কয় মাস কাজ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। ৩টায় বার্ণপুরের ভবতারণ বসু আসে যে ভদ্রলোক দৈনিক বসুমতীতে আমার নবদ্বীপের বক্তৃতার মর্ম দেখিয়া আমার সঙ্গে contact করিবার জন্য মঠের ঠিকানায় পত্র দিয়াছিল। দেখায় তৃপ্ত হইলাম না। অপেক্ষা করিতে করিতে ৩।৪০ টায় ধীরেন-বাবুর গুদাম হইতে ট্যাক্সী আসে। আমাকে ও পথে কুমুদবাবুকে (নলিনী দত্ত রোড) লইয়া গাড়ী পৌঁছে। সভা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তখন রথীন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইয়াছে। সভাপতি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেক্রেটারী স্বামী দেবানন্দ। প্রথমে আমি, পরে যোগেশ ব্রহ্মচারী, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তারক গুপ্ত বলেন।...রবীন্দ্রনাথের 'ডাকিছে কাণ্ডারী' ইত্যাদি অংশ পড়িয়া মনের স্তর হইতে প্রাণস্তরে পাড়ি জমাইবার কথা বলি। পুরাণো সকল নিয়ে ফিরে ফিরে বেচাকেনা আর চলিবে না। প্রাণের স্তর হইতে গীতা বলা। একান্ত অদ্বৈত, একান্ত দ্বৈত সব মনের স্তরের। প্রাণের স্তর পরস্পর বিরুদ্ধদের সমন্বয় স্তর। শ্রীনিত্যগোপাল এই প্রাণস্তরের দর্শন দিয়া গিয়াছেন। আমি দেবানন্দ ও কুমুদবাবু একই ট্যাক্সীতে আসি। মঠ হইতে তারিণীবাবু, নীলরতন-রমাপতিবাবু, অমূল্য চৌধুরী ও সেবানন্দ যায়। ধীরেন আসে। ধীরেন সিংহের নিকট আমার প্রস্রাবের রিপোর্ট সহ চিঠি রেণু দেয়।...

১২ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, নিত্যগোপাল, তুমিই আমার জীবনের 'অর্থ' আমার জীবনের প্রতিটি স্পন্দন যদি তোমাকেই না প্রতিপন্ন করে, তবে আমার জীবন ব্যর্থ, নিরর্থক। সারা জীবন তোমার রাধারূপের ধ্যান করিয়া আসিয়াছি তাহার পরারূপকে অপরা প্রকৃতির বুকে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য। পারিলাম কৈ? আমার দেহ প্রাণ ব্যাপিয়া তুমি প্রকাশিত হও। তোমার জন্যে প্রতিষ্ঠা ছাড়া আমার জীবন যে

আর কিছু চায় না। তুমিই আমার বন্ধন, তুমিই আমার মুক্তি। 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি'—তোমার সঙ্গে আমার বন্ধনহীন গ্রন্থিবন্ধন। তুমিও নির্গ্রন্থি, আমিও নির্গ্রন্থি। একই বৃন্তে তুমি আমি দুইটি ফুল মুখোমুখী বুকে বুক লাগাইয়া চলিয়াছি। আমি তোমার মা প্রকৃতি হইব, তোমার সঙ্গে এক হইব। তুমি এক, আমি এক। দুই একে আবার এক হইব। নিত্যগোপাল, প্রাণবল্লভ, ৭১ বৎসর কাল-প্রবাহে চলিয়া আসিয়াছি তুমি-আমি দোললীলায় দোল খাইতে খাইতে। তোমার জয় হউক। কাল ৭২ বৎসরের আরম্ভ। আমার জন্মে তোমার জয় হউক। ৭১ বৎসর তোমাকেই নূতন করুক। রেণু ১০॥ টায় পর জ্ঞানবাবুর টিকেট কিনিবার জন্য যায়। টিকেট কেনা হয় নাই। Reviewers' conference-এ ২টায় যোগদান করে। কাজ শেষ হয় সন্ধ্যা ৭।০টায়। সেখান হইতে মন্থর বাসায় যায়। ফেরে ৮।০টায়। আমি মঠে যাই ৪টার পর। গিয়া শুনি—'সেবানন্দ বলিয়াছে প্রভাস তাহার নিকট বলিয়াছে যে প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিব, কিন্তু যদি মহারাজদের প্ররোচনায় কেহ কিছু করে, তবে আমরা কি করিতে পারি?' নগেনবাবু প্রথমে ইহা বলেন। ক্ষিতীশ বাবু নীলরতন-রমাপতিবাবু ও তারিণীবাবু প্রভাসের কাছে ইহা জিজ্ঞাসা করে। আমি যাইব ঠিকই। আমি না গেলে উহাদের খুবই বিপদ। এ বিপদে আমি ফেলিব না। ঠাকুর আছেন। সারা জীবন যিনি রক্ষা করিয়াছেন, এখনও তিনি আছেন। আমি ৮।০ টায় ফিরি। ফিরিয়া দেখি রেণু আসে নাই। প্রতিভাকে মন্থর বাসায় পাঠাই। পথে রেণুর সঙ্গে দেখা। আমার লাঞ্ছনার জীবন। ক্ষিতীশ রবিবার কালনা যাইতে বলে। কিন্তু যদি কোনও প্রকারে গাড়ী miss করি, তখন উপায়? শনিবারই যাইব।

১৩ই ডিসেম্বর

কৃষ্ণা পঞ্চমী—আমার জন্মতিথি

ঠাকুর, অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আমি তোমার দিব্য জন্মকে আমার জন্মের ভিতর আবাহন করিতেছি। পিতামাতার আনন্দ হইতে জন্ম, লক্ষ লক্ষ লোকের স্নেহ প্রীতি সেবার পরিবেশের ভিতর দিয়া অতীতের নিরবচ্ছিন্ন ফলরূপে আজ আমি তোমার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করিতেছি। অনন্ত অতীত আমার জীবনে 'কৃত' রূপে বর্তমান। যাহারা ছিলেন, আজও আছেন, ভবিষ্যতে থাকিবেন, তাহাদের সকলকে বুকে লইয়া আমি তোমাকে প্রণাম জানাই। তোমাকে আমার দেহপ্রাণমনবুদ্ধিঅহংকার ও আত্মার প্রণাম। তোমার কাজ করিতে গিয়া তোমার সন্তানের ও বাহির হইতে যে আক্রমণ সুরু হইয়াছে, তাহা পরিপাক করিয়া আগাইয়া চলিবার মত বীর্য দেও— ৭২ বৎসরের এই বিজয়-অভিযান সফল হউক। জগন্নাথ রূপে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবই। জয়া আসে ৮টার পর···। নীলু আসে ১০টায়। রেণু মঠে গিয়া সেবানন্দকে এখানে প্রসাদ পাওয়ার ও তারিণীবাবু ক্ষিতীশবাবুকে আলোচনা সভায় যোগদানের কথা বলিয়া আসে। রেণু জ্ঞানবাবুর টিকিট কিনিবার জন্য ৯।০টার পর ব্যাংক হইতে টাকা তুলিয়া যায়, ট্যাক্সীতে ফেরে। ১২টায় ঠাকুরের পূজা করে উষাদিদি, প্রতিভা, জয়া, রেণু, নীলু, মিনু, অতুল, সুব্রত ও আর আর শিশুরাও। ভোগ দেওয়া হয়···। ৩।০টায় সভা আরম্ভ হয়। নীলু গান করে, চিনুর মেয়ে 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' গান করে। রেণু ও প্রতিভা প্রবন্ধ পাঠ করে। আমিও কিছু বলি। অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের সন্ধিতে দাঁড়াইয়া দুইকেই ব্রহ্ম-জীবনের মধ্যে সার্থক করিবার জন্য চলিব। নিত্যগোপাল এই পথ-চলার সামনে থাকুন। তারিণীবাবু ও ক্ষিতীশ উপস্থিত ছিলেন, সেবানন্দও ছিল। তাহারা প্রসাদ পায়। শেষে সকলে মিলিত কণ্ঠে 'জগন্নাথ নিত্যগোপাল' হারমোনিয়ম সংযোগে গীত হয়। 'জয় নিত্যগোপাল জয় জ্ঞানানন্দ' গানদ্বারা শেষ হয়। সন্ধ্যার পর ধীরেন আসে। ২ টাকা দিয়া প্রণাম করে। প্রসাদ পায়। চিনু সভার শেষে আসে। প্রসাদ পায়। বিরজা আসে, সন্দেশ আনে। সুধাংশু আসে, প্রসাদ পায়, ১ টাকা দেয়। আজ আর মঠে যাই না।··· ১৪ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, আবার ৭২ বৎসরের পথ-চলা সুরু করিলাম। এত বাধাই কি আমাকে পরিপাক করিতে হইবে—ঘরে বাধা, বাহিরে বাধা। বাধা যদি কিছুটাও আপনাআপনি শান্ত না হয়, এত বাধা ঠেলিয়া কি কোনও কাজ হয়? আত্মশুদ্ধি হয়, কিন্তু তাহাতে কোনও কর্ম-প্রতিষ্ঠা হয় না। অথচ কত কাজ আসিয়া পড়িয়াছে। আমার পন্থা নিরন্ন হউক, তোমার স্পর্শে সব-কিছু তোমার ছাঁচে গড়িয়া উঠুক আমার তো তুমি ছাড়া কিছু নাই। সত্যই কি তোমার অঙ্কের প্রতিষ্ঠা বাস্তবে গড়িয়া তুলিতে পারিব না? তুমি বর্তমান যুগসমস্যার সমাধান নও? উহা কি তোমার উপর জবরদস্তি আরোপ করিতেছি? আমাকে বুঝাইয়া দেও। তুমি তো বলিয়াছ, আমার যখন যাহা দরকার ভগবান অন্তর্যামীরূপে আমাকে বুঝাইয়া দিবেন? অতুল সকালে কলিকাতা চলিয়া যায়, বৈকালে আসে। একখানা সমন্বয়মূর্তি বিক্রয় করিয়া আনে। প্রতিভা সকালে মঠে গিয়া তারিণীবাবুর কাছে আমার কাশীতে থাকার সুবিধা করার কথা ও সমন্বয়মূর্তি নিয়া যাইবার কথা বলিয়া আসে। আমি ৪টায় মঠে যাই। নগেনবাবু তারিণীবাবু সম্বন্ধে বলেন যে গৈরিক বসনের প্রতি তারিণীবাবুর বেশ শ্রদ্ধা। তিনি উহার preference দেন। অথচ তিনিই 'সর্বধর্মনির্ণয়সার' হইতে সেই সব স্থান পড়িয়া শুনান যেখানে 'বেশ' অপেক্ষা স্বভাব-সন্ন্যাসের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কোন বৈপ্লবিক চিন্তা তাহার নাই। নইলে কৃষ্ণানন্দের শিষ্যের পুত্রের উপনয়নে প্রণাম করিয়া তাহাকে টাকা দিয়া আসেন? উপবীতের প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা। অথচ 'জাতিদর্পঘ্ন' তিনি পড়িয়াছেন বলিয়া বারবার বলেন। আমি যে বড় একা ঠাকুর। আমি আলোচনা করিলে শতবার্ষিকীর আলোচনা হয়—নইলে ও কথাও কেহ বলে না। নগেনবাবু তো চীনের চালা করিতে দিলেন না, তারিণীবাবুর ঘরে লাইব্রেরীতে তাহার আপত্তি। লক্ষ লক্ষ টাকা আনিয়া দেও, তবে তিনি কাজ করিবেন। অন্যথা কাজ করিবেন না। এই যেখানের অবস্থা, সেখানে আমি কি করিব? যাহা হয় কর, আমি যে পারি না।

১৫ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি উপনিষদের 'মধ্যমপ্রাণ', তুমি শুচির কুলে, অশুচির কুলে নাই, cultured uncultured কোনও কুলে নাই। কুম্ভার কুলে বা কস্তিনীর কুলে নাই, ব্রাহ্মণের কুলে বা আদিবাসীর কুলে নাই। যে মধ্যম প্রাণকে exclude করিয়া এতদিনকার তর্কবিজ্ঞানীগণ চলিয়াছিল, আজ সেই excluded middle প্রাণই সারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। প্রাণ শ্মশানে, প্রাণ কুম্ভাবনে, কুলবনে, প্রাণ শবরীর উচ্ছিষ্ট ভোজনে, প্রাণ দেবতায় নিবেদিত অন্নভোজনে। প্রাণ তাই 'ব্রাত্য', ব্রতচ্যুত; প্রাণবল্লভ, মধ্যপ্রাণ ওগো আমার নিত্য-গোপাল, আমি তোমাকেই চাই। আজকের বিশ্বগঠনে এই প্রাণই একমাত্র পথপ্রদর্শক। মন-বুদ্ধির রাজত্ব আজ শেষ। প্রাণই আজ বিশ্বপূজ্য। আমি প্রাণের পূজারী। প্রাণের আচরণই আমার আচরণ হউক। আজিকার দুর্গাপুরের আনন্দবাজারে 'কালনার' উৎসবের বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে। রেণুর সঙ্গে অনেক কথা হয়। জবাব দিয়া কোনও মীমাংসা হয় না। কথায় শুধু কথা বাড়ে। জীবনই হইল সত্য জবাব। 'বাচারম্ভণং বিকারঃ…'। আমি জীবন দিয়া জবাব দিয়াছি, কথা দিয়া নয়। 'বরিশাল' পত্রিকায় (বিজয় দাশগুপ্ত যাহার সম্পাদক) এমন সপ্তাহ যায় নাই যাহাতে আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে নাই। দুর্গামোহনবাবু 'বরিশাল হিতৈষী'-তে তাহার জবাব দিতে চাহিতেন। আমি সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম। আমি জানিতাম 'প্রথমানবপুঃ' হইয়াই বলের সঙ্গে জবাব দিতে হয়।…

১৬ই ডিসেম্বর

সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার রূপ

॥ শ্রীঅমিয় মোহন বসু ॥

'ঈশ্বর হ'ল সকলের পিতা'—অনেকে একথা বলি,
কিন্তু সে কথা মুখে বলিলেও ক'জন মেনে তা' চলি ?
তাই যদি হবে—তবে উঁচু-নীচু ভেবে কেন স'রে যাই
সকলের সাথে হাত মিলাইতে—সবাই তো মোরা ভাই !
'সকলেই ভাই'—ধর্মী কখনো মানিতে না ইহা চায়,
তাই অবিচার, অন্যায়-ক্লেদ রহিয়াছে দুনিয়ায়।
অন্যায়-পথ দুর্বিবার পথ—এ পথেই যদি চলা
তবে তো জীবন শূন্য—নিজেকে মানুষ কী ক'রে বলা ?
মানুষ যদি না ন্যায় পথে রয় চায় না পবিত্রতা
তা হ'লে তাহার মানুষ হবার কোথায় সার্থকতা ?
চার পা অথবা শিং-লেজ কভু মানুষের নাহি হয়,
তবু ও তাহাকে মানুষ না ব'লে পশু কেন বলা হয় ?
কেন বলা হয় ?—পশু ও পাখিরা প্রকৃতির বলে চলে ;
মানুষেরও চলা সেই ভাবে—তাই তাহাকেও পশু বলে !
জানা প্রয়োজন—কী গুণ থাকিলে মানুষ মানুষই পাবে,
মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ—বোঝে এরা আত্মাকে।
বিবাহিতদেরও ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হয়,
নতুবা মানুষ হয়েও সে হয় তুচ্ছ ঘৃণাময়।
'বীর্য ধর্ম বীর্য পুণ্য বীর্য সাধনা সার
বীর্যবিহীন মানুষের নাহি বাঁচিবার অধিকার।'
সত্যে শ্রদ্ধা, কর্মে নিষ্ঠা, ক্ষমা-দয়া-সরলতা
মানুষের থাকে—আরও থাকে তার ধৈর্য-একাগ্রতা।
এ সব থাকিলে সার্থক হয় আসা এই দুনিয়ায়
দুর্লভ না কি মানুষ জন্ম—তা' কি মাটি করা যায় ?
অহিংসা-প্রেম-ন্যায়-নীতি-সেবা মানুষই পাথেয় করে,
খাঁটি মানুষেরই থাকে বিশ্বাস ঈশ্বরের উপরে।
বুঝিতেই হবে—সংস্কৃতি গেলে কভু নাহি বাঁচে জাতি,
উঁচু আদর্শে উদাসীন হ'লে কাটে না আঁধার রাতি।
পলতে যদি ও তেল না থাকিলে প্রদীপ কভু কি জ্বলে
তেম্‌নি জীবকে না বাসিলে ভালো সাধনা যায় যে জলে !
'সবার উপরে মানুষ সত্য'—স্মরণ রাখিতে হবে
সার্থক হবে পূজা-আরাধনা শান্তি পাবে যে তবে !
জীব মাত্রেই শিব যদি হয় তবে তো সে-শিব পূজা
দেবতারই পূজা—লোক্ সে-দেবতা কৃষ্ণ বা দশভুজা !
সমাজ বা দেশের উপকারে হয় জগতের কল্যাণ
সমাজ মানে তো লোকসমষ্টি—মানুষই ভগবান।
'জপ' না করেও জীবের সেবায় 'জপ-ধ্যান' হতে পারে
'নিষ্ঠার সেবা' 'জপ' অভিন্ন—সেবায়ও মিলায় তাঁরে
জপ কি শুধু 'কালী' 'হরি' বলা ? 'সৎ চিন্তাও জপ',
সৎকথা বলা, সৎকাজ করা তাও হয় জপ-তপ।
ধ্যানের মূর্তি ধ্যানে না মিলিলে ভক্ত দেখেনা যায়
সে মূর্তি যে মানুষের মাঝে—বুঝিলে সে-রাখা যায়।
মানুষকে যদি ভালবাসা যায় প্রভু তাতে আছে জেনে
সে-ভালবাসা যে প্রভুকেই হয়—জ্ঞানী এটি নেয় মেনে।
তাই কাহাকেও ব্যথা যদি দিই সে-ব্যথা প্রভুই পায় ;
প্রকৃত জ্ঞানী বা ভক্ত না হ'লে তাহা নাহি বোঝা যায়।
এ সব তত্ত্ব কঠিন—কিন্তু এ কথা তো বোঝা যায়
ঘা লাগে যদি নিজে ব্যথা পাই অপরেও তাহা পায় !
তাই জীব-সেবা প্রভুরই যে পূজা বুঝিব আমরা যবে
তখনই মোদের এই ধরণীতে আসা সার্থক হবে।
ধরণীর প্রতি জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা যদি না থাকে
যে-শ্রেণীরই হোক্ ব্যর্থ সে তবে করে যে জীবনটাকে।
জগৎ মিথ্যা প্রেম অসত্য একথা যে মনে করে
সে কি কভু তার স্রষ্টাকে পায়—বৃথা সে ডাকিয়া মরে।
এই ভুবনের শব্দ-গন্ধ-রূপ-রস যাহা আছে
তাহা যদি শুধু কণ্টক হয় জগৎ জনের কাছে
মিথ্যাই যদি এ জগৎ হয় তবে কেন নারায়ণ
স্বর্গ ছাড়িয়া ধরণীর ধূলি মাখিয়া ধন্য হন ?

বিশ্বনাথের বিশ্বে রয়েছি—অথচ বিশ্ব নাই
এ কথা কখনো স্বীকার চলে কি ? সবার তা' বোঝা চাই।
অনিশ্চিতের স্বর্গ লাগিয়া নেতে রবো কেন দদা ?
বুকের মাঝারে যে-জীবন আছে তাকে কেন তুচ্ছতা ?
তাঁর খেলাতেই যোগ দিতে চলে আসা ও যাবার খেলা,
ভুল যার গেছে সেই শুধু বোঝে ধরা আনন্দ মেলা।
'জীবের দ্বারে পায় সে দেবতা—চলে সে শ্রদ্ধা ল'য়ে
তাহার চোখে যে এক হয়ে যায় জীবালয় দেবালয়ে।'
সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার রূপ দেখে সে মুগ্ধ হয়,
সার্থক তার জীবন—তাহারে ডেকে নেয় প্রেমময়।

মাধ্যমিক শিক্ষা

।। মানবদরদী স্বদেশরঞ্জন ।।

প্রাথমিক শিক্ষার পর পঞ্চম শ্রেণী থেকে ছাত্রকে বিমূর্ত চিন্তা (abstract thinking) করার অভ্যাস সুরু করাতে হবে। মননশীলতার ও বুদ্ধিবিকাশের তারতম্য নির্ভর করে এই বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা বিকাশের তারতম্যের ওপর। মানব শিশু যেদিন থেকে তার স্মৃতির সাহায্যে চোখের সামনের বস্তু ও ঘটনাকে মিলিয়ে তাকে চিনতে শেখে সেদিন থেকেই বিমূর্ত চিন্তার সুরু। সেই জন্য প্রাথমিক শিক্ষাতেও প্রাথমিক স্তরের সরল বিমূর্ত চিন্তার তালিম অবশ্যই চলবে; এবং মাধ্যমিক স্তরের বিমূর্ত চিন্তা হবে জটিল ও উচ্চ স্তরের। শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয় এই বিমূর্ত চিন্তা-শক্তি বিকাশের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে।

বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের এই বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা ধাপে ধাপে বাড়াবার প্রতি শিক্ষকেরা বিশেষ ভাবে যত্ন নেন না। ছাত্রদের কেবল মুখস্থ করালে বিষয়টিকে আর বোঝার দরকার করে না। মুখস্থ কথাগুলো পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারলেই ভাল ভাবে পাশ করা যায়। বিষয়বস্তুকে বোঝার দরকার না থাকলে চিন্তারও প্রয়োজন হয় না। ফলে বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ে না। এই বিমূর্ত চিন্তার অক্ষমতা হেতুই আজ মানুষ এত বিভ্রান্ত; নিজের, প্রতিবেশীর বা কোন চিন্তার বা ভাব ও ভাবনার প্রতিক্রিয়া নিকট ভবিষ্যতে বা সুদূর ভবিষ্যতে কি হবে, কি ভাবে ব্যক্তিকে ও সমাজকে তা প্রভাবিত করবে সেটা বুঝতে পারে না, ভাবাবেগে, আপাতঃ মধুর বুলি ও ফলকেই স্থায়ী ফলপ্রসূ ভেবে আঁকড়ে ধরে; নিজেদেরই কৃতকর্মের ফলেই যে বর্তমান জীবন জর্জরিত হয়ে উঠেছে, এ সব সংকট ও সমস্যা যে তাদেরই অতীতে কৃত কর্মের ফল সেটা বোঝার মতো ক্ষমতারও আজ অভাব দেখা দিয়েছে। বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা না থাকলে কার্যের সঙ্গে কারণের যোগাযোগ ঘটিয়ে কর্মের ভবিষ্যৎ ফলাফলের চিত্রটা মনের পটে আঁকা যায় না। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্রদের কতক গুলি তথ্যের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো হয় মাত্র। মুখস্থ বিদ্যার দ্বারা এর বেশী কিছু হয় না। কিন্তু যদি বিমূর্ত চিন্তার দ্বারা তথ্যটিকে বিশ্লেষণ করে তথ্যের কারণটি কি ভাবে কার্যে পরিণতি লাভ করেছে, সেটি বোঝার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হত, তা হলে ছাত্রদের ধীশক্তি বিকাশ লাভ করতে পারত। ভবিষ্যতে আমাদের সেটাই করতে হবে, নতুবা শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্তমানের মতো ব্যর্থ হয়েই চলতে থাকবে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, তথ্যের প্রয়োজন বিমূর্ত চিন্তার কাঁচা মাল হিসাবে। তথ্য ছাড়া চিন্তা চলে না। কিন্তু তথ্যটুকু কেবল মুখস্থ করে সেটুকু পরীক্ষার খাতায় লিখে দিলেই বা আলাপ-আলোচনায় সেটা আওড়ালেই বিজ্ঞতার

বা পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হয় না। বর্তমান মুহূর্তের চিন্তা ও কার্য ভবিষ্যৎ মুহূর্তকে গড়ে তোলার জন্যেই। তথা হবে এই ভবিষ্যতের ইমারত রচনার এক একখানি ইট। স্থপতি যেমন প্রত্যেকটি ইট গাঁথবার সময় তাকে মেপেজুখে, কেটেকুটে, সাইজ করে নিয়ে তবে গাঁথে, ছাত্রদেরও বিমূর্ত চিন্তার সাহায্যে কার্য-কারণ নিয়ম অনুসারে তথ্যসমূহের ঠিকমতো নিরূপণ করে তার দ্বারা ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার তালিম নিতে হবে ও সেই সঙ্গে পদ্ধতিটি অভ্যাস করতে হবে।

বর্তমানে ছাত্ররা বিদ্যালয়ে যা শেখে সংসার জীবনে প্রবেশ করে তারা তা প্রয়োগ করতে পারে না বা তা ভুলে যায়। পুনরায় নতুন করে তাদের সব কিছু শিখতে হয়। ছাত্রদের বিমূর্ত চিন্তা করার অভ্যাস করতে পারলে ছাত্র-জীবনের শিক্ষাকে আর তাদের ভুলতে হবে না, সেই শিক্ষাই তাকে সংসার-জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা শিখতে সাহায্য করবে।

বর্তমানে যে পাঠ্যতালিকা ছাত্রদের পড়তে বাধ্য করা হয় তাতে ছাত্রদের প্রচুর শক্তি বৃথা ক্ষয় হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম মূল কথা হল, "Principle of economy in education—ছাত্রের শক্তির অপচয় নিবারণ"। কিন্তু পাঠ্যতালিকা নির্ণয়ে সে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে একই বিষয় বছরের পর বছর পড়াবার ব্যবস্থা আছে। যেমন পাটিগণিতের পাঠ্যতালিকা। সপ্তম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাটিগণিতের পাঠ্য-তালিকা থেকে নতুন কিছু শেখার থাকে না এই ব্যাপার যে কেবল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই ঘটে তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা নির্ণয়ের বেলাতেও এই ব্যাপার ঘটে। উভয় ক্ষেত্রের শিক্ষার উৎকর্ষ নিশ্চয় করতে ও মানের উচ্চতা বিধান করতে হলে উভয় ক্ষেত্রের পাঠ্যতালিকা নির্ণয় ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

প্রায় সকল স্কুল কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতিই প্রকৃত শিক্ষাদান পদ্ধতির বিপরীত। শিক্ষকগণ তাঁদের নিজ নিজ শিক্ষণের সময় শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সব কলা-কৌশল শেখেন কার্যক্ষেত্রে তাঁরা যেন দল বেঁধেই সে সকল শিক্ষা ভুলে যান। তথাপি যে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য থেকেই দু'দশ জন প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বের হয়ে আসেন সেটি এক পরম আশ্চর্য ঘটনা। এটা অবশ্য ঘটে এ জন্যই যে, সকল মানুষের মধ্যেই অন্ত-নিহিত যে সহজাত সত্যানুসন্ধিৎসা বৃত্তি আছে তা সর্ব-ক্ষেত্রেই যুগপৎ চেপে রাখা যায় না, বা অবহেলায় মেরে ফেলা যায় না, বা ভুল শিক্ষার দ্বারা বহুদিন ধরে ভুলিয়ে রাখা যায় না; শক্তিমানদের মধ্যে তা ঠিকই বিকশিত হয়ে ওঠে। এই জন্যই কারাগারে মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত মরে না, বরং জন্মায়, আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সভ্য ও বিশ্ব সমাজ থেকে বহুদূরে, আন্দামান বক্স অরণ্য পর্বতের মধ্য থেকেও জ্ঞানী শ্রেষ্ঠের অভ্যুদয় ঘটে, জন্মে যুগ-প্রবর্তকের আবির্ভাব হয়।

শিক্ষা-ব্যবস্থার যে প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রের যুক্তিবুদ্ধির বিকাশ সাধন, সঠিক চিন্তার পদ্ধতি শেখান ও তাতে অভ্যস্ত করান তা এখন মোটেই হচ্ছে না। খুব কম ছাত্রই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে শেখে, নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না, তাদের বিচার করার ক্ষমতা জাগে না, সৃজনশীলতার বিকাশ হয় না। ছাত্রকে পাঠ্যতালিকার রাশি রাশি বই মুখস্থ করতে বাধ্য করান হয়, যাঁরা ছকে উত্তর না লিখলে পাশ করা যায় না বলে মূল পুস্তকের চেয়ে কয়েকগুণ বড় নোট বই মুখস্থ করতে হয়, প্রশ্নপত্রে যদিও লেখা থাকে স্বকীয়তাকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হবে, কিন্তু ক্লাসে সেই স্বকীয়তা বাড়াবার প্রতি একান্ত অবহেলার ফলে প্রায় কোন ছাত্রই সেটা পারে না, মুখস্থ বিদ্যাই উগারে আসতে হয়। এর ফলে সেই সব ছাত্রই যখন উত্তর জীবনে শিক্ষক ও অভিভাবক হন তখন আর তাঁরা নতুন কিছু শেখাতে পারেন না, যা শিখেছেন, তা ভুলই হোক আর ঠিকই হোক, সেটাই ছাত্র ও সন্তান সন্ততিকে শেখান, নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও পুরাতন জ্ঞানকে যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে মার্জিত ও সংস্কৃত করে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের উন্নত করে তুলতে পারেন না।

নিজেরা যেমন সংসার জীবনে প্রবেশ করে কলের পুতুলের মতো চলতে বাধ্য হয়েছেন, সংসারচক্রের একটা দিক মাত্র হয়ে সমাজ-চাকা চলদে চলেছেন, খাদলে খেয়েছেন বা চাকরির দরখাস্ত লিখেছেন, পেলে পেয়েছেন, না পেলে বেকার থেকেছেন আর দুনিয়ার সবকের দোষ ধরেছেন, নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য অপরকে দায়ী করেছেন, ছেলেমেয়েদেরও ঠিক সেই বাঁধা রাস্তায় কলের পুতুলের মতোই ভাবতে চলতে বলতে করতে শিখিয়ে চলেছেন; সরকারের ওপর, নেতাদের ওপর, অদৃষ্টের ওপর, কোষ্ঠির ফলাফলের ওপর যেমন নিজেরা নির্ভর করে এসেছেন, বংশধরদেরও ঠিক তাই শেখাচ্ছেন। যুক্তিবুদ্ধির বিকাশ না হলে নতুন সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা জন্মে না, এবং সে ক্ষমতা না থাকলে স্বাবলম্বী হওয়া যায় না, পরমুখাপেক্ষিতা ঘোচে না। পিতামাতা শিক্ষক যদি স্বাবলম্বনের শিক্ষা না পেয়ে থাকেন তবে তাদের সন্তান ও ছাত্রদের স্বাবলম্বনের শিক্ষা দিতে পারেন না, নিজেদের মতোই পরমুখাপেক্ষী করে রাখতে বাধ্য হন।

প্রাথমিক শিক্ষার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সুরুতেই ছাত্রদের বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাকে আশ্রয় করেই প্রত্যেকটি বিষয়ের শিক্ষা দিতে হবে। জীবনের ছোটখাট সমস্যা ও ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে কার্য-কারণ পরম্পরা দেখিয়ে দিয়ে কিভাবে আলোচনের সাহায্যে সমস্যাগুলিকে সমাধান করা যায়, ঘটনাসমূহকে ব্যাখ্যা করা যায় তা বুঝিয়ে ধাপে ধাপে জীবনের, সংসারের, সমাজের বৃহত্তর সমস্যা সমাধানের জন্য উচ্চ স্তরের বিমূর্ত চিন্তায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। এই পদ্ধতি পাঠ্য-বিষয়ের সকল বিভাগেই প্রয়োগ করা যায়।

ক্লাসে শিক্ষকের প্রতিদিনকার বক্তৃতার পর ছাত্ররা আলোচনা ক'রে যাতে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিক্ষকের পঞ্চাশ মিনিটের বক্তৃতার পর পঞ্চাশ মিনিট ধরে ছাত্ররা সেই বিষয়টি আলোচনা করবে এবং নিজ নিজ ভাষায় লিখবে।

তা ছাড়া শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে বিষয়টি সম্বন্ধে ছাত্রদের কার কেমন ধারণা হল তা জানার জন্যে প্রশ্ন করতেও উৎসাহিত করতে হবে।

বক্তৃতার বিষয় বস্তুর ধারণা সম্বন্ধে লেখা ছাড়া ক্লাসের এই সব প্রশ্নোত্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণও অপর একটি খাতায় লিখতে হবে।

শিক্ষক এই দুটি খাতা থেকে ছাত্র সম্বন্ধে দুটি জিনিষ জানতে পারবেন। এক হল: বিষয়টির কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছে; আরেকটি হল: ছাত্রের মনকে একত্র করার ক্ষমতা বৃদ্ধির ও মানসিক বিকাশের অগ্রগতির মান।

যেসব ছাত্রের মধ্যে বিষয়টি সম্বন্ধে সম্যক ধারণার অভাব বুঝতে পারবেন, তাদের বিষয়টিকে পুনরায় বোঝাবার চেষ্টা করবেন। অপর যে সব ছাত্রের মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা বাড়ছে না বা মানসিক বিকাশের অগ্রগতির অভাব বুঝতে পারবেন তাদের সেই ত্রুটি নিবারণের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করতে পারবেন। কারণ মনঃসংযোগ অভ্যাস কিছুদিন অবহেলা করলে পুনরায় সে অভ্যাস ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়। সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গে এ রোগের চিকিৎসার প্রয়োজন। ধাপে ধাপে মানসিক বিকাশ যাতে ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রেখেই পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা হয়। ছাত্র যদি নিয়মিত সে সব না শেখে তবে পরবর্তী পাঠ্য বিষয় তার পক্ষে কঠিন লাগে, এবং ছাত্র ক্রমাগত অকৃতকার্য হতে থাকে বা বোকা নামে অভিহিত হয়। সেই জন্য পাঠ্য সূচীর সকল পাঠই ছাত্রদের হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে। তবেই ছাত্রের মানসিক শক্তির বিকাশ ধাপে ধাপে ঘটবে।

সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি বিধান

সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি যে মাত্রাহীন বিমূর্ত পদ্ধতি তার সঙ্গে পরিপূরক রূপে দ্বিমাত্রিক পদ্ধতির সংযোগ সাধন করে সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষার (Humanities) উন্নতি বিধান করতে হবে। ত্রিমাত্রিক-শিক্ষাকে (দ্বিমাত্রিক রূপ) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করতে হবে, এবং সমাজ-বিজ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর দান কথায়

এবং রেখাঙ্কনের দ্বারা দ্বিমাত্রিক রূপের সাহায্যে ঘটনার বিবরণ দেবার নিয়ম প্রবর্তন করতে হবে। এই নিয়ম প্রবর্তনের কারণ হল, পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যেমন ত্রি-মাত্রিক, সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু তেমন নয়। সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে চোখে দেখা যায় না, মনে কল্পনা করে নিতে হয়। একই বিষয় ও সংজ্ঞার মানসিক চিত্র বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে চোখে দেখা যায় বলে বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে বিষয়বস্তুর ধারণা নিয়ে মতান্তর নেই। মতান্তর হয় না বলেই বস্তু-বিজ্ঞানের চর্চা সম্ভব হয়। কারণ অস্থির মূল্যের উপাদান নিয়ে বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব হয় না। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপের হতে পারে। একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা থাকলে তখন আর সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চাও বৈজ্ঞানিক পন্থায় সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে মতান্তরের অন্ত নেই। অথচ এই মতান্তর কেবল ভুল বোঝাবুঝির জন্যই হয় বেশী। কিন্তু যদি ছবি এঁকে দ্বিমাত্রিক রূপরেখার মাধ্যমে বিষয়গুলির সংজ্ঞা ও ধারণা হৃদয়ঙ্গম করার ব্যবস্থা থাকে, তা হলে সমাজ-জীবন থেকে অনেক রক্ত ও অশ্রুপাত বন্ধ হবে, এবং সমাজ-বিজ্ঞানের উন্নতি অতীত ও বর্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকবে। এই কারণেই সমাজ-বিজ্ঞান পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি

পরীক্ষা গ্রহণের বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে। বর্তমান পদ্ধতিতে পরীক্ষক পরীক্ষার হলে বসে লেখা ছাত্রের খাতা পরীক্ষা করেন মাত্র, মানুষটিকে পরীক্ষা করেন না। শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কেবল মুখস্থ করার শক্তি বাড়ানো নয়। অথচ পরীক্ষা-ব্যবস্থাটা কেবল এই একটি মাত্র বিষয়ের মধ্যেই আবদ্ধ। শিক্ষা-ব্যবস্থার যে চারটি উদ্দেশ্য তার সব কটির পরীক্ষাই গ্রহণ করতে হবে। ছাত্রের জ্ঞান বুদ্ধির গভীরতা, আচার-ব্যবহার, শরীর ও চরিত্র গঠন প্রভৃতির রেকর্ড শিক্ষকের ধারণা থেকেই জানা সম্ভব।

বিদ্যাসমূহের সমন্বয় সাধন

বিভিন্ন বিদ্যার সমন্বয় সাধনের দ্বারাই প্রকৃত শান্তিতা লাভ সম্ভব হয়। বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছে। সকল শাখা-প্রশাখার সঙ্গেই যে সকলের মূলতঃ যোগ আছে সে ধারণা ছাত্রের মনে গেঁথে দেবার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই শিক্ষকের দ্বারা সকল বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা থাকে। মাধ্যমিক স্তরে সেটা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন বিষয় পড়াবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক থাকেন। কিন্তু সর্ববিদ্যার মধ্যেই যে মূলতঃ একটা যোগ আছে এবং সর্ববিদ্যার সমন্বয় সাধনের দ্বারাই যে প্রকৃত বিজ্ঞতা লাভ হয় সেটা শিখিয়ে দিতে হবে। কোন বিদ্যাই যে অন্যান্য বিদ্যানিরপেক্ষ এবং পরস্পর সম্পর্ক-শূন্য এটা ভাবলে ক্ষতি হয়, এবং সেটা অবিদ্যা হয়ে ওঠে। সকল জ্ঞান বিদ্যাই যে মানুষের কল্যাণের জন্যই আবিষ্কৃত হয়েছে এবং চর্চাও উন্নত করা হচ্ছে তা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং জ্ঞান বিদ্যা বিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যবহার করলে যে কী ভাবে মানুষের অপকার করতে পারে তাও জানিয়ে দিতে হবে। সেই জন্য সকল বিদ্যা ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধে যে একটা সমন্বয়ী জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সেটা ছাত্রদের মনে দৃঢ় ভিত্তিতে করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ ঘন ঘন মিলিত হয়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবেন, এবং ছাত্রদের অগ্রগতি সম্বন্ধে পরস্পরের ধারণা বিনিময় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা

শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্বাসন করতে হলে সর্বাগ্রে শিক্ষক-গণের শিক্ষার, চরিত্রের ও আদর্শবাদের পুনর্বাসন ঘটাতে হবে। একদিকে যেমন শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, অন্যদিকে তেমন গুণগত মান বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করতে হবে।

ছাত্রের অন্তর্নিহিত বৃত্তি ও শক্তিসমূহ অনুশীলিত করে

বিকশিত করে তোলার জন্য শিক্ষক তার বুদ্ধি ও শক্তিকে কোন্ কৌশলে ও পদ্ধতিতে নিয়োগ করবেন তা শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় শেখাতে হবে।

প্রাথমিক মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে যে পার্থক্য আছে সে কথাটা শিক্ষকদের জানতে হবে, বর্তমানে অনেক শিক্ষকই সে কথাটা স্মরণে রাখেন না বলে তাঁরা তাঁদের পেশায় সাফল্য লাভ করতে পারেন না।

মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হবার পূর্বেই ছাত্রের প্রবণতা অনুসারে তার পেশা নির্বাচন করার জন্য শিক্ষককে সাহায্য করতে হবে। যে সব ছাত্র শিক্ষকতাকে পেশা রূপে গ্রহণ করবে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা বিভাগে ভর্তি হতে হবে, বা শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে; এবং বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, কেবল শিক্ষা দেবার বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেই চলবে না, বিষয়টি কেমন ভাবে শেখাতে হবে সে সম্বন্ধেও শিখতে হবে।

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষণ কাল পাঁচ বছরের জন্য হবে। এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা লাভ করার জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে চেষ্টা করতে হবে। দুবছর কলেজে পড়ার পর কোন স্কুলে এক বছরের জন্য পড়াতে হবে। তারপর পুনরায় কলেজে এসে দুবছর পড়তে হবে।

যে যে বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞান লাভ করার জন্য বেছে নেওয়া হবে তাতে যেন সত্যই বিশেষভাবে দৃষ্টি ও গুরুত্ব দেওয়া হয়; নতুবা ছাত্রদের ভাল ভাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার ধারা ও পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ছাত্রকে কেবল একটি পেশা শেখানো বা কিছু ভাষা শিক্ষা ও কিছু সাধারণ জ্ঞান দিলেই চলবে না, সেই সঙ্গে তাকে যুক্তিবাদী চরিত্রবান নীতি-পরায়ণ দায়িত্বশীল মনোগ্রহিকরূপে গড়ে তুলতে হবে। সেই জন্য শিক্ষকদেরও এই দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরূপ ভাবে শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষণের সময় যা শেখানো হবে তা যেন বর্তমানের মতো ইউটোপিয়ার মতো কেবল শিক্ষকদের মনের মধ্যেই থেকে না যায়, ছাত্রদের জীবনে যেন তা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ওঠে তা দেখতে হবে।

বর্তমানের পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে বিকল্প ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হলে ছাত্রদের শিক্ষা দান পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ছাত্রকে ক্রমশঃ নিম্ন থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত করে তোলার জন্য বুদ্ধি বৃত্তির ও মেধা শক্তির বিকাশের মান বিচারের উদ্দেশ্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা চাই। কিন্তু বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা সেই জানাটা ঠিক হয় না। উত্তরোত্তর বেশী জ্ঞান লাভের পক্ষে মেধাশক্তির বিকাশের মান ও উপযুক্ততা পরীক্ষার সর্বোত্তম উপায় হবে ছাত্রদের দৈনন্দিন পাঠ অভ্যাসের দ্বারা যে জ্ঞান বুদ্ধি বিকাশ ঘটছে তার রেকর্ড রক্ষা করা ও সেই রেকর্ড ও শিক্ষকের মন্তব্য সহ প্রত্যেকটি ছাত্রের বিকাশের দৈনন্দিন বিবরণের সাহায্য গ্রহণ।

এই জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তিনটি নিয়ম প্রবর্তন করতে হবে—প্রথমতঃ প্রত্যেক শিক্ষকের অধীনে কুড়ির অধিক ছাত্র থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন এবং শিক্ষা-দান পেশা যে অতি মহৎ পেশা, অর্থোপার্জনের জন্য যেটুকু যোগ্যতা প্রয়োজন তা ছাড়াও যে একটা আদর্শবাদের প্রতি নিষ্ঠা ও সাধনার প্রয়োজন আছে এবং শিক্ষকতা যে একটা ব্রত সে সম্বন্ধে সচেতনতা ও আত্মত্যাগের মনোভাব থাকা প্রয়োজন হবে। যে সব পেশায় নির্জীব বস্তু নিয়ে কাজ কর্ম চালাতে হয় সেখানে চরিত্রের এ সব গুণের দরকার হয় না, কিন্তু মনুষ্য শিশুকে আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলা যাঁদের পেশা সেখানে অবশ্যই এটার প্রয়োজন আছে। কারণ একটু অবহেলায় একটা জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র সমাজ-দেহের কত বেশী ক্ষতি হতে পারে।

তৃতীয়তঃ এইরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রমের জন্য শিক্ষককে যথোপযুক্ত বেতন, মর্যাদা ও ক্ষমতা দিতে হবে। শিক্ষককে

সমাজ-গুরুর আসনে বসাতে হবে।

ছাত্রের শিক্ষা শেষ হবার পরে ছাত্রকে তার যোগ্যতা অনুসারে পেশায় নিযুক্ত করার ক্ষমতা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের হাতে রাখতে হবে। উৎপাদনের উপায়সমূহের ও সেবাপ্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মখালির সংবাদ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে জানাতে হবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই হবে নিয়োগ-কর্তা। নতুবা ছাত্রদের যদি বর্তমানের মতো কাজের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতে হয় তবে শিক্ষার ওপর, শিক্ষকদের ওপর, সরকারের ওপর, সমাজের ওপর তারা শ্রদ্ধাশীল থাকবে না, আনুগত্য দেবে না, সুনাগরিক হবার মতো তাদের মনোভাব থাকবে না, পরিবর্তে বর্তমানের মতোই ক্ষুব্ধ ক্রোধ ও ভিক্ত মন নিয়ে সমাজ-বিরোধী ও ধ্বংসকারী শক্তিরূপে গড়ে উঠতে থাকবে। শিক্ষার সংকট দূর হবে না। অবশ্য এই জন্য বর্তমানের প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবর্তে এক সহযোগিতামূলক সমবায়ী অর্থনীতির প্রবর্তন করতে হবে, তা হলেই সমাজে বেকারহীন শোষণমুক্ত অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে শিক্ষার সংকট বর্তমান অর্থনীতিরই অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ দেখা দিয়েছে।

ঈশার চোখে জল

।। শংখচিল ।।

[এ কথা সর্বজনবিদিত যে তাজমহল শাহাজাহানের পত্নী-প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রকৃত ব্যাপারটা কিন্তু রহস্যপূর্ণ মমতাজের প্রতি শাহাজাহানের যে প্রেম তাতে হৃদয়ের যোগ অল্প। তাজমহল শাহাজাহানের রাজবৈভবের নিদর্শন মাত্র। সমসাময়িক ইউরোপের শিল্পানুরাগীরা যাতে এ রূপ-সৌরভের অধিকারী না হতে পারেন সেদিকে শাহাজাহানের দৃষ্টি সতর্ক ছিল। তাজমহলের নির্মাণকার্য সমাপনান্তে পারস্য তথা বিশ্বের বরেণ্য শিল্পী মীর্জা ঈশার হস্তচ্ছেদ করা হয় এ রূপ যুক্তিভিত্তিক কাহিনী প্রচলিত আছে। সম্রাটের স্বেচ্ছাচারের কাছে হার মানল না শিল্পীর আত্মা। সম্রাটের দাম্ভিকতা ও নৃশংসতা পারল না শিল্পীর প্রেমকে ম্লান করতে। হস্তচ্ছেদের পূর্বে শিল্পীর উক্তি: 'জাহাপানা, শেষবারের মত তাজমহলকে দেখতে দিন' শিল্পীর প্রার্থনা মঞ্জুর হল। বিদায়ের পূর্বে তাজমহলের মূলে মিনারের উপর শিল্পী তার বিক্ষত হৃদয়ের চিহ্নস্বরূপ রেখে গেল সরিষাবৎ এক বিন্দু ছিদ্র। উক্ত ছিদ্র দিয়ে বর্ষার বারিধারা শিল্পীর চোখের জল হয়ে সংগোপনে গড়িয়ে পড়ে নিয়ে শায়িতা মমতাজের বুকের উপর।]

হায় হায় শব্দে কাঁদে অন্ধকার নিশা,
সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্বে আজ তুমি ফিরে এস ঈশা।
রোশেখের খর রৌদ্রে বক্ষ মোর হল খান্ খান্
কে বলে বেসেছি ভাল অন্তরে নিয়েছি তুলি বিশ্ব শাজাহান।
বেদনার উৎস আজি হৃদয়ের কেন্দ্র বিন্দু হতে,
গড়িয়ে ছুটিয়া চলে নীলবর্ণ যমুনার স্রোতে।
উচ্ছ্বসিয়া নীল সাগর কল্লোলিয়া যাও;
ধরার ধূসর বুকে যদি কিছু পাও।
একটু চোখের জলে হাসি মুখে তাই নিয়ো তুলি ;

হে প্রেমিক সব ব্যথা ভুলি।
আমার মর্মপটে এঁকেছিল যে প্রাণের ছবি,
সে আমার কায়া আজ কল্পনার কবি।
সমস্ত রজনী জাগি নিদ্রাহার ভুলি,
কে তুমি দাঁড়ালে আসি হস্ত মেলি বুকে নিলে তুলি,
জীবন প্রভাতে যবে কিরণ লেখায়,
আমি যে উঠিনু ফুটি শিল্পী-প্রাণ তুলির রেখায়।

শ্রাবণ প্রাঙ্গনে যবে নিখিলের তটে নামে ঢল,
ঐ নয় বর্ষা গীত বিগলিত তব অশ্রুজল।
সেদিন করে নি ক্ষমা অত্যাচারী মুঘল রাজন
তোমার হস্ত ধর হাস্যমুখে নিয়েছিল ছেদি,
রাঙাইল স্বেচ্ছাচারী গৌরবের বেদি;
জ্বালাইল লক্ষ কোটি দীপালীর আলো,
আমি কি বেসেছি তারে ভাল?
আমি কি দিয়েছি তারে মরমী হৃদয়
সে এক শিল্পী প্রাণ,—শাজাহান নয় ওগো
শাজাহান নয়!
রাজবল পারে শুধু সর্ব বিনাশিতে,
বন্দীর শীর্ণ দেহে কষাঘাতে রক্ত ঝরাতে।
জ্ঞাতিময় চোখে দিতে বেদনার ধূলি,
সবুজ শস্য ক্ষেতে মরা ঝড় তুলি।

সে মোরে কহিল আসি,—"শোন মমতাজ,
আমার সৃষ্টি গান শেষ হবে যবে,
সোচ্চারিবে এ ভুবন হায় হায় রবে।
নিশীথের চন্দ্রালোকে লক্ষ লক্ষ পুঞ্জ নীহারিকা,
তাহাদের কাব্য হবে সেই দিনই লেখা,
তাহাদের সপ্তসুর বর্ষরিবে পৃথিবীর দুখে,
আমার অশ্রুজল যুগে যুগে পড়িবে যে তোমারই বুকে,
তোমার নিদ্রাশট নির্বাক্ নিঃসঙ্গ আঁধার গুহায়,
চিরকাল সোচ্চারিবে হায়! হায়!! হায়!!!"

রচনাকাল—১৯৬৫ সাল,
রাজভবন, কলিকাতা—১

প্রার্থনাকালীন ভাষণ
শ্রীশ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

৮১

২৬. ৪. ৫৭—প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ ১ম খণ্ড ভূমিকার মধ্যে প্রমথবাবুর লেখা (পৃঃ ৷৶) দ্রষ্টব্য…।

কথায় চিঁড়ে ভেজে না—কথায় মন ভেজে।…মানুষের মনের আটভাগের ৭ভাগ ঘুমিয়ে আছে, একভাগ জেগে আছে—তাকেই আমরা শুধু জানি।… ঘুমিয়ে থাকা মনের দুইটী ভাগ—অবচেতন, অচেতন। আমার পেছনে যুগ যুগ জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার ঘুমিয়ে আছে…। সে যে তার সাতভাগ মনের কথাই জানে না এটা যদি মানুষ জানত তাহলে তার অনেক বিপদ কেটে যেত।…অথচ মানুষ তর্ক করে, জেদ করে।…যেখানটায় জানি সেখানটায় ভগবান আছেন।… সত্যি সত্যি যদি মানুষ শরণাগত হয় তাহলে অঙ্কের গণনার মত বলে দেওয়া যায় তার জীবনের পরিণতি…। আমার কথায় মানুষের ঘুমন্ত মন জিজ্ঞাসু—কিন্তু জাগ্রত মন দিয়ে আমার কথা বুঝ-না—আটভাগের সাতভাগ মন দিয়ে আমার কথা বুঝ…। …মানুষ আটভাগের একভাগকে ষোল আনা দখলে নিয়ে থাকে…বিপদ হয় সেইখানে।…কাম আছে জাগ্রত এক ভাগ মনে,…মনের বাকি সাত ভাগে রয়েছে প্রেম… আপনার মনের সেই ঘুমন্ত অংশের প্রেমকে জাগ্রতে আনাই সাধনা।…নিত্যগোপাল-প্রসাদে ঐ সাত ভাগের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হয়েছে।…তোমার এবং দ্রৌপদীর কেউ নেই কৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে—তাই তোমাদের কোনো ধর্ম নেই…গীতার কথা দিয়ে তোমার ঘুমন্ত ভাগকে প্রভাবিত করব—ভীষ্মের প্রতি তোমার কোনো কর্তব্য নেই…যেহেতু ভীষ্ম তার কর্তব্য করে নি।…ভীষ্মকে তুমি আমার মধ্যে পাবে।…জাগ্রত মনকে ছেড়ে দিয়ে ১৯১৯-এ ঐ ঘুমন্ত সত্তার পেছনে ছুটেছি…হারাই নি কিছু। …এই বাণ্ডইআটির মাটিতে যা লুকিয়ে আছে, তা আমাকে কর্ষণ করে বার করতেই হবে…। প্রত্যেকের conduct নিয়ে আমরা অসীম ধৈর্য নিয়ে প্রত্যেককে সাবধান করে দিচ্ছি—কথা শুনলে হাতের গোপার মত জীবন যে বদলে যাবে তা বলে দিতে পারি…। মানুষের ঘুমন্ত সত্তার মধ্যের সহস্রারকে জাগিয়ে তুলতে পারব যদি কথা শুনে চল যে বিরাট জাগরণের মধ্যে মানুষের সত্তাটা এসে পড়ছে—deluge is come—এই প্রলয়-পয়োধি জলে প্রতিটী দিনকে মূল্য দিয়ে যারা নিত্য-গোপালের সামগ্রিক জীবনধর্মের আশ্রয় নিল, তাঁর—নোয়ার—নৌকায় যারা উঠে বসল তারাই কূল পাবে, তারাই ভাগ্যবান।…নিত্যগোপাল, নীল অবতার তুমি, তোমার নৌকায় আজকের মানুষকে উঠতে হবে—কোন একটী প্রান্তকে আশ্রয় করলে আজকের দিনের সত্যকে পাওয়া যাবে না।…জাগ্রতটা prose, ঘুমন্ত সত্তাই সাহিত্য, কাব্য—এ কাব্য মানুষের জীবনে অপরিহার্য…।

২৮. ৪. ৫৭ (রবিবার বলেন নি, আজ বলছেন) নিত্য-গোপাল হৃদয় নিয়ে এসেছিলেন—হৃদয় নিয়ে সমাজ রাষ্ট্র গড়বার পথ ও দর্শন দিয়ে গেছেন…। তাঁর চরণস্পর্শে যে হৃদয় আমার মধ্যেও একটু অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল বলে আজও গর্জন করি আবার কাঁদতেও পারি…। হৃদয়ের অর্থ জীবনের সব factor গুলিকে সমান মূল্য দেওয়া…। বুদ্ধির ধর্ম কোন একটাকে নেওয়া…। অজড়বাদীরাও বুদ্ধিমান, জড়বাদীরাও বুদ্ধিমান—অজড়বাদীরাও স্ত্রীপুত্রের দাবী অস্বীকার করছে, জড়বাদীরা আবার সেই স্ত্রীপুত্রের দাবী মেটাতে চুরী চামারী করছে…। এরা হৃদয়বান নয়…। স্ত্রীপুত্রকন্যাকে কেন্দ্র করে একবার আত্মাকে দেখতে হবে, আবার আত্মাকে কেন্দ্র করেও স্ত্রীপুত্র-কন্যাকে দেখতে হবে…। উপনিষদ বললেন তাই—

যত্র সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবাভূদ্বিজানতঃ, সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।...কেউ আত্মা নিয়ে হৈ হৈ করে, কেউ সর্বভূত নিয়ে হৈ হৈ করে, কিন্তু সর্ব উপনিষদের বাণীই উভয়কে সমমূল্য দেওয়ার—একটা নিলেই সর্বস্ব আর বিকায়...। নিত্যগোপাল উভয়কে সমমূল্যে স্বীকার করলেন—কি করে করেন সেটা তোমরা শিখে নাও।...

রঘুনাথ দাস লক্ষপতি, যুবতী স্ত্রী—তবু তিনি বার বার গৌরের কাছে পালিয়ে যান। মা বলছেন পিতাকে ছেলেকে বেঁধে রাখতে...। বাপ বলছেন, এত সম্পত্তি আর ঐ স্ত্রী যাকে বেঁধে রাখতে পারল না, তাকে কি দিয়ে বাঁধা যাবে...? ওই আমার বাপ, না আমি ওর বাপ? ...মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলছেন

অন্তর বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া
স্থির হইয়া ঘরে যাও না হও বাতুল
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল
অন্তর নিষ্ঠা রাখ বাহে লোক-ব্যবহার
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।

...যে ক্ষেত্রে আছ তা সহজে ছেড়ো না—ক্ষেত্রের অভিশাপ সামলাতে পারবে না, উন্মাদ হবে। যথাযোগ্য বিষয় ভোগ কর—এই বৃন্দাবনের স্থর—একটু তফাৎ থেকে—ক্রমে ক্রমে পার লোক ভবসিন্ধু কূল...কোন shortcut policy এখানে চলে না...বাইরকে ফোঁপও না...। কেন সংসার ছেড়ে দেয় না? কারণ এখনও তোমার সংসারের সেবা করা হয় নি...। গায়ের মামড়ী জোর করে ছিঁড়তে গেলে রক্তারক্তি হয়, ঘা শুকোলে আপনি পড়ে যায়...। ...নিজের জীবন এক দৃষ্টান্ত যে কেমন করে সংসার ছেড়ে দেয়।...রঘুনাথ একদিন বেরিয়ে এলেন—সেদিন কেউ আটকায় নি...। নরনারায়ণ আশ্রমকে হৃদয় দিয়ে তৈরী করতে চেষ্টা করেছি...এখানে প্রত্যেকের জন্য সর্বাধিক সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থার চেষ্টা আমাদের রয়েছে...। আমি কর্তা এটা আমি মনে করি না...প্রত্যেকেই এক একভাবে কেন্দ্র...। পৃথিবীর কেন্দ্র সত্যিই যে কোন খানেই করা চলে...নিজের জীবনের কথা বলে রাখি—আমি পথে বেরিয়েছিলাম, তাদেরও পথে নিয়েছি, আন্দোলনেও তাদের সঙ্গে রেখেছি—তাদের বাদ দিয়ে আমি বিপ্লবী-জীবন যাপন করি নি।...সংসার সন্ন্যাস সমন্বয় করতে হলে সংসারের দাবীও মেটাতে হবে নইলে তাকে নিত্যগোপালের সন্ন্যাস বলা চলবে না—কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে সংসারের দাবী মেটাতে গিয়ে আর সংসারের উর্দ্ধে ওঠা বা বৃহত্তর জীবনের কথা একেবারেই আর মানুষ মনে রাখতে পারে না বা নিজেদের জীবনের ব্যবহার সেইমত চালাতে পারে না।...নীলমাধবের বাবা আমাকে কখনো রসগোল্লা খাওয়ালেন—আমি ছেলেমেয়েদের জন্য চেয়ে নিয়ে ছেলেমেয়েদের খাওয়ার দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়েছি ...আমার উপর আমার স্ত্রীর অধিকার রক্ষা করেছি...। আমি বৃন্দাবনে গেলে উষাজিদীর ভাই তাকে নিতে এল সে গেল না...। বৃন্দাবনে যা পেয়েছি স্ত্রীপুত্রকন্যাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।...কোনদিন দূরে রাখি নি—অনাদর হবে মনে করে।...প্রবৃত্তির জোগানও একটু দিয়েছি... একদিন মাঝে মাঝে ইলিশ মাছ এনে দিয়েছি...। সম্পর্ক প্রত্যেকের সাথে eternal...। নিত্যগোপালের এই চলার পথে চলতে পারবে তোমরাও—কিন্তু অহংকার থাকলে পারবে না—অহংকার ছাড়, পারবে।...অর্জুনের বুদ্ধি আর দ্রৌপদীর বুদ্ধি মিললে হয় কৃষ্ণের বুদ্ধি।... আশ্রম সম্বন্ধে তোমাদের যদি হৃদয়ের আকর্ষণ থাকে, তবে তো পারতেই হবে...। আমাদের পথ এক হিসাবে ভীষণ কঠিন, কিন্তু হৃদয় এলে কঠিন নয়...অর্জুনের মত লোকও যেই হারিয়ে ফেলেছিলেন...মানুষের ছোট প্রয়োজন সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত sensitive...। আমি সকলের সঙ্গে চলতে পারি। ঐ স্ত্রীপুত্রকন্যা আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়...কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ তারা দূরে—তারা আমার আদর্শের পথে যতদিন পেরেছে সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে, আজ তাদের জীবনধারা আলাদা—বেশ কথা —তবু অন্তরে তো তারা আছেই...। আমি তো টানা-টানি করি না—আমি একতরফা চলেছি—আমার মধ্যে তো তারা রয়েছে, তাদের অন্তরেও কি আমি নেই?... পুরুষোত্তম হলেন সংসারের ঠাকুর, সন্ন্যাসের ঠাকুর—যাকে

সামনে রেখে নিয়ে করে ছিলাম তিনিও নারায়ণ, আজ যার পথে চলতে চাইছি, তিনিও নারায়ণ।...যারা আমার বুকে ভীষণ আঘাত করেছে তাদের জন্যেও আমার দুয়ার খোলা...। নিজের কাজ যার সামনে, তার কি পাওয়া দাওয়া এ সব ছোট কথা নিয়ে এত আবর্ত সৃষ্টি করার অধিকার আছে?...ঘাটতি-বাড়তির কথা পুরুষোত্তমদর্শনে নেই

বাইরেকে এতটুকু হজম করার বুদ্ধি যার নেই সে কৃষ্ণকে ভালবাসবে কেমন করে?...যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। মার আর ধর পিঠ করেছি কুলো...। আদর্শ ঠিক রেখে...আবেষ্টন ও কেন্দ্র সামঞ্জস্য করে চলতে হবে...। কার কোথায় রাখা তা আমি জানি...। আমার কাছে কাউকে কোনদিন কিছু চাইতে হয় নি...। কিন্তু গুরু কোন কল্যাণ করতে পারবেন না যদি শিষ্য গো নিয়ে চলে...। তোমাদের মন দিলে, অহংকার দিলে কল্যাণ হবে।...নিত্যগোপাল সত্যি ব্রহ্মবন্ধু—নিজে তিনি নিখে গেছেন ...হৃদয় নেমে আসুক—বিশ্বের সব মধুময় লাগবে।...

২. ৫. ৭১। শ্রীনিত্যগোপাল যে জীবন ও দর্শন রেখে গেছেন এক হিসেবে তা খুব দুর্বোধ্য—সহজ বলেই—খুব সহজ বলেই—তা দুর্বোধ্য।...মানুষ যে ভাবে ভাবতে শিখেছে, সেই ভাবনার কাছেই দুর্বোধ্য। সহজ জীবনকে মানুষ তো সহজভাবে দেখতে অভ্যস্ত নয়।...প্রাণ খুব সহজ।...মানুষ সাধারণতঃ ঐশ্বর্যকে চেনে, মাধুর্যকে চেনে না। সেইজন্য নিত্যগোপালের লেখা বোঝা খুব শক্ত...। নিত্যগোপালে 'এ সংসার অতি ভীষণ স্থান' এও আছে, আবার 'এ বিশ্ব আমার মহামঠ' তাও আছে। 'সিদ্ধান্ত-দর্শনে' বিশ্ব সত্তাও বলেছেন, আবার ভয়ানকও বলেছেন। কেন? যেহেতু সত্য আপেক্ষিক। সকলের কাছে সব ভীষণ নয়...। তাঁর বিশ্ব তো তাঁর কাছে ভীষণ নয়, সাপের বিষ কি সাপের কাছে ভীষণ?...তাই নিত্য-গোপাল লিখেছেন, 'অসির দোষ নাই, দোষ তার যে অসি ব্যবহার করে'...। তোমার মধ্যে মদন—কামুকতা—আছে বলেই রমণী তোমার কাছে ভীষণ। তুমি যদি প্রেমিক হতে অর্থাৎ প্রেমের বস্তুর মর্যাদা দিতে জানতে, তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে, তোমার ভোগবাঞ্ছা যদি তোমার একমাত্র কথা না হতো তাহলেই দেখতে পেতে রমণী ভীষণ নয় ...নিত্যগোপালের সমস্ত প্রার্থনাগীতি হরহর শঙ্করের মোহমুদ্গর।...শরণাগত হলেই পথ পরিষ্কার, সংসার মিষ্টি।...শরণাগত মানে তোমার অহংকার আর কর্তৃত্ব দিয়ে তুমি চালাবে, অপরের মতামত, স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দেবে না, সব কিছুকে তোমার করে চাইবে, অপরের প্রতি সেবা-বুদ্ধি, অপরের জন্য কল্যাণবুদ্ধি থাকবে না, জীবনটাকে গণ্ডীবদ্ধ করতে করতে অসীমের সাথে বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেছ—এইগুলিতে প্রমাণিত হবে তুমি ব্রহ্মবন্ধুর শরণাগত নও...ব্রহ্ম চরিত ইতি ব্রহ্মচর্য...। ব্রহ্ম যে ভাবে সংসার পরিপাক করেছেন—তোমাকেও সেইভাবে সংসারকে পরিপাক করতে হবে।...ব্রহ্মচর্য মানে উপবাস নয়—উপ বসতি ইতি—ব্রহ্মের নিকট বসা উপবাস সম্বন্ধে শাস্ত্র লিখেছেন, 'বলৌ অন্নগত প্রাণা নোপবাসঃ প্রশিষ্যতে'...। উপবাসেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু মাত্রা ঠিক রাখা চাই...। আজকের দিনে সাধারণ মানুষ যা খায় তাতে উপবাস প্রশস্ত নয়...দরিদ্রের আবার উপবাস কি?...নিত্যগোপাল-দর্শনে পরস্পর বিপরীত কথা এইজন্যই পাওয়া যাবে যেহেতু তা জীবনের দর্শন—জীবন্ত মানুষের জীবনের দর্শন।...সেইজন্য নিত্য-গোপালকে বুঝতে খুব সতর্ক হয়ে অগ্রসর হতে হবে...। মায়াব্রহ্ম সমন্বয় খুব কঠিনই বটে...। এই সমন্বয় কথাই সেদিন (৩০শে এপ্রিল ১৯৪৭) মহানির্বাণ মঠে বলেছি। ...নারায়ণের বৈকুণ্ঠ থেকে অবতরণের কাহিনীর তাৎপর্য দার্শনিক অর্থে বুঝতে হবে...। জয় বিজয়ের গল্পটি হচ্ছে —নারায়ণের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চার জন উলঙ্গ ঋষি—সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার—দেখা করতে গেছেন... নারায়ণের দ্বারী জয় বিজয়। উলঙ্গ ঋষিদের জয় বিজয় ঐশ্বর্যের অধিপতি নারায়ণের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয় নি—তখন তারা জয় বিজয়কে অভিশাপ দিয়ে বলেন —তোমাদের এই বৈকুণ্ঠ থেকে পতন হবে—ধরায় গিয়ে জন্মলাভ কর। জয় বিজয় খুবই বেদনাহত হলেন। নারায়ণ শুনে বললেন, ঋষিদের অভিশাপ মেনে নিতেই

হবে—পৃথিবীর মাটিতে তোমাদের যেতেই হবে—তবে যদি শক্তভাবে আমার ভজনা কর তাহলে তিনজন্মে, মিশ্রভাবে ভজনা করলে সাতজন্মে মুক্তি পেয়ে আবার বৈকুণ্ঠে আসতে পারবে।...বৈকুণ্ঠ মানে কুণ্ঠাহীনতা—কুণ্ঠার ওপারে চিরদিনের জন্য থাকা জীবিত মানুষের সম্ভব নয়—কুণ্ঠার রাজ্য ধরার মাটিতে যতই ছোট মনে কর ঘটনাচক্রে সেখানে নামতেই হবে—তাই মাটিকে ছোট মনে না করে মাটিতেই তাঁর আবাসস্থলে গড়ে তুলতে হবে—কুণ্ঠার ওপারে চিরন্তনভাবে বসে থাকা সম্ভবই নয়।...নারায়ণও ধরার মাটিতে অবতরণ করে হিরণ্যকশিপু রূপ নিলেন একবার।...হিরণ্যকশিপু মানে শক্তকে recognition —স্বীকৃতি—দিয়ে শক্তমানব।...কৃষ্ণ-অবতারে এসে নারায়ণ একেবারে মাটির বুকে মানুষের রূপে এসে দাঁড়ালেন।... বৈকুণ্ঠে গেলেও শতন হয় মানে idealy মানুষ দীর্ঘদিন টিকতে পারে না যদি সে বাস্তবের দেশে পা না রাখে।

প্রহ্লাদ প্রথম বিশ্বনাগরিক...। নর বাদ দিয়ে নারায়ণ despotism, নারায়ণ বাদ দিয়ে নরও despotism...; আজ নর নারায়ণকে একসঙ্গে বুকতে হবে, নিতে হবে। দুই একত্র হলে শান্তি।...জীবনে এগোলাম কিনা মানে জীবনে সামঞ্জস্য করতে পারলাম কি না...যতটুকু সামঞ্জস্য করতে পারলাম ততটুকুই এগোলাম...। বৈকুণ্ঠের আলো নিবে গেছে, সে আলো আজ মানুষের হাতে। বৈকুণ্ঠের ঠাকুর তো মাটিতেই এসেছেন...। অমিতাভের মত অনন্ত দুঃখকে আলিঙ্গন করতে হবে...সেই দুঃখের পথেই সামঞ্জস্য আসতে সুবিধা হয়...। অনন্ত পথ চলার নাম মুক্তি...। 'পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা। আনন্দে তাই এক হল তার পৌঁছানো আর চলা।'

মুক্তি যে চায় সে তো এখনও আমির ভাষায় কিছু চায়...। জীববাদী যে সে মুক্তিও চায় না...জীবনকেই চায়—মুক্ত জীবন-প্রবাহকে চায়...। এই জীববাদীর কাছে নূতন ভাষা আসে, ভাগবতী ভাষা আসবে—সে ভাষার মধ্যে নারায়ণের ভাষা নরের ভাষা মিশে যাবে।...নিত্যগোপালকে চিনতে হলে সম্পূর্ণ শরণাগতি প্রয়োজন...তাঁকে বুকতে হলে অতীতের জানা unlearn করতে হয়...সুখের বাঁধা নিশ্চিন্ত দুরাশায়...। সংসার থেকে পালাবার কথা তিনি বলেন নি, আবার সংসার নিয়ে ছড়াছড়ি করেও জীবন শেষ করতেও বলেন নি।...পড়, শোনো, অনন্তকাল বসে অগ্রসর হও।...এগিয়ে চল...জীবন বদলে যাবে...। বাইরে থেকে কি পাবে? তাও তো হলেছে (বিজন মুখোপাধ্যায় বলছেন)—ঐ যে এই কাজে আর অসুখ হও না এটাও একটা ফল পাওয়া!...ভুল হও...বাইবেলের সেই কাহিনীটি শোন—এক ভদ্রলোক প্রতিদিন রুটি বিতরণ করছেন—অনেক লোকই রুটি নিত—তারা হুড়োহুড়ি করত—কে আগে নেবে, বড় রুটিটা নেবে...। কিন্তু একটী ছেলে সকলের শেষে সকলের চেয়ে ছোট রুটিখানি নিয়ে প্রাণভরে খুশী হয়ে চলে যেতো।...একদিন তার রুটির মধ্যে একটী স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে সে ছুটতে ছুটতে সেই ভদ্রলোকের কাছে এল...তিনি বললেন—ঐ স্বর্ণমুদ্রা তোমার প্রাপ্য—সকলে হড়াহড়ি করে, তুমি তৃপ্ত, কৃতজ্ঞ ...অল্প পেয়েও তুই তাই।...একদিনের কৃপার জন্য অনন্ত কাল তৃপ্ত থাক...। একটা তৃপ্তি, একটা আত্মতুষ্টি ছাড়া কিছুতেই আনন্দ পাওয়া যেতে পারে না জীবনে।... জীবনে শান্তি সুখ বা প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়ার জন্য প্রাণপণ কর্ম কর, সৃষ্টি কর—সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্ত থাক।... আরও চাই আরও চাই—এটা কামের লক্ষণ। যতখানি তোমার সৃষ্টি করবার ক্ষমতা ততখানিই তুমি পেতে পার—যোগ্যতা বাড়িয়ে চল, বেশী পাবে—কিন্তু তৃপ্ত থাকবার অভ্যেস যদি না কর প্রথম থেকেই—তাহলে যতই পাও না কেন, সেই 'পরিমাণ' দিয়ে তৃপ্তি আসবে না। অল্পও তো অনন্ত—অল্পের পূর্ণতা বুকতে না পারলে আনন্দ পাওয়া যাবে না। আরো দাও আরো দাও—এই-ই মায়া...কেবলই চাওয়াটা কামুকতা।...যে কিছু চায় না তারই প্রয়োজন পূরণ করা যায়।...শিবের কাছেই কুবের ভিখারী...। দাবী করতে গেলেই দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ধনাকাঙ্ক্ষা, যশাকাঙ্ক্ষা, প্রতিষ্ঠা চাইতে গেলেই বিপদ—কাজ করে যাও, সৃষ্টি করে তোল—সেবা কর—ধন যশ প্রতিষ্ঠা হবে...। সৃষ্টি না করে যা চাইবে তা 'বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি' হবে...। রবীন্দ্রনাথের

রক্তকরবী—মকররাজ নারায়ণ, নন্দিনী ভক্তি···। ভক্তি নারায়ণকে মাটিতে টেনে আনবে...সর্দারের দল, অন্য বিষয়ের দল বাধা দেবে নারায়ণকে মাটিতে নামতে... তারা অবতরণকে বাধা দেয়—ইন্দ্র বাধা দিলেন, বরুণ বাধা দিলেন, ব্রহ্মা বাধা দিলেন।···মকররাজ মস্ত আড়াল দিয়ে বসে থাকেন কুণ্ঠার ওপারে—কিন্তু ভক্তি তাকে নামিয়ে আনবে...।···চেয়ো না, কিছু চেয়ো না—কাজ করে যাও—সবাইকে বলি—অন্য আশীর্বাদ নিয়ে তৃপ্ত থাক।···

৪. ৫. ৭৭। আমরা চেতন জীব—জড় বস্তু থেকে আমরা অনেক বিষয়ে পৃথক। জড় বাইরের আঘাতে সাড়া দেয় না, কিন্তু চেতন বাইরের সুখেদুঃখে সম্মানে অসম্মানে ক্ষুধাতৃষ্ণায় সাড়া দেয়। চেতনের আর একটা ধর্ম সে বংশবিস্তার করে। আরও একটা যোগ্যতা চেতনের সে ভেতর থেকে বড়হয়—জড় বাইরে থেকে বড় হয়। চেতন grows from within। সে evilকে resist করে না, সে evilকে পরিপাক করে।···ধাত্রী যেন সদা নিরস্ত কুহকম্···প্রথমানবপু হতে হবে···আমি নিজের ভেতর দিয়ে বড় হব—জীবনকে বাড়িয়ে তুলব···। যার সমস্যা যত জটিল, তার জীবনকে তত বাড়িয়ে তুলতে হয়···যার জীবনের ঘটনা যত প্যাঁচওয়ালা, তার জীবনে তত জোলস থাকা দরকার।...বাইরের ঘটনাকে মেনে দিয়ে শান্ত নেই; তার উপর আর খানিকটা নির্ভর করে। জটিল জীবনে সমস্ত স্তর যখন তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে তখন শরণাগতির ভিতর দিয়ে সৃষ্টি করে—প্রথমানবপু হয়ে—নিজের অন্তরের জ্যোতি দিয়ে কুহক দূর করবার পথে চলতে হবে।···শিশু বার্লী হজম করতে পারে, পোলাও মাংস পারে না—হজমশক্তি কার কি রকম বুঝে চলতে হবে।···কলিযুগে সকল দিকের সত্তা আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে বলে কলিযুগে খুব জটিলতা—সকল মানুষের জীবনেই জটিলতা আছে কমবেশী—তাই কলিযুগে শরণাগতির এত প্রয়োজন···। জাগো, এ সংসার অতি ভীষণ স্থান তার মানে এই নয় যে এ সংসার থেকে পালাতে হবে। কেন না সাধক পালাতে জানে না—তাকে অন্তরের জ্যোতি দিয়ে আর সৃষ্টি করার ক্ষমতা দিয়ে সব কিছু পরিপাক করতে হবে।...অন্নবস্ত্র স্ত্রীপুত্রকন্যা পরিপাক করতে হবে···যার জীবনের intensive ও extensive দিক যত বিস্তৃত ও গভীর, সে-ই পরিপাক করতে পারে···। বাইরে তো এমনি আসে না—আমার মধ্যে তার আসার একটা কারণ সৃষ্টি হয়ে আছে তাই সে আসতে পারে।... ঝড় হয় নীচের বায়ু vapour হয়ে উপরে উঠে যায় বলে। প্রকৃতি, ঘটনা স্বাধীন—তুমিও স্বাধীন—স্বাধীন তোমাকে স্বাধীন প্রকৃতি, ঘটনার সঙ্গে যুঝতে হবে।...তুমি আবেষ্টনকে বদলাও, আবেষ্টনও তোমাকে বদলাবে।... যখন আবেষ্টন too hard, তখন অন্তর্মুখীন গতিতে এসে পুরুষোত্তম-জীবন যাপন করতে হয়।···মানুষ ২।৩টি ক্ষেত্রে হতাশ হলেই যাবড়ে যায়—কিন্তু, সকলের কপালে অবশ্য জোটে না, মানুষের জীবনে অনন্ত সম্ভাবনা অনন্ত পথ···সেই অনন্ত পথের কোনোটা ধরে জীবনে বেরিয়ে যেতেই হবে।···তাত্ত্বাবাজী করে জবাব হবে না, বাকা দিয়েও জবাব হয় না—বাগ্‌বিস্তরং বিকারঃ—জবাব দিতে হবে জীবন দিয়ে...। কথা কম কইতে হয়—যত জটিল ঘটনা—তত কথা কম···। কিন্তু জীবন ভেতরে না বাড়লে কথা কম কইতে পারবে না···অন্তর্নিষ্ঠা রাখ, বাইরে লোক-ব্যবহার···। যে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা হারিয়ে ফেলেছ সেখানে হড়াহড়ি করে দিন কয় করে লাভ নেই; নূতন যে ক্ষেত্র পেয়েছ তাকে ধরে রেখে অন্তরের পুরুষোত্তম সত্তা চৈতন্য আনন্দ বাড়িয়ে তোল···, পরিপাক করবার ক্ষমতা লাভ কর···। 'To be fit is to be Yogi'···। বস্তুকে পরিপাক করা মানে বস্তুকে আত্মস্থ করে তারদ্বারা রস রক্ত বীর্য লাভ করা।···ভুক্ত অন্ন যখন পরিপাক হয় না তখন তা কষ্ট দিয়ে বেরিয়ে যায় —দেহমন অসুস্থ করে—পরিপাক হলে তা দেহে রক্তবীর্য দান করে। মনের অন্ন যদি পরিপাক হয় তাহলে তা জীবনকে আনন্দিত করবে, বীর্য দেবে···জীবনকে বাড়িয়ে তুলবে।···

ভারতের বুদ্ধ

॥ শ্রীসুনীতি সান্যাল ॥

ভগবান বুদ্ধ ভারতের মাটীতে রাত্রার দুলাল হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন বৈশাখী পূর্ণিমায়। আমরা তাঁকে শুরুতেই আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি—"কেশব-ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে"। রাত্রার দুলাল আজ বিশ্বে অনেকের কাছে জগদীশ কেশব রূপে পূজ্য। আমরা ভারতবাসীরা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে কোন কিছু না দেখে না বুঝে খানিকটা ধর্মান্ধতায় সব কিছু যেন মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে আছি। কেশব কেন বুদ্ধ শরীর ধারণ করলেন? যে ভারতবর্ষ ভগবান শঙ্করাচার্য্যের 'এক-মেবাদ্বিতীয়ম্'-মতবাদে আচ্ছন্ন হয়ে জগৎকে মায়া মরীচিকা অতত্ত্ব বলে জগতের ওপারে কূটস্থ ব্রহ্মকে লাভ করবার আশায় জাগতিক সত্তাকেই অস্বীকার করে মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার গলায় টিপে চিত্তবৃত্তি নিরোধের ব্যবস্থার বিধান স্থাপন করেছিল, সেই ভারতবর্ষে এলেন প্রতিমূর্ত্তি জগদীশ বুদ্ধ। শঙ্করও এলেন—বুদ্ধও এলেন। শঙ্কর দিলেন ঈশ্বরের মহিমা—বুদ্ধ দিলেন জগতের মহিমা। ভারতের দর্শনের ক্ষেত্রে শঙ্কর-মতবাদ ও বুদ্ধ-মতবাদ এমনি বিপরীত যে কোন দিনও যে এই দুই মতবাদ হাত ধরাধরি করে মিলিত হবে সে সম্ভাবনা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমরা আর একখানি মূরতি দেখতে পাই যাঁর মধ্যে বুদ্ধ-শঙ্কর মিলিত হয়ে এক অপূর্ব্ব রূপ—এক অপূর্ব্ব মতবাদ তিনি দিয়ে গেলেন। তিনি হলেন জড়-অজড় সমন্বয়াচার্য্য ভগবান শ্রীনিত্যগোপাল যাঁর দর্শনে দেখতে পাই কেমন করে বুদ্ধের বাস্তববাদ আর শঙ্করের ব্রহ্মবাদ মিলে পূর্ণাঙ্গ পুরুষোত্তমবাদে, প্রাণবাদে পরিণত হয়ে বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের বাস্তবতা সূচিত করেছে। যেদিন থেকে ঈশ্বর-জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান বলে মানুষের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে ছিল—সেদিন থেকেই বাস্তব জীবনে কোন কিছুর সৃষ্টি-ক্ষমতা মানুষ লাভ করার প্রয়াসী হল না—ধর্ম্ম তখন ভূতের বেগার খাটায় পরিণত হয়ে জগৎ-পাঠশালায় কোনক্রমে জীবন ধারণ করে ব্রহ্মের ধ্যানে মশগুল হওয়াই পরমার্থ ও কাম্য হয়ে দাঁড়াল। প্রাণের সমস্ত জাগতিক আকাঙ্ক্ষাই নিন্দিত হল। তাই যে কেশব শঙ্করূপে ঈশ্বরের মহিমা, স্থিতির মহিমা প্রচার করে গেলেন, কালের ক্রম বিবর্ত্তনের ধারা বেয়ে মানুষের মহিমা প্রচার করতে সেই কেশবই এলেন ভগবান বুদ্ধ হয়ে—কিন্তু তাতেও দেখা গেল বিশ্বের কোন একদিক বুদ্ধের একান্ত গতিবাদকেই গ্রহণ করল—অন্য কোন দিক যেমন ভারতবর্ষ ভগবান বুদ্ধের গতির ধাক্কায় তার স্থাণুধর্ম্মী অবস্থা থেকে খানিকটা মুক্তির শ্বাস পেল বটে কিন্তু তাতেও সুস্থতা আনতে পারল না। বর্ণাশ্রমীর কঠোর নিষ্পেষণে কত মানুষের শোষিতপ্রাণ দয়াবতার বুদ্ধের পাদস্পর্শে শীতল হল সার্থক হল। মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে লাগল মানুষের মহিমা। প্রহরী বেষ্টিত রাজপ্রাসাদে গৌতমের কানে পৌঁছাল মানুষের কান্না, তিনি সুখশয্যা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন দুঃখী, বেদনাতুর জন সাধারণের কাছে। যে ভারতের কথা ছিল "ধ্যান করবি মনে, বনে, কোণে" সেই ভারতে বুদ্ধ প্রচার করলেন "সংঘং শরণং গচ্ছামি"—তিনি সংঘকে নমস্কার জানালেন, সংঘ-শক্তিকে নমস্কার জানালেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি রইলেন নীরব। মানুষ তথা সমগ্র জীবের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল চিন্তাই ভগবান বুদ্ধের ধ্যানের বস্তু হল।

মানুষ যে একমাত্র ঈশ্বরের হাতের পুতুলই নয়—তারও যে নিজস্ব মূল্য আছে, একমাত্র ঈশ্বরের কল্পনাতেই যে মানুষ ষোলআনা পরিপূর্ণ হয় না—এটা ভাবতে ভারতবর্ষ একদিন ভুলে গিয়েছিল। অবশ্য কয়েক হাজার বছর আগেই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর ও মানুষের যুগ্ম দায়িত্ব ও কর্ম্মের উৎস প্রচার করে বলেছিলেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানংনাত্মনমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। ৬।

"নিজেকে দিয়েই নিজেকে উদ্ধার করবে, আত্মাকে কখনও অবসন্ন করবে না—নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু।" এইভাবে প্রতিটী ব্যক্তি-জীবনেরই জয় গান করে নিজের পৌরুষকে দিয়েই নিজের জীবন গঠন করবার দায়িত্ব শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী কলেবর ভগবান বুদ্ধ প্রচার করে মানুষের সম্বিৎ ফিরিয়ে দিলেন। বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষ ও সম্প্রদায় সংঘ-বুদ্ধির খোঁজ পেয়ে দেশকে, জাতিকে বাঁচাবার বুদ্ধি পেল। ধীরে ধীরে গণ-তান্ত্রিক বুদ্ধি মানুষের মধ্যে জাগ্রত হতে লাগল। ভগবান বুদ্ধ এই গণতন্ত্রের দেবতা। আজকে ভারতের জাতীয় পতাকায় অশোক চক্র স্থান পেয়েছে। যে ভারতবর্ষ একদিন জগৎ মিথ্যা বলে বুদ্ধকে পাষণ্ড নাস্তিক বলতে দ্বিধা করে নি আজ সেই ভারতবর্ষের মানুষ উপনিষদের চরৈবেতি মন্ত্রের প্রতিরূপ, "আত্মৈব আত্মনা বন্ধু" মন্ত্রের প্রতিরূপ বুদ্ধকে উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হল।

কিন্তু এতেও কি আমরা যতখানি মানুষ হওয়া মানুষ জাতির কর্ত্তব্য তা এখন ও হতে পেরেছি? যতই বাস্তব জগতের রুদ্র চাপে, এবং বুদ্ধবাদ দ্বারাও খানিকটা, বুঝতে পেরেছি কর্মের দ্বারা নিজেকে বড় করতে না পারলে, সৃষ্টি করতে না পারলে কোন্ ঈশ্বরের সাধ্য নাই যে আমার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ করেন—তথাপি কর্মের সেই হেয়ত্ব বুদ্ধির মোহ, কর্ম-কৌলীন্যের মোহ আমাদের ধমনীর শিরায় শিরায় এখনও প্রবাহিত হয়ে চলেছে তাই কর্মে ফাঁকি দিতে আমাদের এতটুকুও প্রাণ শিহরিত হয় না—যে কোন কর্ম অবলম্বন করে জীবন বাঁচাতে আমাদের ভদ্র লোকেদের অবমাননা বোধ করি। তার চেয়ে মৃত্যু বরণও শ্রেষ্ঠ মনে করি। "কর্ম্মৈব তস্যেশ্বরঃ" ভাগবতের এই নির্দ্দেশ কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করাই নি, যার ফলে কর্ম্মী ইংরেজ ভারতের বুকে সাত সমুদ্র তের নদী পারি দিয়ে এসে ভারতের সম্পদ, শোষণ করে নিয়ে গেল। আমরা তখন মনে মনে কোণে বসে ধ্যানে মগ্ন। তারা শুধু সম্পদই নিল না ভারতের ভারতবর্ষত্বটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট করে দিয়ে গেল। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে কত মহাজন এলেন—ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, নিত্যগোপাল, বিবেকানন্দ—তাঁদেরও ক্ষেত্রে মোরা ব্যর্থ নমস্কারে। এই ভাবে শঙ্করের ব্রহ্মজ্ঞান আর বুদ্ধের জগৎজ্ঞান ভারতের মাটীতে প্রচারিত হয়েও ভারতকে সুস্থ, স্বস্থ করতে পারল না—এলেন শ্রীনিত্যগোপাল শঙ্কর-বুদ্ধের হাত ধরাধরি করিয়ে, সমগ্র জীবনের সকল সত্তায় শঙ্কর ও বুদ্ধ যে সমান প্রয়োজনীয়—শঙ্কর ছাড়াও জীবন সুন্দর হবে না—বুদ্ধ ছাড়াও জীবন সুন্দর হবে না—এই তথ্য ও জীবন মানুষের কাছে রেখে গেলেন। যারা গ্রহণ করতে পারলেন নিজেরা ধন্য হলেন—কিন্তু সমাজের বুকে ব্যাপক প্রচারিত না হওয়ার দরুণ দিকে দিকে অসুস্থতা মাথা চাড়া দিয়ে বীভৎসতার সৃষ্টি করে যাচ্ছে। ইংরেজ ভারত ছাড়ল বটে—কিন্তু মানুষকে সর্ব্বহারা করে দিয়ে গেল—তার ঘরও রইল না বাহির ও নাই-ই। এই সর্ব্বহারাত্ব দূর করবার জন্য মার্ক্সের জড়বাদকে ভারত স্বাগত জানাল। এই জড় বাদকে স্বীকার করার ফলে ভোগ্য বস্তু তার মর্য্যাদা পেয়ে কিছুটা আত্মতৃপ্তি লাভ করল বটে—কিন্তু বুদ্ধশঙ্কর মিশ্রিত উপাদানে গঠিত ভারতের মানুষ যেন তাতেও স্বস্তি পেল না। এতেও হল না—এ-ও সমাধান নয়, বুঝতে পারল শান্তি যেন ভোগেও নেই এই চিন্তায় মানুষ আরও বিকৃত হয়ে উঠল যার ছবি আমরা বিগত কয়েক বছরেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাহলে কোন্ পথে চললে, কোন্ ছন্দে চললে শঙ্করের স্থিতিবাদ ও বুদ্ধের গতিবাদ আমাদের জীবনের শ্রেয় ও প্রেয় লাভে সহায়ক হবে—তারই বিশ্লেষণ আমরা দেখতে পাব জড়াজড় সমন্বয়াচার্য্য শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল চরণাশ্রিত ভাস্করার শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের অজস্র লেখনীতে। বুদ্ধ-শঙ্করের সমন্বয়ে বিশ্ব একবিশ্বে গড়ে উঠবে। ধরার মানুষ ব্রহ্ম-মানুষ হবে এই হল শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের নিশ্চিত আশার কথা।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে শ্রীনিত্যগোপাল লিখছেন "অনেক জীব নাস্তিক হয়। তাহারা অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী হয়। সেই জন্য জীবের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারে নিজে নাস্তিক হইয়া, নাস্তিকতার মধ্য দিয়া

সর্ব্ব জীবে দয়া করিবার পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নাস্তিকতার মধ্যে অবস্থান করিয়াও কি প্রকারে পরম বৈরাগী হইতে হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নাস্তিক হইয়াও কি প্রকারে হিংসা বিবর্জ্জিত হইতে হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নাস্তিক হইয়াও কি প্রকারে সর্ব্ব সদ্‌গুণ বিমণ্ডিত হইতে হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নাস্তিকদিগের প্রতিও কৃপা পরতন্ত্র হইয়া নাস্তিকতার মধ্য দিয়া কি প্রকারে নির্ব্বাণ প্রাপ্তির উপায় হইতে পারে তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যে নাস্তিক বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন সকল অনুসরণ পূর্ব্বক নাস্তিক হইয়াছেন আমরা তাঁহারও প্রশংসা করিয়া থাকি। যেহেতু তাঁহারা নাস্তিকতার মধ্য দিয়াও আদর্শ ধার্ম্মিকের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দয়াময় বুদ্ধদেব নাস্তিকতার মধ্য দিয়াও জীবকে ধর্ম্মের উচ্চতম অনুষ্ঠান সকল করিবার রীতি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন"।

সমাধানের পথ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

"শ্রমবর্জিত বুদ্ধি যেমন ভাবুকতা, বুদ্ধিবর্জিত শ্রমও তেমনি ভাবুকতা। অথচ ভাবুকতার বিরুদ্ধেই ছিল জড়-বাদের অভিযান। ভাবুকতাকে একান্ত ভাবে অস্বীকার করিতে গিয়া কমিউনিজমও ভাবুকতা ছাড়া আর কিছুই হইবে না। বিশেষত্বহীন নির্বিশেষ কমুনিজম ভাবুকেরই মতবাদ। কোনও ভাবুকই বহুকে 'বহু রাখিয়া অদ্বৈত-সমাজ' গড়িবার কুশল পাত্র অবগত নন। সমাজ গঠনের মূল দার্শনিক ভিত্তিতে যাহাদের রহিয়াছে পরস্পর স্পর্দ্ধিত, তাহারা কার্যক্ষেত্রে শ্রেণী-সংঘর্ষ আনিয়া ফেলিবে, ইহাতে আর বলিবার কি আছে? দর্শন-শাস্ত্রের এই শোচনীয় দৈন্য পরাজয় ও ব্যর্থতা হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্তিত ভারতীয় পথ-দর্শন। শ্রীকৃষ্ণ দুই-কে স্বয়ং মর্যাদাসম্পন্ন দুই রাখিয়াই দুইয়ের অদ্বৈত সমাজ (Commune) রচনা করিয়াছেন, সবিশেষ ও নির্বিশেষের অবিচ্ছেদ্য হৃদয় সংযোগ স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই পরমতত্ত্ব ও অহিংসা, শ্রীনিত্যদেবের প্রকৃত অদ্বৈতবাদ।

এই প্রকৃত অদ্বৈতবাদে বুদ্ধিমান শ্রমিক হইবে, শ্রমিক বুদ্ধিমান হইবে—শ্রম ও বুদ্ধি কেহই কাহাকে শোষণ করিবে না। পরস্পর যখন পরস্পরের শ্ব ও ধাম অর্থাৎ জ্যোতি ও স্থান, তখনই কুহকের নিরসন সম্ভবপর, তখনই বিশ্বের সত্যিকার স্বধামপ্রাপ্তি বা স্বরাজপ্রাপ্তি। বুদ্ধির শাণিত ছুরিকাঘাতে অখণ্ড সমাজকে প্রথমেই শ্রমিক ধনিক এই দুই দলে বিভক্ত না করিয়া, ইহাদের কোনও এক জনের উপর সমগ্রের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার সমর্পণ না করে পরস্পরের রক্তারক্তির ভিতর দিয়া অগ্রসর না হইয়া কোন্ চিন্তাপ্রণালীর আশ্রয়ে সমগ্র সমাজের সমগ্রতাকে বজায় রাখিয়াই তাহাকে বিপ্লবী করিয়া তোলা যায়, পরস্পর পরিপূরক ভাবে থাকিয়াই সর্বতন্ত্র অগ্রগমন করা যায়, এই সত্য কৌশল ও অহিংস কৌশল দিবার প্রচেষ্টাই মহাত্মাজীর 'কর্মশক্তি'-র ভিতর রহিয়াছে। একটি অখণ্ড রসাল ফল বহুধা খণ্ডিত হইলে তাহার 'রস' বাহির হইয়া যায় তখন শত চেষ্টাতেও যেমন আর তাহাকে জোড়া দেওয়া চলে না, জীবন্ত অখণ্ড অবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায় না, তেমনি একবার সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে জাতি খণ্ডিত হইলে সেই খণ্ডিত অবস্থা হইতে তাহাকে পুনরায় জীবন্ত এক অখণ্ড অবস্থায় ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর নয়। যে অখণ্ডের মধ্যে সব খণ্ডগুলি জীবন্ত, সেই অখণ্ডের দিকে প্রগতিযুগের যাত্রারম্ভ। "We must pass from the whole to the whole"—Bradley···অখণ্ডকে টুকরা টুকরা করিয়া খণ্ডিত ধনিক বা শ্রমিক তাহাকেও কেন্দ্র করিয়া আমরা সমাজ গড়িব না। সমাজ গড়িব অখণ্ডকে অখণ্ড হিসাবে বাঁচাইয়া সেই অখণ্ডকে কেন্দ্র করিয়াই। অখণ্ডের জীবন্ত এক, মৃত খণ্ডসমূহের 'একজোট' কখনও জীবন্ত ঐক্য প্রদান করিতে পারিবে না। আরম্ভই করিতে হইবে নবীন অখণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সমগ্র হইতে।"

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৮·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৩·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
বাংলার ঋষি	৩·৫০
বাংলার বিদুষী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৫০
জীবন গড়া	·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	২·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা-১২

সূচীপত্র বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৯, ১৯৭২

১। জাগনে বুদ্ধ ও জগদ্গে শঙ্করাচার্য্য
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

আজকের আমি (কবিতা) ৬৩
শ্রীশান্তশীল দাশ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫৪) ৬৪

৪। সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার রূপ (কবিতা) ৭৩
শ্রীঅমিয়মোহন বসু

৫। মাধ্যমিক শিক্ষা ৭৪
মানবদরদী স্বদেশরঞ্জন

৬। ঈশার চোখে জল (কবিতা) ৭৯
শংখচিল

৭। প্রার্থনাকালীন ভাষণ ৮৩
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত

৮। ভারতের বুদ্ধ ৮৬
শ্রীসুনীতি সান্যাল

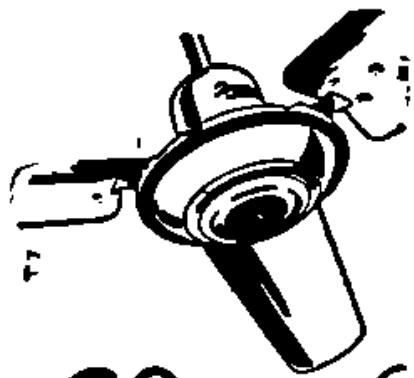

ট্রপিক্যাল

ডি লুক্স

ম্যানুফ্যাকচারার্স

ভারত ইলেকট্রিক্যাল

ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

এজেন্ট:

দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোং লিঃ

কলিকাতা ● বোম্বাই ● দিল্লী ● জামসেদপুর মাদ্রাজ

বাটার সর্বাধুনিক ওয়েদারপ্রুফ জুতো

Bata

দুঃখের ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দৈহহীন আত্মা যেমন অর্থহীন, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। ছুটকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে। 'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest blemish of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—মানুষ কি করে ঈশ্বরী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ হওয়ার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)

ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও ধর্মনে
১০। অবতারের পূর্ণরূপ
১১। গীতাতত্ত্বরত্নী
১২। উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)
১৩। রাষ্ট্রাধীন গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে
১৪। শ্রীপুরুষোত্তম-দৃষ্টি চরিতে আলোচনা
(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
১৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পাণ্ডুলিপি

শ্রীপ্রতিভা রায়ের

শ্রী তির গল্পকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিতাগোপাল
ও শিক্ষা সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়ঋষি শ্রীনিতাগোপাল
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
৩। শরৎচন্দ্রের দেশপ্রেম
৪। রবীন্দ্র-হৃদয়
৫। প্রাথমিক শিক্ষা

18 JUL 1972

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (তার—দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীবিত্যাগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহামঠ"

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৯, ১৯৭২

সম্পাদিকা—রেণু মিত্র

পঞ্চবিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

"সর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ৭০ বৎসর পূর্বে যে দর্শন বাঙ্গালীর কাছে রাখিয়া গিয়াছেন, আজ তাহাই সর্বক্ষেত্রে—রাজনীতিতে অর্থনীতিতে সমাজনীতিতে—স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। তিনি লিখিতেছেন, 'আমি অভেদবাদীও বটে, প্রভেদবাদীও বটে', 'আমাদের বিবেচনায় শ্রীভগবান এক ও বহুর অতীতও বটেন', 'সমস্ত আর্যশাস্ত্র আলোচনা করিলে এক ও বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে'।

প্রত্যেক ধর্মই সকলের ধর্ম, প্রত্যেক দর্শনই সকলের দর্শন, প্রত্যেক ইষ্টই সকলের ইষ্ট, প্রত্যেক পথই সকলের পথ। প্রত্যেক মানুষ যখন প্রত্যেক ধর্মকে, প্রত্যেক দর্শনকে, প্রত্যেক ইষ্টকে প্রত্যেক পথকে নিজেরই বলিয়া আস্বাদন করিতে যত্নবান হইবে তখনই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যকার মিলন সম্ভব। অন্যথা তোমার পথ তোমার, আমার পথ আমার—এ অবস্থায় মিলন একান্তই বাহিরের জিনিষ হইয়া পড়ে। সমন্বয় বলিতে অতখানিই বুঝায়। জীবনকে অতখানি গভীর ও ব্যাপক করিয়া দেখিলেই অধ্যাত্ম জগতে ও বাস্তব জীবনে একই নীতি অনুসরণের ফলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি মানুষকে একই সঙ্গে এতখানি গভীরতা ও ব্যাপকতা দান করিতে পারে না। একমাত্র প্রাণের উদার ঔদার্যের মধ্যেই মানুষ এতখানি বড় হইতে পারে। এই পৃথিবীতে এক সময় মানুষ প্রাণ-সাধক ছিল, কিন্তু সভ্যতার মধ্য দিয়া ক্রমে সে একান্ত বুদ্ধিমান হইয়া উঠে, তাই ডিপ্লোমেসি আজ আর শুধু রাজনীতিতে নাই—পিতা-পুত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে পরিবারে পরিবারে ঘরে বাইরে সর্বত্র। এই ডিপ্লোমেসির স্থলে বুদ্ধিকে পরিপাক করিয়া যে প্রাণ-ধর্ম উপনিষদে কীর্তিত হইয়াছে, সেই প্রাণ-ধর্মকে আজ আবার সভ্যতার মধ্যে আনিতে হইবে। ইহাই শ্রীনিত্যগোপালের জীবন-দর্শন।"

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ, পৌষ ১৩৬১

কর্মে ব্যস্ত পুরুষদের অতি উপযুক্ত বাটা স্টেপমাস্টার

একেবারে নতুন স্টাইলে, বাটা স্টেপমাস্টার
জুতোর সম্মুখভাগ প্রসারিত।
আঙুলের আড়ষ্টতা কাটবে এই প্রসারে
প্রথম দিন থেকেই প'রে পায়ের স্বাধীনতা
আর স্বাচ্ছন্দ্য।
কালো আর গাঢ় বাদামি,
দু রঙেই আছে।
আপনি যখন কাজে ব্যস্ত
আপনার পায়ের পরিচর্যায় থাকে
বাটা স্টেপমাস্টার।

স্টেপমাস্টার ১৪
সাইজ ৬-১০
৩৩.১৪

Bata

নতুন আশার একটি নাম

পালি

পালি একটি গ্রামের নাম। গ্রামটি হলো বিহারের রাঁচি জেলার রাতু ব্লকে। দেশের অধিকাংশ গ্রামের মতই পালিতেও যুগ যুগ ধরে জীবনযাত্রা মন্থর গতিতে চলছে। চাষীরা জমি থেকে বছরে মাত্র একটি ফসল পেয়ে আসছেন। আর, মূলধন নেই বলে গ্রামের কারিগরদের চিরকাল অভাবের সংসার।

সম্প্রতি ইউবিআই রাতু ব্লকের পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম উন্নয়নের জন্যে বেছে নিয়েছে। পালিও তাদের মধ্যে আছে। ইউবিআই-এর সাহায্যে চাষীরা জমিতে দুটি ফসলের চাষ করে উৎসাহজনক ফল পেয়েছেন। এখন পালিতে একটা বড় কুয়ো খোঁড়া হচ্ছে। সেচের জলে বছরে দু'তিনটি ফসল ফলানো সম্ভব হবে। আয় বাড়ানোর জন্যে খুব ছোট চাষী ইউবিআই-এর সাহায্যে হাঁসমুরগি পালন করছেন। তাছাড়া ইউবিআই গ্রামের ঘুচরো দোকানদার, দরজি এবং লোহার জিনিসপত্র, ঝুড়ি ও গয়না তৈরীর কারিগরদেরও আর্থিক সাহায্য করছে।

ইউবিআই-এর বহু প্রকল্পের মধ্যে পালি হলো একটি উদাহরণ মাত্র। জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে গ্রামোন্নয়ন ইউবিআই-এর কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBI/UB-271

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৮·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৩·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
বাংলার ঋষি	৩·৫০
বাংলার বিদুষী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৫০
জীবন গড়া	·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

॥ সুলেখা মানেই উৎকর্ষ • উৎকর্ষ মানেই সুলেখা ॥

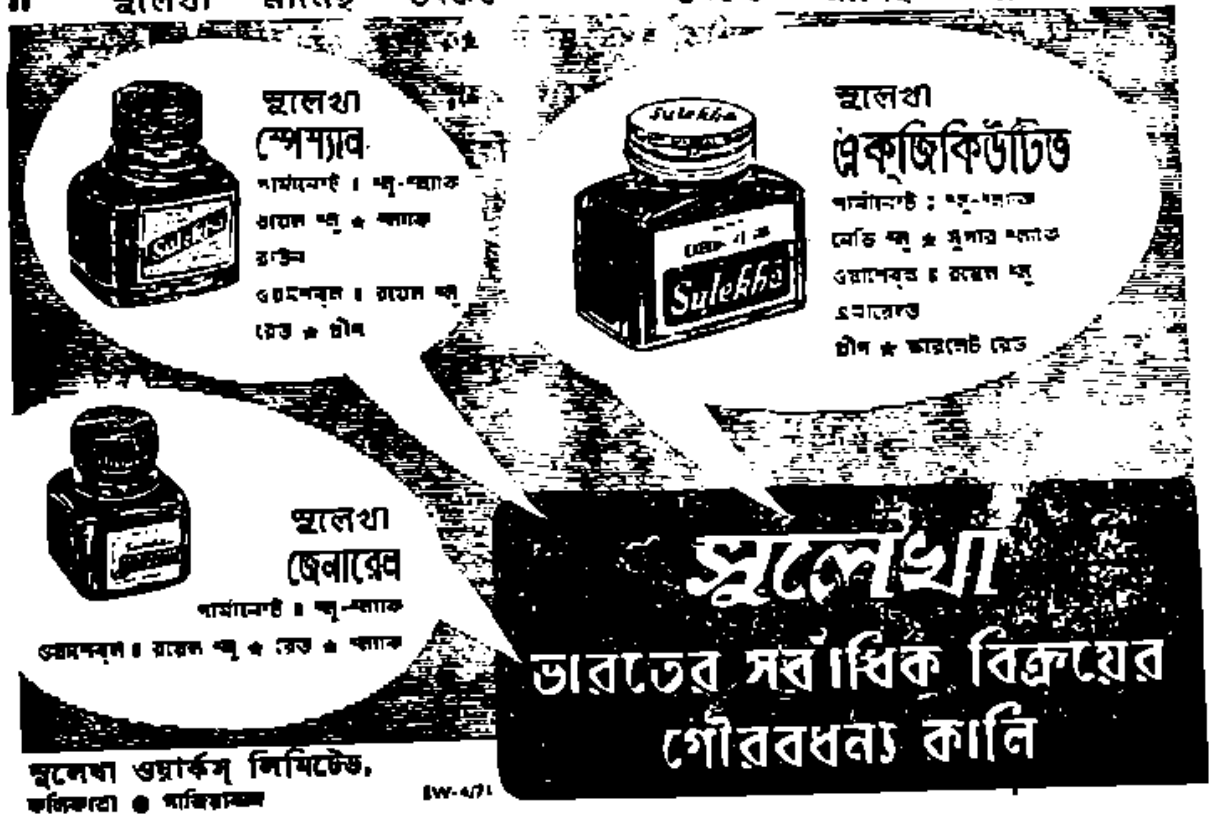

" 'অনির্বচনীয়তা'-বাদ যুক্তিক্ষেত্রে হোঁচট খাইবার মত বেশ একটা শক্ত প্রকাণ্ড স্তম্ভ-বিশেষ বটে। 'মায়া অনাদি, অনির্বচনীয়'—যুক্তির দফারফা। ব্রহ্মে মায়া আসিল কবে, কোথা হইতে? জীবই বা কবে মায়াগ্রস্ত হইল, কি করিয়া? প্রত্যক্ষ জগৎ দিতেছে 'বাধা', সেই বাধাকে হজম করিতে না-পারার ফলে বাধা-দানকারী বস্তু-গুলি প্রতিভাত হইতেছে হেয়রূপে। একদল দোষ দিল বাহিরের বস্তুকে, আর একদল বলিল, 'না, হজম শক্তিই কমিয়া গিয়াছে'।...দুই-ই অর্দ্ধ সত্য।...অন্ন কি স্বরূপতঃ বিষ? অন্নের বিষত্ব আপেক্ষিক...।...রোগ থাকিবে অন্তরে বাহিরে দুই জায়গায়, কিম্বা কোনও এক জায়গায়ই নয়।...দুই দিক দিয়াই রোগ নির্ণয় দরকার। দুইয়েরই অতীত অথচ দুই-ই একাধারে এমন যে জীবনীশক্তি যাহা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের 'পরাশক্তি', তাহাই প্রজ্ঞা ও প্রাণের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। অনন্তপ্রসারিত জীবনের মধ্যে এমন কিছু সামঞ্জস্যের নিশ্চয়ই অভাব হইয়াছে, যাহার ফলে হজমশক্তি কমিল, অন্ন বাধা দিল। একটী সুস্থ জীবনকে ধরিতে না পারিলে কিছুতেই সাংখ্যমত ও বিবর্ত্তবাদের ব্যাখ্যার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।"

—অবধূতভাষ্য-ব্রহ্মসূত্র ১ম খণ্ড—পৃঃ ২৩

ঊর্দ্ধলতারত

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭২ পঞ্চবিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

শ্রীশ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

৮২

বাইরের নিন্দা প্রশংসা ভুলতে হবে...বৃন্দাবন যেতে হবে আমাকে, মোগলসরাইতে মাথা কাটাকাটি করব? সব সময় কি জবাব দিলেই জবাব হয়? সংসারে ছাড়াছাড়ি বা জড়াজড়ি কোনটা করলেই হবে না।...গোপালকাঁটার জবাব শিখতে হবে—বোবা হয়ে, শক্তিমান হয়ে কাজ দিয়ে জবাব —মুখের ভাষা দিয়ে জবাব হয় না—কথায় কথা বাড়ে আজ বিপদে পড়েছি আজ জবাব না দিয়ে অন্তরের শক্তিকে বাড়িয়ে তুলব, সেই শক্তিতে পথ কেটে বেরিয়ে আবেষ্টনকে সৃষ্টি করে তুলব...এই পথে না চললে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব তাদের কল্পনার বিষয়...কুহকের পিছনেও ছুটবে না, ছাড়াতেও চাইবে না...কুহক নিয়ে ছড়াছড়ি না করে নিজের বৃহত্তর মহত্তর আদর্শকে রূপ দেবার পথে এগিয়ে চল—কুহক খসে পড়বে...। নর-নারায়ণ আশ্রম এই সাধনাই করে...। নিজের জীবনে কত ঘটনা—কথা দিয়ে জবাব না দিয়ে জীবন দিয়ে জবাব দেবার।...ভায়ের বাড়ীতে দিদিকে প্রণাম করতে গেছি—অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করেছিল সে-আমার মাথা খারাপ...দীর্ঘদিন আর যাই নি—তারপর রাজনীতি ক্ষেত্রে যখন অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা—মানুষের কাছের সেই সম্মানজনক অবস্থায় তার বাড়ী ঢুকব এই ছিল আমার কথা—আমার মাথা খারাপ কি না বাইরের ক্ষেত্রে এটা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল তখন তার বাড়ীতে ঢুকেছি। ...জীবনে এমনি কত অত্যাচার সয়েছি...ভক্তের কি মুখাপেক্ষা করতে হয়?...উপবাস করে মরব তবু দিয়ে যারা কথা শোনায় তাদেরটা নেব না...এ না হলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না...। অহংকার গেলেই ছাড়া রাখা কোনটাতেই অসুবিধা হয় না...অহংকারটা গোবিন্দে দিতে হবে।...কৃষ্ণ শিব রাম তাঁদের আবেষ্টনকে পরিপাক করেছেন—আমাকেও আবেষ্টন পরিপাক করতে হবে...for a satyagrahi it is never too late...। মানুষ আমার এখানে আসে না—কেন আসবে? আমার যোগ্যতা নেই, কেন আসবে? যদি চাঁদের হাট বসাতে পারি তাহলে আসবে। আসে না বলে রাগ করি না—কি ভাবে মানুষকে আনতে পারি, নিত্যগোপালের কথা শোনাতে পারি তাই ভাবি ...নিত্যগোপাল আমার প্রাণ, আমার আনন্দ—সেই আনন্দ নিয়ে যদি ঠেলে উঠতে পারি আসবে...। মানুষ আমার নিন্দে করলে শতবার ভাবি এ দোষ আমার আছে কি না—কেন যারা নিরন্ত কুহকম্—নিজের জ্যোতি দিয়েই কুহক নিরস্ত করতে হবে।...

৬, ৩, ৪৭—ভারতবর্ষের কর্ম করার পদ্ধতি ও পাশ্চাত্যের কর্ম করার পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা।...বিবেকানন্দ বলছেন, Work is very good no doubt but do you know, young men, what work is? Fill thy brain with high thoughts and work will come out of itself. Little manifestations of energy which have originated in thought and are escaping through muscles are called work.—উচ্চ চিন্তা দিয়ে যখন মগজ ভর্তি হয়ে গেছে, তখন উপচে পড়ছে যে energy সেই প্রকাশের নাম work উচ্চ চিন্তা দিয়ে যখন মগজ ভর্তি হয়, হৃদয় ভর্তি হয়, তখন কর্ম সহজ—প্রেমের ঘনীভূত রূপ যে কর্ম সেই কর্ম সহজ—ভাল না বাসলে কর্ম হয় না।...চরকা যখন কাটতাম, তখন বলতাম উপলক্ষ যেমু রাখা, উদ্দেশ্য লক্ষ্য রাখা—মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, একাত্ম হতে হবে—তা করতে গেলে একটা দরকার—সেই উপলক্ষে মানুষের সাথে মিলতে পারি।... এ পথে আঘাত আসবে...কিন্তু মান অভিমান থাকবে

না···তোমার সাথে না মিললেই কাজ ফেলে চলে যাবে—এ কিছুতে হতে পারবে না—কর্মীর কাজ বন্ধ করা চলবে না।.. কর্মীর মত এত আঘাত সহ্য করতে আর কারো হয় না···। কে কতখানি আদর্শবাদী তার পরীক্ষা হবে কে কতখানি বাস্তবের সংঘর্ষের মধ্যে মেজাজ ঠিক রেখে চলতে পারে···এই চলতে শেখানর শাস্ত্র গীতা...কর্ম-ক্ষেত্র জ্ঞানের পরীক্ষা-ক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র প্রেমের পরীক্ষা-ক্ষেত্র, সব কিছুর পরীক্ষা কর্মক্ষেত্রে।···কর্মকেই যদি ভালবাস তাহলে মান অপমান তুচ্ছ...। মহানির্বাণ মঠে প্রস্তাব দিয়েছিলাম নিত্যগোপাল-ব্রহ্মবিদ্যাপীঠ করতে···হয় নি, তারা রাজী নয়···। আমার জীবনের কথা বলি—আমার দরকার কর্ম—বরিশাল কংগ্রেসে স্থান হলো না··বৃন্দাবন থেকে এসে না ভাবতেই দমন আইন অমান্য আন্দোলনে ঢুকে পড়লাম। বন্ধুরা বলেছিল তুমি কারো ডাকের অপেক্ষা রাখলে না—সকলের আগে কাজে নেমে পড়লে?—মানুষ তা করে না বটে—কিন্তু আমার স্বভাব কাজ করা—মানুষে ডাকবে, সাধবে তারপর আমি কাজ করব? আমার প্রাণের দায়ে আমি কাজ করি। আমার নিত্যগোপাল-তরকে পাওয়ার জন্য আমি কাজ করি। তাঁর কাজ করি—আমার কাজ? কর্তুম্ অকর্তুম্ অন্যথাকর্তুম্ যেখানে সেখানে সত্যিকারের কাজ হয় না—আমি করতেও পারি, না করতেও পারি, অন্য রকমও করতে পারি—আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা নিয়ে চলতে গেলে কর্ম হয় না··। কর্ম তো অর্জুনের নয়—কর্ম ভগবানের, কর্ম বিশ্বের; ভগবানের কাজ মানুষ করবে।···আমার কর্ম, তোমার কর্ম বিশ্বজনীন হবে না··· তুমি স্নেহে ভক্তিতে দুর্বল হবে—তাইতো বলছ—একে কি রকম করে মারবে, তাকে কি রকম করে মারবে···। আমার কর্ম তুমি ত্যাগ করতে পার না—যাদের তুমি মারতে পারছ না তারা যে অত্যাচার করেছিল—যার চরম পরিণতি দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে বস্ত্রহীনা করা—সে অত্যাচারের কথা তুমি তো ভুলে যেতে পারলে—তাই বুদ্ধ-কর্ম ত্যাগ করতে পারছ!...কর্ম আমার, প্রাণ আমার, you are only to carry it out···। নদী সাগরের প্রেরণা বুকে নিয়ে অনায়াসে সাগরের জল পৌঁছে দেবে···; নদী নিজের কথা বয়ে নিয়ে যাবে না···সাগরের কাজ করছে সে...যোগক্ষেম কুরুকর্মাণি...সঙ্গং ত্যক্ত্বা···। সরকারী চাকুরী করলে সন্তান হলেও তাকেতকে গ্রেপ্তার করতে হবে—ভীম বলে দুর্বল হলে চলবে না...সিদ্ধাসিদ্ধৌ সম ভূত্বা···। রাণা প্রতাপ শিবাজী তিলক না হলে স্বাধীনতা হতো না—কিন্তু তাঁদের কাছে সিদ্ধি চাওয়া হয় নি—গান্ধীজীর হয়েছে···কিন্তু তাঁরা না হলে গান্ধীজী হতেন না...। তীর্থযাত্রীর সেবা প্রাণে না পৌঁছে মহলেও তীর্থপ্রাপ্তি হয়...। হয়তো নিত্য-গোপাল-দর্শন প্রসার বা নরনারায়ণ আশ্রমের আদর্শ...হয় তো দেখে যেতে পারব না—তবু পথের যাত্রী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চল, আনন্দে তাই এক হল আজ পৌঁছানো আর চলা।·· আনন্দ আছে, তাই এত লাঞ্ছনাও আমাকে কাবু করে না···। আমি বিশ্ব-কল্যাণ সভা করে ছিলাম—অশ্বিনী দত্ত মশায় তখন আমাকে ঠিক বুঝতে পারেন নি—ঠাট্টা করে বলেছিলেন বিশ্বকল্যাণ···। সে কথারও কোন প্রতিবাদ করি নি—আমার জীবনই আমার বাণী—আমার জীবনই জবাব দেবে···আমার পথে আমি অগ্রসর হয়ে গেছি। তাই সেই অশ্বিনীবাবুই আবার একদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, আমি যাচ্ছি, তুমি রইলে, বুঝে গেলাম বরিশালের সেবা হবে।...কর্ম প্রেম···শান্তি জ্ঞান—নইলে ব্যর্থতা সইবে কি করে?···ভারতের কর্ম আমরা করতে বসেছি·· এখানে প্রেমের জ্ঞানের প্রকাশ কর্ম ···সেই ভাবে কর্ম করলেই ধরার ধূলি হবে ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হবে ব্রহ্ম-মানুষ।···

১৩, ৫, ৫৭—আজ ভগবান বুদ্ধের জন্মদিন, তাঁর সিদ্ধির দিন এবং মহাপরিনির্বাণের দিন। তিনি ভারতবর্ষকে গতির শাস্ত্র দিয়েছেন। অবশ্য এর আগেও বেদে সেই রোহিতের চরৈবেতি চরৈবেতি মন্ত্র ছিল। কিন্তু তারপরে সেটা মুছে গিয়েছিল ···বুদ্ধ বললেন, গতিই সত্য, স্থিতি পাপ।···এই থেকেই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ আসে। বাল্য এগোতে এগোতে কৈশোর হয়, কৈশোর এগোতে এগোতে যৌবন হয়···। বাল্যটা মুছে গিয়ে কৈশোর এই-ই গতি-বাদীদের কথা। গতি হলেই হয়···বাল্য কৈশোর প্রভৃতি সব এক একটি ক্ষণ···। কিন্তু এগুলির তো পারম্পর্য করতে

হবে.. বহুকে একত্র হয়ে থাকতে হলে শৃঙ্খলা না থাকলে এটি পাগলা-পাগলী কাণ্ড হবে। তাই বুদ্ধ অহিংসা আনলেন, মৈত্রীকরুণা প্রভৃতির কথা বললেন। ...পাঁচজন পাঁচজন থাকবে অথচ শান্তিতে কাটবে—সেটা তো করতেই হবে ;... সহযোগিতা-শৃঙ্খলার জন্য একত্বের ধারণা শঙ্কর দিলেন। এক ও বহুর সমন্বয় রাসের গোড়ার কথা···সেখানে বহুজনে নাচছে, কিন্তু তাল কাটে না···এই ছন্দ ব্যক্তিগত জীবনেও চাই।···Unplanned life পরিকল্পনাবিহীন জীবন হচ্ছে আত্মকের দিনের বিপদ···। আমার জীবন planned—একটার পর একটা দুঃস্বপ্ন···। এই plan শংকরের দান। ...দুই আমরা পাঁচজন তাতে ক্ষতি নাই...কিন্তু মেয়াল ছেড়ে প্রত্যেকে যদি অপরের সঙ্গে মিলবই এই শৃঙ্খলা নিয়ে চলি···খাওয়াপরা সবটাতে...তাহলেই তো বৃন্দাবন হয়। ...বুদ্ধ ও শংকর রাসে মেলেন।...এই দুইজন না থাকলে ভারতের structure হয় না। কিন্তু এত বড় স্থান বুদ্ধকে কে দিচ্ছে? নরনারায়ণ আশ্রম বুদ্ধকে এই এত বড় স্থান দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে চলেছে···কি গুরুভার নিয়ে সে চলেছে তা কি তোমরা বুঝতে পার? বুদ্ধদেবের গতি এবং শঙ্করাচার্যের স্থিতির সম্মিলন স্বীকার করলে জীবনে শৃঙ্খলা এবং বিনিময়ধর্ম আসবে, আনতে হবে···। এক এক জনে এক এক কাজ পারে·····সব কাজ একজনে পারে না—এটা ভগবদ্বিধান।···বিনিময়ধর্ম অবশ্যম্ভাবী —অন্যের সাহায্য নেব কিন্তু তার মর্যাদা দেব না তাকে ছোটই মনে করব—বিনিময়ধর্মে কিন্তু তা নেই। চোখ মন পা সব এক হয়ে চলে—চোখে বাধ লেগে—চোখ যদি পাকে পা-গাতে না বলে তাহলে তো পা ছুটবে না—তাতে তো বাধে বাধে—পরস্পর সহযোগিতার কথা বৃন্দাবনে আস্বাদিত হয়েছে। ...পরিবারে কলহ লাগে কিসে? উপেক্ষার অভাবে—সামান্য কথাকে উপেক্ষা করতে না পারার জন্য।...ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, দুঃখে করুণা, শত্রুতে উপেক্ষা। যে ভক্ত সংসারে থাকবে তার এই চারিটি গুণ লাগবে।...অনেক প্রশ্নের মীমাংসা কালে হয় কিন্তু সাধারণ মানুষের সহ্য হয় না—আজই একটা ফয়সলা করতে হবে—এরই জন্য বিরোধ লাগতে পারে।···কালকের (লাইব্রেরী উদ্বোধন অনুষ্ঠান) আলোচনায় শুনেছ বর্তমান যুগ বড় বিপদের যুগ—আর তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে, এ যুগের চলার ছন্দ শিখতে হবে···। পায়ে কাঁটা ফুটলে মাথা যদি চন্‌চন্ করে না ওঠে, তাহলে একত্র থাকার কোন অর্থ হয় না···। পা যদি নিজের মান-অভিমান চালায়, মাথা যদি নিজের মান অভিমান চালায় শুভোগুতি হবেই···। অনর্থিত জীবন যাপন আমার ব্রত ; যখন যাকে পেয়েছি বুকে নিয়েছি···। কিন্তু মেয়াল চালালে এখানে থাকা চলবে না...। এ কথা বলতে পারতে হবে—ভুল করেছি, শুদ্ধ করব—এ মনোবৃত্তি না থাকলে কিছুই হবে না···। অনেক সইতে হয়।···যীশুখ্রীষ্ট থেকে প্রত্যেক মহাপুরুষ অনেক সয়েছেন, আমিও অনেক সয়েছি···একতরফা সয়েছি—। ···কোনদিন যোতরফা ঘরে কলহ বাধিও না···চুপ করে থাকলে অনেক বিপদ কেটে যায়... কারো সাথে চরম বিবাদ করতে নেই··· কথা কম বল।...অযাচিত করুণায় বুদ্ধের আশীর্বাদ পেয়েছি ...শাস্ত্র পড়ে আমি কিছু পাই নি—ভেতর থেকে স্ফুরিত হয়েছে। শৃঙ্খলা আন···দীর্ঘ পথ যাদের যেতে হবে তাদের পরিকল্পনাপূর্ণ জীবন চাই···নিত্যগোপাল নেই plan...। বুদ্ধ শঙ্করের মিলিত মূর্তি নিত্যগোপাল ···জগন্নাথ নিত্যগোপাল

১৪. ৪. ৫৭—শ্রীনিত্যগোপাল নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন নিত্যগোপাল পরম দয়াল—খুব সত্যি; সারাজীবন এই উপলব্ধিই করলাম তিনি পরম দয়াল! যেদিন পথে বেরিয়েছিলাম সেদিন প্রাণের টানেই বেরিয়েছিলাম··· দীর্ঘ পথ বেয়ে কেবল এই প্রমাণই পেয়েছি তিনি পরম দয়াল—বহু ঘটনায়, বহু বিচিত্রভাবে।···আমি পরিচিত জীব, তিনি আমার চেয়েও আমাকে বেশী ভালবাসেন।··· এই বিরাট সংসারে সকলের সঙ্গে টক্কর খেয়ে খেয়ে কোথায় ভেসে যেতাম তা কি আমি জানি?···দয়াল! তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ, তুমি তো প্রতারণা করনি···। তাঁর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করলে তিনি ভার নেন—সংসারের একথা সত্য···। নিজের ভাবনা নিজে ভাবি নাই, কিন্তু কোনদিন চাই নাই···কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে

আর কিছু না হোক ১০০৲ টাকা পেনশন পেতে পারতাম —কিন্তু সেটা আমার শোভা পায় না।···আমার সমস্যা কি আমার একলার?...বিশ্বের সমস্যার সমাধান না হলে আমার সমস্যার সমাধান হবে কি করে? তাই সমাধানের একমাত্র পথ বিশ্বাস করা, মুক্ত থাকা···। প্রহ্লাদকেও একদিন তুমি আগুনের মধ্যে ফেলে করে রেখেছিলে, আমাকেও রাখছ···।···আমার স্বার্থে তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেই রক্ষিত হবে—সে চেষ্টা না করে নিজেকে নিজে বাঁচাতে চাইলে আমি মরব—আমি যদি তোমার ভিতরে মরি তাহলেই আমি বাঁচব—আমার মহানির্বাণের কারণ তুমি···। আমার অস্তিত্বের, আমার বুদ্ধির, আমার দেহের মহানির্বাণ শান্ত হোক···। দিনান্তে নিশান্তে এক মুহূর্তের তরেও যেন তোমায় ভুলি না···। তুমি সাগর, আমি নদী···। তোমার জল বিতরণের ভার যদি তুমি দাও আমায়···ধন্য হব তবে। কোথায় মানুষ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি···! আমি নিজে আর সংকল্প বিকল্প করব না···তোমার চরণস্পর্শে আমার পথ ঠিক হয়ে চলছে ···দয়াল দয়াল! তোমার এই পথে ধরার ধূলি ব্রহ্মধূলি হবে, ধরার মানুষ ব্রহ্মমানুষ হবে।...

১৬. ৫. ৫৭ আমার শরীর ভাল না, কথা না কইলেই ভাল। তবু ২।১টী কথা বলে রাখি যদি তোমাদের জীবনে কোন কল্যাণ হয়। কথা অনেক বলেছি, কিন্তু কথা কওয়ার সুখ হয় নি। এসেছ এখানে আমার আশ্রয়ে—একজনের আশ্রয়ে আসা অর্থই তাঁর বুদ্ধি কর্মশক্তি হৃদয় তোমাদের চেয়ে বেশী এবং তোমরা তা মেনে নেবে।··মানুষে মানুষের স্তর পৃথক—একই আবেষ্টনে থেকেও এই পার্থক্য হয়। যার দৃষ্টি ব্যাপক সে উচ্চ স্তরের, যার দৃষ্টি swallow—অল্প—সে নিম্ন স্তরের। শিশুর দৃষ্টি অল্প—চতুর্দিকের আবেষ্টন সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না—শিল-নোড়া পায়ে পড়লে পা ভাঙবে—পায়ের সঙ্গে শিলের এ সম্বন্ধ সে জানে না।···আমরাও বিষটাকে ব্যবহার করতে জানি না···। পুরুষোত্তম দেবতার স্তরের খবরও রাখেন, অসুরের স্তরের খবরও রাখেন। আবেষ্টনকে যে যতবেশী দেখতে পাবে, সে ততবেশী উচ্চ স্তরের। আবেষ্টন সম্বন্ধে অজ্ঞতার—এই দেখতে না পারার—জন্য মানুষে মানুষে স্তরের এত প্রভেদ—এই-ই জীবত্ব। এই স্তর দুভাবে বদলায়—বুদ্ধি দিয়ে অবশ্য উপলব্ধি হয় তবু বিচার করে হয় না···হৃদয় দিয়ে স্তর বদলায়।...সকলকে আমি বিচার দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি আবার তাদের হৃদয়ের মধ্যেও রেখেছি···। বুকের বাইরে রেখে বুদ্ধি দেখাতে চাই নি...কিন্তু মানুষকে বোঝাতে পারি নি আমার চলার পথের ধারা। হৃদ্‌পিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থাকে তাই তাকে দেখা যায় না—নিতাগোপাল বিশ্বের হৃদয় তাই তাকে দেখা যায় না...হৃদয়ের ভিতর দিয়ে যদি আমাকে বুঝতে চাও বুঝো, আর বোঝাবার দায়িত্ব বা শক্তি আমার নেই।···আমি তোমাদের চেয়ে বেশী বুঝি—এটা মেনে নিতে হবে...। প্রাণ ও প্রজ্ঞা—দুটোই আমার কত প্রিয়!···গুরুবাক্য নির্বিচারে মেনো···বুদ্ধি চালিয়ো না··· বুদ্ধিভবানী···বুদ্ধি দুর্গা···বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ...। গুরুতে বিশ্বাস রাখ, নিজের উপর অবিশ্বাস রেখো—তোমার ভুল হতে পারে—এটা মনে রাখলে শিখতে পারবে নূতন কিছু।···জ্ঞের সৃষ্টি করে যে মনবুদ্ধি, সেই বিচ্ছিন্ন মনবুদ্ধি ত্যাগ না করলে কিছুতেই স্তর বদলাতে পারবে না।···স্তর না বদলালে এখানে আসা ব্যর্থ।···কথা কাটাকাটি তোমাদের সঙ্গে শোভা পায় না।···আমার এখানে যারা আছ তাদের আমি সসম্মানে রাখতে পারি—অন্যের মর্যাদা রাখতে আমি পারি·· রাখতে জানি।··· যখন তোমাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় তখন আর থাকতে ইচ্ছা হয় না, তখন চলে যেতে ইচ্ছা হয়...। আমার সমদৃষ্টি··তোমাদের দৃষ্টির চেয়ে আমার দৃষ্টি ব্যাপক···। নিত্যগোপালায় নমঃ; স্বাহা অর্থ আত্ম-নিবেদন।...আগুনের ভিতরে স্তর বদলায়...সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল...। তোমাদের ভিতরের অনন্ত যোগ্যতাকে ফুটিয়ে তোলবার বড় আশা ছিল···। আমার উপর নির্ভর না রাখলে·· নিজের সম্মান নিজে রাখতে গেলে আমার কাছে এসেছ কেন?···আমার উপর নির্ভর করলে আমি জীবনের স্তর বদলে দিতে পারি যেখানে আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিবেদনের মহিমা ও মাধুর্য

একসঙ্গে মুখরিত হবে। কিন্তু কে শুনবে মানুষের সাধনা নেবে?···কালও চলে যেতে পারতাম (কাল খানিকটা অজ্ঞানের মত হয়ে গিয়েছিলেন···)। নিত্যগোপাল চরণ-স্পর্শে ধরার ধূলি ব্রহ্মধূলি হোক, ধরার মানুষ ব্রহ্মানন্দ হোক।

২৪, ৫, ৭৭ আমরা ভুলে যাই কেন আসিয়াছি কোথা আসিয়াছি—কুটিল কুপথ ধরিয়া ঘুরে মরিয়া আছি পড়িয়া —কবি রজনী সেনের গান···।···আমরা ভুলে যাই··· এখন আর কিছু কইতে ইচ্ছা হয় না···এক রকম ব্যর্থ বলেই কইতে ইচ্ছা হয় না ...আমরা এসেছি জগন্নাথের কাছে নিত্যগোপাল জগন্নাথ। ··দিনরাত কি মনে থাকে এ কথা? নিত্যগোপালের কাছে আসা মানে জগতের কেন্দ্রে আসা। বিশ্বের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি···। জগন্নাথের সঙ্গে পিতা-মাতার সম্বন্ধ যতটুকু ততটুকুই তাঁদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ···এতদিন তুমি তোমার কেন্দ্র থেকে তোমার ভাষা, তোমার ভ্রোণ বিচার করেছ। কিন্তু তারা শ্রীকৃষ্ণের কে? তাঁকে যখন রথের সারথি করেছ, আমাকে যখন গুরু করেছ, তখন থেকেই তাঁর অনুগত হতে হবে।···এসেছ নরনারায়ণ আশ্রমে—এটা ছোট হতে পারে তবু এটা জগন্নাথ ক্ষেত্র।··· যার জগন্নাথ নেই, তার কি আছে?···তোমার পরিচয় তুমি জগন্নাথের কাছে এসেছ···। খেয়াল আমি চালাইনি ...তোমরা খেয়াল চালাতে তো পারবে না···বিশ্বের মধ্যে দাঁড়াতে হলে, থাকতে হলে খেয়াল ছাড়তে হবে।··· অভিযোগ করো না·· ভুক্তানের আত্মকৃৎ বিপাকে···নিজের দোষ দেখতে চেষ্টা কর...কেবল সমর্থন, কেবল সমর্থন— এতে ডুববে।···নিজ বলে কিছু নেই।...সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে অংশ টেকে না...চক্ষু পৃথক আমি হয়ে কি করে বাঁচবে?...সমগ্র বিশ্বের মাঝে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে বাঁচতে হবে...সংসার ততটুকুই সত্য যতটুকু তারা জগন্নাথের··· আমার মধ্য দিয়ে তারা জগন্নাথের হবে···দেহ-রথের সারথি নারায়ণ—সেখানে নারায়ণের ইঙ্গিত মত চলতে হবে···। সারথি, গাও গান, গীতা শোনাও—সে গানের মধ্যে আমার লাভ অলাভের কথা, জয় পরাজয়ের কথা ভুলে যাব···আমি শুধু সেবক···। তোমারই বিশ্ব-গৃহের আমি গৃহিণী···ভুলিয়ে দিও না তোমারই কাছে এসেছি...তোমার কর্মমন্ত্রে, তোমার প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত।···আমায় তোমার সঙ্গে রাখ; বলে গেছ যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি।...তোমার সেবা করব, তোমার বিশ্বের সেবা করব...তোমার চরণতলে বসে আমাকে বিশ্বের সেবা করবার অধিকার দেও··· তোমায় নমস্কার, আমায় নমস্কার, তুভ্যং মহং নমো নমঃ··· নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল...।

২৫. ৫. ৭৭ নিত্যগোপাল যে জীবন ও দর্শন রেখে গেছেন যা নিয়ে এই নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত, সেই জীবন ও দর্শন আসবার আগে একটা প্রলয় হয়ে গেছে— সেই প্রলয়ের ভাষা দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বলাকার ৩৭ নং কবিতায়। সমাজ আজ এই প্রলয়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে···। এই আশ্রম আর পাঁচটা আশ্রমের মত নয় একথা মনে রাখতে হবে প্রলয় হয়ে গেছে—আজ কারো কোন প্রয়োজন পূরণ হবে না···। বুক হতে কি মৃত্যুর গর্জন শুনতে পাও না? ঘুরে আর কোথায়? সে তো আমাদের মধ্যে এসে পড়েছে—শিশু যুবক বৃদ্ধ স্বামী স্ত্রী কারো জীবনেই তো সুখ নেই—পুরাণো সব বিধি ব্যবস্থা ভেঙে গেছে—কিন্তু নূতন জীবন-ধারা তো তার মধ্য থেকে ফুটিয়ে তুলতে হবে—শ্মশানের বুকে ফুলের উপবন তৈরী করতে হবে—সে দায়িত্ব নিয়েই নরনারায়ণ আশ্রম রওয়ানা হয়েছে···। কোন মানুষের জীবনে আজ স্থিতি নেই, আনন্দ নেই—ভেতরে ভেতরে বুদ্ধির মরণ হয়ে গেছে, কিন্তু সেই মড়া বুদ্ধি দিয়েই জীবন চালাতে চাইছে—প্রাণকে জাগ্রত করে তুলতে পারছে না···। মানুষের দেহের স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে···চতুর্দিকে কেবলই মরণ, কেবলই দুর্নীতি · পত্রিকা খুললে দেখবে হাহাকার মহামারী চুরী জোচ্চুরি···। কিন্তু উদাসীন হয়ে আছে মানুষ···তাই শুনতেই পায় না চতুর্দিকে কি দুঃসহ অবস্থা—মানুষ এর মধ্যে থাকতে পারে কি না ···নরনারায়ণ আশ্রমও কি উদাসীন হয়ে থাকবে? ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে নূতন সমুদ্র তীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি—নিত্যগোপাল পুরাণো যা কিছু কুসংস্কার, মানুষের ব্যক্তি সমষ্টি জীবনে যা অকল্যাণ-কর সেগুলি সব ভাঙলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোন্ খুঁটিতে

আশ্রয় নিতে হবে তাও দিলেন···ও তাঁর ডাক শোনাতে তোমাদের পারলাম না···কিন্তু সত্যিই তো পুরণো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা আর চলবে না···। পুরণো সমাজ-ব্যবস্থা, পুরণো জীবন-দর্শন, পুরণো নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে পুরণো সংসার করতে নরনারায়ণ আশ্রম আসে নি—আমি সব নূতন কথা শোনাই নিত্যগোপাল প্রসাদে।...এত বিষাক্ত মানুষের দেহ, মানুষের মন হয়ে গেছে···কথা কয় কেবল বিষ ওঠে···। কালোয় ঢেকেছে আলো...কোথায় আলো ···উদ্বোধন ভারত আলো দেবে...। কানে লয়ে নিখিলের হাহাকার, শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন, চিত্তে লয়ে আশা অন্তহীন চলেছি একা ...। নিত্যগোপাল, স্থান দেও··· মানুষকে তোমার সুস্থ জীবন-চেতনার কথা শোনাবার সুযোগ করে দাও, নিত্যগোপাল, আমি একা···। তোমরা সহজ হও, সত্য হও ···। অনন্ত দুর্যোগ মাথায় নিয়ে নিত্য-গোপালের পতাকা বিশ্বের মানুষের কাঁছে বয়ে নিয়ে যেতে চাইছি···নিত্যগোপাল, যাদের ডেকে ছিলাম তাদের যদি পার বল দেও...তারা তোমাকে বুঝুক—তোমাকে তারা মেনে নিক জীবন দিয়ে—তাদের সাথে আর কথা কাটাকাটি ভাল লাগে না—নূতন কথা বোঝান যে কি শক্ত!... নিজেদের মধ্যে শান্তি আসুক ...। মেয়েদের চাকুরী জুটছে বটে কিন্তু নারীত্বের অপমানে কে কাঁদছে?

আমার অন্তরে যে কী গভীর বেদনা—এই ছোটদের অপমানে—নারী শূদ্র—তারা তো আজও উপযুক্ত মর্যাদা ও স্থান পায় নি! সংসারে সকলে তো বেশ আছে... মহাপ্রভু তো নিশ্চিন্তে ছিলেন না।···নিত্যগোপাল, তোমার জয় হোক, সকলকে সচেতন করে দাও, বিশ্ব-পরিস্থিতি বোঝবার মত সচেতন করে দাও।···এই নূতন কথা শোনাবার কামনা ও প্রেরণা নিয়েই তো ১৯১৯-এ বেরিয়ে ছিলাম পথে...কিন্তু তেমন একটা কিছু করতে পারলাম কই?···কাজের সামনে তো পথ নেই—তবু অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা কই? যেদিন বেরিয়েছিলাম সেদিন তো রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতা আমি শুনি নি। ঐ কবিতা কত বছর পরে সুধা আমায় পাঠিয়েছিল।···

৫, ৬, ৫১ বুধবার। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রকৃতি পুরুষের যে দ্বন্দ্ব নির্ণয় করেছেন তাতে আছে কেউ কাউকে হারাতে পারছে না—কেহ নাহি হারি।···এতদিন ছিল প্রকৃতি পুরুষকে নানা ভাবে বন্ধ রাখতে চায়—এটা বদ্ধ অবস্থা...পুরুষ প্রকৃতিকে ফেলে চলে গেল—এটা মুক্ত অবস্থা।···পুরুষ এমন জোরে এগিয়ে যাবে যে কিছুতেই প্রকৃতি পুরুষের নাগাল পাবে না···এই ছিল ব্যবস্থা—কিন্তু বৃন্দাবনে প্রকৃতিকে পায়ে রেখে ব্রহ্ম ব্রহ্ম···আবার প্রকৃতি ব্রহ্ম হয়েও প্রকৃতি...। অনাদি অনন্ত কাল এমনি চলছে। ···মানুষও কখনও ঘটনার হাতে বন্দী হয় আবার ঘটনাকে সে নিয়ন্ত্রিতও করে···ঘটনা থাকবেই না—তাও নয়···। ঘটনার জাল গাঁথা হবে, তাকে ব্রহ্মভাবে আস্বাদন করব, আবার ঘটনার চাপ মুক্ত হবে···। ভয় কি টেনে তুলব, সেই বাণীই তো রক্ষা করছে।...ঘটনা মানুষ কমাতে চেয়েছে···তাতে অনেকখানি রক্ষা পায়···। কিন্তু আমার কথা ছিল যে কোন রকম ঘটনাকে হজম করে তাকে সমাজের কল্যাণরূপী সামগ্রিক রূপ দেব আমি, তাই আমি ঘটনাই চেয়েছিলাম।···আমার জীবনে দু'রকমের ঘটনা···অন্যান্য জীবনের ঘটনা, আবার গৃহযাত্রার ঘটনা... নিত্যগোপাল দ্বন্দ্বের সমন্বয় করেছেন দুইকে স্বীকার করেই মর্যাদা দিয়েই···। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন এ দ্বন্দ্বের সংঘর্ষ দীর্ঘ কাল চলতে পারে না।···আমি সংসারযাত্রারও গুরু, সাধনাজগতেরও গুরু ···। সংসারে কি খাও না খাও, কেমন করে খাও, তা-ও দেখতে চাই, আবার একমাত্র এই সংসার নিয়েই জড়িয়ে না থেকে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে, ভগবানকে ভালবাসার মধ্যে কি করে দাঁড়ান যেতে পারে, তা-ও জানাতে চাই...। কোন মানুষকে যখনই টেনে নিয়েছি তখনই তার পরিবার ভারই নিয়েছি···। পেটে ভাত নেই তাকে ছবিনাম দেব কি? সে দলের গুরু আমি নই।··· সেই টালীগঞ্জের পুলিন দাশগুপ্ত ··দীক্ষা নিতে এল—অন্নের সংস্থান নেই···তাকে আমি চারবেলার খাওয়ার ব্যবস্থা করি....না দেখে ছেলে খেল কিনা, শুকনা খাও না খাও সে তত্ত্ব রাখে না, আত্মার দাবী মেটাতে কতটা তাই দেখতে চায়।···আমি মায়ের মত দেখি...অন্ন ও ব্রহ্মজ্ঞান আমার

কাছে ছুটেই সভা···তেমন ব্রহ্মজ্ঞান সভা যা গৃহধর্মকে সার্থক করে।...ব্রাহ্মণশাখা, ক্ষত্রিয়শাখা, বৈশ্য ও শূদ্র শাখা এই চার শাখায় ভাগ করেছিলাম যখন প্রথম আশ্রম করি—বেদান্ত প্রচার করেছি, প্রাণ খুলে রাজনীতি করেছি, নরনারায়ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্-এর ভার এই জন্যই নিয়েছিলাম যে নরনারায়ণ আশ্রম বৈশ্যকর্ম করছে অবশ্য তা হয় নি, পারি নি। যাক্ লোকের অসুবিধা চলছে এখন ...অন্তরঙ্গ না জুটবার অবস্থা...। তবে সেই ভরসা—ভয় কি টেনে তুলব বাণী...। আমি আর বিষ্ণু রায়দের বলি - হাল পরিষদ এসেছে দয়া করে দয়াল দয়াল এমনি করে তো তুমি চালিয়ে নিচ্ছ...! দিন তো শেষ হয়ে এল। · গৃহযজ্ঞ ও সাধনা এক করতে নিত্যগোপাল পারেন।···নূতন সৃষ্টির উদ্দেশে দিতে হবে পাড়ি বিপদ আছে বলেই নেই নেই, বলেই আছে···ঝড় আছে বলেই শান্তি, শান্তি আছে বলেই ঝড়··· অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো সেই তো তোমার আলো, সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে তাল সেই তো তোমার তাল.... নিত্যগোপাল, তোমার নিয়ে আসা বাণী জয়যুক্ত হউক···সংসারের হাতে বন্দী হবে—গৃহমেধী—সে বড় দুঃখ; আবার সাধনার হাতে বন্দী হবে তা-ও বন্দীদশাই গৃহদুঃখকে যারা বাড়িয়ে তোলে তারা গৃহমেধী —গৃহম্ এধতি

স্মৃতির পাতা থেকে

॥ শ্রীরুহিদাস সাহা ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের মানবতাবাদ, তাঁর অপরিসীম মানবপ্রেম আমাকে তাঁর প্রতি অদৃষ্ট করেছিল বলেই। অবহেলিত নিপীড়িত আর নির্যাতীত মানুষের জন্যে তাঁর সীমাহীন ব্যাকুলতা, পদদলিত মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর নিরলস প্রয়াস, প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও সকল মানুষকে সম মর্যাদা দান তাঁর প্রতি আমাকে শ্রদ্ধাবনত করেছিল। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে তাঁর বিরাটত্বকে পরিমাপ করার চেষ্টা করতাম মাঝে মাঝে, তাঁর হৃদয়ের ঔদার্য্য আর মাধুর্য্য দেখে অবাক হতাম তখন। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ফাঁকে কখনও কখনও স্মরণ করতাম মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীককে; পড়াশুনার মাঝে মাঝেও আমার স্মৃতিতে তাঁর আবির্ভাব হতো, স্কুলের পরীক্ষার সময়েও কখনও কখনও তিনি আবির্ভূত হতেন আমার হৃদয়-মন্দিরে।

একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার কথা আজও মনে পড়ে।

তখন আমি অষ্টমশ্রেণীতে পড়ি—চিত্তরঞ্জন কলোনী হিন্দু-বিদ্যাপীঠে। সেই সময় অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ভৌগোলিক প্রশ্নের উত্তর-পত্রের এক কোণে সেই স্মরণ চিন্তনের স্বাভাবিক পরিণতিতে লিখে ফেলেছিলাম—শ্রীচৈতন্য।

উত্তর পত্রগুলো পরীক্ষা করেছিলেন সদ্য আগত একজন শিক্ষক। তিনি সেগুলো একদিন ক্লাসে নিয়ে এলেন। তখনও আমি তাঁর পরিচিত হইনি, আমার নাম তখন তিনি জানেন না।

উত্তর পত্রগুলো এক এক করে বিলির মধ্যে এক সময় আমার উত্তর-পত্রটিও বেরিয়ে এলো। আর তা হাতে তুলে সেই শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করলেন—এটি কার খাতা।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, উত্তর দিলাম—আমার।

তিনি তখন কাছে ডাকলেন আমাকে। আমিও

হৃষ্ট-চিত্তে বেঞ্চ ছেড়ে তাঁর টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলাম। ভাবলাম—আমি হয়তো সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছি। স্কুলের বিভিন্ন পরীক্ষায় বিভিন্ন পত্রে সর্বোচ্চ নম্বর যে না পেয়েছি এমন নয়। পেয়েছি বলেই এতেও পাবার আশা নিয়ে হৃষ্ট-চিত্তে এগিয়ে গেলাম।

উত্তর-পত্রের এক কোণে লিখিত সেই 'শ্রীচৈতন্য' শব্দটি দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন শিক্ষক মহাশয়—এ কি তুমি লিখেছ?

উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, আমি লিখেছি

প্রশ্ন করলেন—গলায় তুলসীর মালা তবে কোথায়?

বুঝলাম—এ প্রশ্ন উত্তরের আশায় নয়। দেখলাম, দৃষ্টি তাঁর বিদ্রূপাত্মক, বক্তব্য তাঁর শ্লেষাত্মক।

হৃষ্ট-চিত্তে এগিয়ে গিয়েছিলাম, ব্যথিত চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনটা আমার ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। 'শ্রীচৈতন্য' শব্দের সঙ্গে তুলসীর মালার কি সম্পর্ক তাও তখন ঠিক বুঝতে পারলাম না। এতে আমার কি অপরাধই বা হলো তাও বুঝে উঠা সম্ভব হলো না। আমি শুধু বাথাভরা মন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন বক্তব্য রাখতে পারলাম না, কোন প্রতিবাদ করলাম না।

সেদিন সে-ভাবেই গেল।

তারপর গেল মাসের পর মাস।

ক্রমে ক্রমে সেই শিক্ষক মহাশয়ের সান্নিধ্যে এলাম। শ্রদ্ধা করলাম। স্নেহ ভালবাসাও পেলাম।

ক্রমে ক্রমে বছরের পর বছরও অতীত হয়ে গেল। স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলাম। তারপর কলেজ ছেড়ে চাকুরী জীবনে প্রবেশ করলাম। একদিন ঐ ঘটনাটি স্মৃতি থেকে হারিয়ে ফেললাম:

বছর কয়েক বাদে একদিন ইস্পেজে যাবার অপেক্ষায় রয়েছি, সেই সময়ে দেখলাম একটি সংকীর্তন দলকে। উচ্চ-স্বরে কীর্তন করতে করতে এগিয়ে আসছে সে-দলটি। দলের পুরোভাগে শ্রীচৈতন্যদেবের একটি প্রতিকৃতি।

এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই, বিস্ময়ের কিছু থাকতে পারে না এমন নগর-সংকীর্তন তো হামেশাই চোখে পড়ে।

একটু বাদেই কিন্তু স্তম্ভিত হলাম সেই সংকীর্তনে এক ভদ্রলোককে দেখে ইনি আমাদের সেই শিক্ষক না! আমাদের প্রফুল্লবাবু—শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুপ্তই তো ইনি!

তক্ষুনি ক্লাশের সেই ঘটনাটির কথা মনে পড়ে গেল। ইনিই সেই প্রফুল্লবাবু! বিস্ময়েরই কথা! অবাক লাগাই স্বাভাবিক।

পরে অবশ্য চিন্তাস্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হলো, অস্বাভাবিকতার পরিবর্তে স্বাভাবিকতার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত হলো। ভাবলাম, কেউ হয়তো সংকীর্তনে নিয়ে এসেছেন ওকে, কোন বন্ধুর অনুরোধ বা ইচ্ছাকে বোধ হয় উপেক্ষা করতে পারেন নি প্রফুল্লবাবু।

এ ঘটনারও বেশ কিছুদিন পরে। একদিন দেখলাম, প্রফুল্লবাবু মালা জপ করছেন। পরিতৃপ্তি সহকারেই মনে হয়েছে, চোখে মুখে তারই প্রকাশ দেখতে পেয়েছি। মুখ মণ্ডলে দেখেছি প্রশান্তি।

এবার আর অপব্যাখ্যা করতে পারি নি, আন্তরিকতার প্রশ্ন খুঁজতে হয় নি। দুটো ঘটনার মাঝে মিলন ঘটাবার চেষ্টা করেছি শুধু।

"Consciousness of imperfection, the capacity for progress and the pursuit of perfection are alike possible to man only through the universal life of thought and goodness in which he shares and which, at once an indewelling presence and an unattainable ideal, draws him "on and always on". —Pringle Pattison—Idea on God P. 37.

রামমোহন

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে 'ভারতপথিক' বলে বর্ণনা করেছেন। অনাদিকাল থেকে ভারতবর্ষে যে বিচিত্র ধর্ম ও সংস্কৃতির যে চলমান স্রোত এক মহামিলনের ক্ষেত্র রচনা করছে, সেই মিলনের বহুমুখী ধারার মধ্যেই তিনি ভারতবর্ষকে নতুন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার পূর্বাবর্তে সৃষ্টি হ'য়েছিল, রামমোহন তার মধ্যে তলিয়ে যান নি। বরং সমস্ত বিরোধিতা ও সংস্কারের আবিলতার ভেতর থেকে তিনিই প্রথম শাশ্বত ভারতবর্ষকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। রামমোহন হিন্দু ছিলেন কিনা ছিলেন না, তিনি মুসলমান ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কি না, এমন কি খৃষ্টধর্মের দর্শন তাঁকে অভিভূত করেছিল কি না, এইগুলি নিয়ে যখন আমরা বিতর্কে নামি, তখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ভুল বুঝি। কারণ, রামমোহন জাতি, ধর্ম বা সংস্কৃতিগত কোন একটি বিশেষ ধারায় নিজেকে সীমাবদ্ধ থাকতে দেন নি। তাঁর চোখের সামনে ছিল এমন একটি ভারতবর্ষ, যেখানে বহু মানুষের ধারা নিরন্তর প্রবাহিত, যে মিলন ক্ষেত্রে আর্য অনার্য, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলের সাধনার ধারা সমানভাবে প্রবাহিত, যে ভারতবর্ষ এই বহুবিচিত্রতার মিলনক্ষেত্রে মানুষের সভ্যে উদ্ভাসিত। এবং সেই ভারতবর্ষকে নতুন করে জানবার ও জানাবার সাধনাতেই রবীন্দ্রনাথও 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নদীর উৎসকে জানা যায় না, তার স্রোতের অনাবিল ধারায় অবগাহন করা যায় না, যদি বালুচরায় আবদ্ধ জলে স্নানের পঙ্কিলতা সৃষ্টি হয়। 'ভারতপথিক' রামমোহন নদীর অনাবিল ধারাকে স্রোতস্বতী করতে চেয়েছিলেন। তাই প্রচলিত সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বালুচরাকে যুক্তি ও মানবপ্রেমের ড্রেজার দিয়ে কাটতে তিনি অগ্রসর হ'য়েছিলেন। তাঁর এই সংস্কারের মূলে বিদ্বেষের ভাবাবেগতা ছিল না। হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করে নয়, হিন্দুধর্মের মূল দৈবিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার বিশ্বা পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা নিয়ে অগ্রসর হ'য়েছিলেন। আমরা সংস্কারনিষ্ঠ হিন্দুরা তাঁকে 'বিধর্মী' বলে অভিহিত করেছি, কিন্তু রামমোহন নিজেই এ কথা বারবার বলেছেন যে তিনি কখনও হিন্দুধর্মকে আঘাত করার চেষ্টা করেন নি, তিনি শুধু সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। ১৮২১ সালে তিনি একেশ্বরবাদ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের (Unitarian Association) প্রতিষ্ঠা করেন। এই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, শিক্ষার প্রসারের জন্য, অজ্ঞতা সংস্কার, অন্ধতা ও গোঁড়ামি নাশ করার জন্য, মননশক্তির বিকাশের জন্য, এবং অসঙ্কোচ সহৃদয়তা ও বদান্যতার মনোভাবের প্রসারের জন্য যা কিছু করা হবে, তাই জনাদের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে।

রামমোহন বিপ্লবের পটভূমিকা সৃষ্টি করতে আসেন নি। তিনি এসেছিলেন ঐতিহ্যবাহী সংস্কারক মন নিয়ে। তাই তিনি নতুন করে উপনিষদ ও বেদান্তের অনুবাদ করতে বসলেন। বেনোজল সরিয়ে বদ্ধ জাওলা পরিষ্কার করে নদীর মুক্তধারাকে প্রবাহিত করাই তাঁর কাম্য। তিনি বেদান্ত থেকে প্রমাণ করতে চাইলেন অদ্বৈতবাদকে। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় এ কথা বোঝাতে চাওয়ায় তিনি তেত্রিশ কোটি দেবতার উপাসক অনুষ্ঠান ও আচারে বদ্ধ হিন্দুর মনে বিধর্মী বলে প্রতিভাত হ'য়েছিলেন। অথচ তাঁর এই চিন্তাধারার অনুসরণ করেই উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংস্কারক বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

রামমোহন ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন বলেই ধর্ম সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষা সংস্কারেও

মনোযোগী হ'য়েছিলেন। রামমোহন চেয়েছিলেন ভারতের পথকে বিশ্বের পথ করতে, ভারতের সংস্কৃতির ধারাকে বিশ্বের দিকে প্রবাহিত করে দিতে কিন্তু সেই সঙ্গে সমস্ত বিশ্বের সাধনার ধারাকে ভারতের সাধনার সঙ্গে যুক্ত করতে। তাই রামমোহন একদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের জন্য যেমন প্রাণপাত করেছেন, তেমনই হিন্দুদর্শনকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে বেদান্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। একদিকে হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধেয় করে তুলতে এবং অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করতে তিনি যেমন সংগ্রাম করেছেন, তেমনই ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে শিক্ষার অঙ্গ করে তুলবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

কারণ শুধু শ্রদ্ধা দিয়ে নয়, শুধু জ্ঞান দিয়েও নয়, যুক্তি দিয়ে বস্তুকে বিচার করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মন যুক্তিনিষ্ঠ ছিলো বলেই, হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্মের নীতি ও দর্শনকে তিনি পাশাপাশি বিচার করতে চেয়েছেন।

আধুনিক ভারতবর্ষের মানসে সত্যকে উদ্ঘাটনের যে চেষ্টা আজ চলেছে তার পথিকৃৎ রামমোহন। তিনি তাঁর সময়কে পরিবেশকে অতিক্রম করে দেশকে মানুষের সত্যে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আধুনিক ভারতবর্ষের মানুষ তাই রামমোহনের কাছে তার ঋণকে কোনদিনই বিস্মৃত হ'তে পারবে না।

যুদ্ধ

॥ শ্রীজয়দেব মুখোপাধ্যায় ॥
তৃতীয় শ্রেণী "খ" বিভাগ
বয়স আট বৎসর

কলিকাতা শহরের ছোট্ট একটি বাড়িতে মাত্র ছয় জন প্রাণী বাস করে। মা, বাবা, বুড়ো দাদু, কাকা, ভাই, বোন। ভাইটির ভালো নাম দীপঙ্কর ও ডাক নাম বিমল। বোনটি নিতান্ত ছোট। তার নাম ইন্দ্রাণী। বড় ভাইটি ক্লাস টেনেভে অবধি পড়েছে কিন্তু সে বেকার। হঠাৎ তার নজরে পড়ল খবরের কাগজের বড় হরফের লেখা "পাকিস্থান ভারতকে প্রবল বেগে আক্রমণ করেছে, তাই মাতৃভূমি রক্ষার জন্য শত শত দেশমাতার সন্তান এগিয়ে যাচ্ছে"।

এই লেখা পড়ে দীপঙ্কর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, তক্ষুনি সে বাবার কাছে গিয়ে তার মনের কথা জানাল। বাবা খুশি হয়ে বললেন যে হ্যাঁ তুমি নিশ্চয়ই যুদ্ধে যাবে। বাবার কথায় দীপঙ্কর খুশি হয়ে চলে গেল। যুদ্ধের কর্তাকে জিজ্ঞেস করে জানল যে, সে সৈনিক হবার উপযুক্ত। তারপর একদিন সে বাবা-মাকে, দাদুকে, কাকাকে নমস্কার করে ও ছোট বোন ইন্দ্রাণীকে আদর করে চলে গেল। কিন্তু দীপঙ্করের কপাল খারাপ। সে যুদ্ধে গিয়ে বেশীদিন যুদ্ধ করতে পারেনি। কৈফুদ্দীনের গুলিতে মারা যায়। কয়েক জন পাকিস্তানি সৈন্য ইন্দ্রাণীদের বাড়িতে ঢুকে তার মা ও বাবা-মাকে হত্যা করে। ইন্দ্রাণী পালিয়ে গিয়ে বনে চলে গেল। কিছুদিন পরে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করল।

দীপঙ্কর ছোট হলেও বুঝতে পেরেছিল মা আর জন্মভূমি এক। মার কষ্ট যেমন সহ্য করা যায় না, তেমনি দেশমায়ের ওপর অত্যাচার করাও সহ্য করা যায় না। তাই কিশোর দীপঙ্কর যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বর্বর পাকসৈন্যের ওপর। *

---

* আট বছরের ছেলের রচনাটি হুবহু ছাপানো হল। ছোট্ট ছেলে মেলাতে পারে নি কলকাতা শহরের বাড়ীতে পাকিস্তানি সৈন্য ঢুকে বাবা-মাকে মারল কি করে।—সম্পাদক—উঃ ভাঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

১৯৫৪—

(৯২)

খলের কাছে জবাব দিতে হইলে খলত্বভাব হইতে হয়। জওহরলাল নেহরু জবাব দেওয়ার মধ্যে নাই 'চরৈবেতি'। রেণু বাহির হয়—বিজ্ঞাপনের জন্য অনেক জায়গায়। ধীরেনবাবু একটি ওষুধ কাল ভোরে খালি পেটে খাইবার জন্য লিখিয়া জানাইয়াছেন। রেণু ৪টায় ফিরিয়া তখন শেষ বে কোং হাওড়া স্টেশনের কাছে ২০নং হ্যারিসন রোডে গিয়া কিনিয়া আনে। পোটেন্সী লেখা ছিল না বলিয়া ৩০ ও ২০০ দুই-ই আনে, পরে আমার মঠ হইতে ফেরার পর মঠে যাইয়া সুধাংশুর কাছে জানিয়া আসে ৩০ ব্যবহার করিলে reaction হইবে কি না। ৩০ই খাইব। কুমারের চিঠি আসে। সে আসিবে।···মঠে ৪টায় যাই। ক্ষিতীশ-বাবুর সঙ্গে কথা হয়। ক্ষিতীশবাবু খগেনবাবুকে গত বৎসরের অক্টোবর নভেম্বরের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছে যে এবারের অর্থ-আদায় কম হয় নাই। সত্যিই তাই।

১৬ই ডিসেম্বর।

নিত্যগোপাল, তুমি আছ নিত্য ও অনিত্যের আত্মা ও অনাত্মার, জড় ও অজড়ের, চৈতন্য ও অচৈতন্যের সন্ধিতে দাঁড়াইয়া মধ্যমপ্রাণরূপে যোগসূত্ররূপে। বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন প্রভৃতির যা-কিছু সম্পদ, তাহা তো মূলতঃ তোমারই সম্পদ। তোমার সম্পদেই তাহাদের সম্পদ। সংহতি, সঙ্ঘবদ্ধতা তোমারই আশীর্বাদ। বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন যে সঙ্ঘ গঠনে ব্যর্থ, তুমি সেখানে উদ্গীথ গান করিয়া সংহত কর, সঙ্ঘবদ্ধ কর, পরিবার সমাজ বিশ্বে সংহতি আনয়ন কর। প্রাণ আমার, সখা সাথী বন্ধু শরণ সুহৃৎ স্বামী আমার! আমি প্রাণের ভাষায় কথা কহিব, প্রাণের চক্ষু দিয়া দেখিব, প্রাণের কাণ দিয়া শুনিব, প্রাণের মন দিয়া মনন করিব, প্রাণের আচরণ করিব। প্রাণের জয় হউক, রাধারাণীর জয় হউক। পোষ্টাফিস হইতে তাগিদ আসে নভেম্বরের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশান না করার জন্য। রেণু দরখাস্ত লইয়া পি, এম্, জি-র অফিসে যায়। ৫৲ টাকা জরিমানা দিতেই হইবে। সে টাকা জি, পি, ও, নেয় না। ছুটিতে ছুটিতে কালীঘাটে আসে—৩টার পর হইলেও তাহারা নেয়। সেই রসিদ লইয়া আবার পি, এম্, জি-র অফিসে যায়। তাহারা দরখাস্ত নেয়। ৪টার পর মঠে যাই। শীঘ্রই ফিরি। রাত্রি ৩টায় উঠি। ৪৸টায় ট্যাক্সীতে রওয়ানা হই আমি, উষাঙ্গিণী, রেণু ও গোপা। ৪-৪৫-এ গাড়ী। প্রতিভা নিজ এখানে রহিল। সঙ্গে চালুয়া নেওয়া হইয়াছিল। Parevia Bravo একমাত্রা খাই। বিশেষ কোনও উপকার লক্ষিত হয় না।···

১৭ই ডিসেম্বর।

৫-৩৫-এ কালনার গাড়ীতে রওয়ানা হই। স্টেশনে প্রভাস অবনী পতিতপাবন, সারদানন্দ, নগেন পাল তারিণীবাবু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।···যে ঘরে ঠাকুর একদিন ছিলেন—বৃহস্পতিবার নূতন মন্দিরে যাওয়ার পূর্বে সেই ঘরে ও সেই স্থানে আমার বিছানা হয়। তাঁহার কোলেই ছিলাম, চিরদিনই তিনি কোলে করিয়া রাখিয়াছেন। গিয়া গোপসুন্দরানন্দের ঘরে দেখা করিয়া আসি। দুপুরে ভিতরের দিকে বারান্দায় আমরা একত্র প্রসাদ পাই। নবদ্বীপ হইতে ধীরেন সিংহ আসেন ১৸টার পর। আমার অসুখের অতীতের ইতিহাস সব বিস্তারিত শোনেন।··· ২টার পর ময়নাডালের কীর্তন হয়—'কলহান্তরিতা'। আমি উপস্থিত ছিলাম।···কীর্তন শেষে চলিয়া আসি। এখানে আরও মশার অভাব নাই। শুনিলাম ২৪-৩

হাজার লোক বৃহস্পতিবার প্রসাদ পাইয়াছে। শুক্রবার ঠাকুরকে নিয়া নরীতে খুব লোকযাত্রা হইয়াছে। সন্ন্যাসী ও শিষ্য প্রণিপাত করিয়া ও পায়ে হাঁটিয়া অনুগমন করিয়াছেন। নারিকেল দেওয়া কটি ও দুধের বন্দোবস্ত ছিল। সেবানন্দ সময় পাইলেই সঙ্গে সঙ্গে ছিল। বাউলের গান হয় কীর্তনের পর। শরীরটা ভাল লাগিতেছিল না তাই গানে যোগদান করা হয় নাই।…

১৮ই ডিসেম্বর।

সকালের গাড়ীতে যোগমায়া বিমলা নবদ্বীপ হইতে আসে।…দুপুরের পর অমরেশবাবু আসেন। বীরেনবাবুর অপেক্ষা করি। আসেন নাই। ১টার পর শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় আসেন। তাঁহার ওখানে একটু বসি। সভাপতি সুধাংশুবাবুর পিতা বিধুবাবু ছিলেন আমার বিশেষ পরিচিত। সভার কাজ ২টায় আরম্ভ হয়। আমাকে মালা দিতে আপত্তি উঠিয়াছিল। শেষে কর্তৃপক্ষের চাপে সচ্চিদানন্দ দেয়। পরমানন্দ ঠাকুরের বন্দনা-স্তোত্র পাঠ করে, পরে একজন খ্রীষ্টান বাইবেল ও একজন মুসলমান কোরাণ পাঠ করেন। প্রধান অতিথি ধর্মের উপযোগিতা সম্বন্ধে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও খ্রীনা'র কথা বলেন—যেন এই সভা খ্রীনার শতবার্ষিকী সভা। নিত্যগোপাল নাম মাত্র ২।১ বার করেন। আমি বলি, 'অন্যকর্ম্ম চ যে দিব্যম্'—নিত্যগোপাল-তত্ত্ব জানিতে হইবে। এই তত্ত্ব হইতেছে সমন্বয় তত্ত্ব যাহা উপনিষদের ন্যায় প্রাণকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। এ কূলে ও কূলে —জড়ের কূলে অজড়ের কূলে—কোনও কূলে আমরা যোগ দিব না। ইহারই রূপ রাজনীতিক্ষেত্রে আজ প্রকাশিত হইয়াছে। Co-existence সমন্বয়েরই অন্য প্রকাশ। সর্ব দর্শনকে, সর্ব জাতিকে আজ co-existence নীতির আশ্রয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। ধর্ম-রাজনীতি ভারতবর্ষে এক। নারায়ণ-সেবার পরিণতরূপ নর-সেবা। 'ন কাময়েঽহম্' ও 'প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ' বলি কালীয়দমনের 'অদৃষ্টচেষ্ট' ও 'প্রধানানবপুঃ' বিশেষণ দুইটি ব্যাখ্যা করি। মেয়েদের সমস্যার কথা বলি। নরনারী আজ মিলিয়া মিলিয়া গিয়াছে একই কর্মক্ষেত্রে। কে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবে নিত্যগোপাল ছাড়া? নারীর মাতৃমূর্তির ব্রহ্মময়ী রূপ কালী, আর রমণীত্বের ব্রহ্মময়ী রূপ শ্রীরাধা এক। মা জাগিলেই নারী তাহার রমণীরূপ সংবরণ করিবে না। সিনেমা, টেলিফোন, টাইপিস্ট, কেরাণী লক্ষ লক্ষ মেয়ে। তাহারা কেহই মা হইবার জন্য বাহির হয় নাই। কে তাহাদের সমাজ-সেবার কাজে লাগাইবে ব্রহ্মনারীরূপে নিত্যগোপাল ছাড়া? ২ ঘণ্টা বক্তৃতা হয়। খুব impression হইয়াছিল। শৈলকুমারের খুব ভাল লাগিয়াছে co-existence-এর কথা। অজ্ঞেয়বাদের নীতি ব্যাখ্যাত হয়। ওখানের মুনসেফ বলেন, 'নূতন শুনিলাম'। পরমানন্দের 'ধামাইর পায় হওয়া' গানা কিছুক্ষণ শুনি। যোগমায়া ও বিমলা সভার পূর্বে চলিয়া যায়। শত শত পুরুষ মহিলা বক্তৃতার পর প্রণাম করে। দুইজনে ৬৲ টাকা প্রণামীও দেয়।

১৯শে ডিসেম্বর।

খুব সকালে বাহিরে আসি। সকালে Parevia Bravo ২০০ ১মাত্রা খাই। প্রভাস অমনী নগেন পাল প্রভৃতি আজ খুব ভোরের গাড়ীতে কলিকাতা যায়। তাহাদের যাত্রার সময় উপস্থিত থাকি। নির্মলা চাকলাদারের (ফরিদপুরের ৺কামিনী ঘোষের কন্যা) আগ্রহাতিশয্যে তাহার বাসায় রিকশায় যাই বেলা ১০॥ টার পর। সিঙ্গাড়া রসগোল্লা খাইতে দেয়, পায়ে ফুল দেয়। সকল ছেলেমেয়েদের বণ্টন করিয়া দেই। শ্যামসুন্দরানন্দ প্রভৃতি সকালে গুস্তিপাড়া যায়। কলিকাতা যাত্রার আয়োজন করি। ১২-৩৫-এ গাড়ী। মণির নিজের মোটরে আমি উমাদিদি রেণু গোপা ও ফুটি (সরল মন্তের বোন) ষ্টেশন পর্যন্ত আসি। হরিস্মরণানন্দ রিকশায় আমাদের পূর্বে রওয়ানা হইয়া আসে। রিকশা না আসায় আমাদিগকে মোটরে তুলিয়া দেয়। কিন্তু নিত্যপ্রকাশানন্দ ষ্টেশনে আসিয়া আমাকে অভিযোগ করে যে, কেন আমাদিগকে মোটরে আনা হইল, হরিস্মরণানন্দকে আনা হইল না? হরিস্মরণানন্দকে মোটরে দিয়া মেয়েদের কেন রিকশায় পাঠানো হইল না? হরিস্মরণানন্দ কি আমাদের রিকশা আসিল না বলিয়া আমাদের জন্য

অপেক্ষা করিয়াছেন? তিনি তো আগেই চলিয়া আসিলেন। উহারা বলে যে ইহা পূর্ব পরিকল্পিত।... গাড়ীতে চিত্তরঞ্জন কারখানার টাইপিষ্ট সুপ্রভাত বসের সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়। সকালে একটী শিক্ষকের সঙ্গে অনেক আলোচনা হইয়াছিল—আইনষ্টাইনের time space matter relativity সম্বন্ধ, বহু লোকের বহু কৃষ্ণ-লীলার কথা, eternal present-এর কথা আলোচনা হয়। ৪। টার পর কলিকাতা পৌঁছি। ট্যাক্সীতে চলিয়া আসি...।

২০ শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত সৌর আমার। জননীত্বের ব্রহ্মময়ীরূপ শ্রীদুর্গা, শ্রীকালী; রমণীত্বের ব্রহ্ম-ময়ীরূপ, মোক্ষদারূপ শ্রীরাধা। শ্রীকালীও পরাপ্রকৃতি, শ্রীরাধাও পরাপ্রকৃতি। দুই-ই বিশ্বময়ী। শ্রীরাম-কৃষ্ণের দীনতারিণী কালীই শ্রীনিতাগোপালের শ্রীরাধা। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর উপাসক; তুমি শ্রীনিতাগোপাল বারবার সহস্রধার রাধা-গোবিন্দের কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছ। রমণীরূপের বরকে, বিলাসে আমরা ভীত, পলায়নপর। তুমি ছাড়া কে এই কৃষ্ণ-বিলাসিনী, মহা-যোগিনী মহামায়ারূপের ব্রহ্মময়ীরূপ আবিষ্কার করিবে? কালীর মাতৃত্ব যেমন ব্রহ্ম, তাঁহার রমণীত্বও কি তুল্য ব্রহ্ম নয়? শ্রীনিতাগোপাল, তুমি ছাড়া কে সমাজ-সংগঠনে এই দিব্য ব্রহ্মময়ী রূপকে কাজে লাগাইবে? তোমার জয় হউক।...প্রতিভা প্রেসে প্রথম ফর্ম প্রুফ দিয়া আসে।...৪টার পর মঠে যাই। অপেনবাবুর কাছে কালনার বিবরণ বলি। চিদানন্দ নাকি খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে এই বলিয়া যে, কালনায় উপস্থিত সমস্ত মহারাজরা আমার বক্তৃতা বয়কট করিবে। হইয়াছে তাহার বিপরীত। 'আমার নিতাগোপাল'-ই চলিবে। ইহাদের নিতাগোপাল সেই মধ্যযুগীয়, অতি পুরাতন। তাহা বর্তমান যুগে অচল।...কালনায় বলিয়াছি, শ্রীনিতা-গোপাল কবি। যিনি প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি ছাড়া কবি আর কে হইবেন? প্রকৃতিহীন ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া কবিতা হয় না। কবিতার বাসভূমি বৃন্দাবন, রাসস্থলী। প্রবৃত্তি-সঙ্কোচের জীবন যাহার, তিনি আর কবি? প্রবৃত্তির sublimation-ই হইল কবিতার মূল উৎস। ৮টার পর ফিরি। নিত্যানন্দানন্দ এক পত্র দিয়াছেন তারিণীবাবুর নিকট—কেহ যে মত প্রচার করিতেছেন, তাহা ঠাকুরের মতবাদ কিনা তাহা ঠিক করা উচিত তথায়। তবে ঠাকুরের লেখা ও সমস্ত দার্শনিক মতবাদ জানিয়া লইতে হইবে। বিচারক হইবে কে? আমি বলি বিচারক হইবে বহুজন অর্থাৎ mass। রায়ের ঠিক হইবে তাহার মত সত্য।

২১ শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি বিশ্ব-রহস্যের যে-ছবি উদ্ঘাটন করিয়াছ, তাহাতে বিশ্বের প্রতিটী কণা এক মুক্তিবন্ধনে গ্রথিত—'সখ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি' এই বিশ্বের স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, প্রতিটী ধূলিকণা অপরের সঙ্গে 'বন্ধনহীন' গ্রন্থিবন্ধনে বদ্ধ। প্রাণই এই সখ। প্রাণ চির যুক্ত, চির বদ্ধ। ওগো প্রাণ, বিশ্বপ্রাণ, তুমিই এই সখের আদি সখিত, আদি সাক্ষী। বর্তমান যুগ-মানবগণ এই সখ বহিয়া চলিয়াছেন, তোমাকে আবর্তন করিয়া চলিয়াছেন। তুমি আদি অথচ অনাদি। আমি তোমার পাদুকাবাহী হইব—এই অধিকার আমাকে দেও। তোমার গর্বকে আমি মাথায় বহিব, তোমার 'অহম্'-এর কাছে আমার অহম্' লুটাইয়া পড়ুক। তোমার জয় হউক আমার জীবনে সোমবার হইতে ঔষধ খাওয়ার পর আড়াই দিন যেন প্রস্রাবের ভাবটা কম ছিল। বৈকাল হইতে আবার obstruction ও inflamation অনুভব করি। সন্ধ্যার পর কবিশেখর কালিদাস রায় রেণুর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তাঁহার 'পুরাকলিকা' নামে VI এর র‍্যাপিড রীডার অনুমোদনের জন্য পেশ করিয়াছিলেন। রেণু তাহা pass করিয়াছিল। কিন্তু তাহা শেষ পর্যন্ত অনুমোদিত হয় নাই। তাহাই বিস্তারিত জানিতে আসিয়াছিলেন। ৪॥ টার পর মঠে যাই। শতবার্ষিকী হওয়াই যাহাদের কাম্য নয়, তাহাদিগকে লইয়া কাজ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ঠাকুর, তোমার কথা ছিল, জীবন ছিল।

আর সেই তুমিই আজ সবচেয়ে অপরিচিত! কি আমি করিব? এখনও যে শক্তিটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা যদি তারে লাগাইতে পারিতাম, যদি অর্থ দিতে, শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ বিলাইতে পারিতাম, শত শত সভা করিবার মত অর্থ যদি থাকিত, তবে মানুষের কল্যাণ হইত, ঘরে ঘরে তোমার তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিতে পারিতাম।...

২২ শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, স্বামী আমার, 'তোমারি চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি। সব সমর্পিয়া এক-মন হইয়া নিচয়ে হইনু দাসী'। আমার দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি অহঙ্কার, আমার জাতি-কুলশীল, আমার সকল সু ও কু, আমার সকল শুচি অশুচি, আমার ইহ জীবনের, অতীত জীবনের সব সংস্কার তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া অবধূত হইয়া, নিরঞ্জন নিত্যশুদ্ধ হইয়া সহজ জীবন লইয়া তোমার চরণে দাসী হইলাম, 'নিত্যদাসী' হইলাম, তোমার নিত্য সেবায় জীবন দিলাম। তুমি আমি এক, তুমি আমি একাত্মা, একানন্দ, এক-বিজ্ঞান, এক-মন এক-তন্ত্র। আমার এই 'নিত্যদাসী' নাম তো তোমার অনুমোদন লাভ করিয়াছে। তোমার কাছে তো এই নামেই চিঠি দিতাম তুমি তাহা নিয়া রহস্যও করিয়াছ। আমার কাছে কি তাই তুমি তোমার সত্তা স্বরূপ খুলিয়া ধরিয়াছ? আমার তুমিই না জগন্নাথ? ওদের তুমি কত ছোট? আমার স্বামী জগৎস্বামী, আমার নাথ জগৎনাথ, সর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। অতুলের সঙ্গে গৌরীপাশার নিবারণবাবু আসেন। বৈকালের দিকে নীলু সুব্রত মধু আসে, সন্ধ্যা ৭ টায় যায়। বলরামপুরের কিতীশ রায় চৌধুরী ও গান্ধী ট্রাস্টের শিশিরবাবু আসেন নীলুর আসার পরে। বিনোবাজী ৪ঠা মাঘ বলরামপুর, আসিবেন, আমাকে এরা সেখানে যাইবার কথা নিয়া আসেন। একদিন সেখানে 'ভাগবত' পাঠ করিতে হইবে। যাইব বলিয়া দেই। 'উদ্বোধন' ফেরত দিবার কথা বলি। লজ্জিত হয়। যাবজ্জীবন গ্রাহক থাকিবে বলে। কাল ১০টায় আবার আসার কথা। বেলু ২॥ টায় পর (নীলু আসার পর) খুশাল্ল ও আনন্দবাজারে যায়। কালনার বিবরণ দিয়া আসে। ফেরে নীলু যাইবার একটু পূর্বে। জ্ঞানবাবুরা আসেন...। নীলুর সঙ্গে অনেক কথা হয়। রাস্তায় নামিয়া মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে যাহা প্রয়োজন তাহা আমার সঙ্গে বাহিরের দিক দিয়া যুক্ত না থাকিলে সম্ভব হইবে না। একটা প্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অনন্ত সম্ভাবনাময় একটি ক্ষেত্র আমার চতুর্দিকে আছে। আমার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া তাহার সুযোগ নিতে হইবে। কত বিভিন্ন রকমের কাড়াকাড়ির মধ্যে পড়িতে হয় মেয়েদের রাস্তায় নামিবার পর। কেমন করিয়া সামলাইবে আমার সঙ্গে যুক্ত না থাকিলে? দুর্জয় সাহস ও ধৈর্য ছাড়া নিজও তাহার সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না, নীলুও না। মনোরঞ্জন গুপ্ত আসেন যখন খাইতে বসিয়াছি তখন তাঁহার প্রবন্ধের প্রিন্টের খোঁজে। নীলুর জন্য মঠে আম যাওয়া হয় নাই।

২৩শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি আমার 'শীতের ওড়নি পিয়া গিরিষের বা বরিষার ছত্র পিয়া ঘরিয়ার না'। আমাকে তুমি আদরে করিয়া আজান করিয়া বুকে করিয়া রাখিয়াছ শত শীত-গ্রীষ্মের সুখদুঃখের আকর্ষণের মধ্যে। শত লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হইয়া যখন চোখের জলে ঘরে ফিরিয়া আসি, তুমি চোখের জল মুছাইয়া আদরে সোহাগে আমার চিত্ত-বিনোদন কর। ...শত কষ্টের মধ্যে তুমিই সান্ত্বনা। তোমাকে তিল-তুলসী দিয়া দেহ-মন সমর্পণ করিলাম—দেওয়ার অর্থ যতখানি ততখানি পূর্ণ করিয়া দিলাম, বাকি না রাখিয়া দিলাম। আমার দেহপ্রাণ 'তোমার' হউক ...কিতীশ রায় চৌধুরী ১০টার পর আসে ওরা মাঘ যাইবার কথা হয়। বিনোবা ৪ঠা মাঘ আসিবেন।... আমার খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস আসিয়া বসে বৈকালে আমার জন্য খাওয়ার দিয়া যায় ভারতীয় প্রাণ-সাধনার লক্ষ্য জীবনে 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' উপলব্ধি করা জ্ঞানে ভক্তিতে কর্মে। জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াছে জ্ঞানীরা অদ্বৈতবাদের ভিতর দিয়া, ভক্তিতে করিয়াছে ভক্তগণ দ্বৈতবাদের মাধ্যমে। কর্মে কেহ চেষ্টা করে নাই। কর্মে অদ্বৈতবাদ সাম্যবাদ কোন দিনই পূর্ণমাত্রায় হইবে না। সেখানে 'বহুত্বম্' ছাড়া সম্ভব নয়।

সর্ব-ব্রহ্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আগাইতে হইবে গতিতে গতিতে, বহুর ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু কোনদিনই কর্মগত সর্বব্রহ্ম আস্বাদিত হইবে না Cultured uncultured 'সর্বব্রহ্মবাদে' সম। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে becoming-এর ক্ষেত্রে এই ব্রহ্মের আস্বাদন ছাড়া উপায় নাই ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন দিনই 'সর্বব্রহ্ম' তত্ত্ব আস্বাদিত হইবে না, হইবে বহু-ব্রহ্মতত্ত্ব, কৃপা-ব্রহ্মতত্ত্ব। সর্বের ক্ষেত্রই being-এর ক্ষেত্র, বহুর ক্ষেত্রই becoming-এর ক্ষেত্র। নগেন প্রামাণিক বলেন যে, আমি ঠাকুরের কথা বলিতে সকলের মত করিয়া বলি না, আর উহারা তাহা পারেন না, তাই আমাকে হিংসা করেন ঠাকুরকে আমি বাড়াইয়া বলিব, কিংবা তাঁহার নামে আমি নূতন কথা সৃষ্টি করিব ইহা অসম্ভব। তিনি নিজেই এতটা বাড়িয়া আছেন যে তাঁহাকে বাড়ানো অসম্ভব।

২৪শে ডিসেম্বর

নিত্যগোপাল, তুমিই যীশুখ্রীষ্ট—উইলিয়াম সাহেব 'Here is my Jesus' বলিয়া তোমার শ্রীচরণে প্রণত হইয়াছিলেন। তোমার জীবনে সকল অবতারের প্রকাশ ভক্তগণ দেখিয়াছেন। তুমিই God the son—পুরুষরূপে নারায়ণ তুমি ক্ষমার অবতার, ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় Father, Father, forgive them, they know not what they do' বলিয়া ক্ষমা করিয়াছ তুমি রক্ত দিয়াছ—শত লাঞ্ছনাতেও আঘাত কর নাই। তোমার শ্রীচরণ-স্পর্শে ধরণী ধন্য, পবিত্র। তোমাকে Mary-র কোলে দেখিয়া বিশ্ববাসী আমরা ধন্য। তোমার পাদস্পর্শে ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্মমানুষ। ওগো ব্রহ্ম-মানুষ যীশুখ্রীষ্ট শ্রীনিত্যগোপাল—তোমার আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক। যীশুর যে একখানি ছবি আছে তাঁহাকে গোপা সাজায়। উপরের শিশুদের কমলা দেওয়া হয়....৪টার পর মঠে যাই। আজ নীলরতনবাবু ও রমাপতিবাবুরা সকলেই আসেন। নকুলেশ্বর বাবু (ঢাকুরিয়া) মঠে আসেন। রেডিয়োতে মেয়েরা কেহ বা হিন্দুবিবাহ বিলের পক্ষে, কেহ বিপক্ষে আলোচনার কথা তিনি বলিয়া যিনি বিপক্ষে তাহার মতের সমর্থন করেন। আমি এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করি। কেন রমণীভাব আজ এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল? একান্ত জননীত্বকে প্রতিষ্ঠা করিবার ফলে রমণীত্ব আজ ক্ষিপ্ত। সংঘর্ষ হইবে অচিরাৎ। জড়বাদ রমণীত্বের প্রচার করে, অধ্যাত্মবাদ জননীত্বের। জড়াজড় সমন্বয়বাদী দুইয়ের সমন্বয়বিধান করিবে। অরবিন্দ যাহা বলিতে চান তাহা যেরূপ 'অসম্ভব' বোধ হইলেও সম্ভব, ঐ সমন্বয়ও অনিবার্য। এই সম্ভব মনঃপ্রসূত। প্রাণ আসিয়া পড়িয়াছে। আর তো ২০০ বৎসর পিছনে যাওয়া সম্ভব হইবে না। তবে কি সমাজ কালের আগুনে পুড়িয়া মরিবে? বিশ্ব আজ ধ্বংসের সামনে দাঁড়াইয়া। Co-existence এর নীতিও আসিয়াছে। মার্শাল টিটো বলিয়াছেন—Either co-existence or co-destruction। নরনারীর কাছেও ইহা পূর্ণভাবে সত্য। দীর্ঘ আলোচনা হয়। মুরলীধরবাবু যোগেশের কীর্তন বন্ধ করিয়া দিয়াছে, বলিয়াছে, আমি মরিব, দেখি তারিণী এন্ডী বা কিতীশ চক্রবর্তী কেমন করিয়া তোমাকে দিয়া গাওয়ায়। যোগেশও অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুর, তুমি কি ক্ষুব্ধ হইবে না? তোমার বুকের উপর এই অনাচার চলিবে? তোমার যাহারা আশ্রিত, তাহারা কোথায় তোমাকে আনিয়াছে? আমি কি করিব? আমি যে সর্বতোভাবে অসহায়।

২৫শে ডিসেম্বর

নিত্যগোপাল, তুমিই গৌরগোপাল—একাধারে রাধা ও শ্যাম, পরাপ্রকৃতি ও পর পুরুষ। যাহারা এতদিন কলহাকলহি করিয়া কতই না পরস্পর-বিবদমান ism-এর সৃষ্টি করিয়াছে, গোটা বিশ্বসৃষ্টিকেই মিথ্যাত্বে পর্যবসিত করিয়াছে, সেই কলহের আজ অবসান ঘটিল গৌররূপের মধ্যে। কে এক বৈষ্ণব ছিলেন গৌরভক্ত। তাঁহার পুত্র রাধাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করিলে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ওরে বেটা, যাহারা বৃন্দাবনে মান অভিমান করিয়া কতই না কষ্ট পাইয়াছেন, যদি-বা মিলিয়া মিশিয়া 'এক' হইলেন, জড়াজড়ি করিয়া রহিলেন, গৌর হইলেন, তুই কি না আবার তাঁহাদের পৃথক করিয়া সেই মান অভিমানের

পাগার সৃষ্টি করিলি'! পিতামাতার যেখানে অনেকা সেই পরিবারের সন্তানদের যে দুর্নীতি, সেই দুর্নীতি আজ বিশ্ববাসীর যাহাদের দর্শনে পুরুষ প্রকৃতি এক অন্যকে অস্বীকার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র। সকালে অতুল হরেন রায়কে নিয়া আসে। সে 'সাধু'র উপর খুব চটা। আমার প্রেটেট ম্যাগের জন্য নৈবিক ১০৮টি করিয়া তুলসী পাতা এবং রেণুর হার্টের জন্য গাব্দাফুলের ভিতরকার সাদা অংশটি খাইতে বলে। প্রতিকার হাত লাগিবে না বলে। আমরা খাইতে বসিয়াছি এমন সময় অতুলের স্ত্রী আসে।...১০ টাকা নেই।...এমন মানুষ (অতুলের স্ত্রী) জীবনে দেখি নাই। আমার সামনে ২ ঘণ্টা মিথ্যা বলিয়া গেল। ধরা পড়িলেও লজ্জার কোন চিহ্ন নাই।

২৬শে ডিসেম্বর।

আমার ঠাকুর, বড় কষ্ট ঠেলিয়া সারা জন্ম চলিলাম। ইহার কি আর বিরাম নাই? সেই মালতী, আজ আবার অতুল। কত আর আমি সামলাইব? মিনুকে নিয়াও তো টানাটানি। মঠের অবস্থা আর কি বলিব? কেহ তোমার প্রচার চায় না। হুগলীতে খুব ভাল 'ভোগ' হইয়াছে, ইহাই হইল তোমার 'উৎসব'! তোমার তত্ত্ব, তোমার জীবন আলোচনার জন্য কে বসিয়া আছে? আমিই যে-অল্প বলিয়া যাইতেছি। তারিণীবাবু এটা ওটা লইয়া ব্যস্ত। তাহারও ঐ জাতীয় উৎসব ভাল লাগে, এতদিন তো তাহাই করিয়াছে। সেই পানিহাটী —কতমাস পরে নবদ্বীপ, কতদিন পর কালনা—কবে হইবে কলিকাতা, কে জানে? মঠে তো আলোচনার কোন প্রসঙ্গই নাই। চালাটা যেমন তেমন পড়িয়া রহিল! যাহা হয় কর। আমি আর পারি না। অতুলকে লুকাইয়া রাখার মত রাখিয়াছি, পাছে টানাটানি করে। কি আমার দায়? প্রাণ লইয়া আমি বিপন্ন। সততব্রত নিজের বিপদ নিজেরা আনিয়াছে, আমি কাঁদিয়া আকুল। সারা জীবনই তো এই করিলাম। রেণু দুপুরে বাহির হইয়া প্রথমে প্রেস সিণ্ডিকেট, পরে ফিলিপস্, বাসন্তী বাইণ্ডিং, স্টাণ্ডার্ড ফটো, ঢাকেশ্বরী, তাহার পর রাজেনবাবুর ওখানে হইয়া ফেরে ৭টায়। হরেন রায় আসে নাই। আজ ওবারে ৩৬টি করিয়া ১০৮টি তুলসী পাতা যাই। মন্দ ছিলাম না সেবানন্দ তুলসী পাতা দিয়া যায়। 'পরমা প্রকৃতি সারদামণি' আশুবাবুর কাছ হইতে রেণু আনে। বি, কে, পালের জামাতার সঙ্গে রেণুর প্রেস সিণ্ডিকেটে দেখা। ভাল আছে বলিল। বি, কে, পাল বোধ হয় বেলুড়ে যাতায়াত করে। এখানের আলোচনা সহ্য করিতে পারে না। আজ 'কেমন আছেন' জানিবার জন্য চিঠি দেওয়া হয়। অনেকদিন আসিয়াছেন, তাই জানিতে ইচ্ছা হয় কেমন আছেন। কোনও অভিসন্ধি আমার নাই। কেহই তো এই আলোচনা শুনিয়া আটকা পড়িল না। তবে কি যাহা বলি তাহা আমার মনঃকল্পিত? কোথা হইতে ইহা আমি পাইলাম? আমি তো বুদ্ধি দিয়া ইহা তৈয়ারী করি নাই। সহজ ভাবেই আমার জীবনে আসিয়াছে, ধীরে ধীরে নানা স্তরের ভিতর দিয়া আসিয়াছে।...

২৭শে ডিসেম্বর।

ঠাকুর, তোমার প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিব বলিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। তোমাকে যে 'জগন্নাথ' বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। হয়ত এ আমার বেয়াদপি, শখ। তাই কেহ আসে নাই, অর্থ আসে নাই, অনুকূল আবেষ্টন সৃষ্টি হয় নাই। আমি এই বয়সে কত আর দাপাদাপি করিব? কিছুই তো দানা বাঁধিয়া উঠিল না। মঠ প্রচার চায় না। তোমার বিশ্বরূপের বা স্বরূপের কিছুরই কোন খোঁজ আছে বলিয়া দেখি না। তোমার বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেছে। তুমি কোথায়? তোমার সেবা অর্থ ইহারা বড় করিয়া 'ভোগ' দেওয়াই বোঝেন। আমি কেবল তাহাতে তৃপ্ত হই না। তোমার তত্ত্বালোচনা কই? কোনও একটি মানুষই কি এই আলোচনা চায়? তত্ত্বালোচনার পাশাপাশি কীর্তন হইলে দোষ ছিল কি? আমার দ্বারা আর কিছু হইবে না। আমি বড় রিক্ত যে! যাহা হয় করিও। আমাকে বিদায় দেও। প্রেস সিণ্ডিকেট হইতে রেণু ফিলিপসের ব্লক লইয়া আসে। ওটার পর মঠে যাই। আজ সারাদিন মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি হয় দিনে ও সন্ধ্যার পর বেশ। ভিজিতে ভিজিতে মঠ হইতে ট্রামে এবং মোড় হইতে রিক্সায় আসি।...'কল্যাণ' হইতে 'সন্তবাণী অত' আসে।

উহার মধ্যে প্রভু জগদ্বন্ধু-র পর্যন্ত উল্লেখ আছে, নাই শুধু নিতাগোপাল : আমার দুঃখী ঠাকুর, আমরা তোমাকে লইয়া এই ৪০ বৎসর কি করিয়াছি? কেউ তোমাকে চিনে না। অথচ তোমারই সর্বপরিচিত হওয়ার যোগ্যতা ছিল। তোমাকে চিনাইবার, বুঝাইবার, উপলব্ধি করাইবার মত যোগ্যতা দেও: আমি আর কিছু চাই না।…শরীর মন ক্লান্ত। কি নিয়া বাকী কয়টা দিন কাটাইব যদি না ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু করিতে পারিলাম? আমার চতুর্দিকে শুধুই কণ্টক! তুলসী পাতা ১০৮টা খাই।… অমৃতবাজারে আজ কালনার সভার বিবরণ সবটা (বেণুর লেখা) উঠিয়াছে। ভাল লাগিল। কালকে হাজার লোক তো ঠাকুরের দর্শনের কিছুটা খোঁজ পাইবে। তাঁহার দর্শন ও জীবন unique! একবার ধরাইয়া দিতে পারিলে মানুষ লুফিয়া নিত—ইহা নিশ্চিত। Who will set the ball rolling? ঠাকুর, বল দেও, বুদ্ধি দেও, সুযোগ দেও। তোমাকে ধরার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া যাই। সে দিন কত দূরে?

২৮শে ডিসেম্বর

১৩ই পৌষ দাদার জন্মদিন। ঠাকুর, আমি যেরূপে তোমাকে পাইয়াছি, কিংবা যেরূপে তুমি আমার জীবনে প্রকাশিত হইয়াছ, তাহা তোমার আশ্রিতদের মনঃপূত না হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমার কাছে যেমন লোভনীয়, সর্বাঙ্গসুন্দর, বিঘ্নহীন, তেমনি সর্বচিত্তাকর্ষক। আমি সেই রূপের ধ্যানে বিভোর থাকিব। তোমাকে আমার সকল জীবনে প্রতিষ্ঠা করিব,… একদিন আমার জীবনে বিশ্ব তোমাকে খুঁজিবে। আমার দেহ-প্রাণ-মন সব তোমার 'প্রতিষ্ঠান' হউক…। সেবানন্দ দাদার জন্মোৎসব মঠে করিয়াছে। ভোগ হইয়াছে ঠাকুরের ২॥ টায়; প্রসাদ পাইয়াছে ৪টায়। কি ব্যবস্থা এদের? ৪০ জনের বেশী লোক হইবে না—অথচ ঠাকুরের ভোগ দেয় এত বেলায়? ইহারা না করিল স্বরূপের সেবা, না করিল বিশ্বরূপের সেবা? ভোগ-রাগের একটা সময় নাই? যখন ইচ্ছা তখন করিলেই হইল? তবে বিধিমার্গ অনুসরণের প্রয়োজন কি? কোনও শৃঙ্খলা কি ইহাদের আছে? সকলেই যজ্ঞের কর্ম করে, যুক্তের কর্ম-কৌশল কেউ জানে না। অথচ বিধির আচারের অন্ত নাই। ইহার নাম কি সেবা? তুমি কি জাগ্রত হইবে না? তারিণীবাবু প্রাচীর তুলিলেন, পাদিহাটির ঘর করিলেন, বাগানও করিলেন, ভোগের ঘরের ওধারে দেওয়ালও তুলিলেন। ইহাও যথেষ্ট কাজ বটে। কিন্তু ইহার পর কি করিবেন? তত্ত্ব-প্রচার কোথায়? সেটার জন্য কি কাহারও কোন মাথা-ব্যথা আছে? পথও কেহ জানে না। ঠাকুর, আমি বড় অসহায় ইহাদের মধ্যে। আমাকে বুদ্ধি দেও, বল দেও, সুযোগ দেও। কুমারের চিঠি আসিয়াছে। ২রা ও ৩রা জানুয়ারীর মধ্যে রওয়ানা হইবে।…

২৯ শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, বর্তমান বিশ্ব সমস্যায় বিব্রত; সমাধান-মূর্তি তুমিও আসিয়া রহিয়াছ জীবন ও ধর্মন লইয়া। কিন্তু যোগাযোগ তো হইতেছে না। এদিক ওদিক সে ঘুরিতেছে, ঠিক জায়গায় তো সমাকৃরূপ ব্যবসিত হইতে পারিতেছে না।…সমন্বয়-তত্ত্বের মূল তুমি। তোমার সঙ্গে বিশ্বের দেহপ্রাণমনগত যোগ কেমন করিয়া সম্ভব করিব? গোবৎস দুগ্ধের জন্য তাহার মায়ের এখানে ওখানে ঢু মারিতেছে, কে যোগ করিয়া দিবে বাছুরের মুখের সঙ্গে আর গরুর স্তনের সঙ্গে? সেই অধিকার আমাকে দেও। …আমার ধ্যান জ্ঞান সব তুমি, এই বয়সেও বাঁচিবার সূত্র তুমি.…উজ্জীবনভারতের ৭টী বৎসর শেষ হইয়া গেল। ইহার অনন্ত ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা রহিয়াছে। মানুষ থাকিলে ইহাকে কলিকাতার চিন্তাশীল মানুষদের অবশ্য গ্রহণীয় রূপে উপস্থিত করা যাইত। নূতন দর্শন লইয়া সে চলিয়াছে। বৈকাল ৪॥ টার পর মঠে যাই। ক্ষিতীশের সঙ্গে কথা হয়। মঠের প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে মিলন কিভাবে সম্ভব হয়, তাহারই আলোচনা হয়। ইহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করিয়া লাভ নাই। কেননা ইহারা বুঝিতে চায় না। বুঝিলে যে ইহাদের vested interest নষ্ট হয়। যাহা এতদিন লুকাইয়া করিয়াছে ধরা পড়ে নাই, তাহা আজ ফুটিয়া উঠিতে

চাহিতেছে। নিজেদের স্বরূপ দেখিয়া ইহারা আৎকাইয়া উঠিতেছে। এত রাগের কারণ তাই। ইহা শুভ লক্ষণ। যদি আমরা ৪।৫টী মানুষ জাগাইয়া যাইতে পারিতাম, ইহারা আসিয়া যোগদান করিত। ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই। রাত্রি ৮টার পর তারিণীবাবু আসে। রমাপ্রসাদ-বাবু এখানে নাই। হল পাওয়া যাইবে কিনা সেজন্য সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলি। ২রা জানুয়ারী সভা হইবে মনে হয় না, ১৬ই জানুয়ারী রবিবার কথা ঠিক হয়।

৩০শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি ছোটদের, অন্যকে ভাব দিয়া গেলে, তাহারা তোমার ভাবে সাড়া দিল না; তুমি ছোটদের মান বাড়াইয়া গেলে, তাহারা তোমার অপমান করিল, তুমি ছোটদের অন্তরের ব্রহ্মরস ব্রহ্মরস আস্বাদন করাইবার জন্য বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করিয়া গেলে। তুমি লিখিলে, 'অন্ন অগ্নিও পূর্ণ,...' এমন করিয়া অন্নের পূর্ণত্ব কে স্থাপন করিল? উপনিষদও তো লিখিলেন—'ন অন্নে সুখমস্তি'—অন্নে সুখ নাই। অন্নও যে অনন্ত সুখের আকর, তাহা তুমি প্রকাশ করিলে। তোমার সঙ্গে উপনিষদের মন্ত্রের সামঞ্জস্য করিতে হইলে বলিতে হয় —অন্ন ভূমার জেরই অন্ন, তাহাতে সুখ কোথায়? অন্ন ভূমার জের না থাকাই ভূমাত্ব। তুমি লিখিয়াছ, যদি বেদব্যাসের সঙ্গে জগৎধাত্রীর বিরোধ হয়, তবে জগৎধাত্রীকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। ওগো আমার ছোটদের ঠাকুর, তোমাকে আমি আমার সকল দেহমনপ্রাণ দিয়া আদর করিব; তবেই আমার প্রাণ জুড়াইবে। আমি তোমার আছি জীবনে মরণে।...আমি ৪টার পর মঠে যাই। ধীরেন ব্যানার্জী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসে। প্রধানতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যগোপালের পার্থক্য কোথায় তাহা নিয়া আলোচনা হয়। অচিন্ত্য সেনই শ্রীরামকৃষ্ণের অতি-ব্যাখ্যা করিতেছেন—ইহাই নাকি বেলুড় মঠের ধারণা —ধীরেনবাবু বলেন। কামারপুকুরের কে একজন মস্ত লোক আসিয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ মাটি খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন নিজ হাতে। আর নিত্যগোপাল? সারদানন্দের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পর 'বিদ্যার' স্তর পর্যন্ত নামিয়াছিলেন, নিত্য-গোপাল নামিয়াছিলেন অবিদ্যার স্তর পর্যন্ত। নিত্যগোপাল নির্ভীক।.....শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীধরের দেওয়া) 'ব্রহ্মাদি-জয়সংরুদ্ধদর্পকন্দর্পদর্পহা' বিশেষণটি বর্তমান যুগের কম্যুনিজম-প্রাবিত দেশে রমণীপ্রাণের একমাত্র প্রতিষেধক। অমূল্য চৌধুরীর সঙ্গে কালীরঞ্জন লাহিড়ী (মালদহ) সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 'উদ্বোধন' ও এক চিঠি দিতে বলিল তাঁহাকে। দিনাজপুরের অর্থনীতির প্রাক্তন প্রফেসার অমূল্য চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়। তিনি সংসার হইতে দূরে থাকিতে চান। কাল আসিতে বলি মঠে। ধীরেন ঘটকের সঙ্গে কথা—দার্শনিক বিপ্লব ব্যতীত কোনও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দাঁড়াইবে না, অস্পৃশ্যতা বর্জনের ইতিহাস বলি। বুদ্ধও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দিয়াছেন, শঙ্করও দিয়াছেন। ঐতদেশিক ছিল বলিয়া উহা দাঁড়ায় নাই। নিত্যগোপাল এইবার সংঘের ভিতর উহাকে কার্যাত্মক করিবেন। মঠের Executive কমিটীর সভা হয়। লাইব্রেরী করা স্থির হয়। ৩১শে ডিসেম্বর

১৯৫৫

শ্রীনিত্যগোপাল, আমার দেহমনের আশ্রয়, মদনমোহন, 'ব্রহ্মাদিজয়সংরুদ্ধদর্পকন্দর্পদর্পহা' শ্রীকৃষ্ণ আমার, তোমার আবির্ভাবে আমার জীবনের সকল কাম-সম্বন্ধ—মোহন-সম্বন্ধ গড়িয়া উঠুক মোহন-সম্বন্ধে, প্রেম-সম্বন্ধে। মোহনের আগুনে পুড়িয়া যাওয়া এই বিশ্বের বুকে, হে নব জলধর, তোমার মোহনবারি সিঞ্চন কর, তোমার প্রেমের প্রলেপে কাম-প্রদাহ শান্ত হউক। প্রিয়তম, আমি তোমার প্রেমে গলিয়া যাইব, তোমার প্রেম-সাগরে মিলিয়া যাইব, এক হইব। আমার দেহপ্রাণমন তোমার হউক, আমি তোমার মাঝে 'না' হইয়া থাকিব, ওগো আমার আমি। সকল দ্রষ্টা-দৃশ্য, ভোক্তা-ভোক্তব্য, মন্তা-মন্তব্যের সম্বন্ধ মদনমোহন-সম্বন্ধ হউক। আমার দেহপ্রাণমন যেন তোমার বিশ্বের কিছুকেই শোষণ না করে, তোমার মর্যাদায় বিশ্ব মর্যাদা লাভ করুক। তোমার মদনমোহন রূপের জয় হউক।...৪টার পর মঠে যাই। তারিণীবাবু...সন্ধ্যার পর আশুতোষ হলের সেক্রেটারীকে পাই। ১৬ই হল book

করা আছে, ২৩শে জানুয়ারী হইতে পারে। ১১২৲ টাকা হল ভাড়া, তদ্বির করিলে কম হইতে পারে। গতকল্যকার অমূল্য চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয় সন্ধ্যার পর। তাহাকে আমার 'শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে' ও সৌরের উজ্জ্বলতারত দেওয়া হয়। কিতীশের কাছ হইতে পিতা-মাতার অনেকের গানটা অমূল্যবাবুদ্বারা লিখাইয়া আনি। ৮টার পর ফিরি। আমার মঠে থাকা-কালীন হরিদাসী ভিড়গুড়, পাটালিগুড় ও কিছু আলু পাঠাইয়া দেয়।...রাত্রিতে ৪ বার উঠি। মঠের যা পারি-পার্শ্বিক অবস্থা তাহাতে ইহার কোনও ভবিষ্যৎ নাই। শুধু ঠাকুরের অনন্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে বলিয়া ইহা রক্ষা পাইবে, প্রতিষ্ঠিত হইবে। তবে কোন্ পথে কেমন করিয়া তিনি জানেন। তাঁহার দর্শন ও জীবন লইয়া বিশ্বের বুকে আগাইয়া গেলে সব ঠিক হইবে।

১লা জানুয়ারী ১৯৭৫

ঠাকুর, তোমারেই প্রাণের আশা কহিব। সুখে দুঃখে সকল দ্বন্দ্বে তোমার ঐ রাঙা চরণে চাহিয়া রহিব। কোন্ প্রয়োজনে? তোমার ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য। কোন্ সেবার জন্য বৃন্দাবন হইতে আমাকে এই জটিলতাময় সংসারে পাঠাইলে, তাহা তুমি জান। আমাকে তাহা তুমি বুঝিতে দাও। জটিলতার মাঝে পড়িয়া যখন মুহ্যমান হইব, তোমার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া আবার পথ ঠিক করিয়া লইব। তোমার জগতে প্রেম বিলাইব, বিশ্বকর্মা তোমার কাজ করিব। তোমার বিশ্বকর্ম ছাড়া অপর কোন কর্ম যেন আমি না করি। আমার দেহপ্রাণমন যেন তোমার সেবা ছাড়া আর কিছু না করে। জগন্নাথ, বিশ্বকর্মা, তোমার সেবা আমার কর্মে প্রকাশিত হউক। তুমি আমার বিশ্রাম স্থান—সকল ছুটাছুটির পর শিশুর যেমন মায়ের কোল বিশ্রামস্থান। তোমার চরণমূল হইতে যাত্রা, তোমার চরণমূলেই আমার স্থান। যমুনা ২॥ টায় যায়। ৪॥ টায় মঠে যাই। পূর্ণেন্দু ঘোষের সঙ্গে কথা হয় নিত্য-গোপাল-দর্শনের uniqueness সম্বন্ধে। 'এষা তেঽভি-হিতা সাংখ্যে'—'ধামিমাং পুষ্পিতাং বাচং' প্রভৃতি শ্লোকের নিত্যগোপাল দর্শন-সম্মত ব্যাখ্যার কথা বলি। সব পুরাণ সমন্বয় করিলেই পুরুষোত্তমের সম্বন্ধে সমগ্র দৃষ্টি লাভ হয়। শিব-কালীই বিপরীত রতিতে psycological line of development অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণ। মহাভারত পুরাণে এই তত্ত্ব নিহিত আছে। বিশ্বের প্রতিটী কণা যে প্রকৃতি-পুরুষ সমন্বিত। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্য। দুইয়েরই সমান আস্বাদন চাই। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে চূড়া বাঁশরী দিতেছেন। প্রকৃতি যাহা পুরুষও তাহা,—দুই-ই আত্মা —নিত্যগোপাল লিখিয়াছেন। নীলরতন ও কিতীশ-বাবুদের সামনে 'সংযোগিতা স্বয়া' শ্লোকটী ব্যাখ্যা করি। এই ব্যাখ্যা শুনিয়া একদিন দাশরথি পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া ছিলেন, 'অপূর্ব'। 'ধামিমাং' শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়াও উমেশ চক্রবর্তী (রাঙাদাদা) বলিয়াছিলেন ইহাই যুক্তি-সম্মত ব্যাখ্যা। শ্রীনিত্যগোপাল একদিন 'চলিবেনই'—হয়তো দেখিয়া যাইতে পারিব না। বিশ্বের সাধ্য নাই, তাঁহাকে স্বীকার না করিয়া পারে। বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছে, বিশ্বই তাঁহাকে প্রকাশ করিবে।...রোগের একটা ভোগ-কাল আছেই। 'Let the disease run its own course'।...শ্রীনিত্যগোপাল...কাহিনী-কাঞ্চনে নির্ভীক। দুঃখ কাহাকে চায়? ২রা জানুয়ারী

শ্রীকৃষ্ণ

॥ শ্রীসুনীতি সান্যাল ॥

"নব বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে একত্র হইয়া রয়" কী অদ্ভুত কথা! যে ঈশ্বর ছিলেন মানুষের তথা সর্ব জীবের শুধুই শাসকরূপে, সেই ঈশ্বর নেমে এলেন মানুষের মধ্যে, জন্ম পরিগ্রহ করলেন কংস-কারাগারে অত্যাচার-ক্লিষ্ট শৃঙ্খলবদ্ধ মানুষের মধ্যে দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিকালে বসুদেব-নন্দন রূপে, দেবকী-নন্দন রূপে। আজ সর্বহারা সকল মানুষের সঙ্গে একযোগে দেহ প্রাণ মন দিয়ে অনন্ত প্রণতি জানাই সেই ঈশ্বর-মানুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে।

কালের ধারা বেয়ে আজও সেই কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণ-কথা মানুষের অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে। বৃন্দাবনের ব্রজগোপীরা গাইলেন, 'তব কথামৃতং তপ্ত-জীবনম্ কবিভিরীড়িতম্ কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলম্ শ্রীমৎ আততম্। ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ জনাঃ'। এই কৃষ্ণ-কথা অমৃতস্বরূপ; দুঃখ-তাপ,শোক-তাপ, কাম-তাপ সকল তাপ এই কৃষ্ণ-কথায় দূর হয়ে যায়, সকল কল্মষ দূর হয়ে যায়। এই কৃষ্ণ-কথা শুনলে জীবের মঙ্গল হয়। এই কৃষ্ণ-কথায় অশোভন শোভনময় হয়।

কিন্তু কত যুগই ত কেটে গেল, লক্ষ লক্ষ মানুষ কৃষ্ণ নাম করল, মানুষের দুঃখ-তাপ, কল্মষ, অসৌন্দর্য কিছুই ত পৃথিবীর মাটী থেকে, মানুষের অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল না। কেন না আমরা যে তাঁকে পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের আসনেই বসিয়ে রেখে শুধু নাম জপেই নিজেদের পরমার্থ খুঁজে আসছি; তিনি যে বাস্তব বস্তু হয়েই আমাদের কাছে এসেছিলেন কিন্তু আমরা তাঁকে ঈশ্বরের আসনেই রেখে তাঁর বাস্তব সত্তা স্বীকার করলাম না। তাইতো আমাদের দুঃখ জ্বালা শোক তাপ দূর হল না। বস্তুতন্ত্রম্ তত্ত্বং জ্ঞানম্। মানুষের জ্ঞান যদি বস্তুতান্ত্রিক না হয় তবে তা কেবল ভাবুকতারই সৃষ্টি করে, জীবন বদলে যা যোকায় তা গড়ে না। তাই ত দেখি সভ্যতার গোড়ার দিকে মানুষ প্রাকৃতিক রুদ্র শক্তিগুলিকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে পূজা বলি ইত্যাদি দ্বারা নিজেদের নিরাপত্তার রাখার চেষ্টা করেছে মনুষ্য সভ্যতার আদিতম ইতিহাসে। এই ভাবে মানুষের ভেতরে ঈশ্বর-ভাব জাগ্রত হতে সুরু করেছিল।

ক্রমোন্নত মানব গোষ্ঠীতে বৈদিক যুগে দেখতে পাই মননশীলতা আরও উঁচু স্তরের। তাঁরা শুধু প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে ভীতির চক্ষেই দেখলেন না, যুদ্ধও হলেন এবং তাঁদের উচ্চতর মননশীলতার দ্বারা যাতে সীমিত মানবগোষ্ঠি বহু গোষ্ঠিতে এই পৃথিবীর বুকে সুস্থ দেহে মনে মিলে মিশে পরিবার, সমাজ পরিচালনা করতে পারে তারই পথ-নির্দেশ রেখে গেলেন।

এল কালের ধারা বেয়ে উপনিষদের যুগ। মানুষের চিন্তাধারায় আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সংসা। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনে জীবিত ঔপনিষদিক ঋষি মনুষ্য জীবনের চরম উৎকর্ষতা লাভের পথে রেখে গেলেন আরও নতুন-তর আলোকের সন্ধান। অতীত ইতিহাসের পূজনীয় ঋষিদের অবদানে এই জড় জগৎ ও তার প্রাণ শক্তির তথ্য মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত হল।

কিন্তু তবুও কেন আমরা যুগে যুগে দেখতে পাই মানুষে মানুষে এত ব্যবধান, এত হিংসা, এত স্বার্থপরতা, সবলের অত্যাচার দুর্বলের লাঞ্ছনা? এ ত কোন যুগের কোন ইতিহাসেই বসতি নেই!

তাই বুঝি ভাগবতের চিত্রে আমরা পাই ধরণীর বিলাপ—"আত্মানাঞ্চাশুশোচামি ভবন্তঞ্চামরোত্তমম্, দেবান্ ঋষীন্ পিতৃন্ সাধূন্ সর্বান্ বর্ণান্‌শ্চাশ্রমান্'॥ বিমর্ষা ধরণী ধর্মের কাছে অনুশোচনা করছেন, হে ধর্ম, তোমার জন্য আমি অনুতপ্ত কেননা ধর্ম আজ বিকৃত। দেবতা, ঋষি, পিতৃকুল, সাধুকুল; ব্রাহ্মণাদি সর্ববর্ণ আজ বিপথ-গামী; সংসার-আশ্রম, সন্ন্যাস-আশ্রম আজ সব কিছু পথ-

হই। কেন এমন হয়েছিল? তার কারণও নিশ্চয়ই আছে। কেননা অরণ্যবাসী ও গ্রামবাসী মানুষের জীবনযাত্রা ছিল সহজ সরল। ক্রমবর্ধমান মানবগোষ্ঠী ধীরে ধীরে নানা শাখায় বিভক্ত হতে লাগল—গ্রাম থেকে নগর গড়ে উঠল। নাগরিক জীবনের জটিলতার ভেতর দিয়ে চলতে চলতে মানুষের মন-বুদ্ধি অধিকতর জটিলতার আবর্তে ডুবতে শুরু করল। এই সব জটিলতার সমাধান দিতে যুগে যুগে নানা সম্প্রদায় নানা মতবাদের সৃষ্টি হল। প্রত্যেকেই বললেন আমার মতবাদই জীবনের চরম মীমাংসা দিতে একমাত্র, অদ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথের "সুধাই যত পথের লোকে এই বাঁশিটি বাজাল কে? নানান্ নামে ডোলায় তারা নানান্ ধারে বেড়াই ঘুরে"। বেদ-উপনিষদের বাণী আমরা আমাদের নৈব মন বুদ্ধিদ্বারা মনন করে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণের দ্বারা বিশ্লেষণ করেছি, যার ফলে দেখা দিয়েছে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব। রাজায় প্রজায়, নর-নারীতে, ধনিক-শ্রমিকে উচ্চ বর্গে নিম্ন বর্গে শুধু শোষণ। ভারতের উপনিষদ্ কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব-কিছুকে প্রাণ-রসে ভাবিত করে আস্বাদান করতে বলেছেন। কাল-বিবর্তনে ভারতের মাটি হতে এই প্রাণধর্ম অন্তর্হিত হতে শুরু করে। শুধু চলতে থাকে বুদ্ধির কারসাজি। কী ধর্মনীতি, কী রাজনীতি প্রতি ক্ষেত্রে মানুষ এই প্রাণ-ধর্মকে বাদ দিয়ে শুধু বুদ্ধির কসরতই কয়েক যুগ ধরে চালানোর ফলে সর্বক্ষেত্রে শোষণের চিত্র সেদিন উৎকট হয়ে উঠেছিল। তাই ধরার গ্লানি, ধরার সর্বজীবের গ্লানি, পরিবারের গ্লানি, সমাজ ও রাষ্ট্রের গ্লানি দূর করবার জন্য এসেছিলেন ঐতিহাসিক মানুষ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সমগ্র জীবন খানির মধ্যে আমরা কী দেখতে পাই? তিনি পিতা-মাতার সার্থক সন্তান, ব্রজগোপীদের প্রাণবল্লভ, রাখাল-বালকের রাখাল-সখা; আবার একই জীবনের আরেক দিকে অত্যাচারী কংসপ্রমুখ রাজানিধনকারী—"মৃত্যুর্তে জিগতে", কুরুক্ষেত্রের বুকে দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ, বিশ্ব-দার্শনিক। এক কথায় তাঁর জীবনে কোন কোঠাবিভাগ নেই। মানুষের সামগ্রিক জীবনের সকল দৃষ্টিকোণের সুসামঞ্জস্য তাঁর জীবনের মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায়। তাই ত যুগে যুগে তিনি আমাদের আরাধ্য, তিনি ভগবান, তিনি পুরুষোত্তম। তাঁরই মুখের বাণী "অতঃ লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ"। ভগবৎ সত্তার লক্ষণ শাস্ত্র বলেছেন, "বিস্তীর্ণস্য গভীরস্য বিবিধ ভগলক্ষণম্"—যাঁর জীবনে বিস্তার ও গভীরতা সমভাবে বিদ্যমান, তিনি ভগবান। তাই ত ভাগবত বলেছেন "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"। শ্রীকৃষ্ণ জীবনের মত এতখানি বিস্তৃতি ও এতখানি গভীরতা আজ পর্যন্ত কোন জীবনে পরিলক্ষিত হয়নি। আবার একই জীবনে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও মোক্ষ সব কিছুর সমভাবে বিদ্যমানতা—এ-ও মানুষ-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবনেই বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। তাই পাঁচ হাজার বছরের আগের মানুষটি আজও মানুষের কাছে হারিয়ে যায় নি, আশ্চর্যবৎ হয়ে রয়েছেন।

আশ্চর্য তাঁর চলার ছন্দ! মানুষ কঠিন কৃচ্ছ্রতার ভেতর দিয়ে জীবনের সকল বৃত্তিকে শুকিয়ে ফেলে পারমার্থিকতা খুঁজেছে। শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জীবনের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ সকল স্তরের পরিপূর্ণ আস্বাদন করেও কেমন করে সর্বাতীত হওয়া যায় তা তাঁর জীবনের চলার ছন্দ দিয়ে প্রমাণ রেখে গেছেন। নির্লিপ্তের লিপ্ততাই তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাই তিনিই একমাত্র বলতে পারেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'—কর্মের কৌশল শিক্ষা-দানই নটবর শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মূল কথা। তাই বুঝি তাঁর সাধের বিশ্ববাসী এই কর্ম-কৌশল শিক্ষা করে যাতে জীবন ও জগৎ নতুন করে সৃষ্টি করতে পারে এই আশাতেই জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের আপনজন হয়ে, প্রাণের মানুষ হয়ে সকল অন্ধকারের বুক চিরে এসেছিলেন।

দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছর ধরে প্রকৃতির দোললীলায় আমরা মানব জাতি সভ্যতায় অনেক ধাপ এগিয়ে এসেছি। কাল পরিণামে আমরা শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্তিত প্রাণ-প্রজ্ঞা সমন্বিত পথের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। এই বুদ্ধি-শাসিত সভ্যতার যুগে মানুষের প্রাণ-ধর্ম আজ লুপ্তপ্রায়। বুদ্ধির শাণিত ছুরিকাঘাতে মনুষ্য সমাজ

বিরাজমান, খণ্ডে খণ্ডে বহুধাখণ্ডিত। আস্তিক্যবাদ, নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, অজড়বাদ এমনই কত শতসহস্র বাদে (ism) মানুষ আজ দিশাহারা। সকল ismই আজ মানুষের কাছে পরীক্ষিত। সমাধান কোথায়? এ যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে হরে মুরারে। হরি মুরারীর হৃদর্শিত পথ ছাড়া মানুষের আজকের দিনে নতুন করে বাঁচার পথ কই।

তাই আজকের দিনে আবার নতুন করে ভাববার দিন এসে গেছে। এসে গেছে কৃষ্ণকথা নতুন করে শোনবার এবং শোনাবার দিন। দীর্ঘদিন ধরে ভারতের ভাগ্যাকাশে ধ্বনিত হয়েছিল কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের বাণী। আজ সেই কামিনী কাঞ্চনের ভূত মানুষের ঘাড়ে চেপে জীবনযাত্রা বীভৎস করে তুলেছে। পুরুষের পুরুষ-কৌলীণ্যের অভিমান, নারীর হেয়ত্বের অপমান, ব্রাহ্মণের কৌলীণ্যের দম্ভ, ধনীর ধনের রুদ্র চাপ, মোক্ষ-কাঙ্ক্ষী ধার্মিকের জড় জগতের প্রতি ঘৃণার কী পৈশাচিক প্রতিক্রিয়া সমাজের বুকে দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবন ও দর্শন দিয়ে রেখে গেছেন কী আশ্চর্য্য চলার কৌশল। যেখানে প্রাণের ভাষা মনবুদ্ধির ভাষা সমন্বিত তাই-ই কৃষ্ণভাষা। যে কর্ম প্রাণরসে কৃত সেই কর্মই কৃষ্ণ-কর্ম। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ভাষায় "যে কর্ম আত্মকল্যাণ-প্রসূত ও বিশ্ব-কল্যাণ-প্রসূত তাই-ই কৃষ্ণ-কর্ম"। বৃন্দাবনের সেই আশ্চর্য্য মানুষটী তাঁর বংশীধ্বনিতে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এই পথে চলার জন্য। কৃষ্ণ-বংশী নিনাদে পশুপাখী সেদিন আনন্দিত হয়েছিল, তরুলতা পত্রপুষ্প শোভিত হয়েছিল, যমুনা উজান বইত। বিবর্ণা ক্ষীণা প্রকৃতি বৃন্দাবনে রাইরাঙ্গা আর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির মান ভঞ্জনে, মান দানে রত। "দেহি মে পাদপল্লবমুদারম্" এই চিত্রই আজ মানুষের আরাধ্য। বৃন্দাবনই একমাত্র গণতন্ত্রের দেশ। আজকের ভারত-বাসী তথা বিশ্ববাসী যদি শ্রীকৃষ্ণ-চরণতলে বসেই গণতন্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ না করে তবে জনযৌবন জল তরঙ্গ রোধ করবার আর দ্বিতীয় পন্থা নেই। গীতায় তিনি বললেন "যাবান্ স্চানি বেত্তি তত্ত্বতঃ"—তাঁর জীবনতত্ত্ব আজ সর্ব্বহারা বিশ্বের বোঝবার দিন এসেছে। পুতুল কৃষ্ণের পূজা না করে আমরা যেন জীবন-তত্ত্বমূর্ত্তি কৃষ্ণের পূজারী হই।

পরিবার, সমাজ বা জাতিকে শোষণ করে মুখে লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করলেও জগতের গ্লানি দূর হবে না, দূর হবে না জগতের বন্ধন। কোন গ্লানিই যে মানুষের অন্তর থেকে যায়নি তারতরঙ্গীর কাছে আজ এটা প্রত্যক্ষ। তাই ত আজকের সমাজের একদল এমন কৃষ্ণ-নামের প্রতি মহা অবিশ্বাসী। কৃষ্ণনামের পাশে যদি ঐ পরিবার, সমাজ তথা জাতির সেবাবুদ্ধি না থাকে তবে লক্ষ কৃষ্ণ নামেও জীবনকে করবে ব্যর্থ।

যেদিন থেকে একমাত্র বুদ্ধিমাত্রাই ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার জীবন, সমাজ-জীবন গড়বার মূল মানুষ গ্রহণ করল, সেদিন থেকে গ্রামের সহজ সরল জীবন পড়ে গেল বাদ। শহর গড়ে উঠল, শহরের কৃত্রিম শিক্ষা, কৃত্রিম সভ্যতা, কৃত্রিম মিলন-বিকৃত জলবায়ু মানুষের জীবনকে সর্ব্ব প্রকারে বিকৃত করে তুলল। লাঙ্গল চাষীর মূল হিসেবে উচ্চ বর্ণের কাছে অপাংক্তেয় হল। কলমই হল সভ্য-ভব্যের একমাত্র লক্ষণ। অন্তঃসারশূন্য বহিঃ চাকচিক্যময় বিলাসোপকরণ হল মানুষের মানুষ পরিচয়ের নিদর্শন।

আজকের মানুষ এই বিকৃতি থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ত্রায়স্ব ত্রায়স্ব বলে যুগান্তের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে উদ্যত। পথ ত সে হারিয়ে ফেলেছে—তাই একে অন্যের খুনে রক্তস্নান করে মনে করছে প্রায়শ্চিত্ত বুঝি করলাম। সত্যিই আজ প্রায়শ্চিত্তের দিন আমাদের এসেছে। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাঁরই চরণ তলে, যিনি ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে এসেছেন এই ধরার মাটীতে ধরার ভার লাঘব করতে। আজকের এই দিনটীতে আমরা তাঁর জীবন-কথা তত্ত্বতঃ অবধারণ করব, নিজ জীবনে রূপ দেব এবং বিশ্ব-জীবনে তাঁর তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলবার সাধনায় ব্রতী হবার সংকল্প গ্রহণ করব। তবেই হবে আমাদের সকল কল্মষ, সকল অশোভন অপনীত, আকাশে বাতাসে আনন্দের হিল্লোল বইবে, কৃষ্ণ-কথায় তখনই জগৎ ধন্য হবে, ধনী হবে।

বাংলাদেশ : একটি সার্থক স্বপ্ন

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

জাগরণ

সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি জীবনের বলিষ্ঠ প্রকাশ,
প্রচণ্ড কল্লোলধ্বনি সাগরের শুনি কান পেতে
এক জাতি, এক প্রাণ, সম্মুখেতে মহান মানুষ,
প্রতি পদক্ষেপে তার কী দৃঢ় প্রত্যয়, অঙ্গীকার।

সত্তা স্বাধীনতা চাই, শেষ হোক শোষণ-শাসন ;
মাতৃভূমি মাতৃভাষা—মুক্তি চাই দুই জননীর ;
মানবো না কোন বাধা—সারা দেশে একমাত্র পণ :
এত শক্তি কোথা ছিল, কে জোগাল কোন্ মন্ত্র বলে।

সহ্যের সকল সীমা ভেঙে চুরে সব খান খান,
আর নয় এইবার সময় এসেছে বাঁচবার ;
সে বাঁচার এক মন্ত্র 'জয় বাংলা' কোটি কণ্ঠে জাগে
সেই ধ্বনি ভেসে যায় দেশে দেশে, আকাশে বাতাসে।

জীবনের সমারোহ কী বিপুল, কি মহিমময়।
শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে গাই সেই জীবনের জয়গান।

॥ নৃশংসতা ॥

কোন অপরাধ তারা করেনি অথচ
কী নির্মম অত্যাচার তাদের ওপর,
শাসনের নামে ওই দানবের দল
ঝরে গেল ! পথে পথে অসংখ্য জীবন।
দিকে দিকে হাহাকার। নিমেষে শ্মশান
সুসমৃদ্ধ জনপদ ! এ কোন্ শাসন !
হত্যা শুধু চারি ধারে রক্তদলের সারি।
গলিত শবের গন্ধ। এই দানবতা
সবাই দেখলো চেয়ে। কী আশ্চর্য তবু
সমস্বরে উঠলো না কোন প্রতিবাদ !
বললো না : এ অন্যায়, সভ্য জগতের
মাঝে এই বর্বরতা—এর শাস্তি চাই।
সভ্যতার অভিমানী মিথ্যে মানুষেরা
দেখলো এ দৃশ্য শুধু স্থাণুর মতন !

সংগ্রাম

সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে নির্ভীক সেনাদল,
বীর সেনাদের পদভরে মাটি কাঁপে ওই টলমল।
'নির্ধন হাতে হানো হানাদার,'
হাঁকে ওই শোন, দেরী নয় আর ‖
শেষ ক'রে দাও শয়তানদের যত কিছু সম্বল।

ওই দিকে দিকে অযুতকণ্ঠে জাগে অভিনন্দন ;
শোষণ মুক্ত নরনারী গায় সঙ্গীত-বন্দন।
'জয় হিন্দ' 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে
ভাসে পথঘাট শত্রু শোণিতে,
পূব দিগন্তে জাগে নবারুণ রক্তিম উজ্জ্বল।

আত্মসমর্পণ

পূবদিগন্তে নব জীবনের গান
কান পেতে শোন : বেদনার অবসান।
বন্ধুর পথ, তবু না আঁধার,
ঝরে গেল কত রক্তের ধার :
এবার মিলেছে আলোকের সন্ধান।
দীর্ঘ দিনের অসম্মানের শেষ ;
দেশের মানুষ ফিরে পেল তার দেশ।
শ্মশানের বুকে নতুন জীবন,
এগিয়ে চলার নব আয়োজন ;
জাগ্রত আজ সাড়ে সাত কোটি প্রাণ। *

---

* ১৬, ১২, ৭১, ৪-৩১ মিনিটে আত্মসমর্পণ।

অঘটন

মৃত্যুদণ্ড দে'য়া হ'ল। বরণও প্রস্তুত।
কেবল প্রতীক্ষা চলে শেষ মুহূর্তের।
অন্ধকার চারিধারে, এক বিন্দু নেই
বাহিরের আলো সেই বন্ধের অন্তরে।
সহসা কী অঘটন! বন্দীর বন্দনা
দিকে দিকে ওঠে আর কারার দুয়ার
মুক্ত হয়। সাড়ে সাত কোটি মানুষের
সাথে মানবতাবাদী বিশ্ব মানবের
মিলিত শুভেচ্ছা বহ্নি। মৃত্যু সসঙ্কোচে
দূরে সরে যায়। জাগে কী বিপুল ধ্বনি
আনন্দিত জীবনের। প্রেমের আসনে
প্রতিষ্ঠিত হয় 'বন্দী' মহা সমারোহে।
মানবতা চিরজয়ী। অপমৃত্যু তার
নেই, নেই। শিখা তার চির দীপ্যমান।

সশ্রদ্ধ স্মরণ

এ দৃশ্য দেখল না তারা; জল্লাদের হাতে
প্রাণ দিল এই দৃশ্য দেখার আগেই।
কোন অপরাধ তারা করেনি কখনো,
তবুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল দানবের
ঘৃণ্য হাতে কী নির্মম, কী নিষ্ঠুর ভাবে!
তাদের স্মরণ করে বেদনায় বুক
ভরে ওঠে। দুই চোখে নেবে আসে জল।
এ মুক্তির আনন্দের এই পুণ্য ছবি
দেখল না দেখতে তারা পাবে না কখনো।
অথচ এ ছবি তারা সারাটি জীবন
বুকে নিয়ে খুঁজছিল অধীর প্রহর।
আজকে মুক্তির দিনে, আনন্দের দিনে
এ বেদনা কী যে ব্যথা জাগায় অন্তরে!
বারে বারে মনে পড়ে যারা নেই আজ।

প্রত্যাবর্তন

সাড়ে সাত কোটী মানুষের প্রাণ আনন্দে উদ্বেল,
আসবে তাদের নেতা, মহানেতা মুজিবুর রহমান।
অন্ধকারের তন্দ্রিমা ভেদ ক'রে ওই জাগে আলো;
সে-আলোকে ম্লান করার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হল।
সূর্যের পথ রোধ করে কার শক্তি এমন আছে?
সে চিরদীপ্ত মহিমান্বিত; যে পথ দিয়ে সে চলে,
আলো ভরে দেয়। জয় জয় জয় ধ্বনি ওঠে চারিধারে
সেই আলো আজ আসবে স্বদেশে, প্রতীক্ষা অবসান।
অনেক রক্তে-রাঙা পথে আজ আসে সে মহানায়ক;
পুষ্পে মালে আসা-পথখানি ছেয়ে গেছে, জয়ধ্বনি
ওঠে সাড়ে সাত কোটি কণ্ঠের মুহু উচ্চারণে—
এস মহানেতা, পুনা তোমার দীপ্ত আসনে বস।
সে-আসন নয় মণিমুক্তায় খচিত সিংহাসন,
সে-আসনখানি প্রেমের আসন দেশের হৃদয়ে পাতা;
সে-আসে এসে বস হে বন্ধু, বন্ধবন্ধু তুমি,
তারপর নিয়ে চলো সে-মানুষে নবজীবনের পথে।
জানাই তোমাকে স্বাগতম্, হে বন্ধু বরণীয়,
তিমির রাত্রি শেষ হয়ে গেছে, আলোর যাত্রা সুরু।

মহাদানে বন্ধ-বন্ধু

অনেক উন্নত মাথা নত করে সে এসে দাঁড়ালো
কী বলিষ্ঠ, কী উজ্জ্বল, কী দৃপ্ত ভঙ্গিমা!
কোথাও জড়তা নেই, এতটুকু নেই কৃত্রিমতা,
চেয়ে চেয়ে মুগ্ধ হই—জীবন্ত মানুষ একজন।
আবেগকম্পিত স্বর, কত কথা দুঃখ বেদনার;
অশ্রুঝরা সেই স্বর কখনো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে,
শ্মশানের বুকে গড়ে তুলতেই হবে নব তাজ,—
এতটুকু দ্বিধা নেই সেই কণ্ঠে, নিরুক্তির মত।
কঠিন সে কণ্ঠস্বর ছুটে যায় আকাশে বাতাসে।
অসংখ্য মানুষ শোনে মন্ত্রমুগ্ধ সে দৃপ্ত ভাষণ,—
অন্তরে অন্তরে তার রেশ ওঠে, শিহরণ জাগে।
কেঙে ফেলে দেয় সব জড়ত্বের সুদৃঢ় বন্ধন।
সব জটিলতা মুক্ত সহজ সুন্দর সুকঠিন
প্রেমসিক্ত সে-বাণীর কাছে নত মানবক দল;
মনে মনে বিচলিত আপনার দীনতা স্মরণে,
লজ্জায় লুণ্ঠিত শির—সম্মুখেতে মহা মহীরুহ।
অমিত ঐশ্বর্য নিয়ে জয় করে নিল সে সবার
সহৃদয়-হৃদয় ভূমি। জয়তু হে নায়ক মহান।

ক্রম অনুযায়ী নিজে-শেখো

(Programmed Instruction)

॥ শ্রীসুবোধ কুমার সেনগুপ্ত ॥

শ্রেণী-শিক্ষণের অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে নানা শিক্ষণের পদ্ধতির উদ্ভাবনের কথা আমরা জানি। ডালটন ও উইনেটকা পরিকল্পনায় ব্যক্তিমুখী শিক্ষণপদ্ধতির মধ্যে শিক্ষার্থী কি ভাবে নিজ নিজ সামর্থ্য, আগ্রহ, ঔৎসুক্য প্রভৃতির ইত্যাদিকে ভিত্তি করে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হয় তাও দেখা গিয়েছে। সেখানেও 'নিজে শেখো' এরূপ একটি ভাবধারা শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বর্ত্তমান ছিল।

এখানে আরও একটি প্রগতিশীল শিক্ষণপদ্ধতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। এটি হচ্ছে 'ক্রম অনুযায়ী নিজে শেখো' বা Programmed Instruction। Programmed Instruction কি ?

ক্রম অনুযায়ী নিজে-শেখো হচ্ছে একটি স্বয়ংক্রিয় শিক্ষা-পদ্ধতি (Auto Instructional method) এবং এ ব্যবস্থা শ্রেণীশিক্ষকের ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে বদ্ধপরিকর. Programmed Instructionএর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে James Michael Lee বলেছেন যে ক্রম অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীকে এমনভাবে সুপরিকল্পিত-ভাবে সাজিয়ে দিতে হবে যে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বস্তু নিজে শিখতে পারে এবং সঠিক ভাবে তা শিখেছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার স্বয়ংক্রিয়তা এমন কিছু অভিনব নয়, কারণ সত্যিকার উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এই নীতি যে অনুসরণ করা হয়নি এমন নয়। তবে পূর্বে শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে শিক্ষার্থীর স্বয়ংক্রিয়তা থাকলেও তা নিয়ন্ত্রিত হত শিক্ষকের দ্বারা। কিন্তু এখানে শিক্ষকের ভূমিকা নগণ্য। তাহলেও Programmed Instruction এ শিক্ষকের ভূমিকা একান্তভাবে অকিঞ্চিৎকর নয়। তাঁকে Programmed Instructionএর সমস্ত ধরণের কার্যক্রম শিখে ফেলতেও হবে, তবেই তিনি শিক্ষার্থীদের স্বয়ংক্রিয় শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিচালনা করতে পারবেন। তাঁকে জানতে হবে ক্রম অনুযায়ী নিজে শেখো পদ্ধতির প্রকৃতি, নির্বাচিত বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাযন্ত্র, শিক্ষাক্রম লিখন, শ্রেণী শিক্ষণের পূর্ব ভূমিকা, এবং নিজে শেখো বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষণ ব্যবস্থা। Programmed Instruction-কে মূলতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা শিক্ষাশ্রয়ী যন্ত্র বা Teaching machine এবং ক্রমানুযায়ী "নিজে শেখো" পাঠ্যপুস্তক।

Programmed Instructionএর উৎস, ব্যাপ্তি ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

Programmed Instructionএর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে জানবার পূর্বে এর উৎস, ব্যাপ্তি ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আমাদের জানা প্রয়োজন। Programmed Instruction পদ্ধতি সর্বাধুনিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া যা ভারতে বর্ত্তমানে প্রচলিত হবার উপক্রম। The National Institute of Education এই 'নিজে শেখো' programmed Instructionটির বহুল প্রচারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে National Institute of Educationএর অধীনে Indian Association for Programmed Learning নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়েছে এবং তারপর থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এইরূপ উপসমিতি গড়ে উঠেছে। দিল্লীতে এবং রাজ্যের বিভিন্ন Regional College এ জাতীয় শিক্ষার জন্য শিক্ষণ ব্যবস্থা হচ্ছে।

শিক্ষাদান সংক্রান্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এমন একটি শিক্ষাদান কৌশল যা শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু প্রদান করে এবং শিক্ষার্থী সেই বিষয়বস্তু যথাযথরূপে আয়ত্ত

করতে পেরেছে তা পরীক্ষা করে দেখে এবং যদি শিক্ষার্থী ভুল করে তা শুধরে দেবার জন্য ব্যবস্থা থাকে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাবিদ Sidny L. Pressy এই যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং এই শিক্ষাযন্ত্রের সামরিক প্রশাসনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে প্রয়োগ করা হলেও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই প্রক্রিয়া জনপ্রীতি লাভ করেনি। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাবিদ Skinner এই যন্ত্রটিকে আরও সংস্কার করে এই যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও জনপ্রিয় করে তোলেন।

মনোবিজ্ঞানবিদ B. F. Skinner শিক্ষায়ন আবিষ্কার সম্পর্কে যে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি অবলম্বন করেছিলেন তা বর্তমানেও প্রচলিত। মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ হচ্ছে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার (Stimulus Response Theory) তত্ত্ব এবং পুনরুপস্থাপনের সূত্র (The Law of reinforcement)।

Skinnerএর পরে N. A. Crowder Programmed Instructionএর একটি তত্ত্ব ও প্রয়োগ ব্যবস্থার আবিষ্কার করেন যার সাথে Skinnerএর আগে মতানৈক্য রয়েছে। প্রথমত: Crowder বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার্থী ভুল করতে করতে শেখে। দ্বিতীয়ত: Crowderএর মতানুযায়ী ক্রমবিশিষ্ট পাঠসূত্র উচ্চ শিক্ষায় প্রয়োজনীয়। তৃতীয়ত: Crowder বলেন যে কোন লেখকই এমনভাবে programmeএর পরিকল্পনা করতে পারেন না যা সকল শিক্ষার্থীর পক্ষেই উৎকৃষ্ট। বিভিন্ন স্তর এমন স্বাভাবিক ভাবে পর পর সজ্জিত থাকবে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী স্বীয় ব্যক্তিত্বের গঠন ও সামর্থ্য অনুযায়ী অগ্রসর হতে পারে।

শিক্ষালাভের এই নূতন পদ্ধতি আমেরিকাতে সুরু হয় এবং বর্তমান যুগের পক্ষে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত সুফলপ্রসূ হবে বলে Programmed Instructionএর নীতি ইংলণ্ড, জাপান, রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশ গ্রহণ করে। আমাদের দেশও এই শিক্ষণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে তবে ব্যাপক ভাবে এখনও চালু হয়নি। এজন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

প্রয়োগের ক্ষেত্রে একক পাঠ পরিকল্পনা (unit plan) 'ক্রমানুযায়ী নিজে-শেখো' বা programmed Instructionএর পরিকল্পনা দুইই বিপরীত প্রক্রিয়া মূলক। একক পাঠ পরিকল্পনা বা planএ সমগ্র হিসেবে পাঠের বিষয়বস্তু ধার্য হয় কিন্তু Programmed Instruction পরিকল্পনায় অংশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশী।

শিক্ষাপ্রদানমূলক যন্ত্র (Teaching machine)

শিক্ষাপ্রদানমূলক যন্ত্রগুলি সাধারণভাবে পরিকল্পিত বা Electronic Computor এর মত হয়ে থাকে। দুরা বাহুল্য সরল বা জটিল দুই ধরণের শিক্ষাপ্রদান মূলক যন্ত্রই স্বয়ংক্রিয়। শিক্ষাপ্রদানমূলক যন্ত্র সত্যিকার রক্তমাংসের শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষাদানে বেশী কৌশলী এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের পূর্ণ পরিবর্ত হিসাবে Teaching machineকে ধরা যায়।

শিক্ষাপ্রদানমূলক যন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শিক্ষা প্রধানকারী যন্ত্রের কলকব্জাগুলি এবং 'ক্রম অনুযায়ী নিজে শেখো' বিষয়বস্তু, সমস্যা ইত্যাদি অর্থাৎ programmed material গুলি এমন ভাবে সাজান যে শিক্ষার্থী এক স্তরে শিক্ষা সমাপন না করলে অন্য স্তরের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না।

একটি শিক্ষাপ্রদানমূলকযন্ত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রম অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পাঠ বিভক্ত থাকে। সাধারণ সরল যন্ত্রে শুধু ছাপা জিনিস নিয়ে কাজ চলে। কিন্তু জটিল যন্ত্রাদিতে নক্শা, চিত্র, চলচ্চিত্রের ফালি (films strips) এবং অন্যান্য শিক্ষোপকরণের ব্যবহার হয়। পাঠের ক্ষুদ্র অংশকে বলা হয় কাঠামো বা frame। মাত্র একটি frame এক সময়ে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করা হয়। প্রতারণা এই যন্ত্রে অসম্ভব। কারণ শিক্ষার্থীর সঠিক উত্তর দানের পরই যন্ত্র থেকে সঠিক উত্তর বের হয়ে আসবে।

শিক্ষা প্রদানকারী যন্ত্রের সুবিধা (Advantages)

প্রথমত: এ পদ্ধতি অত্যন্ত সক্রিয় পদ্ধতি। শিক্ষার্থী প্রতি স্তরে সক্রিয় হয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে,

কারণ প্রতি স্তরে শিক্ষার্থীর কাজ শেষ করে পরের স্তরের কাজটুকু করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ—প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার নিজের শিক্ষার গতি অনুযায়ী শিখতে সাহায্য করে। তৃতীয়তঃ—কাজগুলি যদি ক্রম অনুযায়ী সন্নিবেশিত হয় তাহলে নানা ধরনের শিক্ষায় তা কার্যকরী হবে; যেমন শিক্ষার্থী মুখস্থ করবে, সমস্যা সমাধান করবে, বিমূর্ত চিন্তা করবে ইত্যাদি। চতুর্থতঃ—এর পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট করে বলা যায় যে সে জ্ঞানের স্তরটি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। বলা বাহুল্য সাধারণ শ্রেণী শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব আমরা জোর গলায় স্থাপন করতে পারি না। পঞ্চমতঃ—শিক্ষা প্রদান মূলক যন্ত্র কার্যশেষে শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করে বা শাস্তি প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ যদি উত্তর সঠিক হয় তাহলে শিক্ষার্থীকে পরের স্তরে যেতে দেওয়া হয়। আর সে ভুল করলে তাকে পুনরায় সেই সমস্যাটির সমাধান করতে হয়। পুনরুপস্থাপনের সূত্র অনুযায়ী এখানে কাজ চলে। ষষ্ঠতঃ—শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার্থীর ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে অবহিত হতে সাহায্য করে এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর ত্রুটিসমূহ অপসারণ করতে অগ্রসর হতে পারেন। সপ্তমতঃ—এ ব্যবস্থা প্রতারণা নিরোধক, কারণ শিক্ষার্থীকে প্রথমে programmed materials পড়তে হয় এবং তার উপরই কাজ করতে হয়। তারপরই সে উত্তর দেখতে পারে, নকল করার আর তার কোন সুযোগ থাকে না।

অসুবিধা (Disadvantages)

শিক্ষাপ্রদানকারী যন্ত্রের কিছু অসুবিধাও আছে—প্রথমতঃ—স্বয়ংক্রিয়মূলক যন্ত্র শিক্ষাপ্রদানমূলক হলে কি হবে, যন্ত্র ত বটেই এবং জীবন্ত শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থী যেরূপ শিক্ষালাভ করতে পারে, যন্ত্রের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না। যন্ত্রের সম্পর্কে বলা যায় সেখানে Law of reinforcement অনুযায়ী কাজ হয়। উত্তর শুদ্ধ হলে পরবর্তী স্তর অর্থাৎ পুরস্কার আর উত্তর সঠিক না হলে পুনরায় তা করা, কিন্তু শিক্ষকের কাছে উত্তর সঠিক ও বেঠিক যাই হোক না কেন, যে আচরণ লাভ করে, তাতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্বন্ধীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ—সাধারণ শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থী কাজ করতে যে উৎসাহ বোধ করে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কাছে শিক্ষার্থী তা লাভ করে না। চতুর্থতঃ—যন্ত্র শিক্ষার্থীর সৃজনাত্মক সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি ত করতেই পারে না, বরং খর্ব করে থাকে। পঞ্চমতঃ—স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষার ফলে প্রত্যেক অঞ্চলে, এমন কি সমগ্র দেশেই একই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হবে এবং আঞ্চলিক বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তি বৈষম্যের প্রকাশ পাবার সুবিধা এখানে হবে না। ষষ্ঠতঃ—যন্ত্র প্রয়োগের পর উত্তর সঠিক কিংবা বেঠিক হল তা জানা যেতে পারে কিন্তু কেন শিক্ষার্থীর উত্তর ভুল হল তার কোন ব্যাখ্যা ত সেখানে নেই।

ক্রম অনুযায়ী নিজে শেখো পাঠ্য পুস্তক

Programmed Instruction Text book বা নিজে শেখো পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় আবশ্যকীয় স্তরগুলি হচ্ছে তিনটি—(১) উপস্থাপন (presentation) (২) প্রতিক্রিয়া (Response) এবং পুনরুপস্থাপনের সূত্র (The Law of Reinforcement)। একটি নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষার্থী ক্রমস্তরের কাজ করে। একটি work book এবা স্বয়ংক্রিয় অনুশীলনী হতে শিক্ষার্থী ১ম ও ২য় স্তরের কাজ করতে পারে কিন্তু একটি Programmed Text Book বা নিজে শেখো পাঠ্যপুস্তক হতে শিক্ষার্থী তিনটি স্তরেরই কাজ করতে সক্ষম। এখানেই Programmed Text Bookএর বৈশিষ্ট্য।

Programmed Text Book-এর সাহায্যে ব্যক্তিগত শিক্ষণ শ্রেণীতে সম্ভব এবং শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে ক্রম অনুযায়ী নিজে শেখো পাঠ্য পুস্তকের উপযুক্ত বিষয়বস্তু। এই নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করতে পারে। শিক্ষার্থীর দু'জন শিক্ষক—একজন হচ্ছে programmed পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যজন হচ্ছেন শ্রেণী শিক্ষক। প্রথম শিক্ষক শিক্ষা দেয় শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু এবং দ্বিতীয় শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করেন।

Programmed Iustruction-এ শ্রেণী শিক্ষকের ভূমিকা

Programmed instruction-এ শিক্ষকের ভূমিকা একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়। কারণ প্রথমেই বলা হয়েছে শিক্ষককে Programmed instruction এর বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্বন্ধে অবহিত হবে। কিন্তু যান্ত্রিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান এক জিনিষ আর প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান সাহায্য এক জিনিষ। Text Book অনুসরণ কালে শিক্ষকের কিছুটা সাহায্য নিতে হলেও শিক্ষাপ্রদানমূলক ঘন্ত্রে যখন শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করতে বসে তখন শিক্ষকের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই।

আমরা teaching machine এর অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যে সম্পর্ক তা যান্ত্রিকতার মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। অতএব শিক্ষাও হচ্ছে যন্ত্রাশ্রয়ী। কিন্তু জন শিক্ষা (mass education)-র চাপে আমরা যতই যান্ত্রিকতার জন্য চীৎকার করি না কেন শিক্ষাদান মূলক যন্ত্র কখনও রক্ত মাংসের শিক্ষকের পরিবর্তন হতে পারে না।

সমালোচনা :—

Programmed instruction নিয়ে খুবই কম পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। এটি এখনও শিশু-স্তরেই আছে বলতে হবে। এর সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা সময় সাপেক্ষ। প্রথমত: Programmed instruction-কে যত সহজ মনে করা হচ্ছে ততটা সহজ নয়, কারণ এর প্রস্তুতির জন্য প্রচুর সময় প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে সঠিকভাবে সাজান এবং সঠিক উত্তর নির্দেশনা সহজ-সাধ্য নয়। তবুও আশার বিষয় এর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং Indian Association of Programmd learning, N. C. E. R. T র সাহায্য নিয়ে অনেক ক্রমানুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু তৈরী করেছেন।

অভাবিত

॥ শ্রীমান ॥

'বাবু, দুটো পয়সা দিয়ে যাও। আমার ছেলেগুলো না খেয়ে মরছে।'

কথাটা কানে গিয়ে পৌঁছল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের। প্রতিদিনকার সান্ধ্যভ্রমণে তিনি বের হয়েছিলেন। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী ১৬ বার তাঁর হাঁটতে হবে। একবার করোনারির আক্রমণ হয়েছিল তাই। তিনি পার্কে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন এমনি সময় কথাটা তাঁর কানে এল।

বৃদ্ধ হলেই মানুষ ঠিক সাধারণের পর্যায়ে থাকে না। কতকগুলি পছন্দ অপছন্দ তাঁর গভীরভাবে গড়ে ওঠে। এ ভদ্রলোকের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু বৃদ্ধ হবার আগে থেকেই তাঁর জীবনযাপনের এই রীতিনীতিতে তিনি রপ্ত হয়ে গেছেন। তাই তাঁকে আপন প্রিয়জনরা পাগলাটে বলে। আর যে সব কথা আড়ালে বলে, সে সব কথা আড়ালেই থাক, আমাদের জানবার দরকার নেই।

বৃদ্ধের রোজকার কাজ হচ্ছে ভিখিরীদের দেখে দেখে পয়সা দেওয়া। তাঁর মনের এক ধারণা হয়ে গেছে, তাঁর রোজগারের এক অংশ যাদের কিছু নেই, যারা ভিক্ষা করে অন্নের সংস্থান করে, তাদের প্রাপ্য। যখন ভদ্রলোক সরকারী চাকুরী করতেন তখন না হয় এ 'বিলাস' তাঁর চলত। কিন্তু এখন? এখন ত পেন্সন ভরসা। অবশ্য তা ছাড়াও কিছু আয় আছে—একটি প্রতিষ্ঠানে তিনি পড়ান। কিন্তু সে কাজও তো শেষ হয়ে এলো। তাহলে

এ 'বিলাস' ওঁর চলবে কি করে? তিনি ভাবেনও না সে কথা। একটা ঝোঁক আছে ওঁর। প্রিয়জনরা প্রকাশ্যেই বলেন মাথায় গোবর। একজন জিজ্ঞেসও করেছিলেন, আপনি ভিখিরীদের পয়সা দেন কেন? ওরা ত পেটে খেতে পায়। দেখুন না 'সুন্দরীকে'। মোড়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করে। কেমন স্বাস্থ্য! আমাদের চেয়েও ভাল। তবু আপনার বরাদ্দ সপ্তাহে সোমবারে ১৪ পয়সা। স্বর্গের পথ পরিষ্কার করে রাখছেন বুঝি।

—স্বর্গ নরকের খবর রাখি না, তবে আমার দিতে হবেই, আমার উপার্জিত অর্থের একাংশ এদেরই।

প্রতি শনিবারই কলকাতা যান বৃদ্ধ। কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থান আছে। সেখানে বসে থাকে ভিখিরীরা। শনিবার দুবেলা ও রবিবার দুবেলা সেখানে যান তিনি। ভিখিরীরা হর্ষধ্বনি করে। সেতো রোগী, হাটের রোগী তিনি। তাই কোন শনি রবিতে না গেলে ভিখিরীর দল সস্নেহে প্রশ্ন করে 'কেন আসনি বাবু'?

এমনি ভাবে ভিখিরীর রাজ্যে বৃদ্ধের দিন যায়। কিছু দিতে গিয়ে অনেকবার বৃদ্ধের ধাক্কা খেতে হয়েছে, তবু তাঁর খেয়াল নেই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, না চাইলে তিনি কাউকে কিছু দেবেন না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা তিনি ভুলে যান।

একবার তিনি রাসবিহারী এভিনিউর কেওড়াতলা শ্মশানের কাছে এক শুয়ে থাকা ভিখিরীর কাছে পয়সা ফেলে রেখে যান। এক ঘণ্টা পরে ফিরতি পথে তিনি দেখেন ভিখিরীটি মৃত। বহুলোক তাকে ঘিরে।

আর একবার রাজশাহীর যাবার পথে বক্সিয়ারপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এক ভিখিরীকে পয়সা দিতে গিয়েছিলেন। পাশের লোকটি হিন্দিতে বলল 'কিস্‌কো দে রহা হায় জনাব, জিসকো মাহিনামে তলব ৬০০ রুপেয়া'? মাথা নীচু করে চলে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ। না, তখন বৃদ্ধ নন, প্রৌঢ়।

আরও কিছুদিন আগে কলেজ ষ্টীটে বসে থাকা এক ভিখিরীকে পয়সা দিতে গেলে ভিখিরী পয়সা নিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। বললে, কেয়া, তুম মুঝে ভিখিরী সমঝা? ফুটপাথমে বৈঠনেসেই ক্যা ভিখিরী বনতা হায়?

আর একবার এক ভিখিরীকে পয়সা দিতে গেলে সে পয়সা দিতে দেখে মানা করেছিলো।

বার বার বৃদ্ধ প্রতিজ্ঞা করেছেন, না চাইলে কাউকে পয়সা দিবেন না। তবু দিতে গিয়েছেন, ধাক্কা খেয়েছেন বারবার। কিন্তু স্বভাব যোচেনি। স্বভাব যায় না মলে।

আজ, ভিখিরীর ডাক বৃদ্ধকে সচকিত করে তুলল। তিনি ট্রাম লাইন পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাছে অল্প অন্ধকারে দেখেন এক আধাবয়সী ভিখিরিণী, পাশে চারটি শিশু। সকলেরই বয়স ৬-৮ মাস। সব শিশু শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। ভিখারিণী চীৎকার করে বলে যাচ্ছে দুটি পয়সা দিয়ে যাও বাবু, আমার বাচ্চারা না খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে।

ভদ্রলোকের পয়সা দেবার একটা রেট্ আছে। সাধারণ ভিখিরী ২ পয়সা, ছোট্ট শিশু ৩ পয়সা, কারণ তাদের দুধের প্রয়োজন। যুক্তি—সাধারণ ভিখিরীরা চা পান করতে পাচ্ছে। কিন্তু শিশুরা তো দুধ খাবে। দশ বৎসরের পরিচিত ভিখিরী হলে তার রেট বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৫ পয়সায়। অন্ধ ভিখিরীরা পায় ৩ পয়সা বা ৫ পয়সা যা যখন থাকে।

বৃদ্ধ চারটি শিশুকে দেখে হিসাব অনুযায়ী ৪ জনের ১২ পয়সা ও ভিখারিণীর জন্য ২ পয়সা একুনে ১৪ পয়সা পকেট হতে পয়সা বের করতে গেলেন। ১৪ পয়সা ছিল না, ৩টা ৫ পয়সা ভিখারিণীকে দিলেন।

হঠাৎ বৃদ্ধের খেয়াল হল ৪টি শিশুর বয়স প্রায় এক। তাহলে কি সব ক'টি শিশুঃ মা নয় ভিখারিণী? জিজ্ঞেস করলেন—সব কটি শিশুর মা কি তুমি?

—হ্যাঁ, বাবু।

—চারটী শিশু যে একই বয়সী?

—চারটি একই সঙ্গে হয়েছে।

—সাধারণতঃ এ রকম হয় না। খবরের কাগজে তো পড়িনি এ রকম কথা।

আমরা ভিখিরী বাবু, আমাদের কথা খবরের কাগজে ছাপাবে কেন?

—ওঃ তাই, তা তোমার স্বামী কি করে?

—ও হতচ্ছাড়ার কথা বলছেন? ও তো ঠেলাওয়ালা। পায় প্রতিদিন ৭-৮ টাকা। মদ মাংস খেয়ে উড়িয়ে দেয়। আর ভাত খায় আমার ভিক্ষার পয়সায়।

ভিখারিণীকে খুব পরিষ্কার ভাষায় কথা বলতে শুনলেন ভদ্রলোক।

আর কথা না বাড়িয়ে ভদ্রলোক পার্কের দিকে পা বাড়ালেন।

ও পারের ফুটপাথে পৌঁছবার পূর্বেই ভদ্রলোক ডাক শুনতে পেলেন, "বাবু, বাবু, দয়া করে একটু শুনে যাবেন"?

ভদ্রলোক ফিরে গেলেন। —কেন ডাকছ মা?

—আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলেছি বাবু। আমায় ক্ষমা করুন।

—মিথ্যে কথা বলেছ? কেন? তোমার কথাগুলো মার্জিত, যদিও তুমি তোমার স্বামীকে কটূক্তি করেছিলে। কি ব্যাপার বল ত?

আমি সবই মিথ্যে বলেছি। আমি বিবাহিত নই; আমার স্বামীর কথা মিথ্যে করে বলেছি।

ভদ্রলোক ছেলেগুলোর কথা চিন্তা করেছিলেন। বললেন, ছেলেগুলো তোমার নয় বুঝলুম, তবে এদের জোগাড় করলে কোথা থেকে?

—আমার মত ভিখিরীদের ঘর থেকেই জোগাড় করেছি। ভিখিরীদের ঘর বাচ্চা কাচ্চায় ভর্তি। ওদের বাচ্চা ভাড়া দিতে আপত্তি নেই।

—কি বলছ তুমি মা? মা হয়ে এতটুকু বাচ্চাকে তারা ছেড়ে দেয়?

—হ্যাঁ, দেয় বই কি। তারা সারা দিনের জন্য ছেড়ে দেয়।

—তার বদলে কি তারা চায়?

—চায় বাচ্চাদের সারাদিনের খাবার আর তাদের প্রত্যেকের জন্য ৫০ পয়সা ভাড়া।

—অদ্ভুত কথা যে বলছ মা। এও কি সম্ভব?

—হ্যাঁ দেখতেই তো পাচ্ছেন বাবু, সম্ভব।

—এদের জন্য আমার খরচ হয় ৩ টাকা দুধ, বালি ও ভাড়ায়। কিন্তু পাই দিনে প্রায় ৮ টাকা। পুরো ৪ টাকা লাভ থাকে।

—তোমার কথাগুলো শিক্ষিতের মত মনে হচ্ছে। কিছু পড়াশোনা করেছ কি?

—হ্যাঁ করেছি। যে শিক্ষায়তনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি, তার থেকে ডিগ্রী নিয়েছি।

—বি. এ. পাশ করেছো মা?

—হ্যাঁ করেছি।

—তবু ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েছো?

—নিয়েছি, না নিয়ে কি করবো বলুন। বি. টি. তে ভর্তি হতে চেষ্টা করেছি; পারিনি। কারণ এম. এ পাশ না হলে সাধারণতঃ ভর্তি হওয়া যায় না। বাঁশীপুর সি জি বি টি-তে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরেছিলাম। কোথাও কোন চাকরী পাই নি। কি করব? বাড়ী বাড়ী বাসন মাজতে গিয়েছি। বাড়ীর যুবকদের এমন কি বয়স্কদের কটাক্ষ ও ইঙ্গিত সহ্য হয় নি। তাই চলে এসেছি! অথচ বৃদ্ধা মা ও বৃদ্ধ বাবা রয়েছেন, তাঁদের খেতে দিতে হবে।

—এ দিকে এলে কি করে মা?

—তাও এক মজার ইতিহাস আছে বাবু।

—বাঁশীপুরে interview দিতে গিয়েছিলাম, আপনারই মত এক বয়স্ক ভদ্রলোক আমাকে interview-তে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অভিনয় করতে পার? বলেছিলাম পারি। এক নাটক থেকে একটি অংশ আবৃত্তিও করেছিলাম। সঙ্গীদের তিনি বলেছিলেন একে নিতে পারা যায়, আমাদের সাংস্কৃতিক দলের উৎকর্ষ সাধন করবে। তবু সেখানে ঢুকতে পারিনি। ইঙ্গিতটা আমার মনে লেগেছিল। থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরেছি, সামান্য কাজও করেছি। কিন্তু সব জায়গাতেই বীভৎস অবস্থা, গা ঘিন ঘিন করে উঠেছে, পালিয়ে এসেছি। কিন্তু সেই ইঙ্গিতটা কার্যকরী করেছি এই-ভাবে। সকালে সকালে সামান্য একটু পেন্ট করে অভাগীদের সন্তান ভাড়া করে এনে দিন চালাই, বাবু। এই আমার কথা। আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলেছি, বাবু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

বৃদ্ধ মূক হয়ে যান। কি বলবেন ভাষা খুঁজে পান না।

পরে বলেন—"ভিখিরীদের ঘরে এত শিশু, সরকার পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা সেখানে করেন না"?

—কই না, সরকার শিক্ষিতদের নিয়ে আছেন যারা সব বোঝেন। আর যারা বোঝে না, তাদের ধারেও যেঁষেন না।

—ওরা কি সমস্যাটা বুঝতে পারে না?

—পারে কিন্তু প্রতিরোধ করতে পারে না। আর দারিদ্র্যের সমস্যা? সে কথা কে ভাবে বাবু। গরীবী হটাও, কিন্তু হটাবে কি করে? আমরা জটিল এক পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়েছি। এই ছল চাতুরি করে জীবন যাপনের মধ্যে মাধুর্য্য কোথায়? এ আমার ভাল লাগে না। খেটে খেতে চাই, তাও পাচ্ছি না কোন সুযোগ। পুরুষ হলে যে কোন কাজ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা যে মেয়ে মানুষ, আর বয়সও বেশি নয়। কি করি বলুন বাবু।

বৃদ্ধ কি বলবেন? এ সমস্যা যে বাঙালীর ঘরের লক্ষ লক্ষ মানুষের। এর সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া সহজ নয়। বৃদ্ধের পক্ষে ত সম্ভব নয়ই। ব্যক্তিগত সাহায্য তিনি মেয়েটিকে সেদিনকার মত করতে পারেন, আর হয়তো পারেন আরও দু'দিনের জন্য, কিন্তু তারপর? তারপর ত সব অন্ধকার। সরকারেরই এদিকে এগিয়ে আসতে হবে। মুখের বুলি দিয়ে নয়, সক্রিয়ভাবে।

বৃদ্ধ একটি টাকা পকেট হতে বের করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন, 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সৎপথে থেকে পথের খোঁজ পাও। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন'।

বৃদ্ধ তারপর থেকে প্রতি শনি ও রবির সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ দিয়ে যাতায়াত করেন, ভিখিরীর ডাকও শোনেন বারবার, কান্নাও শোনা যায়। কিন্তু সে মেয়েটি কোথায়? সে ত নেই। কলকাতার জনারণ্যে সে হারিয়ে গেছে।

অভিশপ্ত পুরোহিত

॥ শংখচিল ॥

ললাটে আমার ধূমকেতুর চন্দন,
পরণে আমার সোনালী মেঘের চেলী
গায়ে আমার রামধনুর নামাবলী,
গলায় অজস্রধারার উপবীত
রাত্রি আমার চুল,
ছায়াপথ আমার···
শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী আমার নাক,
পার্বতীর বালা আমার কাণ।
মেরুজ্যোতি অধর আমার;
বিজলী আমার হাসি
কোরাণ আমার ডান চক্ষু,
বাইবেল আমার বাম চক্ষু।
পাপড়ি পলকে বেকাঙ্কটা আমার,
আমার অঙ্গ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ,
সূর্য্য আমার ঘন্টা,
চন্দ্র আমার নৈবেদ্যের থালা,
আকাশ আমার পুঁথি,
তারামণ্ডল অক্ষর,
হোমাপাখির শিষ যার মন্ত্র-সংগীত।
মণিকর্ণিকার জলে আমি স্নান করি
ডান পা আমার জন্ম,
বাম পা আমার মৃত্যু
মহাকাল আমার চলার পথ
'রাফ্‌রাফ্' অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে চলি আমি।
হোমের আগুনে গড়া আমি—গভীর—বিস্তীর্ণ—লাল।
মৃত কুমারীর হাসির গন্ধের মত আমার গায়ের সুবাস।
(যে হাসির রং চম্পকবর্ণ)।
এই বিশ্বই আমার মন্দির,
এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া যার দেওয়াল।
মহাওংকার মন্দিরের শীর্ষবিন্দু,
নিঃশ্বাস আমার ধূপের নীল ধোঁয়া।
এই ধোঁয়াই আমার প্রতিটি দেওয়ালের সম্মুখে
একই রূপে একই সুরে একই ভঙ্গিতে নৃত্যরত
প্রশান্ত মহাসাগর, আত্‌লান্টিক, উত্তর সাগর ও
ভারত মহাসাগর।

দেবতা আমার মানব;
অভিশপ্ত পুরোহিত আমি,
অস্ত্র আমার ফুল;
বিশ্বের মন্দিরে খুঁজি প্রাণের ঈশ্বর।

সাময়িকী

পচা ভাদ্রের বিপ্লবী দুই জন্ম : এ সংসারে সব কিছুরই যেমন একটা অনন্যতা রয়েছে, তেমনি এই পচা ভাদ্র মাসটীও দুইটী বিশেষ কারণ নিয়ে বিখ্যাত—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নিজের জন্মানর জন্য এই ভাদ্র মাসটীই বেছে নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ চায় ভাল জায়গায় ভাল দিনে ক্ষণে জন্মাতে—কোন দুর্যোগ যাতে না হয়—কোন অসুবিধা। কিন্তু মহতের চালচলন আমাদের সাধারণ জীব-শ্রেণী থেকে আলাদা—তাই ভগবান যীশুখ্রীষ্ট জন্ম নিয়েছিলেন ঘোড়ার আস্তাবলে ভার্জিন মেরীর কোল আলো করে, আর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কেবল পচা ভাদ্রতে নয়—দেশের রাজার কারাগারে—আরও আছে—তখন প্রচণ্ড বড়বৃষ্টি। আমরা কিন্তু এ ঘটনাগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখি না—পাঞ্জিপুঁথির দিনক্ষণ দেখে অনেক ক্ষেত্রেই চলতে দেখা যায় এখনও বুঝি বা শতকরা নব্বই জন লোককে, যদিও তারাই হয়তো এখন আচরণও করে পাঞ্জিপুঁথির ব্যবস্থার সাথে মেলে না বা একেবারেই। মহতেরা যে দুর্যোগ তাঁদের সঙ্গে করে আনেন সেই দুর্যোগই তাঁদের মহৎ করেছে। আর আমরা কেবলই দুর্যোগ এড়াতে চাই—তাই জীবনটাকেও যেমন উপভোগ করতে পারলাম না, তেমনি আবেষ্টনকে সৃষ্টি করে তুলে কিছু গড়ে তুলতেও পারলাম না। যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ অমন অসময়ে কুমারসার জন্মেও এমন কিছু করে গেছেন যাকে মুছে ফেলতে পারা গেল না মোটামুটি এই সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসরেও। অথচ কোথায় তাঁর তত্ত্বঘন জীবনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বা আজকের সমাজচেতনার মূলসূত্র, তারও পরিচয় মানুষ জানল না। যারা তাঁকে অখিলাত্মার আত্মা জেনেও নিজের অন্তরতম প্রিয়তম জ্ঞানে তাঁকে ভালবেসেই জীবনটা কাটাল, তারাই কি জানে শ্রীকৃষ্ণ জড়বাদীর সভ্যতায় চরম রূপ রেখেও কি করে জড়বাদের হাতে বন্দী না হওয়ার দর্শন রেখে গেছেন। আজকের সভ্যতায় মধ্যে মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকার করার গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে যতই সভ্যতার উৎকর্ষের নিদর্শন বলে মানি না কেন, শুধু এতখানি জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়েও সে কেন জ্ঞান বিজ্ঞানকে জয় করে তার বিজয় কেতন ওড়াতে পারল না? আজকের সভ্যতা তো নিজের কাছেই নিজে বন্দী—তার মুক্তি কোথায়? অর্থ বল, ক্ষমতা বল, পদমর্যাদা বল, কিংবা বিজ্ঞানের চরমতম জ্ঞান দিয়ে যদি মানুষের—সমস্ত বিশ্বের সমস্ত মানুষের—কল্যাণই করা না গেল, তাহলে আর জড়বাদীর সভ্যতার জয় ঘোষণার সার্থকতা কি? এখন পর্যন্ত বিশ্বে যা কিছু মঙ্গলকর আবিষ্কার হয়েছে—বিজ্ঞানের প্রযুক্তি বিদ্যার ফলই হোক আর রাষ্ট্রীয় তথা সমাজের ক্ষেত্রে নূতন তত্ত্ব আমদানী করেই হোক—তা সর্বভূত হিতের জন্য লাগানো গেল না—সর্বক্ষেত্রেই তা একটা গোষ্ঠী বা দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল—দেশকাল পাত্র ভেদে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মানসিকতা বা পদ্ধতি তো বের করা গেল না আজও? কিন্তু পচা ভাদ্রের এই মানুষটি কিন্তু চূড়ান্ত জড়বাদকে যেমন উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্তার মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তেমনি তা করতে পেরেছিলেন সমস্ত মানুষের জন্য—কোন ভেদবাদই সেখানে স্থান পায় নি—কি মানুষে মানুষে সম্বন্ধে, কি তত্ত্ব প্রস্থাপনে। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন—কৃষ্ণের অবতারত্ব তিনিও মেনে নিয়েছিলেন অর্থাৎ ভগবান মানুষ-দেহে অবতীর্ণ হন একথা ভাষা দিয়ে মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে হয়তো সম্ভব হয় নি—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত 'গীতা' সম্বন্ধে তিনি যা লিখছেন, তা একটু এইখানে উদ্ধৃত করি—"গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। য়ুরোপে খ্রিলিজিয়ন বলিয়া যে শব্দ আছে, ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব; কারণ ভারতবর্ষ ধর্মের

মধ্যে মানসিক পিছনের খটিতে বাঁধা রিয়াছে—আমাদের বুদ্ধি বিশ্বাস আচরণ, আমাদের ইতিহাস পুরাণ সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনটাকে পেয়াদি, কোনটাকে আউলোরে করিয়া রাখে নাই তাহার জীবন, পাশের জীবন, মন্দার জীবন, উহাদের জীবন যেমন আলাদা তেমনি বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম, নির্জনের ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজের ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে; তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই। ধর্মকে ভারতবর্ষ ভালোকে ভূলোকব্যাপী মানবের সমস্ত জীবন-ব্যাপী একটী বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।"—এই সামগ্রিক ধর্মের প্রবক্তা পুরুষোত্তম কৃষ্ণ সর্ব মানুষের সমগ্র জীবনের জন্য অস্তিত্বের নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য কল্যাণ ও আনন্দের এক শোষণহীন চিন্তাধারা ও জীবন রেখে গেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা সে চিন্তাধারার খোঁজ পেলাম না, বিশ্বের সমাজ দূরস্থান আমাদের সমাজেই তাকে রূপ দিতে পারলাম না!

ভারতবর্ষের যে অনেক বিপদ—বিচিত্র এই দেশে কত রকমের চিন্তাধারাই যে প্রকাশিত হয়েছিল তার সংখ্যা নেই। সকলেই শেকড় গেড়ে বসে আছে। এখানে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ—সমস্ত দিকের শোষণ—দূর করবার জীবন নিয়ে যেমন শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন, এসেছেন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সেই প্রাণের মহিমা সমস্ত মানুষের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দেবার জন্য এসেছেন, নানক কবীর প্রভৃতি, আবার এই ভারতেই মানুষে মানুষে বিভেদ ঘটিয়ে ঘৃণ্য অস্পৃশ্যতার জনক বর্ণাশ্রমীয় সমাজ-ব্যবস্থা হাজার হাজার বছর চলেছে—আজও যে চলে না তা-ও নয়। এখন হয়েছে আরও মজার—আজকের মানুষ অনেক কিছুই মানে না—আবার একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় অপরকে ছোট মনে করার মানসিকতা সর্ব-হিন্দুর মধ্যে তাবা পালটে বেশ বর্তমান—সমাজের ক্ষেত্রেও তথাকথিত অধ্যাত্ম ক্ষেত্রেও। তাই যদি শ্রীকৃষ্ণের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে আমরা আজও হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি—আমরা তাঁকে পটের ঠাকুরই করে রেখে পূজো করে যাচ্ছি। ভারতবর্ষের এতদিনকার যে সমাজ কাঠামো ভেঙে পড়েছে তার মধ্য দিয়ে নূতন যে প্রাণের সমাজ তৈরী করে তুলতে হবে—যেখানে সর্ব মানুষের মানবিক মনুষ্যত্ব-ভিত্তিক স্বীকৃতি ও প্রকাশ—সেই প্রাণের সমাজ তৈরী করার বিপ্লব-চেতনা ও তার দর্শন শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে গেছেন। সেই সর্ব মানুষের শোষণহীন সুন্দর অভিব্যক্তির জন্য ভক্তজনের এই মন্ত্রটিকে আজ সত্যিই বড় প্রয়োজন।

এই পচা ভাদ্র বিশিষ্টতা অর্জন করে আরও একজন বিপ্লবিনীর জন্মমাস হয়ে—তিনি পুরুষোত্তম-মহিষী শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণকে আমরা যতটুকু বা জানি বা বুঝি—শ্রীরাধাকে তার ষোল আনার এক আনাও জানিও না, বুঝিও না। তিনি যে চরম বিপ্লবিনী—তিনি যে সমাজের শোষণ মনে নিয়ে ভাল মানুষ সেজে দিন যাপন করে যান নি—তাই একদল তাঁর নিন্দে করে, আর অপরে খোঁজও রাখে না কে এই মহীয়সী নারী, কি তিনি বলতে এসেছিলেন? শ্রীরাধা-জীবনের বিপ্লব-কথাকে সমাজ-জীবনে আমরা প্রয়োগ করে দেখবারই চেষ্টা করলাম না,—কেননা এ বড় কঠিন। যতদিন ভারতবর্ষ বর্ণাশ্রমের বিধিনিষেধ মেনে নিয়ে নারী যে আবার একটি স্বতন্ত্র মানুষিক স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকারী একথা ভাবনা চিন্তা না করে বিধি সংসার চালাচ্ছিল—ততদিনও যেমন তার মধ্যে সত্য ছিল না, সকলের জন্য শোষণহীনতা ছিল না, সাম্য ছিল না, সকলের আনন্দ ছিল না—আজ যখন সে বর্ণাশ্রমকে ভেঙে চুরে বেরিয়ে পড়েছে পথে—পুরণো কোন বিধি ব্যবস্থাই মানছে না, তখন সে ভেবে দেখতে পারল না যে ভাঙনটা কোন্ ধারায় হবে, সে যে পথে ভেঙে চলছে তার ভেতর দিয়ে সত্য, সাম্য, শোষণহীনতা ও আনন্দ আসবে তো? তা তো আজআসে নি—প্রাচীন বিধিনিষেধ যেমন মনুষ্যত্ব বিরোধ-কারীশোষণপূর্ণ ছিল, তা যেমন দেয় নি আনন্দ—আজ যখন সমাজ দেহাসক্তির ক্লেদে জর্জরিত আনন্দহীন শূন্যতার অলে পৌঁছেছে, তখন তারই বা সার্থকতা কোথায়?

সেদিনের মানবত্ব-স্বীকৃতিবিহীন কোন একদলীয় কৌলীণ্য-শাসিত—রাজা, ধনিক, ব্রাহ্মণ, পুরুষ শাসিত—সমাজ ব্যবস্থার বিধিনিষেধ ভাঙা হল কি এইখানে পৌঁছানর জন্য? এখানে আনন্দ কোথায়; তৃপ্তি কোথায়? নারী-জীবনের কথাই যদি তুলি—আজকের নারী কি আনন্দিত? আজকের নারী কি তৃপ্ত? সে কি তার ঠাকুমা দিদিমা থেকে বেশী কিছু পেয়েছে? যা তার পাওয়ার কথা ছিল তা কি সে পেয়েছে? তার সেদিনের অপমানকর বন্ধ জীবনের বদলে যাকে অন্যের মানদণ্ডেই চিরদিন চলতে হয়েছে, আজ পাওয়ার কথা ছিল শোষণহীন পারস্পরিক স্বীকৃতির ও স্বাতন্ত্র্যের গর্বেপূর্ণ এবং আনন্দ ও তৃপ্তিতে পূর্ণ জীবন। সেই ইঙ্গিত দিয়েই বিধাতা তাকে তখন তার শোষিত অপমানিত জীবনকে ভেঙে বেরিয়ে পড়তে বলেছিলেন। অথচ পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাপূর্ণ সমষ্টিবোধের জীবন-চেতনা আজ কি নারী শিখেছে কিংবা তাকে কি শেখানো হয়েছে? কিন্তু এমনই একজন নারী ছিলেন শ্রীরাধা—যিনি শোষণ আর স্ত্রীত্বের খোঁড়াজাল থেকে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলেন প্রাণের সদর রাস্তায়—যিনি প্রস্তাপন করতে পেরেছিলেন যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আত্মার মধ্য দিয়ে—কতকগুলি বিধিনিষেধের ব্যবস্থাপনার মধ্যে নয়। তিনি তথাকথিত শোষণের থেকে বেরিয়ে পড়েও নিজেকে চুকিয়ে দেন নি ক্ষুদ্রত্বের পঙ্কে, নিজেকে তিনি যুক্ত করেছিলেন পুরুষোত্তমের সঙ্গে—জড়কে সার্থক করেও যিনি জড়াতীত, সর্বত্র বিচরণশীলা হয়েও কোন কিছুতেই যিনি আটকে নেই, যাঁর ব্যক্তিত্ব একটা মহত্তর কিছু মানুষী সত্তার অধিকতর সর্বাঙ্গীণতাকে প্রকাশ করছে, যা মানুষের দৈনিক প্রয়োজনকে মেটানর সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে জ্ঞানে কর্মে বিজ্ঞানে আনন্দে ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সার্থক করছে, স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য ও সর্বাঙ্গীণ মর্যাদা দিয়েও যিনি নিজ স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। এমনই শোষণহীন মর্যাদাপূর্ণ একটি স্বাধীন অবস্থার জন্যই অতীতের শোষণ আর স্ত্রীত্বে পূর্ণ অবস্থার থেকে বেরিয়ে আসা উচিত এবং তা কল্যাণপ্রদ। শ্রীরাধারাণী এইটে করে আজকের নারী জাতির সামনে এই দৃষ্টান্তই রেখে গেছেন যে ঘর ছাড়া মানেই উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, ঘর ছাড়া মানেই জীবনটাকে দেহাসক্তির ক্লেদে জর্জরিত করে তারই পাকে আবর্তিত করা নয়। আজকের ভারতের নারী পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে করে চলেছে। এই কি মানুষের সভ্যতা? পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ঐকান্তিক জড়বাদের চাপে এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অথচ আমরা তা বুঝতে পারছি না! কি আমাদের হওয়ার জন্য বিধাতা ডাক দিয়েছিলেন তা ধরতে পারছি না—অন্ধ পাশ্চাত্ত্যানুকরণে মৃত্যু দিয়ে নিজেদের আচ্ছন্ন করে ফেলছি। আজকের সভ্যতার ডাক প্রত্যেকের স্বাধিকারের, স্বাতন্ত্র্যের, শোষণহীন মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়—তার প্রমত্ততায় নয়, এ নারীর সম্পর্কেও যেমন শ্রমিকের সম্পর্কেও তেমনি। ধনিকের শোষণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে—ঘরে বাইরে যে যেখানে শোষণের কষাঘাতে জর্জরিত হচ্ছিস সবাইকেই বেরিয়ে আসার ডাক এসেছে। কিন্তু নিজেই আবার প্রমত্ততার মধ্য দিয়ে রকমফেরে শোষণেরই যন্ত্র হওয়ার ডাক আসে নি। অপ্রমত্ত সুস্থ স্বাধীনতায়, অপ্রমত্ত সুস্থ স্বাতন্ত্র্যবোধের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন মহীয়সী ঐ নারী শ্রীরাধা কয়েক হাজার বৎসর আগে। আজ সেই রাধাতত্ত্বই সামাজিকভাবে আসতে চাইছে সভ্যতার মধ্যে—কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ হয়েও আমরা তার খবর পাই নি আজও আমরা এতই অন্ধভাবে চলি। স্বাধীন নারী জীবনের মহান দৃষ্টান্ত যেমন শ্রীরাধা, তেমনি স্বাধীন স্বতন্ত্র সুন্দর মহৎ পুরুষজীবনের দৃষ্টান্তও শ্রীকৃষ্ণ—দুই জনই এই পঙ্কা ভারতকে সার্থক করে জন্মে ছিলেন। আমরা বিপ্লব করতে গেলেই, নূতন কথা, আধুনিক জীবনের কথা বলতে গেলেই পাশ্চাত্ত্যের দিকে তাকাই—সেখান থেকে মুখস্থ করা উদ্ধৃতি দিয়ে গাল-ভরা বিপ্লব-তত্ত্ব বলি—কিন্তু এই দুইটি নরনারী যে বিরাট বিপ্লবকে তাঁদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে রূপ দিয়ে জড়-জীবনকে সার্থক করেও জড়াতীত আত্ম-স্বরূপে স্থিত হয়ে অধ্যাত্ম-সাধনার খবর রেখে গেছেন, আজ সে বিপ্লবের খোঁজ করার দিন এসেছে। ব্যক্তিগত তথা পরিবার জীবনে, সমাজ জীবনে রাষ্ট্র জীবনে এবং এইগুলিকে

সার্থক করে অধ্যাত্মজীবনে এমন কোন বড় বিপ্লবের কথা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি যার তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা দিয়ে যান নি—ঐ তত্ত্বেরই পূর্ণ পরিণতি ও প্রকাশ হবে আজকের দিনে। পাশ্চাত্যাক্রান্ত যে ভারতবাসী, ঘরের দিকে তাকাও—যাদেরকে তোমরা শুধু অধ্যাত্মজীবনের 'ঠাকুর' করে রেখেছ তারাই তোমাদের সমাজ-বিপ্লব, রাষ্ট্র বিপ্লবের গূঢ়তম কথা শোনাবেন—গণতন্ত্র, সমাজ-তন্ত্র, কম্যুনিজম এবং তারও পরের কথা সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্রের খবরও ঐ বিপ্লবী চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্তিত সামগ্রিক জীবনবাদে পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে শ্রীরাধারাণীর বিপ্লবাত্মক প্রেমধর্মে। আমরা সেই প্রকাশের অপেক্ষায় রইলাম।

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর

ভারতবর্ষ ইংরেজ-বিতাড়ন থেকে পঁচিশ বৎসর পার হয়ে এল—১৫ই আগস্ট ১৯৭২ থেকে তার স্বাধীনতার ২৬ বৎসর আরম্ভ। যারা এই স্বাধীনতা আসতে যে রকম করে যতটুকুই সাহায্য করে থাকুন তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে বলি অনেক কিছুই হয়েছে, অনেক কিছুই হয় নি। কর্মকুণ্ঠ নিয়তি-নির্ভর ভারতবাসী তার স্বভাবমতই কেবল ওপরের দিকে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে—তার সবটুকু প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে নেতারা, সরকার, ওপরওয়ালা; নিজেদের তাদের করবার কিছু নেই। অথচ এই ভারতেরই বেদ উপনিষৎ ভাগবত বলল—নিজের অন্তরের জ্যোতিকে জ্বালিয়ে তোল, ফুটিয়ে তোল, বাড়িয়ে তোল—তারই আলোকে ভেতর বাইর দুইয়েরই কুহক দূর কর। কর্পোরেশনের কলের জল অকারণে পড়ে যাচ্ছে—আমাদের ভারতবাসীদের আজ পর্যন্ত এ চৈতন্য হয়নি যে জলটা বৃথা পড়তে দেওয়ায় আমাদের জাতীয় সম্পদের ক্ষতি—আমাদেরই পাঁচজনের অসুবিধা। এ বোধই অন্তরে জাগেনি, আর হাত বাড়িয়ে যে কলটা বন্ধ করে দেবে কিংবা কষ্ট করে প্রয়োজনের সময় আবার সেটা খুলবে—এটুকু পরিশ্রম করতেও আমরা রাজী নই। তার উপরে আছে কলের মুখটা চুরী হয়ে যাওয়া—বস্, তার পরে আর কথা কি? এই স্তরের ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলে তাদের সুখশান্তিতে রাখা যে কী কঠিন ব্যাপার তা বলার নয়। কলের মুখটা চুরি যাওয়ার সময় পাঁচজনে দেখলেও তার প্রতিবাদ হয়নি, কর্তৃপক্ষও এমনভাবে কল তৈরী করবার বুদ্ধি পায়নি যা চুরী করা সহজ নয়। এইভাবে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের সমস্যা—সমগ্র বুদ্ধি, জাতীয় কল্যাণ-বুদ্ধি যাদের জাগ্রত হয়নি—নিজের ঘর সামলানোই যাদের এখন পর্যন্ত বড় কথা—তাদের ভাল করবার জন্য এখনও অনেক বিপ্লবের—দার্শনিক বিপ্লবেরও—দরকার আছে। আমার ভাল কিসে হয় তা যেন বুঝি না, আমার ভাল আমি করতে না উদ্যোগী হলে ভগবানেরও সাধ্য নেই আমার ভাল করেন। নেতৃস্থানীয় থেকে আরম্ভ করে সবাইকে কথা বন্ধ করে কাজ করার প্রবৃত্তি গড়ে তুলতে হবে সর্বাগ্রে। নিজের দরজার পাশের জঞ্জালটুকু পরিষ্কার করবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টাও আমাদের নেই—আমাদের বড় কথায় কাজ কি? স্বাধীনতা হয়েছে। আজও রাষ্ট্রক্ষেত্রে বড় বিপ্লবের কথা যারা বলে, যারা নানান ধরণের বিদ্রোহ করে বেড়াচ্ছে তাদের ব্যক্তিজীবনের কর্মপ্রবণতা বা সমাজটাকে গড়ে তোলার, সুস্থ রাখার চেষ্টা কতটুকু আছে তা ভাবনার বিষয়। বড় বড় অফিস থেকে মানুষের বাড়ীর পায়খানা প্রস্রাবখানার অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় মানুষের সত্যিকারের কালচার কত নিম্নস্তরের। সরকারী অফিসগুলিতে বড় বড় প্রস্রাব পায়খানার ঘর আছে, কিন্তু সেখানে কেন, তার পাশ দিয়ে যেতে কোন রুচিসম্পন্ন লোক পারে না। অথচ দেখা যাচ্ছে কারো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বহু বাড়ীতেও এই দেখা যাবে—সাজে সজ্জায় যত জৌলোস থাক, ভেতরে এই নোংরামি চূড়ান্ত। এটিকে যারা ছোট কথা মনে করেন, আমরা সে দলের নই—আমরা জাতিকে এই গোড়া থেকে অন্ত সুস্থ রুচি-সম্পন্ন করতে চাই। কলকাতা শহরে জঞ্জালের স্তূপ—জল-নিকাসনের কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা শহরে বা শহরতলীতে নেই—অথচ ব্যক্তিগত উৎসবে হাজার হাজার টাকা যেমন খরচ হচ্ছে, তেমনি জাতীয় উৎসবেও সেই জল আর জঞ্জালের উপরে আলোক-সজ্জা হচ্ছে! যেমন

জনসাধারণ, তেমনি নেতৃত্ব! মাটির মূল্য কোন দিন ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে স্থান পায়নি—আজও তাই উপরের আলোক সজ্জা যে তলার জঞ্জাল আর জলের সামনে পরিহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে সে বোধটুকুও আমাদের জাগ্রত হয় নি তাই বলছিলাম আমাদের অনেক কিছু করার আছে।

অবশ্য অনেক কিছু হয়েওছে—এ আজাদী ঝুটা বলে যারা চীৎকার করে তারা সত্যকে স্বীকার করবার মানসিকতা পায়নি, তাই তারা দয়ার পাত্র। কিন্তু ইংরেজের দেড়শ বছরই যদি ধরি তার সঙ্গে তুলনা করেও ঘরে বাইরে আমরা আজ স্বাধীন জাতি একথা সত্য—তবু আমরা যে কত অন্ধকারে ও ক্লীবত্বে পড়ে আছি—নীচু থেকে, গোড়া থেকে গড়বার বুদ্ধি যে আমাদের জাগ্রত হয়নি আজকে দিনে তাও মনে রেখে এ স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী দিবসকে স্বাগত জানালাম, শ্রদ্ধা জানালাম। বন্দেমাতরম্।

সূচীপত্র শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৯, ১৯৭২

প্রার্থনাকালীন ভাষণ
শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত

স্মৃতির পাতা থেকে
শ্রীরুহিদাস সাহা

রামমোহন
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

৪। বুদ্ধ
শ্রীজয়দেব মুখোপাধ্যায়

৫। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী
(১৯৫৪)

৬। শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীসুনীতি সান্যাল

বাংলাদেশ : একটি সার্থক স্বপ্ন
শ্রীশান্তশীল দাশ

কর্ম-অনুযায়ী নিজে দেখো
শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত

অভাবিত
শ্রীমান

অভিশপ্ত পুরোহিত
শংখচিল

সাময়িকী
পঞ্চা ভাদ্রের দুইজন
স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

"সংসার কাহাকেও বাধা দেয় নাই, সংসার, সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা, মিথ্যা বিভীষিকাই আমাদের বাধা দিতেছে।···বিশ্বকে ভালবাসাই যে সংযম, ব্রহ্মচর্য; অথচ এ ব্রহ্মচর্যে শুষ্কতা নাই; যে অর্থে "নিরোধ" আমরা বুঝি, সে নিরোধও নাই। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে হয়, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা" সংসার বিসর্জনই মরণ জয়। যারা অবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে সরাইয়া লইবার জন্য কাম ক্রোধের সঙ্গে কুস্তি করিল, তাহারা লৌকিক চক্ষে বড় ব্রহ্মচারী হইলেও পুরুষোত্তম-রাজ্যে "মরা" সন্দেহ নাই। সংসারময় জীবন ছড়াইয়া না দিলে লক্ষ বৎসরেও ব্রহ্মচর্য্য বজায় থাকিবে না। চিত্তকে সংসার হইতে গুটাইয়া লইতে চাহিলেই সে বিদ্রোহ করে, তখন তাহাকে নিরোধ করার চেষ্টা ব্যর্থ। খাইতে পরিতে না দিয়া কাহাকেও পোষ মানানো যায় না: ইন্দ্রিয়ের খাদ্য স্বরূপ ও বিশ্বরূপ। তুমি যদি বিশ্বরূপের খাদ্য দিবে না, সে মরিবে বটে কিন্তু তাহার ভূত তোমায় ছাড়িবে না।

কামের ভূত আজ ব্রহ্মচারীদের ঘাড়ে চাপিয়াছে। তাহারা যে মরিয়া আছে তাহা বুঝা কি কঠিন? নরনারায়ণের কাজ তাই গুরুতর, গুরুতম। এই মৃত ব্রহ্মচর্য্যকে জীবন্ত ব্রহ্মচর্য্যে গড়িয়া তোলার জন্যই তোমাদের ব্রহ্মচারিণীরূপে আমি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। যিনি জীবনচারিণী, তিনিই ব্রহ্মচারিণী; জীবনই ব্রহ্ম। জীবনহীন ব্রহ্ম নরনারায়ণের উপাস্য নয়। ভারতবর্ষ তাইতো ব্রহ্মেরও পর পর-ব্রহ্মের স্তর স্থাপন করিয়াছেন। স্বরূপ ও বিশ্বরূপে প্রেম হইলে কাম নিয়া ঠেলাঠেলি করিতে হয় না। দুই ভাবে সংযম থাকিলে কামের সকল ফাঁক বন্ধ হইয়া যায়। বিশ্বরূপ ও স্বরূপ দুই দিক খুলিয়া দিলে কামের দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। সব জীবন মধুময় হয়। সেই জন্যই বলি "অহং" ছাড়িয়া দাও। অহং দুইটির একটীকে নিয়া দাঁড়াইতে চায়। দুইটীর সমন্বয় "অহং" জানে না। আমির কাছে হয় বিশ্ব সত্য, নয় ঈশ্বর সত্য। আমি যদি হন পুরুষোত্তম, তখনই বিশ্ব ও ঈশ্বর দুই-ই সত্য। তখন হয় বাস্তব ব্রহ্মচর্য্য। এ যে কলিযুগ। এখানে "বাস্তবম্ বস্তু বেদ্যম্"—কলি-যুগে যে বাস্তব বস্তু জানিবার যুগ। কোনো তত্ত্ব নিয়া ফাঁকি বা অভিনয় চলিবে না। সব আজ পুরুষোত্তমের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে।"

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

তাদের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। শ্রীমদ্ভাগবত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সব মত-সম্বন্ধের সঙ্গে সর্ব পথ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠাতা সমন্বয়-মূর্তি শ্রীনিত্যগোপালের জীবনের দৃষ্টান্তে সে সংবাদ আছে। আর আছে খানিক নিবিকল্প সমাধির পুলক কি করে বিশ্বরী হতে পারে, এই-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শ্রেষ্ঠ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে—

নীচের বইগুলিতে তার খোঁজ পাবেন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অনুবাদ ও ভাষ্য)
১ম খণ্ড (ভূমিকা)
২য় খণ্ড ২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)

ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ

শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
স্বরাজের পূর্বরূপ
গীতালহরী
১২। মাতৃসাধনা (পুস্তিকা)
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৫·০০

পাণ্ডুলিপি

অপ্রতিভা মায়ের

নারী-প্রগতির ভূমিকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ -শিষ্য নিত্যগোপাল
ও শিক্ষা সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়ন্ত্রষ্টা শ্রীনিত্যগোপাল
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ·····৩·০০

ওরিয়েন্ট-বুক কোং প্রকাশিত

৪। রবীন্দ্র-স্মরণ
৫। প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (ভায়া—কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয় আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয় সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহামঠ"

শারদীয়া ১৩৭৯, ১৯৭২ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র পঞ্চবিংশ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিবাদন
গ্রহণ করুন

সুভাষ লাইব্রেরী

১২, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসবের দিন সেবার দিন

উৎসবের দিন এল। সৌভাগ্যের রাখিবন্ধন। দূরকে কাছে আনার দিন। সমুদ্র-পর্বতের স্বপ্নকে সফল করার মুহূর্ত।

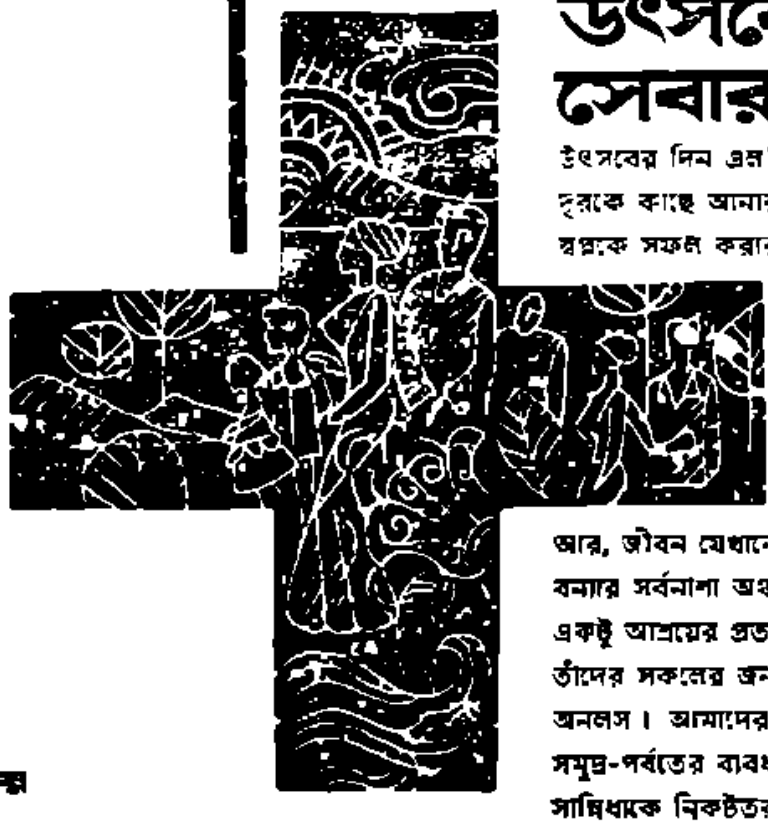

আর, জীবন যেখানে উৎসবহীন—খরা ও বন্যার সর্বনাশা অকালে। এক মুঠো অন্ন বা একটু আশ্রয়ের প্রত্যাশায় যাঁরা অতন্দ্র। তাঁদের সকলের জন্যই আমাদের দিনরাত্রিও অনলস। আমাদের অব্যাহত পরিবহন সমুদ্র-পর্বতের ব্যবধান দূর করছে; প্রিয়জনের সান্নিধ্যকে নিকটতর করছে; নিরন্ন ও গৃহহীনের কাছে আহার্য ও অন্যান্য সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছে।

উৎসবের দিন—আমাদের কাছে সেবার দিন।

পূর্ব রেলওয়ে

আমার রেল ভ্রমণের ছাড়পত্র

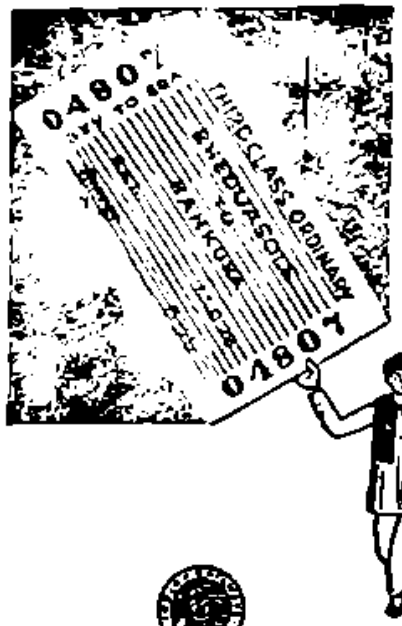

যদি কোনও যাত্রী বিনা টিকিটে কিম্বা বেঠিক টিকিট নিয়ে রেলে চাপেন, তবে আদালত তাঁকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে। সবচেয়ে কম জরিমানা হলো ১০ টাকা।

সঠিক টিকিট না নিয়ে ট্রেণে যাওয়ার সময়ে রেল কর্মচারীদের নজরে পড়বার আগেই যদি কোনও যাত্রী রেলভাড়া মিটিয়ে দিতে চান, তবে খুব কমে তাঁকে ৫ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

বিনা টিকিটে ট্রেণে যাওয়ার সময়ে যদি কেউ ধরা পড়েন, তাঁকে খুব কমে ১০টি টাকা জরিমানা দিতে হবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

টিকিট কেটে ট্রেনে চলা আরও সস্তা

উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ ★ বিক্রয়ে সর্বাধিক

সুলেখা স্পেশ্যাল
পার্মানেন্ট ঃ ব্লু-ব্ল্যাক ★ রয়েল - ব্লু ★ ব্ল্যাক। ওয়াশেবল ঃ রয়েল ব্লু ★ রেড ★ গ্রীন।

সুলেখা এক্‌জিকিউটিভ
পার্মানেন্ট ঃ ব্লু-ব্ল্যাক ★ নেভি ব্লু ★ সুপার ব্ল্যাক ★ ডার্ক ব্রাউন। ওয়াশেবল ঃ রয়েল ব্লু ★ এমারেল্ড গ্রীন ★ স্কারলেট রেড ★ ক্রিস্টাল ভায়লেট।

সুলেখা জেনারেল
পার্মানেন্ট ঃ ব্লু-ব্ল্যাক। ওয়াশেবল ঃ রয়েল ব্লু ★ রেড ★ ব্ল্যাক

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • কৃষ্ণনগর

SW-3/72

PUJA GREETINGS

On this happy occasion
we renew our pledge to be
of service to our countrymen.

UNITED COMMERCIAL BANK

HEAD OFFICE : CALCUTTA

UCO-13/72

আপনাদের পূজার দিনগুলি
আনন্দমুখর হয়ে উঠুক...
সকলকে জানাই আমাদের
আন্তরিক শুভেচ্ছা।

লক্ষ্মীবিলাস

এম. এল. কম্বু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-১৬

আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতিগতির নকশা

ইভা ১৩
১৪.৯৫-১১.৯৫

পপ্‌ট্‌ ৬১
৭.১৫-১০.১৫

-৫
-১৭.৯৫

ওয়েই-ভার্স ৭০
১৯.৯৫-২১.৯৫

ওয়েই-ভার্স ০১
১৮.৯৫-২৪.৯৫

নিউ শ্যু ৪১
১৪.৯৫-২০.৯৫

স্পোর্টাফ ০৭
২০.৯৫-২৪.৯৫

সানওয়ে ৫১
১.১৫-১৪.৯৫

যেমন তরুণ মনের, তেমনি তরুণ পায়েরও ভল পাওয়া ভার। বাটার কারিগরদের সারা জীবনের সাধনাই তো এই নিয়ে। বাটার দোকানে এলে তাদের সেই গবেষণা, অনুশীলন আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল পাবেন হাতে হাতে। আরামডরা ও টেকসই, বাহারে ও মানানসই। কাজও দেয়, আরামও দেয় একই সঙ্গে। বাড়ন্ত পায়ের দুরন্তপনার সকল ধকল সইতে পারে এমনভাবেই এই জুতো তৈরি। ছোটোদের বার বার নিজের জুতো বেছে নিতে দিন।

Bata

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৮·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৩·৫০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
বাংলার ঋষি	৩·৫০
বাংলার বিদুষী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৫০
জীবন গড়া	·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	২·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৮৫
বঙ্কিমের গল্প	১·২৫
বিদ্যাসাগর	২·২৫
ছোটদের সেরা গল্প	৩·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি.

ছড়ায় জীবনী	১·২৫
শিশু রামায়ণ	১·০০
শিশু মহাভারত (শিক্ষা-বিষয়ক বই)	১·০০
শিক্ষা—শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত	৮·৫০
আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি	১২·০০

শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত ও শ্রীরমণী সেনগুপ্ত

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা	১২·০০

শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত

শিক্ষা-বিজ্ঞান—শ্রীযতীন্দ্র চৌধুরী	৪·০০
শিক্ষার ইতিহাস—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বসু	৪·০০

ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাসের

তরুণ তুর্কী	২·৫০
ভয়ঙ্কর আফ্রিকা ১ম, ২য়	৩·২৫
বেদুইনের দেশে	২·৫০

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	২·০০
নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন	২·০০
সরল যোগ-ব্যায়াম	২·০০
যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	২·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	২·০০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৪·০০

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর (মহারাজ)

জেলে ত্রিশ বৎসর ও ভারতের বিপ্লব-সংগ্রাম	

শ্রীরমেশচন্দ্র সরকারের

বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী	

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

সর্বদা ব্যবহার্য মধ্যমাকৃতি অভিনব বাংলা অভিধান। পরিবর্ধিত সংস্করণ। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে॥
সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে॥

॥ ব্রতকথা ॥

টাকা জমানোর পথও একটাই—একমুঠো চালের মত, নিয়মিত যত টাকা সম্ভব ইউবিআইতে রাখো। ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয় সংসারে চিরকাল লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখবে। ইউবিআইতে টাকাটা নিরাপদ থাকবে, সুদে বাড়বে আর তোলাও বেশ সুবিধেজনক।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBI-2-718

সি, সি, কো স্পা নী

—কন্টিনেন্টাল কম্যার্শিয়াল কোং লিঃ—

৮।১, ডালহৌসী স্কোয়ার,

কলিকাতা

যাবতীয় অফিস-ষ্টেশনারী ও

ছাপাই-এর কাজ :

টাইপরাইটার—ফাউন্টেন পেন

বিক্রয় ও মেরামত :

—ষ্টীল ফারনিচার—

গ্রাহকের সন্তোষ আমাদের লক্ষ্য

ফোন—২২-৪২৬৩

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই

বিশুদ্ধ

মাখন ও ঘৃত

●

বিশুদ্ধ প্রতিষ্ঠান

সরকার ডায়েরী

ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক

৩২, ভূপেন বসু এভিনিউ

কলিকাতা-৪

পুস্তক প্রকাশনীর

অনন্য রচনা-সম্ভার

৮২।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ফাঁসোয়া বার্ণিয়ের এর তথ্যভিত্তিক অনুপম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বার্ণার্ড সাহেবের বেগম'—নিগূঢ়ানন্দের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কোমল সৌন্দর্যস্নিগ্ধ মিলন মধুর এক অপরূপ প্রেমোপাখ্যান।

'বেদুইনের' তথ্যভিত্তিক রম্য রচনা 'ইন্দোচীনে পাঁচটি রাত' স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে এক অনতিক্রম্য আকর্ষণ। ভিয়েৎনামের মুক্তিযোদ্ধাদের লৌহদৃঢ় সংগ্রাম —সাম্রাজ্যবাদী মার্কিণ শক্তির আগ্রাসী নীতির শোচনীয় পরিণামের ধারাবাহিক বর্ণনায় এ গ্রন্থ অনন্যতার অধিকারী।

উৎকলভারত

আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭২ শারদীয়া পঞ্চবিংশ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদুর্গা

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

শ্রীদুর্গা দীনতারিণী পরমা জননী,
আনন্দময়ী অভয়া পরমা শিবানী।
মহাজ্যোতির্ম্ময়ী তিনি চৈতন্যদায়িনী,
শিবানন্দ প্রদায়িনী শিবস্বরূপিনী,
মুক্তকেশী মনোরমা, কভু তিনি ঘনশ্যামা,
আত্মাময়ী অনুপমা অনন্তরূপিনী,
সারদা বরদা তিনি ত্রৈলোক্যতারিণী!

হিমালয়ে হেমাঙ্গিনী গৌরী গিরিবালা,
ভক্তের হৃদয়াকাশে চিন্ময়ী চপলা,
কমলাসনে কমলা, পুরুষোত্তমে বিমলা,
পরাভক্তি সুনির্ম্মলা মানসরঞ্জিনী!
মেনকা-মানসাকাশে উমা আদরিণী,
মেনকার মনোরমা অঙ্কশোভিনী
কভু বালা ভগবতী, কমলিনী ক্রীড়াবতী
বেদময়ী বেদবতী তিনি ওঁকারিণী,
মহাভাবময়ী শ্যামা শ্রীকৃষ্ণতারিণী।
(তাঁর) সুচারু কটিতে শোভে সুবিচিত্র বস্ত্র,
শ্রীকর দশকে শোভে দিব্য দশ অস্ত্র,
দিব্য ভূষণে ভূষিত, দিব্য শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
তিনি দিব্য কিরীটিনী সুমনা মালিনী,
নিত্যজ্ঞান সরোবরে দিব্য সরোজিনী!

দক্ষিণ শ্রীপদ তাঁর ধর্ম্ম সিংহোপরে,
দিয়েছেন বামপদ অধর্ম্ম অসুরে,
কত উঁহার করুণা, অধর্ম্মে ঘৃণা করে না,
অধমে তারিতে তিনি অধমতারিণী,
পতিত উদ্ধার হেতু পতিতপাবনী!

মায়া ভুজঙ্গিনী তাঁর শ্রীচরে অধীনে,
বদ্ধ করিবারে নারে তাহা ভক্তজনে,
বিষম বিষ অজ্ঞান, তাহা করে উদ্গীরণ,
মহাদেবী দুর্গা নিয়ে সে বিষহারিণী,
সে বিষে মরিলে তিনি মৃত্যুসঞ্জীবনী!
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্ম তিনি সত্য সনাতনী,
করুণাময়ী শ্রীকালী পরম কল্যাণী,
হয়ে মনসা রূপসী বিতরেন সুধারাশি,
(তিনি) অজ্ঞান বিষহারিণী সুধা স্বরূপিণী,
নিরুপমা নিত্যময়ী নিত্য নিরঞ্জনী।
গৌতমীয় তন্ত্র মতে তিনি কালাচাঁদ,
গোপিনী হরিণী-ধরা প্রেমময় চাঁদ।
তিনি পরমা সুন্দরী, শিবচন্দ্রে সুমাধুরী,
তিনি পরা শান্তি সুধা ভুবনমোহিনী।

ভারতের মহাশক্তি তিনি আদ্যাশক্তি,
রহুক আমার তাঁর শ্রীচরণে ভক্তি,
কবে বা তাঁর কৃপাতে, রত রবে মতি তাঁতে,
স্বদেশের তরে হব কবে উন্মাদিনী!
আমার স্বদেশ তাঁর শ্রীপদনলিনী (বা চরণ দুখানি)!

পূজা ও জীবন

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

বাঙ্গালীর শারদীয়া পূজা আসিয়া পড়িল। অর্থাৎ জামাকাপড় ইলেকট্রিক আলো, হৈ-হৈ, খাওয়া দাওয়া বেড়ানোর একটা সুবর্ণ সুযোগ আসিল! ইহাই হইল আজিকার বাঙ্গালীর বার্ষিক পূজার পরিচয়। ইহার মধ্যে হয়তো কোথাও শতকরা এক ভাগ একটা কিছু সংগঠনমূলক কাজ বা আলোচনা হয়—তাহা ছাড়া বাকি নিরানব্বই ভাগই উচ্ছৃঙ্খল অর্থহীন অপচয়ের কিরিত্তি। একটা বুদ্ধিমান জাতি কি করিয়া যে বছরের পর বছর অর্থ ও শক্তির এইরূপ অপচয়কে জাতীয় জীবনে সহ্য করিয়া যাইতেছে ভাবিলে বিস্ময় লাগে। কেবল এই ক্ষেত্রেই নয়—সবক্ষেত্রেই বাঙ্গালী—তথা ভারতবাসীমাত্রই—আজ এক অর্থহীন ভাবনাচিন্তাহীন অনুকরণসর্বস্ব জীবনযাপনের দাসত্ব করিতেছে! জাতীয় সত্তা বলিয়া তো আজ আমাদের কিছু নাই। তাই পূজাও হইয়া উঠিয়াছে ভাবনাচিন্তা-অর্থহীন একটা অনুষ্ঠানমাত্র, আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাপনেরই একটা দামী সংস্করণ মাত্র। যাহারা দিনে ২৫৲ টাকা খরচ করে, পূজার দিনে তাহারা ২৫০৲ টাকা খরচ করিবে—ইহাই হইল অধিকাংশ বাঙ্গালী জীবনের পূজা। পূজা লইয়া আমরা কি পাঁচটি মিনিটও ভাবনা চিন্তা করিব? পূজা কি, কেন এই পূজা, আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ—এ সব কিছুই কি শতকরা একজনও ভাবিয়া দেখিব? আজ আমরা এমনিতেই কিছু ভাবিতে চিন্তা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি—পূজা লইয়া ভাবনা তো কিছুই নাই। আমাদের আজকালকার দিন কি ভাবে যায়? ঘুম হইতে উঠিয়া আমরা রেডিয়ো খুলিয়া দেই—কেহ কিছু শুনিতেছে না—রেডিয়ো হইতে কিছু শেখা তো দূরের কথা—, ঘরের মধ্যে শিশুরা পড়িতেছে তখনও রেডিয়ো, কেহ অন্য আলোচনা করিতেছে তখনও রেডিয়ো—রাত ১১টা পর্যন্ত এইভাবে চলিল। ইহারই মধ্যে চাকুরী খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম সবই হইল। যেদিন সময় একটু পাওয়া গেল সেদিন সিনেমা দেখা হইল, নয়তো বেড়ানো। বস্, বর্তমান সময়ের আমাদের বেশীর ভাগ মানুষের দিন কাটিয়া গেল। রেডিয়ো সিনেমা যে সমস্ত জাতিকে কি রকম ভাবনাচিন্তাহীন করিয়া ফেলিতেছে তাহা কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি? অথচ উহাতে শিখিবার অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী কিছু শিখিতে ভুলিয়া গিয়াছে। আমরা আজ যে-জীবন যাপন করিতেছি, আমাদের খাওয়াদাওয়া বেশভূষা যেভাবে চালাইতেছি—তাহার কোন কিছুতেই একটা স্বকীয়ত্ব, একটা নিজস্ব চিন্তা বলিয়া আজ কিছু পাওয়া যায় না। জাতির জীবনে ইহা যে কত বড় দৈন্য তাহা তো ভাবিতেছি না? বিশ্ব হইতে যাহা উত্তম, যাহা জীবনকে ব্যাপকতর গভীরতর করিবে তাহা আমরা অবশ্যই গ্রহণ করিব। কিন্তু আমাদের যাহা ছিল তাহার re-orientation—নূতন অর্থ, নূতন দ্যোতনা—কিছু আছে কি না তাহা যেমন ভাবিয়া দেখি না, তেমনি বিশ্ব হইতে আমরা কি গ্রহণ করিতেছি? মেয়েদের কথাই বলি—পাশ্চাত্ত্য মেয়েদের বেশভূষা মায় চুলবিন্যাসের সূক্ষ্মতম ভাঁজটি পর্যন্ত আমাদের মেয়েরা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য মেয়েদের সময়নিষ্ঠা, আপন কর্তব্য কর্মে নিষ্ঠা, কর্মের নৈপুণ্য, জাতীয় স্বার্থরক্ষার চেতনা এ সব কি আমাদের মেয়েরা শতকরা একজনও শিখিল? আমাদের মেয়েরা আজ নানাভাবে বাহিরের দিকে স্বাধীন হইয়াছে, চাকুরী করিতেছে, কিন্তু এই স্বাধীনতার অন্তরালে তাহাদের স্বাধীন মনোবৃত্তি কতটুকু জাগ্রত হইয়াছে? স্বাধীনচিন্ততা বলিয়া কোন মানসিকতা মেয়েদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে কি না খোঁজ করিলে বুঝি বা শতকরা একটীও পাওয়া যাইবে না। একটা সত্যিকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতেও যেমন বেশীর ভাগ শেখে নাই, তেমনি নারীত্বের বা মনুষ্যত্বের

আত্মমর্যাদাবোধ বলিয়াও তাহাদের কিছু সৃষ্টি হয় নাই। এ যেমন একটা চিত্র, আর একটা চিত্র আছে; এত বড় মেয়ের—শিশু হইতে বৃদ্ধও তাহার মধ্যে পড়ে—উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী, দুর্বিনীত, অধিকারের নামে যে কোন অন্যায় তাহারা অনায়াসে বিনা দ্বিধায় করিতে অভ্যস্ত। দুই চিত্রই প্রমাণ করে যে এতকাল দাসত্ব করিতে করিতে মানসিকতার মধ্যে দাসত্ব করার স্বভাবটা এমন সেকড় গাড়িয়া গিয়াছে যে কোথায়ও সেটা প্রকাশ পায় অন্যায়েরও প্রতিবাদ করিতে না পারায়, আবার কোথায়ও প্রকাশ পায় স্বেচ্ছাচারিতা বা দুর্বিনয়ে। স্বাধীনতার নামে এ উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে আমরা তো সচেতন হইতেছি না? কয়জন নিজের কর্তব্যটুকু ষোল আনা দূরস্থান আট আনাও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে? এ স্বাধীনতার তাহা হইলে মূল্য কি? মেয়েদের যে আজ ঘর হইতে বাহির হইতে হইল তাহা কি সাজিয়া গুজিয়া শুধু বাহির হওয়াটাকেই আস্বাদন করিবার জন্য? অর্থনীতির কারণে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের চাকুরী করা আজ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই—তাছাড়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা রাখিতে গেলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন বটে কিন্তু এ সকল ঘটনাকেও যে কত ভাবনাচিন্তাদ্বারাই সমাজ-জীবনে ঢুকানো প্রয়োজন—সে কথাটা তো আমরা ভাবিয়া দেখিতেছি না?

দেহকে বানাইয়া তোলা যাহাদের কাজ তাহাদের পরিধি খানিকটা ছোট রাখিতে হয় সত্য, কিন্তু এই ছোট-রাখার স্বভাবটা মেয়েদের যদি একান্তভাবে থাকিয়াই যায় তাহা হইলে এ কূপমণ্ডূকত্ব তাহাদের বড় করিবে কি করিয়া? আনন্দিত করিবে কি করিয়া? আগে গৃহ-কোণে যে কাজগুলি একান্তভাবে মেয়েদেরই বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছিল, এখন গৃহকোণই একমাত্র তাহার স্থান না হইলেও যে যেখানে আছে, সেটুকু লইয়া এবং শেষ পর্যন্ত সেই গৃহমেধী হইয়া থাকিতেই আজও মেয়েরা ভালবাসে। কিন্তু মেয়েরা যেমন মেয়ে তেমনি তাহারা মানুষও যে একথাটা মনে রাখিয়া মেয়েরা যদি নিজেদের খানিকটা বদলাইয়া না লয় তাহা হইলে স্বাধীনতায় লাভ হইল কতটুকু? এতকাল মেয়েদের এই ক্ষুদ্রতার মধ্যে আটকাইয়া রাখিয়া ছিল সামাজিক চাপ, তাহার পিছনে দার্শনিক সমর্থন। কিন্তু আজ দার্শনিকভাবে সে সমর্থন তথাকথিত প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্র-ব্যাখ্যা হইতে কেহ তুলিয়া লয় নাই বটে, কিন্তু সামাজিক চাপ আজ অনেকখানিই নাই, তবু কয়টী মেয়ে তাহাদের স্ব স্ব গণ্ডিটুকু ছাড়িয়া একটা বৃহত্তর মহত্তর পরিবেশে নিজেদের নিযুক্ত রাখিয়াছে? কিংবা কোন আধিক সুবিধার অপেক্ষা না রাখিয়া শুধু সামাজিক বা সামগ্রিক কল্যাণ-বুদ্ধিতে কোন্ ব্যাপকতর কল্যাণ-কর্মে ব্রতী হইয়াছে? সমস্ত সমাজেই আজ অর্থোপার্জনের বুদ্ধি ছাড়া অন্য বুদ্ধি কম আছে, তবু মেয়েরাও একেবারেই ঐ রকমই হইয়া গেল—ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়!

আমরা যে কিছুই ভাবনা চিন্তা করি না তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত রহিয়াছে মেয়েদের চাকুরী করার ব্যাপারটায়। অর্থনৈতিক কারণে যেখানে চাকুরী করিতে হয় সেখানে বলার কিছু থাকে না করা লইয়া—কিন্তু এমন অনেক মেয়েই চাকুরী করেন যেখানে অর্থনীতির অপরিহার্যতা নাই, আছে অবসর সময় ক্ষেপণ এবং পরিবারের 'মান' (standard) বাড়ানো। অনেক মেয়েদের অনেকটা আয় ঠিক অপরিহার্য নয়—অথচ আবার অনেক মেয়ে খাওয়া-পরার জন্যই চাকুরী পাইতেছেন না! আমরা কি ভাবিতে পারিব এ ঘটনাটার একটা মীমাংসা করা যায় কি না? এ ছাড়া সকলের পক্ষেই আর একটা সমস্যা রহিয়াছে বিবাহিত ও সন্তান-বতী মেয়েদের চাকুরী করা। সংসারের শান্তি শৃঙ্খলা সৌন্দর্য তথা সন্তানের লালনপালনের আজ কোন আধিক মূল্য নাই, কেবল আরও টাকা চাই। আমরা কি সুক্ষ্ম-ভাবে ভাবিয়া দেখিয়াছি আধিক প্রয়োজন মেটান এবং সংসারের শান্তিশৃঙ্খলা ও সন্তান পালনের সামঞ্জস্য করা যায় কি করিয়া? সকলেরই চাকুরী না করিলেও চলে কি না? সব শেষে আরও একটা প্রশ্ন আসে—এই যে মেয়েরা চাকুরী করিতেছে তাহাতে সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ হইয়াছে কিনা, কতটুকু? মেয়েরা প্রাণপ্রধান, তাহাদের এই প্রাণস্পর্শদ্বারা চাকুরী ক্ষেত্রে যদি কোন কল্যাণ হইত তাহা হইলে একটা সান্ত্বনা থাকিত। কিন্তু

কিছু হইয়াছে কি? কতটুকু হইয়াছে? শিক্ষাক্ষেত্র, বিশেষভাবে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র, মেয়েদের পক্ষেই মানানসই—কিন্তু কয়টী দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে যেখানে মাতৃত্ব-স্পর্শ ভগিনী-স্পর্শ কোনো শিশুর জীবনে কল্যাণ আনিয়াছে? সব তো আঙ্কিক হিসাব নিকাশের ব্যাপার—ঘণ্টা ধরিয়া উপস্থিতি—মাসান্তে মাহিনা। শিশুরা কি শিখিল, কি হইল—অস্বাভাবিক শিশুদের জন্য কি করা যায়—সেজন্য কয়জন কতটুকু প্রাণ-পূর্ণ সচেতন প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন? মুখে অনেক কথা বলিতে অনেকেই শিখিয়াছেন বটে!

এ-ত শুধু মেয়েদের জীবনের কয়টী কথাই উল্লেখ করা হইল—এইভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে আমরা যে আজ শিশুর সন্ধানে কোন্ পরিণতিতে চলিয়াছি তাহা আমরা জানি না এবং তাহা সমগ্র সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতেছে কি না তাহা ভাবিবার অবসর বা প্রবৃত্তিও আমাদের নাই। আরও একটী কথা আজ মেয়েদের সামনে আসিয়া পড়িতেছে—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মেয়েদের প্রয়োজন বটে, কিন্তু দুই হইয়াও যে 'এক', পরস্পর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন যে পারিবারিক বা সামাজিক ঐক্য—এই দুই দিকের প্রয়োজন-বোধের কথাটা কি জাতির বোধের মধ্যে আসিয়াছে? এই-ই হইল যে আমাদের আজিকার জাতির জীবনের পরিচয়—শত সমস্যা সত্ত্বেও সাজিয়া গুজিয়া আড্ডা দিয়া যাহারা বেশ আছে কিংবা সমস্ত সমস্যাগুলিকে রাজনৈতিক বা দলগত পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া যাহারা ভাবিতে পারে না কিংবা সব সমস্যার সমাধান দায়িত্ব একমাত্র সরকারের, আমাদের করিবার বিশেষ কিছুই নাই ইহাই যাহারা গত পঁচিশ বৎসরে শিখিয়াছে—তাহাদের কাছে বাঙ্গালীর শত শত বৎসরের শারদীয়া পূজা বৎসরান্তে আবার আসিয়া পড়িলে তাহারা নূতন কি করিবে ঐ দৈনন্দিন জীবনটাকেই মহার্ঘ করিয়া তোলা ছাড়া? এ জাতি তো খাওয়া দাওয়া সাজগোজ ইলেকট্রিক আলো আর বেড়ানো ছাড়া পূজা বলিতে আজও কিছু বোঝে না—সে আজ পূজার দিনে আর কী করিবে?

আমরা একদল মনে করি পূজা অর্থহীন, কুসংস্কার; আর একদল বেশভূষায় বা বাহিরে ঘোরাফেরায় যতই আধুনিকতা দেখাই না কেন দৈনন্দিন জীবনে বহু কুসংস্কার মানিয়া যাইতেছি। সংস্কৃত আমাদের যাহা চলিতেছে তাহা একমাত্র সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। পূজার অর্থ কি, কাহার পূজা করি, কেন করি, আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না আমরা এই সকল কথা কি ভাবিয়া দেখিব না? আমাদের ভাবিতে হইবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া। পূজা করাই কুসংস্কার—ইহাও তো একটা কুসংস্কারই? আবার যেভাবে এই পূজা চলিতেছে জীবনের সঙ্গে যাহার কোন সম্বন্ধ নাই, শুষ্ক ও উচ্ছৃত্ত জীবন-চিন্তা হইতে যাহা অনেক দূরে, তাহাও যে কুসংস্কার তাহা-ও তো সত্য? তাই আজ আমাদের প্রাচীন এই সব কথাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া ভাবিতে বুঝিতে হইবে। যে ভাবে এই পূজার ব্যাপারটা চলিতেছে তাহা যেমন সর্বথা বর্জনীয়, আবার পূজা একেবারেই না করা তাহাও জাতির জীবনে খুবই অপকার করিবে।

পূজা মানে কি? সংক্ষেপে পূজা হইল সমর্পণ—ব্যক্তি-অহং-এর সমর্পণ একটী ব্যাপকতর গভীরতর সত্তার মাঝে। ব্যক্তি-অহং-এর বিচ্ছিন্নতার দুয়ার ভাঙিয়া দিয়া সেই বড়-কে আমার মধ্যে ঢুকিতে দেওয়া, বড়দ্বারা নিজেকে আবাসিত করিয়া লওয়া—ইহাই পূজা। মায়ের পূজা—অর্থাৎ মায়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা—মায়ের ব্যাপকতর গভীরতর সত্তাকে নিজের মধ্যে ঢুকিতে দেওয়া, মাকে দিয়া নিজেকে বড় করিয়া লওয়া। পূজা করিলে কি হয়? একাত্মতা আসে। বড়কে আমার মধ্যে নেওয়ার পথ এই একাত্মতা—যাহাকে নিজ জীবনে ঢুকাইয়া নিজেকে বড় করিতে চাই, তাঁহাকে ঢুকাইবার পথ এই একাত্মতা। পূজার মধ্য দিয়া মায়ের সঙ্গে আমি যে এক ইহা উপলব্ধি করিয়া নিজের ক্ষুদ্রতা, নিজের জীবত্ব দূর করা, নিজে বড় হওয়া।

মা কে? আমরা বেশ স্পষ্টই দেখিতেছি আমাদের বাহিরে একটা শক্তির বলে এই বিশ্বে যাহা কিছু সৃষ্টি হইতেছে, বাঁচিয়া থাকিতেছে, ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। ভাবনাশীল মানুষ প্রথমে তাহাকে ভয় পাইয়াছিল। তাহার পর যতই সে সবদিকে আগাইতে লাগিল, ততই নিজের মনের কথা সে কিছুটা

দেবী বুঝিতে পারিল। সে দেখিল যাহাকে ভয় করি সে আমাকে আরও ভয় দেখায়। ক্রমে সে ভয়ের ভয়াবহতা আমাকে আরও চাপিয়া ধরে—তখন তাহা হইতে মুক্ত হওয়া আরও কঠিন হয়। ভয় লইয়া তো মানুষ বাঁচিতে পারে না? মানুষ আরও দেখিল এই শক্তি যেমন বাহিরে তেমনই আমার সচেতনতার বাহিরে আমার মনেও তো বটে, আমিও তো যাহা ইচ্ছা করি তাহাই করিতে বা করাইতে পারি না। তাই সে ভাবিতে লাগিল ভয় না করিয়া ভিতর বাহিরের এই শক্তিকে যদি ভালবাসিয়া আপন করি—তাহা হইলে ভয় করা অপেক্ষা সুবিধা হয় অনেক দিকেই। কেন না মানুষ অভিজ্ঞতায় দেখিতেছে ভয় যেমন মানুষকে আরও ভয় দেখায়, ভালবাসা বা প্রেম মানুষকে মুক্তি দেয়। তাই এই শক্তিকে ভালবাসিতে মানুষ উন্মুখ হইল। এই শক্তিকে যদি মা বলিয়া জানি—তাহা হইলেই তো আনন্দ হয়। সংসারে যে ভাবনার আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকতর সমস্যার সমাধান হয়, অধিকতর লাভ বা কল্যাণ হয়, তাহাই তো আমরা গ্রহণ করিব? ঐ শক্তিকে ভয় করা অপেক্ষা ভালবাসিয়া মাতৃসম্বোধন করিলে দেখি আমি পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি সাহস ও আনন্দ পাই। তাই তাহাকে 'মা' বলিলাম। কোন চিন্তাকে বোধগম্য করিতে হইলে তাহাকে রূপদান অপরিহার্য। শক্তির প্রতীক বা দ্যোতক হিসাবে ঘোড়া বা ঘোড়ার উপরে মানুষ সব দেশেরই মানুষ কল্পনা তথা রূপদান করিয়া থাকে। অন্য দেশে পশুপক্ষীর প্রতীকে অনেক কিছুরই অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা ভারতবাসীরা কোন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পশুপাখীও যেমন গ্রহণ করি, তেমনি মানুষের মধ্যে, মানুষী মূর্তিতে এক একটা বিরাট তত্ত্বকে অনুধাবন ও অনুধ্যান করিতে চাই। আমরা যে বিশ্বাস করি, আমরা যে দেখিয়াছি মানুষেরই দেহে সেই অনির্বচনীয় শক্তি অবতরণ করেন, রূপান্তর করেন। আমাদের এই বিশ্বাস পৌত্তলিক বলিয়া অভিহিত হয় দুইটী কারণে। প্রথমতঃ বর্তমান কালে আমাদের কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, আমরা কি কেমন তাহা পাশ্চাত্ত্য বা ভারতবর্ষের বাহিরের দেশের অভিধান দিয়া স্থিরীকৃত হইবে প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া এই যে ব্যবস্থা চলিতেছিল আজ পর্যন্ত তাহার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই, তাহাদের জড়বাদের ঐকান্তিকতার এপাশে দাঁড়াইতে আমাদের ঐ চিন্তা দোষনীয় বা দুর্বোধ্য; আর একটি কারণ হইল আমাদের স্থিতিধর্মী মন একদিনের সত্যোপলব্ধিকে আর একদিন কুসংস্কারে পরিণত করিয়া তুলিতে দ্বিধা লজ্জাই করে না।

যাহা হউক, বিশ্ব-শক্তিকে মাতৃসম্বোধন করিয়া আনন্দ পাইলাম, শক্তি পাইলাম, ভয়ের আচ্ছন্নতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ হইলাম। সংসারের মাতৃত্বই দেখিতেছি আমাকে সুখে শান্তিতে রাখিতে কত তৎপর, তাহা হইলে বিশ্ব-মাতৃত্ব নিশ্চয়ই আমার ততোধিক স্নেহ করিবেন এবং আমার নিরাপত্তার জন্য ততোধিক উদ্‌গ্রীব থাকিবেন ইহা ভাবিলেই বা দোষ কি? কিন্তু পার্থক্য আছে, জৈব মাতৃত্ব আমাকে রক্ষা করিতে চায়, কিন্তু আমাকে বড় করিতে চায় না। সে কেবলই ভয়ে ভয়ে এই বুঝি আমি বিপদে পড়িলাম—কিন্তু বিশ্বমাতৃত্ব আমাকে বিপদে ফেলিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করেন—কেন না তিনি তো জানেন বিপদে না পড়িলে মানুষ বড় হইতে পারে না, তাহার ক্ষুদ্র চিত্তত্ব ঘোচে না। আমরা এ মাতৃত্ব দেখি নাই, তাই বুঝিও না, বিশ্বাসও করিতে পারি না। বিশ্ব-মাতৃত্ব আমাকে নূতন নূতন ঘটনায় ফেলিয়া আমাকে জীবনের আস্বাদনে জাগাইয়া নিয়া চলেন, অথচ তিনি আমাকে রক্ষা করিতেছেন—এই আস্বাদনই তো সুন্দর মধুর বহৎ। আমার এ নির্ভরতা তখনই দোষনীয় যখন তাঁহার স্নেহ-ছায়ার অপেক্ষায় আমি আমার করণীয়কে ভুলি। আমার সংসারের মা-ও আমাকে সুখে রাখিতে পারিবেন না যদি আমি নিজেকে নিজে সুখে রাখিতে না চাই অর্থাৎ সুখে থাকিতে হইলে যে পথে যে ভাবে আমার যাহা করণীয় বলিয়া আমার মা বলিলেন তাহা না করি। সংসারের মা-ও আমাকে তাঁর সাধ্যমত পথ-নির্দেশই দিতে পারেন শুধু, পথ তো আমাকেই চলিতে হইবে? বিশ্বমাতৃত্বের প্রতি আস্থা নির্ভরতা বিশ্বাস যদি আমাকে অধিকতর প্রেরণা দিয়া নব নব পথে জীবন-সংগঠনে উদ্দীপিত না করে, তাহা হইলে সে ক্লীব আস্থা বিশ্বাস ব্যক্তি বা জাতির

জীবনে অভিশাপ বৈকি। এই অভিশপ্ত অবস্থাই আজ আমাদের জাতীয় জীবনে চলিতেছে। যাহারা ভগবান অবতার বা মহাপুরুষের বিশিষ্ট অবদানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করি না তাহাদের কথা বাদই দিলাম, যাহারা বোধ করি তাঁহারা ঐ কারণেই কর্মকে বাদ দেই, নিয়তির হাতে পুতুল সাজিয়া কর্মহীন ধার্মিক জীবন যাপন করি। আবেষ্টন যেমন মানুষকে সৃষ্টি করে, তেমনি মানুষও যে আবার আবেষ্টনকে সৃষ্টি করিবারও ক্ষমতা রাখে অথচ বিশ্ব-মাতৃত্বকে বা বিশ্ব-পিতৃত্ব বা বিশ্ব-বন্ধুত্বকে অস্বীকার করিতে হয় না—একথা আমরা জানি নাই। আজ আমরা তাহাই শিখিব। মাকে ভালবাসিব, ভক্তি করিব আর সেই জন্যই নিজেকে আরও নানাভাবে গড়িয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমাজকে, বিশ্ব-সমাজকে মায়েরই আঙিনা রূপে গড়িয়া চলিব। মাকে ভালবাসিলে সংসারের আর সবাইকে ভাল না বাসিলেও চলিতে পারে এতকাল আমরা ইহাই জানিয়াছিলাম। কিন্তু আজ শিখিতে হইবে মা এবং মায়ের আর সকল সন্তানকে একই সময়ে ভালবাসিতে হইবে। বিশ্বের মানুষ বাদ দিয়া শুধু নিজের মাকে ভালবাসিয়া খুশী থাকিলে চলিবে না—ইহা যতদিন না বুঝিব ততদিন মাকে ভালবাসাও হইবে না। মায়ের ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি সব মানুষকে ভালবাসিয়া সমস্ত বিশ্বকে মায়ের আঙিনায় পরিণত করিবার প্রয়াস না পাই, তাহা হইলে আমার সে মাতৃ-প্রেম নিছক ক্লীবত্বপূর্ণ মানসিকতার ব্যর্থ প্রকাশ। ভারতবাসী দীর্ঘ দিন পর্যন্ত যে পূজা করিয়া আসিতেছে তাহা ঐ ক্লীবত্বপূর্ণ মানসিকতায় আচ্ছন্ন। তাই সে আবেষ্টনকে গড়ে না, তাহার নিজকে ভাল রাখিতে যে আবেষ্টনকে গড়িয়া চলিতে হইবে—ইহা সে শিখিতে পারে নাই আজও। অথচ এই ভারতবাসী বা বাঙ্গালীই একদিন তাহার শারদীয়া মাতৃপূজায় 'সর্বে'-র সহিত মাতৃত্ব আস্বাদন করিবার একটী সুন্দর পথ লইয়াছিল এই মাতৃপূজায়। সর্বের সঙ্গে সেটা যেমন বহিঃসাধনা, তেমনি আন্তর সাধনাও বটে, আর এই জন্যই আনন্দ-সাধনাও বটে। কিন্তু যদি আমাদের কাছে অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত অর্থ বিলুপ্ত হইয়া যায়—থাকে শুধু একেবারেই বহিরঙ্গের খোসার চাকচিক্যটুকু, তাহা হইলে একটা জাতির জীবনের মানদণ্ড কোথায় আসিয়া দাঁড়ায়? তাই ভাবিবার দিন আসিয়াছে।

মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া নিজেকে, নিজের আবেষ্টনকে সৃষ্টি করিবার—নিজেকে, সর্বকে—নব নব পথে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প লইব, যাহা কিছু আমাকে পিছনের দিকে আগাইয়া যাইয়া নূতন পথে নূতন জীবন গড়িতে বাধা দেয়, সেই সব কিছুর 'অসুর'-কে, 'মধুকৈটভ'কে মায়ের মত আমি বধ করিয়া চলিব। পরস্পরকে স্বীকৃতি দিয়া, মর্যাদা দিয়া, ভালবাসিয়া সম্বন্ধযুক্ত হইব; বিচ্ছিন্নতার, ভেদ-বুদ্ধির মহিষাসুরকে বধ করিব। সংসারের বস্তুকে নিজের ভোগের দৃষ্টিতে দেখিব না। ছোট বড় জড় চেতন সব কিছুকে জননীর দৃষ্টিতে দেখিব, ব্যক্তি-ভোগে লালায়িত শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরকে বধ করিব—বছরেও কি একবার এ সকল কথা ভাবিব না? মায়ের পূজার তিনটী দিনে পূজার অর্থকে নূতন করিয়া এইভাবে ভাবিবার মত মন আমাদের হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আজিকার দিনে জাতিগতভাবে অনেক পরিকল্পনা, অনেক প্রচেষ্টা সর্ব সাধারণের জন্য হইতেছে, সর্বসাধারণকে আজ অনেকখানি মর্যাদা ও অধিকার দেওয়া হইতেছে—যদিও এ সব ব্যবস্থাই রাষ্ট্রীয় আইনদ্বারা সিদ্ধ। আমরা এতদিন যে সমাজ-জীবন যাপন করিয়াছি—যে সমাজ-ব্যবস্থা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেরই প্রতিফলন—সেই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রদ্বারা সর্ব-সাধারণের জন্য এ মর্যাদা ও অধিকার ব্যবস্থিত হয় নাই এবং সেইটা না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র-প্রদত্ত মর্যাদাদান মানুষের চিত্তের কোণে স্থায়ী পরিশুদ্ধি প্রদান করতে পারিবে না, তথাপি সাধারণ মানুষের জন্য আজ যাহা যতটা ভাবা হইতেছে, করা হইতেছে, এ পর্যন্ত কোনদিন তো তাহা হয় নাই, তবু এত পরিকল্পনা সব শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে কেন? কেন লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত স্লুইস গেট একমাসের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ে, কেন রাস্তাগুলি মেরামত করার তিনমাসের মধ্যেই ভাঙ্গিতে সুরু করে, কেন এত পরিকল্পনা এত কমিটী সত্ত্বেও নাগরিক জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন সহর হইতে জল নিষ্কাসন ও আবর্জনা

দূরীকরণ কাজই হয় না? এ প্রশ্নগুলির উত্তরে এই কথাটাই আসে যে, আমাদের চরিত্র ব্যক্তিগতভাবে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তি-ভোগের মানসিকতা দ্বারা একেবারে আচ্ছন্ন—আমরা বস্তুকে আমারই ভোগে লাগাই; যাহা আমার তাহাকে যেমন সম্পূর্ণ আমার বলিয়াই জানি, যাহা আমার নয় তাহাকেও আমার করিতে যে-কোন হীনতার আশ্রয় লইতেও দ্বিধা করি না। আমরা যদি মায়ের পূজা সত্যি করিতাম, তিন দিনের পূজার অন্তরালে কতখানি কথা আছে যদি তাহার খোঁজ লইতাম, তাহা হইলে এত থাকা সত্ত্বেও আমরা সংসারে সমাজে এত ক্লীবত্বের পরিচয় দিতাম না। আমরা নিজেদের পরিবর্তন করিব—এই সংকল্প ও প্রচেষ্টা লইয়া যেন পূজা করি—মাকে যেন ভালবাসি, সমস্ত মানুষকে যেন ভালবাসি, এবং সে ভালবাসার পরিচয় যেন আমাদের কর্মে থাকে—আজ পূজার দিনে এই প্রার্থনা রহিল। আমরা যদি সমাজকে ভুলি, সমগ্রকে ভুলি, যদি কেবল নিজের গণ্ডীটুকু লইয়া থাকিতে চাই, তাহা হইলে মায়ের পূজা করিয়া মাকে যেন অপমান না করি—নিজেদের জন্য এ প্রার্থনাও যেন আমরা করিতে পারি। বাঙ্গালীর শারদীয়া পূজার বৈশিষ্ট্যটুকু, অর্থ টুকু যেন আমাদের আচার আচরণে প্রকাশ পায়, যেন আমাদের বেশভূষায় প্রকাশ পায়। মায়ের পূজায় আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্র গৌরবে বীর্যে আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

পূজার ভাবনা

॥ শ্রীসুনীতি সাঙ্গাল ॥

নতুন বছর সুরু হবার গোড়াতেই আমরা প্রথমেই যা দেখি তা হল পূজার তারিখটী কবে। ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে বারো মাসে তের পার্ব্বণ কিন্তু পূজার তারিখ দেখতে আমরা ওই বিশেষ পূজাটী অর্থাৎ শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গা পূজাকেই মনে করে থাকি। আমরা আনন্দিত হই পূজা আসছে, ধনী দরিদ্র আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে কেমন একটা নাড়া দেয়। ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্যের মাধ্যমে জামা-কাপড় কেনার ধুম পড়ে যায়। পাড়ায় পাড়ায় শারদীয়া দেবী দশভূজা মূর্ত্তি তৈয়ারীর জন্য বৃদ্ধ যুবা বৃদ্ধ মিলে কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত হয়ে ওঠে। কোন্ পাড়ায় কতটা আলোক সজ্জায় সজ্জিত করতে পারে তার প্রোগ্রাম চলে—মাইক ব্যবসায়ীরাও এ সময় খুব দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠেন কেননা এত অধিক সংখ্যায় মাইক জোগাড় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তেমনি আবার পুরোহিত মণ্ডলীর ছোটাছুটীর অন্ত থাকে না। পূজা সমাধা করতে হবে! গৃহস্থের প্রায় প্রতি বাড়ী থেকেই মায়ের এই পূজায় ভোগোপকরণ প্রেরিত হয়—কেউ বা সারা বছরের বিপদ উদ্ধারের সাধনা-স্বরূপ মানত করা জোড়া পাঠা মায়ের কাছে বলিদানে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। এমনি করে ভক্তি ও আনন্দের মাধ্যমে তিন দিনের পূজা শেষে আসে বিজয়া দশমী। পরস্পর পরস্পরকে কোলাকুলি ও মণ্ডামুখ করা ও করানোর মাধ্যমে বৎসর কালের আকাঙ্ক্ষিত পূজার দিনগুলি শেষ হয়ে যায়।

এদিকে আবার প্রকৃতি রাণীর বুকেও যেন দোলা লাগে। প্রকৃতিও তখন নিজেকে ঐ মানব শিশুর মত নতুন সাজে সাজাতে সুরু করে দেয়। বর্ষার মেঘমুক্ত আকাশ নীল চাঁদোয়ায় মায়ের পূজামণ্ডপ যেন আচ্ছাদিত করে দেয়। বর্ষায় স্নাত হয়ে, শুচিশুদ্ধ হয়ে গাছ পালা সবুজ আর নানাফুলে পূজা মণ্ডপ সাজাবার জন্য প্রস্তুত হয়। হলুদ আর সোনার রং-এর পক্ক ক্ষেত্রে তার আঁচল

দেহে প্রতীক্ষায় বসে থাকে মায়ের চলার পথের গালিচা হবে বলে।

সত্যিই কী অপূর্ব উন্মাদনা এই জড়া প্রকৃতিতে ও মানব প্রকৃতিতে মায়ের পূজার জন্য। এই উন্মাদনা আজকের নয়। কোন্ অতীতের ধারা বেয়ে এ চলে আসছে আবার এমনি করেই বয়ে যাবে ভবিষ্যতে।

এই যে আমাদের পূজা—এ কেমন মায়ের পূজা? এ মা বিশ্বের সকলের না, সকলের আত্মিহরণী অসুরনাশিনী মা। এ মাকে কেমন করে পূজা করলে সকলের আত্মি দূরে যাবে, সকল মানুষ সকল সময়ে আনন্দিত থাকবে সে কথা আজ আমাদের ভাবতে হবে। কত যুগ ধরে ভারতবর্ষে এই মায়ের বন্দনা করে আসছে কিন্তু আমাদের ভেতরের অসুরত্ব, আমাদের আত্মি ত কাটছে না। কাজেই সমাজের ভেতর থেকে একদল বুঝলেন যে ভারতীয় এই পূজা পদ্ধতি শুধুই অন্ধ সংস্কার আর হৈ চৈ, কল্পনা বিলাস মাত্র। এতে সমাজের মানুষের কল্যাণ নেই। কিন্তু সত্যিই কী তাই? না আমাদের পদ্ধতির ভেতরেই ভুল! যদি কল্পনাই করি তা হলে যে কল্পনায় বাস্তব মানুষের বাস্তব সুখ দুঃখ হাসি কান্নায় সকলের মাঝেই সমন্বয়িত বুদ্ধি জাগায়, প্রাণবীর্য প্রদান করে সে কল্পনা মূর্তি কী আর তখন কল্পনা থাকে? তখন সে মাটীর দেহেই মৃন্ময়ী রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাস্তব বিশ্বের সকল অসুরত্ব নাশ করে।

এই পূজার উপাখ্যান চণ্ডীতে আমরা দেখতে পাই। সৃষ্টির প্রাক্কালে সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা বিশ্বকে নতুনরূপে সৃষ্টি করবার সাধনায় রত। কিন্তু মধু ও কৈটভ দৈত্য তাঁর এই সৃষ্টি-পথে বাধা। দীর্ঘকাল ধরে এই বাধার সঙ্গে প্রজাপতি ব্রহ্মা যুদ্ধরত। তারপর তিনি শেষে মূর্তি বিষ্ণুর শরণ নিলেন, মধু ও কৈটভ নিহত হল—তখন সৃষ্টি আরম্ভ হল।

উপাখ্যানের এই মধু ও কৈটভ বস্তুটি কী আমরা জানবার প্রয়াসী হব। মানুষের ভেতরেই এই মধু ও কৈটভ বাসা বেঁধে আছে এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও মানুষের ভেতরেই রয়েছেন। সৃষ্টি করবার যে আনন্দ তা এতটুকু শিশুও বুঝি উপলব্ধি করে, মাটি দিয়ে একটা পুতুল গড়তে পারলে শিশু কতই না আনন্দ পায়! শত দুঃখ যাতনা সয়েও সন্তান সৃষ্টি করবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে চির বিদ্যমান। আর বিরাট বিশ্বকে, আর বিশ্ব-জীবনকে নতুন করে সৃষ্টি করবার প্রয়াসে যে কী আনন্দ তার ত তুলনাই হতে পারে না কিন্তু আমার এই সৃষ্টি আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা দিচ্ছে ঐ মধু ও কৈটভ অর্থাৎ আমার ভেতরের অতীত কু ও সু-সংস্কার। এই সংস্কারের শৃঙ্খলে মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে সৃষ্টি ক্ষমতা লাভ করতে পারছে না, কেমন যেন জড়তায় জীবন যাচ্ছে আটকে। অতীতের ত কত ভাল সংস্কারও ছিল—তাতে কী বর্তমান জীবনের সমস্যা মিটছে, না সেই সংস্কার প্রতি পালনে জীবন স্বচ্ছ সুন্দর হয়েছে? তাই এই পূজার দিনে আমাদের প্রথম অনুধ্যান করতে হবে বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গকারিণী যোগমায়া দুর্গা দেবীর। সর্বসংস্কাররূপী মধু ও কৈটভ মানুষের চিত্ত-বৃত্তি থেকে অপনীত হোক। মহাবৈষ্ণবী যোগমায়া দেবীর কাছ থেকেই আমাদের শিখতে হবে সংস্কারমুক্ত জীবনের চলার ছন্দ

মাঘের অষ্টমী পূজার দিনে চণ্ডীর উপাখ্যানে পাই নতুন সৃষ্টি-পথে মহিষাসুরের উপদ্রবে দেবতাকুল ত্রস্ত। সৃষ্টি হল বটে কিন্তু মানুষের ভেতরে সংঘ চেতনা জাগ্রত না হওয়ায় বিভেদবুদ্ধি মহিষাসুরের দৌরাত্ম্যে বুঝি বা নতুন বিশ্ব ধ্বংস হয়েই যায়। তখন সমস্ত দেব-শক্তি সম্মিলিত হয়ে এক মহা আশ্চর্য শক্তি সৃষ্টি করলেন। ইনিই সর্বদেবশরীরজা আমাদের শ্রীশ্রীদুর্গাশক্তি, দুর্গতি-নাশিনী শক্তি। সকল দেবশক্তি মিলে সৃষ্ট হলেন একটী নারী মূর্তি। কেননা পরিচ্ছিন্ন সর্বশক্তি যেখানে জমাট বাঁধা সেখানে সৃষ্টির আশা কোথায়? একান্ত শক্তির সৃষ্টি-ক্ষমতা থাকে না—থাকে ধ্বংসের ক্ষমতা। তাই প্রাণ-প্রধান ওই নারী-মূর্তির ভেতরে সর্বশক্তি সংহত হয়েই বিশ্বকে সেদিন বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা করেছিল। দেবতারা সেদিন নারীমূর্তির রূপ কেমন দেখেছিলেন? দেখেছিলেন বিশ্বের সুধা রূপে, বিশ্বের মাতৃরূপে, বিশ্বের পুষ্টিরূপে, তুষ্টি-

রূপে, এক তথাস্থ বিশ্বসত্তার সকল রূপেই সেই মহাশক্তিময়ী নারী। সেদিনের মানুষ দেবতা সকলেই সেই দেবী-মূর্তির শরণ নিয়ে বিভেদবুদ্ধি মহিষাসুরকে নিধন করেছিলেন।

বর্তমান যুগের এই পূজার দিনে আমার নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে, সংকল্পে রূপ দিতে হবে কেমন করে বিচ্ছিন্নবুদ্ধিবিশিষ্ট নানা সম্প্রদায় আমরা একাত্ম সৃষ্টিকে নূতনতর পথে এগিয়ে নিয়ে যাব। তবেই হবে আমাদের পূজা করা সার্থক ফলপ্রসূ।

তৃতীয় দিনের উপাখ্যানে দেখতে পাই—সৃষ্টি পথে বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে সংঘ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কোন্ ছন্দে চললে, কেমন করে ভোগ করলে ভোগ দুর্ভোগ না হয়ে প্রসাদ-রূপে গড়ে ওঠে সে বুদ্ধি ত জাগ্রত হয়নি। আত্মকেন্দ্রিক অহংরূপী শুম্ভ নিশুম্ভ সেই সুন্দর বিশ্বকে আত্মভোগে লাগাবার জন্য, শক্তিকে কুক্ষিগত করবার জন্য নিজের সব-শক্তি প্রয়োগ করল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন যে সংঘের ভেতরেই থাকি না কেন সে সংঘ ত কল্যাণ কিছু করতে পারে না। তাই দেখি সেদিন দেবতারা শরণ নিলেন ত্যক্তেন 'দুর্ভীধা -র ছন্দ শিক্ষার জন্য এই বিদ্যাদায়িনী মহা সরস্বতীর। কেমন করে ভোগ করলে সকলেরই ভোগে লাগে, সকলের ক্ষুধা আমার ক্ষুধা বলে বোধ হয়, সকলের আনন্দে আমার আনন্দ হয় সেই শিক্ষা লাভ করলেন নবমী পূজার দিনে। আত্মেন্দ্রিয় কামুক শুম্ভ নিশুম্ভ নিহত হল। বিশ্ব-প্রেমের দুয়ার খুলে গেল।

চতুর্থ দিনে বিজয়া। এই তিন দিনের পূজায় পূজারী মানুষ সর্বসংস্কার মুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি ঝেড়ে ফেলে বিশ্বকেন্দ্রিক জীবন নিয়ে জীবন যাত্রা পথে অগ্রসর হলে তখন কোথায় থাকে দুর্ভোগের গ্লানি? তখন যে, বিশ্ব মধুময় হয়ে যায়। তখন তুমিও মধু আমিও মধু এই হয় আস্বাদন তখন এ বিরাট বিশ্বই আমার নিবাস। বিশ্বের সকল পরিবার আমার পরিবার। এই ত বিজয়।

আজ সারা বিশ্বে মহিষাসুর তথা শুম্ভ নিশুম্ভের খেলা চলছে যার ফলে চিন্তাহীন মনুষ্যত্বহীন আজ ভীত সন্ত্রস্ত, মানুষের বিশ্ব বুদ্ধি বা ধ্বংস হয়ে যায়। বিশ্বের একদিকের মানুষ অন্নহীনতায় মৃতপ্রায়, আর একদিকের মানুষ অর্থের দম্ভে অস্ত্রস্পর্ধনবাদে এসে অন্যের গলা টিপে মারতে উদ্যত। কোথায় এর সমাধান?

সমাধান আছে—তা আছে এই ভারতেরই বুকে। ভারত মাতার চিন্ময়ী রূপের চরণতলে বসে আজ নিজেদের গড়ে তুলব মৃন্ময়ী দুর্গা শক্তিরূপে। আজকের দিনে এই ভাবনা ছাড়া আর পথ নাই।

আজ স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নরনারীর কাছে এই একটী মাত্র ভাবনা ও চেষ্টা জাগ্রত হোক্—স্বাধীন ভারতের প্রতিটী মানুষ সকল সংস্কার দূরীভূত করে, সকল ভেদাভেদ ভুলে মৈত্রীবন্ধনে মিলিত হয়ে মায়ের পূজা করি।

"দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ" মায়ের পূজা করব কেমন করে! মাকে আমার ভেতর সৃষ্টি করতে হবে অর্থাৎ আমার ক্ষুদ্র সত্তা তাঁর বিরাট সত্তার কাছে নিবেদন করে ও বিলুপ্ত হলে তবেই হবে মায়ের পূজা সার্থক।

মায়ের এমন পূজারীই পারবে বিশ্বের সকল দুর্গতি নাশ করতে, পারবে সৃষ্টিকে নতুনতর, সুন্দরতর করতে।

'প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে..... ।'

—রবীন্দ্রনাথ

শাসককেন্দ্রিক সভ্যতার পরিবর্তে ব্যষ্টিকেন্দ্রিক সভ্যতাই ব্যক্তি মানুষকে মুক্তি দিতে পারে

॥ শ্রীস্বদেশ রঞ্জন দাস ॥

সংসদীয় গণতন্ত্রের ঋষি রুশো বলেছিলেন, "মানুষ মুক্ত হয়েই জন্মায়, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত—Man is born free and every where he is in chains"

সমাজতন্ত্রের ঋষি মার্কস বলেছিলেন, "The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to the one another, carried on an uninterrupted, now hidden, nowopen fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary re-constitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes."—এ পর্যন্ত যত প্রকার সমাজের উদ্ভব ঘটেছে তাদের সকলেরই ইতিহাস হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, ক্রীতদাস ও মালিকে, ধনী ও শ্রমিকে, জমিদার ও ভূ-দাসে, এক কথায় শাসক ও শোষিতের এই শ্রেণী সংগ্রাম চলে আসছে…"।

এই দুই ঋষিই ব্যক্তি মানুষের এই দাসত্বের অবসান ঘটিয়ে মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা মানুষের মুক্তির জন্য যে পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন তাতেও মানুষের বন্ধন ঘোচেনি; আগেও তারা যেমন শাসকদের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ছিল আজো তারা তেমনি রয়ে গেছে।

রুশোর সংসদীয় গণতন্ত্রে "জেনারেল উইল—সাধারণের ইচ্ছার" দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদেরই নির্বাচিত করার জন্য জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে দল বাঁধতে বাধ্য হন এবং ভবিষ্যতেও নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা রক্ষা করার জন্যও দল রক্ষা করে চলতেও বাধ্য হন। এই ভাবে রুশোর মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে জনগণ রাজার মাথা কেটে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে রাজার শাসন থেকে মানুষকে অব্যাহতি দিলেও সংসদীয় গণতন্ত্রে পার্টিরাজের শাসন থেকে অব্যাহতি দিতে পারে নি। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে পার্টি শাসনের জগদ্দল পাথর মানুষের বুকে ঠিকই চেপে থাকে। সে চাপ রাজতন্ত্রের শাসনের মতো গুরুতর না হলেও তা শাসকের চাপ বটে। বন্ধন রজ্জুর দৈর্ঘ্যটা ঘোরা ফেরার মতো কিছুটা বেশী হলেও গলায় বন্ধন রজ্জুর বাঁধনটা ঠিকই রয়ে গেছে। অবশ্য সেই সঙ্গে শাসন-শোষণের বরাদ্দটা কিছুটা বেড়েছে। আসলে শাসক শাসিত সম্বন্ধটা ঠিকই রয়ে গেছে, রুশোর মানুষ তাঁর নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করেও মুক্তি পায়নি, শৃঙ্খলিত রয়ে গেছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে ব্যক্তি মানুষের এই বন্ধন দশা দেখে মার্কস বলেছিলেন, "ব্যক্তি মানুষ যদি মনুষ্য সমাজের মৌল একক হয়—Man is the root of man kind—" তবে সেই ব্যক্তি মানুষ—সংসদীয় গণতন্ত্রে ও ধনতন্ত্রে মুক্তি পেল কই? সংসদীয় গণতন্ত্রের ও ধনতন্ত্রের বন্ধন থেকে ব্যক্তি মানুষকে মুক্ত করার জন্য তিনি যে বিকল্প ব্যবস্থা দিলেন তাতেও কিন্তু তাঁর ব্যক্তি মানুষ মুক্তি পেল না, শাসক ও শোষক শ্রেণীকে লোপ করতে তিনি এক নতুন শাসক শ্রেণী গড়ে তোলার ব্যবস্থা পত্র দিলেন। যুক্তি দেখালেন, শোষক শ্রেণীকে শোষণ করতে, শাসক শ্রেণীকে শাসন করতে এক কর্তৃপক্ষীয় দল অনিবার্য ভাবেই গড়ে তুলতে হবে। ফলে মানুষের বন্ধন রজ্জু ঠিকই রইল, মাত্র তার নাম-রূপের কিছুটা পরিবর্তন

ঘটল। মার্কস অবশ্য এই সঙ্গে বলেছিলেন যে, এই নতুন শাসক ও শোষক দল বেশীদিন থাকবে না, পুরাতন শাসক ও শোষক শ্রেণী লোপ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন দলের কাজও ফুরিয়ে যাবে, তখন এরা আপনিই অকেজো হয়ে শুকিয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু মার্কস অনুমান করতে পারেন নি যে, মানুষের ক্ষমতার লোভ টাকা পয়সার লোভ অপেক্ষা কম নয়, বরং বহুগুণ বেশী। পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্রের উদ্ভবের ইতিহাসও বর্তমান পার্টিতন্ত্রের ইতিহাসের মতোই। শোষক শ্রেণীকে লোপ করার অজুহাতে যেমন আধুনিক পার্টিতন্ত্রের অভ্যুদয়, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে জনসাধারণকে বাঁচাবার অজুহাতে পুরোহিততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের উদ্ভব। প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবসান ঘটলেও, বহিঃশত্রু নিপাত হলেও পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র অচল অনড় হয়ে জনসাধারণের বুকে বসে থেকেছে বংশ পরম্পরায়। মার্কসের পরিকল্পিত কমিউনিষ্ট পার্টিও শোষক শ্রেণীকে এক দিনের মধ্যে লোপ করলেও অর্ধ-সভ্যতাধীর মধ্যেও লুপ্ত হল না। তাদের ডিকটেটরি শাসন অব্যাহত রইল মার্কসবাদেরই দোহাই দিয়ে। কেউ কোন আপত্তি তুললে শ্রেণী শত্রুর বদনাম দিয়ে তাকে লোপ করে দেওয়া হতে থাকল। মোট কথা মানুষ জন্মগত ভাবে স্বাধীনতা পিয়াসী জীব হয়েও আজো সর্বত্র বন্দী শৃঙ্খলিত শাসিত ও শোষিত। রুশো-মার্কসের প্রদর্শিত পথে চলেও তারা মুক্তি পায়নি, যেমন শৃঙ্খলিত ছিল তেমনি আছে, শৃঙ্খলের রং বদলেছে, গলার দড়ি কিছুটা লম্বা হয়েছে, খোরাকও হয়তো কিছুটা বেড়েছে।

প্রথম থেকেই সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত—শাসক ও শোষিত। অদ্যাবধি রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য কাব্য সবই এই শাসক-শাসিত ভাব ও ভাবনা ভিত্তিক। পুরোহিত তন্ত্র, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতান্ত্রিক-সমাজতন্ত্র প্রভৃতি যত প্রকার সমাজ ও রাষ্ট্র রূপ এযাবৎ মনুষ্য সমাজে দেখা গেছে বা যাচ্ছে তা সবই শাসককেন্দ্রিক। তফাৎ হয় কেবল কোন্ তন্ত্র জনসাধারণকে কত বেশী বা কম নিয়ন্ত্রণ করেন বা কে কত কম বা বেশী দান-অনুদান দিয়ে থাকেন তারই তারতম্য অনুসারে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, মুক্তি পিয়াসা যদি মানুষের সহজাত বৃত্তি হয়, তবে কি কারণে মানুষ সর্বত্র আজো শৃঙ্খলিত, শাসিত শোষিত? জনসাধারণের সমর্থন ব্যতীত কোন তন্ত্র, কোন প্রকার সমাজ ব্যবস্থাই টিকতে পারে না, চলতে পারে না: এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। অতএব সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষের এই যে দাসত্ব এটা কী তা হলে স্বেচ্ছাবৃত দাসত্ব? সমাজে শাসক-শাসিত সম্বন্ধটা স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিলে যে মানুষ স্বভাবতঃই মুক্তি পিয়াসী সে মানুষের পক্ষে মুক্ত থাকা যে আর সম্ভব হয় না সেটা বেশ বোঝা যায়। প্রশ্ন হল: মানুষ নিজ দাসত্বের শৃঙ্খল স্বেচ্ছায় নিজ অঙ্গে ধারণ করে কেন? মুক্তি পিয়াসার বৃত্তি নিয়ে জন্মলাভ করে সকলেই কতিপয় শাসক শ্রেণীর শৃঙ্খল পরে কেন?

এর উত্তর হল: ভুল করে মানুষ নিজ বন্ধন-শৃঙ্খলকে মুক্তির ভূষণ ভেবে নিজ অঙ্গে জড়ায়। এই ভুল হয় প্রথমতঃ সঠিক চিন্তা করার নিয়মটি না জানার জন্য। মানুষ জ্ঞান লাভ করে তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সাহায্যে, কিন্তু সেই অনুভূতিই তাকে সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞান দেয় না। অবভাস, অমূল প্রত্যক্ষ প্রভৃতির দ্বারা সে অনেক ভুল অভিজ্ঞতা লাভ করে। সেই সব ভুল অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ-আরেষণের সাহায্যে বিচার করে সঠিক সত্য জ্ঞান লাভ করতে হয়। সঠিক চিন্তা করার পদ্ধতি আছে, তার ব্যাকরণ আছে। তাকেই আরোহ পদ্ধতির চিন্তা বা inductive logic বলে। সেই নিয়ম অনুসারে চিন্তা করলে চিন্তা সঠিক হয়, সাধারণ মানুষ সে পদ্ধতিতে চিন্তা করতে এখনো শেখেনি। ভুল অনুমান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা ভুল হবে। অনুমানসমূহকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সঠিক সত্যরূপে নির্ধারিত করার পর সেই সত্য অনুমান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তবেই তা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। এ যাবৎ মানুষ অনেক ভুল অবভাসকে বা অমূল প্রত্যক্ষকে সত্য বলে গ্রহণ করে

এসেছে এবং অসত্য ও ভুলকেই আঁকড়ে রেখে কষ্ট পেয়ে এসেছে; বোঝেনি যে, এ কষ্ট তার নিজেরই ভুলের ফসল। শাস্ত্র-নির্দেশিত বাক্যকে বা অন্যের ব্যক্তির বাণীকে অনুমানরূপে নির্বিচারে গ্রহণ করে সেই অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অনেক সময়েই সে ভুল করেছে, তাতে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয়নি, সে ঠকেছে, কষ্ট পেয়েছে: কারণ ধরতে পারে নি, পুনরায় ভুল করেছে। এই ভুল সিদ্ধান্তের জন্যেই মানুষ মুক্তি পায় নি, ভুল করেই নিজের বন্ধন-শৃঙ্খলকে নিজেই নিজের অঙ্গে জড়িয়েছে।

অবশ্য এই সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষের মূল্য-বোধ ক্রমে ক্রমে জাগে, ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে বিকশিত হয়। সেই জন্য প্রথম প্রথম মানুষ সামান্য কিছু পেলেই আহ্লাদে আটখানা হয়। কিছু কাল পরেই নতুন মূল্য বোধ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার তুচ্ছতা বুঝতে পারে।

দ্বিতীয় কারণ হল মানুষ আবাল্য শাসক-শাসিত সমাজের ভাব ও ভাবনার দ্বারা, অভিজ্ঞতার দ্বারা অভিভূত ও প্রভাবিত হয়ে আসছে। মানুষ জন্মেই মা-বাপের শাসনাধীনে থেকে পালিত হয়, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দ্বারা শাসিত ও তালিম পায়, কর্মক্ষেত্রে মালিকের দ্বারা শাসিত হয়, রাষ্ট্র ও সমাজের নানা আইন-কানুন অনুশাসনের দ্বারা সকল সময় শাসিত হয়। সেইজন্য শাসক-শাসিত সমাজ ব্যবস্থাটাকেই সে শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় ধারণা করে তা মেনে নেয়। মুক্তি পিয়াসা তার সহজাত, সেইজন্য এই বন্ধন দশা সে অন্তর থেকে মেনে নিতে পারে না, ভুল করে গ্রহণ করলেও তার ভুল ভাঙতে দেরী হয় না, অবশ্য যদি তার মনের নিগড় কেটে যায়, মনের কথা অকুতোভয়ে বলার সাহস জেগে থাকে তা হলে সকল প্রকার শাসন কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিই তার প্রতিবাদ, অভিযোগ জেগে ওঠে; তা কখনো হয় সোচ্চার —কখনো হয় নীরব। যুগ যুগ ধরে এই ভাবে মানুষ ভুল করে নিজের বন্ধন শৃঙ্খল নিজেই গড়ে চলেছে, পরে ভুল বুঝতে পেরে তাকেই ভাঙতে চেয়েছে, ব্যক্তি মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস এই ভুল করার ও সেই ভুল সংশোধন প্রচেষ্টার ইতিহাস।

ব্যক্তির এই মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস মনুষ্য সমাজ গড়ার আদি থেকেই চলে আসছে দেশে দেশে, তবে স্থান কাল ভেদে তার রূপ ও পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। রুশো ও মার্কসই কেবল দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের দুঃখে বিগলিত হয়ে তাদের মুক্তির জন্য মাথা ঘামান নি, পথের হদিস দেবার চেষ্টা করেন নি, এনলাইটেনমেন্ট যুগের মনীষীরা থেকে সমগ্র রেণেসাঁসী যুগের বহু মনীষীও সে জন্য মাথা ঘামিয়েছেন; এবং তাঁদের এই প্রচেষ্টার দ্বারা, ভাব ও ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সশ্রদ্ধ আগ্রহে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক মানুষ তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন, ভেবেছেন তাঁদের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি আসবে, শাসক-শাসিত সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটবে। কিন্তু তা ঘটে নি। সাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার যতটুকু মূল্য বোধ তখন জেগেছিল ততটুকু অবশ্য মিলেছে।

এইখানেই শেষ নয়, গ্রীসে আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্রোটাগোরাস ও সুফিপাস ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অগ্রদূত। এদের মতে ভাবিত হয়েই সফিষ্টগণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, তারপর এপিকিউরাস ও তাঁর অনুগামীগণ সফিষ্ট সম্প্রদায়ের মতো ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য প্রচার করে গেছেন। গ্রীস ও ইউরোপের ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল এই পার্থিব জগতের সামাজিক রাষ্ট্রিক অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বন্ধন থেকে মুক্তি। এঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই ইউরোপে রেনেসাঁস আন্দোলন জেগেছে, এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার আদর্শও মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে পেয়ে চলেছে।

ভারত ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশে সম্ভবতঃ গ্রীস অপেক্ষা আরো দু-এক হাজার বছর আগে থেকেই মুক্তি পিয়াসী মানুষ এই মুক্তির চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাসক শ্রেণীর বন্ধন থেকে ও প্রকৃতির অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করেছেন তাদের অস্বীকার করে। বহির্জগতকে, প্রকৃতিকে জয় করে, শাসক শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, সে ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে এসে, শাসক শ্রেণীর শোষণ শাসন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা না করে, তারা তাদের সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে,

মনকে নিষ্ক্রিয়তাবীনে এনে, বহির্জগতকে, শাসক শ্রেণীকে, প্রকৃতিকে অস্বীকার করে, কৃত্রিম উপায়ে প্রাণশক্তির বিপাক ক্রিয়াকে বন্ধ রেখে, মুক্তির সন্ধান করেছেন।

পাশ্চাত্যে মুক্তি সাধনার উদ্দেশ্য ছিল সামন্ততন্ত্র সমাজের অন্যায় গৃহ স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব থেকে মুক্তি, চিন্তার স্বাধীনতার জন্য মনের বন্ধন থেকে মুক্তি, ইচ্ছা মতো বাঁচার, বলার, চলা-ফেরার বাধা থেকে মুক্তি এই মুক্তি প্রচেষ্টায় তারা বুঝেছিল যে সর্বপ্রথম শাসক-শাসিত সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে রাষ্ট্র কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সর্ব প্রথম মনের শৃঙ্খল ভেঙে চিন্তার স্বাধীনতা আনেন করতে হবে, বাহ্যজগতের পাদ্রী পুরুত, রাজা-রাজন্য, জমিদার-মহাজনের শাসন পাশ থেকে মুক্ত হবার আগে অধ্যাত্ম জগতের বন্ধন কাটাতে হবে; ঈশ্বরের ভয় দেখিয়ে, নরকের বিভীষিকার ছবি এঁকে পাপাতঙ্কে আতঙ্কিত করে, স্বর্গের লোভ দেখিয়ে মানুষের মনকে সম্মোহিত ও পঙ্গু করে রাখা থেকে মানুষকে সর্বাগ্রে মুক্তি পেতে হবে। গ্রীক দার্শনিক, রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেন্টের মনীষীদের ভাব ও ভাবনায় ভাবিত হয়ে পাশ্চাত্যের সাধারণ মানুষরা শাসক সম্প্রদায়ের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে এনেছিল। তারা রাজন্য, পাদ্রী পুরুত, ধনীজমিদারদের মাথা হেঁটে ছিল, সম্পত্তি ও ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত করেছিল। সেই কারণে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি প্রচেষ্টায় তারা যখন ব্যাহত হত, তখন আংশিক জয়েও তাদের মন তুষ্ট থাকত না। মুক্ত মনে শীঘ্রই নতুন মূল্য বোধ জেগে উঠত এবং নতুন আদর্শ লাভের জন্য সংগ্রাম সুরু হত; তখনকার নতুন শাসকদের বিরুদ্ধে পুনরায় জেহাদ ঘোষণা করে তারা এগিয়ে যেতে চেষ্টা করত।

কিন্তু প্রাচ্যে মানুষের এই মুক্তি প্রচেষ্টার ইতিহাস ভিন্ন পথে, বিপরীত মুখে বয়ে গেছে। পরলোকের বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়ে সে ইহলোকের বন্ধনকে অস্বীকার করে তুলতে চেয়েছে। পরলোকের কল্পিত সুখৈশ্বর্যের চিন্তায় সে ইহলোকের অন্নবস্ত্রের দুঃখ ভুলতে চেয়েছে সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে। ইহলোকের অন্নবস্ত্রের কষ্ট যতই কেন বাড়ুক না মানুষ শাসক শ্রেণীকে দোষ দেয় নি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। সে জন্য সে নিজ সাধনাকে দোষ দিয়েছে, সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারকে আরো বেশী নিরুদ্ধ করতে চেয়েছে। বহির্জগৎকে ভুলে মানসিক জগতের অন্তর্লোকে, নির্বাণ ও মোক্ষলাভের প্রচেষ্টা গুপ্তযুগের পর এতই বেড়ে যায় যে সমাজ জীবন থেকে রাষ্ট্র-চিন্তা, শিল্প বাণিজ্য প্রচেষ্টা, বিজ্ঞান চর্চা প্রায় লোপ পেয়ে যায়। ফলে মুষ্টিমেয় বহিঃশত্রু আসমুদ্র হিমাচল এক রকম বিনা বাধায় জয় করে নেয়। রাজারা নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য তাড়াটে সৈন্য নিয়ে বাধা অবশ্যই দিয়েছিলেন কিন্তু জনগণ সর্বত্র উদাসীনই ছিল।

মনের এই নিগড় কাটল, জীবন-বিমুখতা ঘুচল, ব্রিটিশ শাসনে পাশ্চাত্য ভাবধারায় অবগাহন করে। তখন দেখা দিল জীবনমুখীনতা, জন্মলাভ করল পাশ্চাত্যের অনুকরণে জাতীয়তাবাদ। জনগণের মধ্যে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হল। কিন্তু পাশ্চাত্যে যেমন এই লোকায়ত সমাজের ও রাষ্ট্রের শাসন থেকে ব্যক্তির মুক্তি প্রচেষ্টার অবসান ঘটিয়ে ব্যক্তি সত্তাকে সমষ্টি সত্তার মধ্যে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তির সুখ-দুঃখকে অস্বীকার করে এই ব্যষ্টি-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রনীতির অবসান ঘটানো হয়েছে তেমনি ভারতও তারই অনুকরণ চলেছে।

রুশো ও মার্কস যদিও ব্যক্তি মানুষের মুক্তির জন্য পাগল হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের মতবাদের দ্বারা সমষ্টিবাদ পুষ্ট হয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শ ও সাধনাকে পুপ্ত করে দিয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে পার্টিশাসন যেমন অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তেমনি সমাজতন্ত্রেও কমিউনিষ্ট পার্টির শাসন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক যুগে ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য যাঁরাই চিন্তা করতে সুরু করেছিলেন সেই হবস্, লক, রুশো, বেন্থাম, মিল, মার্কস গ্রীন্ সর্বশেষ রাসেল ল্যাস্কি পর্যন্ত সকলেই সেই পার্টি শাসক তন্ত্রে এসেই শেষ করেছেন! কেবল মাত্র তাঁরা ব্যক্তির গলায় পরানো বন্ধন রজ্জুর দৈর্ঘ্যটা কিছু কিছু বাড়িয়েছেন মাত্র এবং ধরা-ছাঁকিণার পরিমাণও কিছু কিছু বাড়াবার ব্যবস্থাপত্র নিয়ে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার চূড়ান্ত করেছেন বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। ব্যক্তি মানুষও এই

সকল স্তরের ব্যক্তির অস্বীকারকে বেদবাক্য জ্ঞানে অন্ধ ভক্তির সঙ্গে বিশ্বাস করেছে এবং পরম নিশ্চিন্তে সেটাকেই পরম লাভ ভেবে সংসদীয় গণতন্ত্রের পার্টি শাসনকে, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের পার্টি ডিকটেটরি শাসনকে সানন্দে সমর্থন করে এসেছে। ব্রিটিশ লেবার পার্টি প্রমুখ ইউরোপে ও ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরাও পার্টি শাসনকে সমর্থন করে চলেছেন। সাধারণ মানুষ মন থেকে পার-লৌকিক নাগপাশের বন্ধন কাটালেও নতুন করে ইহ-লৌকিক বিভিন্ন মতবাদের নাগপাশের বন্ধনকে নিজ অঙ্গে তুলে নিয়েছে। সভ্যতার আদিকাল থেকে মুক্তি পিয়াসী মানুষ মুক্তি পায় নি, রুশো মার্কসে নির্দেশিত পথে চলেও তারা মুক্তি পায় নি, এবং আজো পাচ্ছে না। কেন না সাধারণ মানুষ কোন না কোন প্রকার শাসক কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই বাস করছে এবং সমর্থন করেও চলেছে।

এই যদি অবস্থা হয় তবে স্বভাবতঃ মুক্তি পিয়াসী মানুষের মুক্তি কী কোন দিনই আসবে না? মানুষ কী সচেতন হয়ে মুক্ত মানুষের দ্বারা গঠিত মুক্ত সমাজ কোনদিনই গড়ে তুলতে পারবে না? কোন দার্শনিক কী সে পথের সন্ধান দেবে না? স্বভাবতঃ মুক্তি পিয়াসী মানুষের প্রতি এ কোন্ অভিশাপ যে অন্তরে সে অহর্নিশ মুক্তির জন্য ব্যাকুল হলেও কেবলই ভুল করে মুক্তি জয়ের মালা ভেবে বন্ধন-শৃঙ্খলকেই বরণ করে চলবে? এই শাপমোচন করতে সংকট দুঃখ ত্রাতা মুক্তি দাতা মহা-পুরুষের আবির্ভাব কি ঘটবে না?

এই প্রবন্ধের লেখক এ প্রশ্নের জবাবে অবশ্যই বলতে পারে যে বিশ্বমানবের মুক্তি পথের সন্ধান পঁচিশ বছর আগেই মিলেছে। মুক্তি পিয়াসী মানুষের স্বেচ্ছাকৃত বন্ধন রজ্জু কাটার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে। সমাজ সংগঠনের আদিকাল থেকে মুক্তি পিয়াসী বন্দী মানুষকে অভিশাপ মুক্ত করে তার বন্ধন দশা ঘুচিয়ে মুক্তি পিপাসা চরিতার্থ করার ব্যবস্থাও হয়েছে। ব্যক্তি মানুষের সর্বপ্রথম পরমবন্ধু, উপদেষ্টা, পথ প্রদর্শকের আবির্ভাব ঘটেছে। পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই মহাপুরুষের জন্ম ইউরোপ আমেরিকায় হয়নি, হয়েছে এই অভিশপ্ত বাংলাতে। সেই মানববন্ধু মহাপুরুষের নাম মানবেন্দ্রনাথ রায়। তথাপি তাঁর নাম তাঁর দর্শনের সংবাদ আজো যে সাধারণ মানুষের নিকট অজানা আছে তার কারণ সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রচার যন্ত্র সবই শাসক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে। তারা তাঁর নাম ও তাঁর দর্শন প্রচার করে শাসক কেন্দ্রিক সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতির সর্বনাশ সাধন করে সমাজে তাদের শাসিতদের মুক্তির পথ পরিষ্কার করে দিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না।

তিনি বলেছেন: মানুষ যে স্বভাবতঃই স্বাধীনতা প্রিয় মুক্তি পিয়াসী জীব সে কথা আধুনিক শরীরতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সীমাহীন সম্ভাবনা নিহিত আছে সেই সকল বৃত্তি ও শক্তির অনুশীলন, সম্ভোগ ও বিকাশ প্রচেষ্টার পথে যে সব বাধা আছে সে সব বাধার ক্রমোপসারণের নামই মুক্তি।

মানুষ যখন জীব তখন অন্যান্য সকল জীবের মতোই তারও জীবিকার্জন করে বেঁচে থাকার কর্তব্য আছে; তার জন্য নেতা, দল, শ্রেণী, পার্টি, অভিভাবকদের দরকার হয় না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে, সমাজের আর সকলের সঙ্গে পরস্পরের স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করে, সদ্ব্যবহার শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করার ক্ষমতা, যোগ্যতা ও অধিকার সকল মানুষের আছে; কারণ প্রত্যেক মানুষই প্রধানতঃ বুদ্ধিপরায়ণ সেই হেতু নীতি পরায়ণও বটে।

মানুষ পিঁপড়ে মৌমাছি উইপোকার মতো সামাজিক জীব নয়, সে পারিবারিক জীব। তার অন্তরের স্বাভাবিক টান নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি নয়। মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠা সেইজন্য স্বাভাবিক নয়, এক কৃত্রিম সৃষ্টি। সেইজন্য প্রতিবেশীর সঙ্গে, সদ্ব্যবহার করে সমাজকে টিকিয়ে রাখতে এক সর্বজন গ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসনের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া পিঁপড়ে-মৌমাছি যেমন তাদের সমাজ ছাড়া বাঁচে না—মানুষ কিন্তু বাঁচে। পিঁপড়ে-মৌমাছি সমাজের সবলে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না, সকলে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না, সকলে

শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। কিন্তু মানুষ সমাজ ছাড়াও নিজ নিজ পরিবারকে নিয়ে বংশ বৃদ্ধি করে বেঁচে থাকতে পারে, সকল মানুষই খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে, সকলেই শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। তথাপি যে সে সমাজবদ্ধ হয়েছিল তা তার সহজাত যুক্তিশীল মনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, অপর শক্তিশালী সংখ্যা গরিষ্ঠ দলবদ্ধ মানুষের নিকট থেকে নিজ পরিবারকে ও নিজ শিকারের ক্ষেত্রকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, এবং তার যুক্তিশীল মন স্বাভাবিক ভাবেই নিজ সমাজের অন্যান্য প্রতিবেশীর প্রতি, অন্যান্য পরিবারের প্রতি আপত্তিকর আচরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিল। কারণ তাহলে দল টিকবে না, সমাজবদ্ধতা বিনষ্ট হবে। সেইসব সর্বজনগ্রাহ্য আচরণই পরে মর‍্যালিটি নাম নিয়ে সমাজে চলে আসছে এবং তা সমাজবদ্ধতার সিমেন্ট রূপে গণ্য হচ্ছে। কিন্তু এই সমাজবদ্ধতার ফলে সে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা নষ্ট করতে কোন দিনই রাজি ছিল না, বা সম্মতিও দিতে পারে না, দেয়ও নি। তথাপি যদি তা নষ্ট হয় তবে সমাজ গঠনের মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বর্তমানের বৃহৎ দেশ, বৃহৎ সমাজ, কেন্দ্রীভূত বৃহৎ রাষ্ট্র, জটিল অর্থনীতি প্রভৃতি সবই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর, জীবনের সব বৃত্তিকে বিকশিত করে জীবনকে সম্ভোগ করার পক্ষে পরম বাধা, এবং এই জটিল সভ্যতা ও সমাজ ব্যক্তির স্বার্থে গড়ে ওঠে নি, গড়ে তোলা হয়েছে শাসক শ্রেণীর স্বার্থে তাদের ক্ষমতা লোলুপতার উদগ্র আগ্রহে।

মানুষ তার স্ত্রীপুত্র নিয়ে যুগ যুগ ধরে খুব ছোট ছোট সমাজেই বাস করে এসেছে, নিজের সকল বৃত্তির অনুশীলন ও বিকাশ সাধন করে জীবনকে সম্ভোগ করে এসেছে। অতীতে সকল দেশের সমাজই ছোট ছিল। আজো ভারতের আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে এই সব ছোট সমাজের দেখা মিলবে, এশিয়ার অন্যান্য দেশে, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও মিলবে। সভ্য সমাজে ইউরোপে লুক্সেমবার্গের মতো ছোট রাষ্ট্রের মানুষরা নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে থেকে জীবন সম্ভোগ করে চলেছে; আমেরিকা, রুশিয়া, চীন, ভারতের মতো বিশাল রাষ্ট্র, জটিল অর্থনীতি ও সমাজের প্রয়োজন হয় নি। বিদ্যুৎ ও আধুনিক ছোট খাট যন্ত্র পল্লীতে পল্লীতে বিকেন্দ্রিত করে দিলেই মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুফলও ভোগ করবে, জীবন ধারণের মান যুক্তি-সঙ্গত ভাবে দেহ ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রয়োজন মতো বৃদ্ধি পাবে; অথচ জীবন মানবিকতা হারিয়ে রস শূন্য কৃত্রিম হয়ে যাবে না। লেনিনেরও এই আদর্শ ছিল। তিনি বলেছিলেন, "Soviet plus electricity, is Communism—বিদ্যুৎ ও গ্রাম-পঞ্চায়েতই হল কমিউনিজিম। অবশ্য লেনিনের এই কমিউনিজিমের আদর্শ লেনিনের দেহের সঙ্গেই কবরিত হয়ে গেছে

আধুনিক উচ্চমানের সভ্যতা ব্যক্তি মানুষের সকল সকল বৃত্তি ও শক্তিকে সামঞ্জস্যের সঙ্গে বিকশিত করে তোলার পক্ষে পরম বাধা। এই সভ্যতার যতটা না সম্ভোগ্য গুণ আছে তার চেয়ে বেশী আছে ক্ষতিকর, কষ্টকর, অমানবিক অবক্ষয়কারী দোষ। আধুনিক সভ্যতা শাসক শ্রেণীর স্বার্থেই গড়ে তোলা হয়েছে।

এই শাসক কেন্দ্রিক সভ্যতা থেকে ব্যক্তি মানুষ মুক্তি পেতে পারে তখন যখন তারা গ্রামে গ্রামে ও সহরে পাড়ায় পাড়ায় সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ ভাবে সক্রিয় করে নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ হবে। দেশব্যাপী এই সকল ভোটার পঞ্চায়েতই হবে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। বর্তমান সংসদের কেন্দ্রীভূত সার্বভৌম ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত হয়ে এইসব স্থানীয় গণতন্ত্রসমূহকে সার্বভৌম ক্ষমতায় ক্ষমতাবান করবে। এইসব সংগঠিত ভোটাররা বর্তমানের মতোই সংসদে প্রতিনিধি প্রেরণ করবে বটে কিন্তু সে সকল প্রতিনিধি এইসব ভোটার পঞ্চায়েতের নিকট দায়ী থাকবে—কোন পার্টির কাছে নয়, পঞ্চায়েতসমূহের নির্দেশ না মানলে, পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকবে। সংসদ হবে এইসব লক্ষ লক্ষ স্থানীয় গণতন্ত্রের ইচ্ছার মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান মাত্র। ব্যক্তি মানুষ তাদের স্থানীয় গণতন্ত্রে বসে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহার করে নিজেদের অর্থ নৈতিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক সমস্যা-

সমূহের সমাধান করে চলবে—নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য বিধাতা হবে।

সমাজের সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজ নিজ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রত্যেককে মাথা ঘামাতে হবে, চিন্তা করতে হবে। এই মাথা ঘামানোর ফলে ব্যক্তি মানুষের সকল বৃত্তি ও শক্তি অনুশীলিত ও বিকশিত হয়ে উঠতে থাকবে। এইসব ছোটোর পঞ্চায়েতগুলি হবে এক একটি জন-শিক্ষার বিদ্যাপীঠ।

দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ স্থানীয় গণতন্ত্রসমূহের মধ্যে গুরুতর মতভেদ ও মত বিরোধ ঘটবে না, কারণ যেহেতু সকল মানুষই প্রধানতঃ যুক্তিপরায়ণ, সেই হেতু নীতি-পরায়ণও বটে। অর্থাৎ দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে চাপলে, মানুষ চিন্তাশীল হতে বাধ্য হলে সে এমন কোন কাজ করবে না বা সিদ্ধান্ত নেবে না যা তার প্রতিবেশীর পক্ষে আপত্তিকর হতে পারে। আর প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহারের নামই হল নীতিপরায়ণতা—মর‍্যালিটি। বর্তমানে এই যে, দেশব্যাপী গভীর দুর্নীতিপরায়ণতা, তার কারণ, শাসক শ্রেণীর সার্বিক কর্তৃত্বের ফলে জনসাধারণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগের একান্ত অভাব, এই দায়-দায়িত্বের অভাবেই জনসাধারণ পূর্বাপর চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, শাসক শ্রেণীর নির্ধারিত পথে যন্ত্রের মতো দৈনন্দিন রুটিন কাজকর্ম করে চলে যায়। জীবিকার্জনের তাগিদে সত্য-মিথ্যার, দুর্নীতি-সুনীতির অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না; তারা সেই জন্য দুর্নীতিপরায়ণ নয়—অনীতিপরায়ণ—amoral, not immoral।

এইখানে পুনরায় প্রশ্ন হল: স্বভাবতঃ মুক্তি পিয়াসী জীব মানুষ যদি তার সমগ্র জন্ম ইতিহাসের মধ্যে সর্বপ্রথম মুক্তি পথের সন্ধান পেয়ে থাকে তবে সে সংবাদ গত পঁচিশ বছরের মধ্যে দাবানলের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল না কেন? মানব জাতির সর্বপ্রথম মুক্তি পথের পথ-প্রদর্শকের পঁচিশ বছর পূর্বেও যেটুকু পরিচিতি ছিল আজ সেটুকুও নেই? কেন বর্তমান যুব সম্প্রদায়ের নিকট তিনি একান্ত ভাবে অপরিচিত? কেন মানবেন্দ্রনাথের নব মানববাদ আজ চেষ্টা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে না, ফলে গ্রহণও করতে অক্ষম হচ্ছে। তবে কী সকল মানুষ জন্মগত ভাবে মুক্তি পিয়াসী নয়? কিংবা নব মানববাদ দর্শনে ভুল আছে? কিন্তু তা তো নয়। কারণ মানুষ যে স্বভাবতঃই মুক্তি পিয়াসী জীব তা তো নৃবিজ্ঞান সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে তাকে একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং আজ পর্যন্ত কেউ নব মানববাদের ভুল প্রমাণ করতে পারেন নি। নব মানববাদের ভুল ধরা বড় সহজ কারণ মানবেন্দ্রনাথ নানা বিজ্ঞানের প্রমাণিত খণ্ড সত্য-গুলিকে যুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে আশ্লেষিত করে তাঁর দর্শন রচনা করেছেন। ভুল যদি থাকে তবে এই আশ্লেষণের মধ্যে আছে, এই যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মে সিদ্ধান্ত টানার মধ্যে আছে, এবং সে ভুল যে কোন যুক্তিবিজ্ঞানী ধরতে পারবেন। এবং আজ পর্যন্ত সে ভুল কারো চোখে পড়ে নি! তাই যদি হয় তবে ব্যক্তি মানুষের মুক্তির দর্শন এই মানববাদের প্রতি সকলের এই অনীহার কারণ কী? এর উত্তর অতি সহজ ও সরল। এটা আরো সহজ ও সরল হয়ে যায় যদি একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে জবাবটা দেওয়া যায়।

প্রকৃতি বিজ্ঞানের উন্নতি যখন হয়নি, চারশ বছরেরো আগে পণ্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে ধারণা ছিল সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই অহর্নিশ প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এই ভূকেন্দ্রিক সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) যখন তাঁর সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন তখন বিশেষ কেউ তা বুঝল না। কোপার্নিকাসের মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দীর পর জিওর্দানো ব্রুনোকে (১৫৪৮-১৬০০) ধর্মদ্রোহ বিরোধী সৌরকেন্দ্রিক সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচারের অপরাধে পুড়িয়ে মারা হল। সৌরকেন্দ্রিক সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তখনো পণ্ডিত মহলেও অজ্ঞতা এত বেশী যে ব্রুনোকে পোড়ানর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে গ্যালিলিওকেও (১৫৬৪-১৬৪২) পুড়িয়ে মারার ভয় দেখিয়ে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য করা হল। গ্যালিলওর মৃত্যুর বছরেই জন্মালেন নিউটন (১৬৪২-১৭২৭)। যেহেতু তিনি

গোপের নাগালের বাইরে ইংলণ্ডে জন্মেছিলেন, সেই হেতু তাঁকে তাঁর সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব ও মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রচারের অপরাধে লাঞ্ছিত হতে হয় নি বরং সম্মানিতই হয়েছিলেন তথাপি এই সৌরকেন্দ্রিক সৃষ্টিতত্ত্বকে ঈশ্বর ও ধর্মশাস্ত্র-নির্ভরতা ত্যাগ করে স্বনির্ভর হতে লাপ্লাস (১৭৪৯-১৮২৭), কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪), লাভোয়েজ (১৭৩৬-১৮১৩) -এর গাণিতিক সমর্থনের প্রয়োজন হয়েছিল। অর্থাৎ ভূকেন্দ্রিক সৃষ্টিতত্ত্বের পরিবর্তে কোপার্নিকাসের সৌর-কেন্দ্রিক সৃষ্টিতত্ত্বকে ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব কাটিয়ে এবং জন-সাধারণের প্রচলিত ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে জনসাধারণ দূরে থাকুক এমন কী বুধমণ্ডলীকে পর্যন্ত গ্রহণ করাতে তিন'শ বছরের ওপর লেগেছিল।

সমাজ-বিজ্ঞান অপেক্ষা পদার্থ বিজ্ঞানের তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত সহজে বোঝা যায়। কারণ পদার্থ বিজ্ঞান ত্রিমাত্রিক ও অপরিবর্তনশীল বস্তু নিয়ে কাজ-কারবার চালায়; কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানের কাজ বিমূর্ত ও পরিবর্তনশীল বস্তুকে নিয়ে। সমাজ-ব্যবস্থা ও সংগঠন-পরিকল্পনা সবই বিমূর্ত চিন্তার সাহায্যে করতে হয়, এবং সমাজ-বিজ্ঞানের একমাত্র উপাদান যে মানুষ তা শুধু নিয়ত পরিবর্তনশীল নয়, সে দিন পর্যন্ত অনেকটাই অজ্ঞেয় ও দুর্জ্ঞেয় ছিল। সেই জন্য সমাজ-বিজ্ঞানের কাজকর্ম সবটাই মননশীলতার দ্বারা সম্পন্ন করতে হয়, এবং সেটা সহজ নয়। এই জন্য গত তিন'শ বছরে পদার্থ বিজ্ঞানের যেটুকু উন্নতি হয়েছে, পেরিক্লিসের এথেন্সে যে উচ্চপর্যায়ের গণতান্ত্রিক মূল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, আড়াই হাজার বছর পরেও যে তার চেয়ে বেশী কিছু হয়েছে তা মনে হয় না। সেই জন্য বলছি যে, সমাজ-বিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞান অপেক্ষা কঠিন। সুতরাং ভূকেন্দ্রিক সৃষ্টিতত্ত্বের পরিবর্তে সৌর-কেন্দ্রিক সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝতে পণ্ডিত মহলের যদি তিন'শ বছর লেগে থাকে তবে শাসককেন্দ্রিক সমাজ-বিজ্ঞানের পরিবর্তে মানবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ-বিজ্ঞানের প্রসার যে গত পঁচিশ বছরে বিন্দুমাত্র সম্ভব হয়নি তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

সমাজবিজ্ঞানের এই যুগান্তকারী আবিষ্কার, ব্যক্তি-মানুষের মুক্তি পথের সন্ধান জনসাধারণের বোধগম্য করতে হলে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সৌরকেন্দ্রিক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রসার যে পদ্ধতিতে সম্ভব হয়েছিল সেই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে সৌরকেন্দ্রিক সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা সর্বপ্রথম সুরু হয়েছিল একাডেমিতে—স্কুল কলেজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। সেখানে বাইবেল ও ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গেই পরস্পর বিরোধী এই সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের আলোচনা চলত। বহুদিন যাবৎ কেবল পণ্ডিত মহলেই সৌরকেন্দ্রিক সৃষ্টি-তত্ত্বের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণ তখনো তাদের চোখে দেখা ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বকেই বিশ্বাস করত। তারপর যখন পদার্থ বিজ্ঞানীরা সেই সব ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষের সাহায্যে যন্ত্র-শিল্প গড়ে তুলে তাদের জন্য ধর্মশাস্ত্রজনের চেয়ে বেশী অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করল, অনেক বেশী অবসর ও আরাম দিল, তখনই তারা তাদের হাতে-কলমে অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহকে বিশ্বাস করতে সুরু করল, এবং ক্রমে ধর্মশাস্ত্রের চেয়ে বিজ্ঞানের ওপর বেশী আস্থাবান হয়ে উঠতে থাকল।

অনুরূপ পদ্ধতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজবিজ্ঞানকেও প্রথমে স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা বয়স্কদের মধ্যে এই সমাজবিজ্ঞান প্রচার করলে তারা গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ তারা জন্মাবধি শাসককেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত —কণ্ডিসনড্। আগেই বলেছি যে, মানবসন্তান যেমন জন্মাবধি দেখে যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবী স্থির হয়ে আছে, সেই জন্যে সরল ধারণা অনুসারে সাধারণ মানুষ ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বে বিশ্বাসী,—তেমনি তারা দেখে যে, শৈশবে বাপ মা, স্কুল কলেজে শিক্ষক, কর্মক্ষেত্রে মালিক শাসন করে, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা বিধি-নিষেধ ও অসংখ্য অনুশাসনের দ্বারা অহর্নিশ শাসন করে চলেছে এবং এটাই বুঝি স্বাভাবিক নিয়ম কর্তা ছাড়া কর্ম চলে না। এইভাবে জন্মাবধি শাসক-শাসিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করে মানুষ এমন ভাবে কণ্ডিসনড্ হয়ে যায় যে ভাবতে পারে না যে সে নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়ন্তা হতে পারে, নিজের কর্তা নিজেই হতে পারে; শাসক-

কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থাকেই স্বাভাবিক ও চিরন্তন ব্যবস্থারূপে মেনে নেয়। অথচ মুক্তি পিয়াসী মানুষের অন্তর এ ব্যবস্থা মেনে নেয় না, খুঁত খুঁত লেগেই থাকে, মনের কোণে প্রতিবাদ জেগেই থাকে; মূল্যবোধের তারতম্য অনুসারে তা কখনো হয় মোচ্চার কখনো থাকে সুপ্ত। এই জন্যই শাসনকেন্দ্রিক সমাজে শুরুবেধি পালিত হয়ে ব্যষ্টিকেন্দ্রিক রাজনীতি অর্থনীতি শিক্ষা সংস্কৃতিকে তারা সহজে গ্রহণ করতে পারে না। সেই জন্য শৈশব থেকেই যাতে মানুষ বুদ্ধি দিয়ে ব্যষ্টিকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে তার মুক্তিকামী স্বভাবকে তৃপ্ত করতে পারে তার জন্য তালিম দিয়ে চলতে হবে। অন্যদিকে এই পার্টিশাসিত রাজনীতি ও মালিকশাসিত অর্থনীতির মধ্য থেকেই ব্যষ্টিকেন্দ্রিক রাজনীতি ও অর্থনীতির তালিম দিয়ে চলতে হবে, হয়তো মধ্যবর্তী সময়ের জন্য পার্টি পলিটিকস করেই পার্টিবিহীন সংহত ব্যষ্টিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে ও সমাজ সংগঠনে উত্তরণ করতে হবে। মোটকথা যেভাবে চার্চ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠের মধ্য দিয়ে ধর্মশাস্ত্র আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি বিজ্ঞানের চর্চা চলে এসে ক্রমে ক্রমে তা সর্বগ্রাসী আকার ধারণ করেছিল, তেমনি বর্তমান শাসনকেন্দ্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায়—পার্টি পলিটিক্সের কব্জিসনড্ মানুষকে তাদের পরিচিতি ও অন্যান্য রাজনীতির চর্চার মধ্য দিয়েই এই ব্যষ্টিকেন্দ্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে।

ভারতীয় সংস্কৃতি

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

[২৩ বৎসর আগে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইতে পুনর্মুদ্রিত]

"সমন্বয়—নিত্যানিত্য সমন্বয় বা আত্মানাত্ম সমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয়। সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়। জড়াজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয় দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল

পশ্চিম ভারতের বৃহত্তম শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্য-কেন্দ্রের 'ভারতীয় বিদ্যাভবনের' নূতন গৃহের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজাগোপাল-চারী বলিয়াছেন—"ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতের দর্শন বিগত কালে ভারতকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজ যদি তাহা অব্যাহত থাকিত, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণতাজনিত ক্ষতির উপর হয়ত তেমন গুরুত্ব আরোপ করিবার প্রয়োজন থাকিত না। কেবলমাত্র পণ্ডিতের নয়, সাধারণ নরনারীর হৃদয়ে এবং তাহাদের গভীর উপলব্ধির মধ্যে যদি বৈদান্তিক সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভবপর হইত, তবে স্কুল বা কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির ফলে তেমন মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হইত না। ক্ষোভের বিষয়, পরবর্তী কালে আমাদের প্রাচীন সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। আমার আশঙ্কা হয়, তাহার কিছুই আর অবশিষ্ট নাই।...বৈদান্তিক সংস্কৃতি বলিতে যে শৃঙ্খলা, সংযম ও নীতিজ্ঞান বুঝায়, গত ৫০ বৎসরের অনুসৃত শিক্ষা-পরিকল্পনা দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার সহিত দূরে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে। অথচ এই বর্তমান শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রাচীন সম্পদের স্থানে কিছুই দেয় নাই।"

রাষ্ট্রপালের উপরোক্ত বক্তব্যের সারমর্ম এই যে,—(১) ভারতের সংস্কৃতি ও দর্শন ভারতবর্ষকে বিগতকালে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, (২) উহা অব্যাহত থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অসম্পূর্ণতা তেমন ক্ষতি করিতে পারিত না, (৩) শুধু পণ্ডিতদের মধ্যে নয়, সমগ্র নরনারীর

মধ্যেও যদি এই সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখা যাইত, তবে শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি দ্বারা মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হইত না, (৪) প্রাচীন সম্পদ শুধু ক্ষত হু'দ পাইতেছে না, কিছু সম্পদই আর অবশিষ্ট নাই বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা, (৫) বৈদান্তিক সংস্কৃতিকে অবজ্ঞার সহিত দূরে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে, (৬) অথচ বর্ত্তমান শিক্ষাপরিবল্পনা তাহার স্থানে কিছুই দেয় নাই।

(১) ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন বলিতে কি আমরা সেই সংস্কৃতি ও দর্শন বুঝিব, যে সংস্কৃতি ও দর্শন একদিন বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও দর্শনের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে, রাজা অশোকের সময় হারিয়াছে, পরে জিতিয়াছে এবং সনাতন হিন্দু সমাজের কোটি কোটি মানুষকে বৌদ্ধ ধর্মের কোলে আশ্রয় পাইবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে, তাহাদের উপর নির্য্যাতনও করিয়াছে, সর্ব্বশেষে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও দর্শনকে ভারতের আওতার বাহিরে বিতাড়িত করিয়াছে; আবার বৌদ্ধ যুগের পর যে সংস্কৃতি ইসলাম সংস্কৃতির হাত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে পারে নাই, কোটি কোটি হিন্দুর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার পথ রুদ্ধ করিতে পারে নাই, হিন্দু-যবনের সংগ্রামকে শাশ্বতোক্তই করিয়া রাখিয়াছে; আবার যে সংস্কৃতি একই ভারতবর্ষে পরস্পর বিবদমান হিন্দু-মুসলমান-শিখ-বৌদ্ধ লইয়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আক্রমণ সামলাইতে না পারিয়া তাহারই কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল? ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন নিশ্চয়ই এক হিসাবে ভারতকে 'রক্ষা' করিয়াছে, কেননা ভারতীয়েরা সবই বৌদ্ধ হইতে পারিত, ইসলামের পতাকাতলে সারা ভারতবর্ষ আসিয়া মস্তক অবনত করিতে পারিত, গোটা ভারতবর্ষ খৃষ্টানধর্ম বরণ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। ভারতের অন্তর্নিহিত 'কমঠ বৃত্তি' সেদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার বিপদ হইতে ভারতবর্ষকে নিশ্চয়ই 'রক্ষা' করিয়াছে।

কিন্তু ইহার নাম কি 'রক্ষা'? অখণ্ড ভারতের বুক খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়াছে, ইহার কলিজা ছিঁড়িয়া এই সে দিন পাকিস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। একরূপ সব খোয়াইয়াও 'জানে প্রাণে' ভারতবর্ষ রক্ষা পাইয়াছে, যেমন উপাত্তর দল পলাইয়া আসিয়া রক্ষা পাইয়াছে। ইহাকে মানুষের মত 'রক্ষা' পাওয়া বলে না। ভারতীয় সংস্কৃতির রক্ষা করিবার নমুনা এইরূপ বলিয়াই তো গত ৫০ বৎসরের শিক্ষা-পরিকল্পনা দ্বারা ইহাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার সহিত দূরে ঠেলিয়া রাখা সম্ভবপর হইয়াছে যে সংস্কৃতি বিজাতীয় মানুষকে ও তাহার সংস্কৃতিকে হজম করিবার শক্তিদান করিতে পারে না, বরং দূরে সরাইয়া রাখে, ঘরের ছেলেকে পরের করিয়া দিবার সাধনায় গর্ব্বেই উন্মত্ত, যাহারা নানা বিধির নিগড়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বদ্ধ, সে সংস্কৃতি যে বর্ত্তমান বিশ্বে কোণঠাসা হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। এতদিনকার ভারতীয় সংস্কৃতি বর্জ্জননীতির উপর, নেতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সংস্কৃতি যদি বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও দর্শনকে, ইসলাম সংস্কৃতি ও দর্শনকে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও দর্শনকে পরিপাক করিবার যোগ বা কৌশল যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া শিখিত, তবে নিশ্চয়ই হাত পা গুটাইয়া এমন করিয়া ক্লৈব্যের প্রশ্রয় দিতে হইত না! কেন বৌদ্ধ-ধর্ম ভারতের বুকে একজন ভারতীয় রাজপুত্রের জীবনেই স্ফুরিত হইল, কেন ইসলামের এদেশে আগমন সম্ভব হইল, কেনই বা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির জোয়ারে এদেশে ঘর-বাহিরকে, নরনারীকে এমন করিয়া ভাসাইয়া নিতে পারিল, তাহার কারণ কি অতীত কালের ভারতীয় সংস্কৃতির উপাসকগণ কিছু নির্ণয় করিয়াছেন? ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন বলিতে আজ আমরা কি বুঝিব?

সেদিন প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি ডাঃ এ, এস, আলটেকার মহাশয় ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির "উন্নতি ও অবনতি" শীর্ষক বিষয়বস্তুর উপর প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—"ভারত মুসলমান আক্রমণকারীদিগকে অঙ্গীভূত করিতে পারে নাই। এর কারণ এই যে, ঐ সময় ভারতীয় সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতিকে নিজের মধ্যে লীন করিয়া লইবার ক্ষমতা হারাইয়াছিল। আর এক কারণ এই যে, ঐসলামিক ও ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে বহু বিষয়ে তীব্র বিরোধ ও পার্থক্য ছিল। অতএব মুসলমান আক্রমণকারীদের আক্রমণে হিন্দুরাজ্য যে বিলুপ্ত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়

নহে।...যাহা হউক, অধুনা ভারত ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে, পূর্ব্বে ইহা কখনও ছিল না। গত এক সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার বিষয় স্মরণ করিয়া ভারত অবশ্যই বৈদেশিক আক্রমণকে লঘু করিয়া দেখিবে না। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে, নূতন পরিস্থিতিতে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন হইবার কোন আশঙ্কা নাই

—আনন্দবাজার, ২রা অগ্রহায়ণ, '৫৬

ইহা সুস্পষ্ট যে অসহিষ্ণু ভারতীয় সংস্কৃতির যে রূপ বৌদ্ধযুগে, মুসলমান আমলে ও ইংরেজ শাসনের সময়ে বর্ত্তমান ছিল, তাহাদ্বারা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কিছুতেই আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিব না, যেমন পূর্ব্বেও পারি নাই। অথচ ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরেই এমন কিছু সার্ব্বজনীনতা ছিল যাহার জন্য ভারতবর্ষ সত্যই বৈদেশিক আক্রমণকারীদের দ্বারা একেবারে বিধ্বস্ত হয় নাই, সে আজও আবার বিশ্বসভার সামনে হুঙ্কার করিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে। ডাঃ আল্‌টেকার লিখিতেছেন—"প্রকৃত পক্ষে ভারতে ইসলামের শক্তি অত্যুদয় অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলিয়াছিল। পয়গম্বরের মৃত্যুর পর ২০০ বৎসরের মধ্যে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স, সিসিলি এবং ক্রীট মুসলমান আক্রমণকারিগণ জয় করিয়া মুসলমান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। ৭১২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু বিজিত হইলেও ৩০০ বৎসরের শাসনকালের মধ্যে মুসলমানগণ আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।"

একথা খুবই সত্য যে, ভারতের 'কঠিন যুক্তি' সেদিন আক্রমণকারীদের 'বেশীদূর অগ্রসর' হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু পরে যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল এবং যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দু সমাজ সকল দিক দিয়া চরম বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়াছে। তাই ভারতীয় স্ব সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সেই পুরুষোত্তম-রূপকে ফুটাইয়া তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে, যদি তাহার রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে চরম বিপদ হইতে আজ রক্ষা করিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আক্রমণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যকে আজ সুস্পষ্ট ভাবে তাহাকে বুঝিতে হইবে, 'লঘু করিয়া দেখিবার' ভুল যেন তাহার না হয়। মনস্তত্ত্বের কোন্ রন্ধ্রপথে বিদেশের আক্রমণকারিগণ প্রবেশ করিল, কেন প্রবেশ করিতে পারিল এবং কোন্ কৌশলেই বা সেই রন্ধ্রকে মুছিয়া ফেলা সম্ভব হইবে, তাহা আজ খুব হুঁসিয়ারীর সহিত বিবেচনা করিতে হইবে। অবশ্য গণপরিষদের এই দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মার্কিন কংগ্রেস যাহাতে নিগ্রোদের নাগরিক স্বাধীনতা দান করে, তজ্জন্য আজিও প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্রের ধারায় অস্পৃশ্যতা ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত হইয়াছে। উপজাতীয় লোক-সম্পর্কিত শাসনতন্ত্রের অধ্যায়টি আফ্রিকার উপজাতীয়দের উপর আজও যাহারা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব-সুলভ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সম্মুখে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। শাসনতন্ত্রে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, তুল্যাধিকার স্বীকার, পানদোষ বর্জ্জন, নারীর পরিপূর্ণ না হইলেও আংশিক মর্য্যাদা দান প্রভৃতি ব্যবস্থা বিশ্বের সম্মুখে "নূতন আদর্শ" স্থাপন করিয়াছে।

বৌদ্ধযুগের, মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসনের সময়কার ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কোন শাস্ত্রব্যাখ্যাই কি এই "নূতন আদর্শের" প্রচার করিয়াছে? ব্রহ্মসূত্রের আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ একযোগে যেখানে বৌদ্ধদর্শনকে খণ্ডনের জন্য কোমর বাঁধিয়াছিলেন, সেখানে বৌদ্ধদিগকে 'অঙ্গীভূত' করিবার কোনও সাধনার কথাই কি উঠিতে পারে? অথচ আজিকার পরিবর্ত্তিত আবেষ্টনে বৌদ্ধ-জৈন-ইসলাম-খৃষ্টান মতবাদকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষার ভিতর দিয়া পরিপাক করা ছাড়া কিছুতেই ভারতের পুরুষোত্তম আত্মা তৃপ্ত হইবেন না। ভারত তাহার যে সংস্কৃতি ও দর্শন দ্বারা বিশ্বের সব সংস্কৃতি, দর্শন ও ধর্ম্মমতকে পরিপাক করিয়া বিশ্বভারত, উদ্ভুদ্ধ ভারতে গড়িয়া উঠিতে পারে, সেই সংস্কৃতি ও দর্শনের খোঁজ অতীত কালের কোনও শাস্ত্র ব্যাখ্যার ভিতরই নাই। আজ তাহারই প্রয়োজন।

(২) অতীত কালের শাস্ত্র ব্যাখ্যা জড়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কোনও পারমার্থিক মূল্যদান করিবার কৌশল শিখায় নাই বলিয়াই গত ৫০ বৎসরের অনুসৃত শিক্ষা-পরিকল্পনা দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার সহিত দূরে ঠেলিয়া

রাখা সম্ভব হইয়াছে, ভারতীয় সম্পদও প্রায় রিক্ত হইয়া আসিয়াছে। এই ভাবে চলিতে থাকিলে ভারত তাহার সম্পদের অবশিষ্টটুকুও হারাইয়া ফেলিবে, ইহা নিশ্চিত। জড়াজড় সমন্বিত পুরুষোত্তম কৃষ্টি, শ্রীকৃষ্ণ-সংস্কৃতি যদি 'অব্যাহত' ভাবে চলিতে থাকে, তবেই শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির অসম্পূর্ণতা কোনও ক্ষতি করিতে পারিবে না। অতীত কালের বেদান্ত-ব্যাখ্যার ধারাকে কিছুতেই বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে অব্যাহত ভাবে চালু রাখা সম্ভব হইবে না। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা আজ যে শিক্ষাব্যবস্থার মূলে আঘাত হানিয়াছে, তাহার মূল রহিয়াছে এই খানে যে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী নিতান্তই সে-কালের বুদ্ধি-প্রধান, আদর্শবাদমূলক পাঠ্য-তালিকা দ্বারা জর্জরিত ; ইহার মধ্যে বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনও সম্ভাবনাই নাই। অথচ যুগদেবতা চাহিতেছেন জড়বাদ ও আদর্শ-বাদের সমীকরণ। বর্তমানে এদেশের যুবকদল না পাশ্চাত্যের জড়বাদী, না প্রাচীনদের মত অধ্যাত্মবাদী, একান্ত-ভাবে কোনও একটাই নয় বলিয়া তাহাদের আজ দুইটির সমন্বয় করিবার অধিকার রহিয়াছে।

(৩) এই জড়াজড়-সমন্বয়, চার্বাক-শঙ্করসমন্বয়ই পুরুষোত্তম কৃষ্টির মধ্যে সম্ভবপর। শ্রীকৃষ্ণই একাধারে মহা নাস্তিক ও মহা আস্তিক। সমস্ত প্রস্থানত্রয় ও স্মৃতির মধ্য দিয়া এই কৃষ্টি ছড়াইয়া দিতে পারিলে শুধু পণ্ডিত কেন, সমগ্র নরনারীর মধ্যেই ইহাকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইবে, পণ্ডিত মূর্খের মহাসম্মেলন গড়িয়া উঠিবে। মায়া-বাদের কৃষ্টি, নেতিবাদের কৃষ্টি পণ্ডিতগণ স্বীকার করিবেন, ধনিকও মানিয়া লইবেন। কেননা তাহাদের হাতে সমাজের সকল সুযোগ সুবিধা থাকার ফলে "জগৎ মিথ্যা" হইলেও জগতের সুখ সুবিধাগুলি তাহাদের ভাগে পড়িবে ও ভোগে লাগিবে, বঞ্চিত হইবে সাধারণ নরনারী। এই সাধারণ নরনারীর অধিকার দান করিবার জন্যই এদেশের রামানুজ-আচার্য প্রভৃতি বৈদান্তিক বৈষ্ণবগণ গতিধর্মশীল বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মায়াবাদের ভিত্তি বদলাইয়া না লওয়ার ফলে তাঁহাদের মতবাদ মায়াবাদের পাতেই চলিয়া গিয়াছে। সাধারণ নরনারীর ব্যবহারিক সাধারণ জীবনের (every day living) কোনও স্বয়ং মূল্য আস্বাদন তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। বৈদান্তিক সংস্কৃতি বলিতে আমরা আজ কোন্ সংস্কৃতি বুঝিব ? শঙ্করের না রামানুজের ?

(৪) প্রাচীন সম্পদ শুধু হ্রাসপ্রাপ্তই হয় নাই, উহার কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না, যদি না এখনও নবীনের চাঁচে প্রাচীন, অনাত্মার ছাঁচে আত্মা নবীনতম হইয়া গড়িয়া না উঠে। প্রাচীন শুধু প্রাচীন থাকিলে প্রাচীন সম্পদ প্রাচীনের লোকেরাই শুধু ভোগ করিতে পারে। কিন্তু আমরা যে আজ একান্ত প্রাচীন হইয়াও চির নবীনের উপাসনা করিতে চাই। যদি আমাদের সর্বস্বান্ত না হইতে হয়, তবে এখনও পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের ছাঁচে বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ভারতকে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। শুধু 'বেদান্ত', 'গীতা' ও 'সনাতন' বলিয়া চীৎকার করিলে কিছুই ফল হইবে না। 'গীতা' 'গীতা' সকলেই বলে ; গীতার ভাষ্যকারগণ যে পরস্পরকে আঘাত করিয়া প্রত্যেকেই রক্তাক্ত। তাহার গীতা আমরা পড়িব ? শঙ্করের, না রামানুজের, না বলদেব-বিদ্যাভূষণের ? কে আমাদের বিরোধের মধ্যে পথ দেখাইবেন ?

(৫) বৈদিক, বৈদান্তিক সংস্কৃতিকে কিছুতেই দূরে ঠেলিয়া রাখা সম্ভব হইবে না যদি বেদ-বেদান্ত 'জীবনে'র আস্বাদক হয়। শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিমান্ জীবন্ত বেদ-বেদান্ত। তাঁহার সমগ্র জীবনেই আর্য-অনার্য, দেব-অসুর, শক-হুন-তাতার, মোগল-পাঠান, ব্রিটিশ সংস্কৃতি সব পরিপাক হইয়া এক অখণ্ড বিশ্ব সৃষ্টি করিবার মন্ত্রের খোঁজ মিলিবে।

(৬) বর্তমান শিক্ষা-পরিকল্পনা কি কিছুই দিতে পারে নাই ? সব কিছুকেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'বিচার' করিয়া, 'বিশ্লেষণ' করিয়া দেখিবার ও জীবনে বরণ করিয়া লইবার সৎসাহস বর্তমান শিক্ষা-পরিকল্পনার মাধ্যমেই এদেশের মানুষ লাভ করিয়াছে। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই এদেশের সব শিক্ষা-পরিকল্পনা হইয়াছিল ; আজ সেখানে আসিয়াছে বিচার-মূলক শিক্ষা-পরিকল্পনা। কোনও একটিই যে স্বয়ংপূর্ণ নয়, আজ তাহা আমাদের কাছে ধরা

পড়িয়াছে। আজ চাই বিচারমূলক বিশ্বাস, বিশ্বাসমূলক বিচার। 'জীবন' ছাড়া আর কোথায়ও বিচার ও বিশ্বাসের সামঞ্জস্য হয় না। 'বুদ্ধি'র স্তরে বিচার ও বিশ্বাস পরস্পর-বিরুদ্ধ। বর্তমান শিক্ষা-পরিকল্পনাগুলিতে জোর দেওয়া হইয়াছিল বিচারের, তাই এই বিচারের আঘাতে প্রাচীন আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। একান্ত বিচার যেমন একদেশদর্শী, একান্ত বিশ্বাসও তেমনি একদেশদর্শী: 'জীবন'-ই শুধু সমগ্রদেশদর্শী, সমদর্শী। এই সমদর্শনের উপর ভারতীয় সংস্কৃতিকে আজ গড়িয়া তুলিতেই হইবে। ইহার জন্য চাই জীবনকে activity method-এর ভিতর দিয়া আগাইয়া নিয়া যাওয়া, যেখানে প্রত্যেককে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিবে অনন্ত ভবিষ্যৎ। আজ 'বর্তমান'কে দিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে 'অতীতকে', 'ভবিষ্যৎ'কে দিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে 'বর্তমান'কে। একান্ত 'অতীত'কে আশ্রয় করিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ব্যাখ্যা করিবার প্রাচীন পন্থা আজ অচল। কালাতীতের দেশে অতীতও যাহা, বর্তমানও তাহা, ভবিষ্যৎও তাহাই। অতীতকে দিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যাখ্যা এত দিন চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহাকেই আমরা একান্ত অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। আজ যদি বর্তমানকে দিয়া অতীতকে বা ভবিষ্যৎ দিয়া বর্তমানকে কেহ ব্যাখ্যা দিতে চায়, তবে কালাতীতের দেশে তাহার বিরুদ্ধেই বা কি বলিবার থাকিতে পারে? এদেশের প্রাচীনেরা অতীত দিয়া বর্তমানকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বর্তমানের ভিত্তিতে অতীতকে ব্যাখ্যা করিতে চায়। পুরুষোত্তম কৃষ্টিতে দুই-ই তুল্য-মূল্য। অতীতের ছাঁচে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যাখ্যা, বর্তমানের ছাঁচে অতীত ও ভবিষ্যতের ব্যাখ্যা, ভবিষ্যতের ছাঁচে অতীত ও বর্তমানের ব্যাখ্যা সমমূল্যে যে জীবনে মেলে, সেই জীবনই পুরুষোত্তম-জীবন। সেই জীবনই শুধু কালাতীত থাকিয়া কালের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অংশের সার্থকতা দান করিয়া অনাদি অনন্তে আগাইয়া চলিয়াছে। ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপ; ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা ইহারই ধ্যানে আজ বিভোর। বন্দেমাতরম্

"Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother etc, have no actual entity, they consequently deserve no real affection."

—Rammohan Roy's Letter to Lord Amherst.

"It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort."

—Rammohan Roy's Letter to John Digby.

ধর্ম্ম-সমন্বয়

॥ জনাব রেজাউল করীম ॥

পৃথিবীতে নানাধর্ম্ম প্রচলিত আছে। সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য একই কেন্দ্রের অভিমুখে মানুষকে নিয়ে যাওয়া—সে কেন্দ্র হচ্ছে স্বয়ং ভগবান। সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন—আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক ও ঐহিক। শুধু মানুষের নহে, সমস্ত জীবের মঙ্গল বিধানও ধর্ম্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রাচীন যুগে মানুষ যখন বৈশব অবস্থায় বাস করছিল, তখনও মানুষ সকলের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের কথাই চিন্তা করেছে। সে যুগে তার যতটুকু বুদ্ধি ছিল তদনুসারে সে এই কল্যাণ-বোধ-দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তার এই বোধশক্তি ধীরে ধীরে আরও বিকশিত হয়েছে। যেমন যেমন যুগ অতিবাহিত হয়েছে যুগের গতির সহিত তাল রক্ষা করে সেই পরিমাণ দ্রুততার সহিত মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মশক্তিও বিকশিত হয়েছে। সে চোখের সামনে দেখল অনন্ত বিশ্ব, বিশাল তার শাখা-প্রশাখা। একটা অপরিসীম শক্তি দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এই সব দেখে মানুষ উপলব্ধি করল যে তার শক্তি ক্ষুদ্র, নিতান্ত সীমাবদ্ধ। প্রাকৃতিক শক্তি নানাভাবে মানুষকে বিপর্য্যস্ত করতে চেয়েছে—এত সব বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে নিজেকে অসহায় বোধ করলেও তার বিরুদ্ধে সঞ্চিত এই বিপুল শক্তির লীলা দেখেও মানুষ বিচলিত বা দিশেহারা হয় নি। সকল শক্তির কেন্দ্রকেই সে অনুসন্ধান করতে চেয়েছে। সে দেখল ও উপলব্ধি করল যে প্রাকৃতিক শক্তির উর্দ্ধে একটা অনন্ত শক্তি আছে। তার সন্ধানলাভ করতে পারলে তার সকল অসুবিধা দূর হবে, তার শান্তি স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ জাগবে। এই অনন্ত শক্তির উৎসমূল সন্ধান করতে গিয়ে মানুষ ঈশ্বরকেই আবিষ্কার করে ফেললো। কিছুটা অন্তরের অনুকৃতি, কিছুটা প্রয়োজনের তাগিদ, আবার কিছুটা অভিজ্ঞতা—এই তিন প্রকার আবেষ্টন থেকে মানুষ সুস্পষ্ট উপলব্ধি করল যে ঈশ্বরই চরম সত্য, ঈশ্বরই পরম মঙ্গলময়। আর ঈশ্বরই মানব-জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। পরম শক্তিমান, সর্ব্বকল্যাণময় ও সদা চিন্ময় ঈশ্বরকে আবিষ্কার সীমাবদ্ধ মানুষের চরমতম আবিষ্কার। মানুষ ক্ষুদ্র আর ঈশ্বর বিরাট ও মহান। ঈশ্বর-তত্ত্ব লাভ করে মানুষ সমুদয় সৃষ্ট জীব থেকে অনেক উর্দ্ধে স্থান লাভ করল। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন জীবের পক্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি ও বুদ্ধি নিহিত আছে যা অন্য কোন জীবের মধ্যে নাই। সেইজন্য মানুষের পক্ষেই ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে। ক্রমে ক্রমে মানুষ বুঝলো যে জীবনে ঈশ্বর প্রাপ্তিই চরম প্রাপ্তি। ঈশ্বর লাভ ব্যতীত মানব-জীবনের অন্য কোন বড় সার্থকতা নাই।

পৃথিবীতে যুগে যুগে ঋষি, মুনি, সাধু, সজ্জন সেন্ট, পরমহংস—এই ধরণের বহু মহামানব মানব-মুক্তিতে এসেছেন। তাঁরা অনন্যসাধারণ সাধনা, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন, ও সাধারণ মানুষকে ঈশ্বর লাভের পথ বলে দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণাও দিয়েছেন। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানলাভ করে জনসাধারণকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে ঈশ্বর-চিন্তাই আসল বস্তু। ঈশ্বর-লাভই প্রকৃত লাভ। ঈশ্বরগত প্রাণ নিয়ে জীবন গঠন করলে প্রকৃত শান্তি ও পরমার্থ লাভ হবে। এতদ্ব্যতীত মানুষ পশুতুল্য।

মানুষ ঈশ্বরকে বুঝল। কারুর কারুর ঈশ্বর দর্শনও হ'ল। কিন্তু এ হ'ল কতিপয় সাধকের ব্যাপার। কেমন করে সর্ব্বসাধারণের ভাগ্যে ঈশ্বর দর্শন হয়, আর কেমন করেই বা তাঁকে লাভ করা যায় এটাই হ'ল একটা প্রধান সমস্যা। ঈশ্বর দর্শন ও লাভের উপায় অনুসন্ধানের অন্য নাম ধর্ম্ম।

প্রাচীনকালের আদি মানুষ—যাদেরকে আমরা "অসভ্য" বলি, তাদের মধ্যেও ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল। আর তাঁকে পাওয়ার জন্য তারাও একটা পন্থা আবিষ্কার করেছিল। আমাদের দেশে সাঁওতাল জাতি যাকে বলে "সারাং বুরু" তিনি ঈশ্বর। সাঁওতালদের পূজা পার্বণ ও আচার-নিষ্ঠাকে ধর্ম না বলিবার কোন কারণ নাই। এই ভাবে মানুষ সত্যের পথে যেমন যেমন অগ্রসর হয়েছে তার ঈশ্বর-প্রাপ্তির পন্থাও তেমনি পরিবর্তন হয়েছে—যার ফলে মানুষের অবস্থান্তর ঘটেছে। সে এক স্তর থেকে আরও উন্নততর স্তরে উন্নীত হয়েছে। প্রস্তর সহিত সে যে কোনও বস্তুকে একটা অদৃশ্য শক্তির নিকট নিবেদন করেছে তা সে সেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই করেছে। এই সত্যনিষ্ঠার পন্থাই ত ধর্ম। কেউ পূর্বে উন্নত হয়েছে আবার কেউ উন্নত হয়েছে বহু পরে। সকলেই ধর্মকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়েছে. ঈশ্বর প্রাপ্তির পন্থা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। সুতরাং সকল ধর্মের মুখ্য লক্ষ্য হ'ল ঈশ্বরপ্রাপ্তি—ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ, তাঁর অনুগ্রহ ও কৃপালাভ।

এখন প্রশ্ন এই যে তাই যদি হয় তবে জগতে এত ধর্ম কেন? আর বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এত বিরোধ এত রেষারেষি ও এত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বা কেন? একথা সকলকে স্বীকার করতে হবে যে দেশ কাল পাত্রভেদে মানুষের মানসিক, চারিত্রিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ বিভিন্ন পথেই হয়েছে ও বরাবরই তা হবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ধর্মের বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেও পার্থক্য ও বিভিন্নতা আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে কোনও পার্থক্য নাই। আর রেষারেষি, ঝগড়াবিবাদ, বাদপ্রতিবাদ, সে ত সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বরং আমরা বলব যে মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ না থাকলে এই সব রেষারেষি ইত্যাদি আরও চরম আকার ধারণ করে। ধর্মবোধই মানুষের শয়তানী প্রবৃত্তিকে কিছুটা দমন করেছে। তা না হলে তা চরম আকার ধারণ করত। মানুষের ধর্মবোধ যখন পূর্ণ ও নিখুঁত হবে তখন মানুষ প্রকৃত দেবত্বে উন্নীত হবে। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে আকার প্রকার প্রকৃতি প্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে বহু পার্থক্য বিদ্যমান আছে। ধর্মের আচার অনুষ্ঠানে ও ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যাপারেও পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে কোথাও কোন গণ্ডগোল নাই, বিতর্কের অবকাশ নাই। লক্ষ্য এক, পন্থা বিভিন্ন—ইহাই ত সৃষ্টির নিয়ম, অলঙ্ঘনীয় বিধান। প্রচলিত ধর্মসমূহের বিবিধ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে সকল ধর্মের মধ্যে একটী মৌলিক ঐক্য-সূত্র বিরাজমান আছে, আচার ও ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য আছে, পূজা অর্চনার পদ্ধতির মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। কিন্তু মূল লক্ষ্য-বিষয়ে কোথাও কোন বিরোধ নাই। সেইজন্য আমরা আশাকরি একদিন না একদিন পৃথিবীতে ধর্ম সমন্বয় হবে। সে আশা কল্পনাতীত নয়।

বর্তমান যুগে জগতে যে কয়টি ধর্ম প্রচলিত আছে তাদের সকলের মধ্যে বহু বিষয়ে ঐক্য দেখা যাবে। হিন্দু ধর্ম খৃষ্টান ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম এগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে একই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস, সৎ কর্ম ও মানব সেবার দ্বারা ঈশ্বরলাভ ও চিত্ত শুদ্ধির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা—এগুলি হ'ল এই তিনটি ধর্মের মৌলিক নীতি। এদিক দিয়ে এসব ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। এ যুগের কয়েকজন মহান সাধক ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করেছেন। যারা সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী তাঁরা অপরকে ধর্মান্তরিত করার উপর কোন গুরুত্ব দেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক ধর্মেই মুক্তি আছে, মোক্ষলাভ সম্ভব, ও প্রত্যেক ধর্মই সত্য ও শাশ্বত। প্রত্যেক ধর্ম-পদ্ধতিতে মোক্ষলাভ হয় ও মানুষের সেবা করবার সুবিধা আছে। আজ রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছে, এবং পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে সখ্যভাবের অভাব ঘটেছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে যদি উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ সত্যিকার ভাবে ধর্মকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেন ও উদারতার সহিত সকলে ধর্মকে সত্যের বিভিন্ন দিক বলে স্বীকার করেন তবে সব বিরোধের মূলীভূত কারণ অপসারিত হবে। সাধারণ লোক ধর্মের মূলনীতি জানে না বলেই যত গণ্ডগোল ও কোলাহল। আমি নিজে বিশ্বাস করলে মুসলিম হয়েও

হিন্দু খৃষ্টান অথবা অন্য কোন ধর্মের সার সত্য গ্রহণ করলে আমার ধর্ম-বোধের ও ধর্ম-বিশ্বাসের কোন অঙ্গহানি হয় না, বরং হৃদয় আরও প্রসারিত হয়। সেজন্য একথা জোর গলায় বলতে পারি যে একজন লোক একই সময়ে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সবই হতে পারে। আমি কোরআন মানি, সুতরাং আমি মুসলমান। আমি বেদ উপনিষদ গীতা মানি সুতরাং আমি হিন্দু, আর আমি বাইবেল মানি, সুতরাং আমি খৃষ্টানও। বেদ-গীতা-বাইবেল মানলে আমার কোরআনকে কোনক্রমেই অমান্য করা হয় না। রাজনৈতিক কূট চালের মধ্যে নয়—এই প্রকার ধর্মবোধের দ্বারাই ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে সত্যকারের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হবে—এ বিশ্বাস আমার আছে।

দুঃখের বিষয় সাধারণ মানুষ উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিভিন্ন ধর্মকে ভালবাসে না। তাঁরা মনে করেন প্রতিটি ধর্ম অপর ধর্মের বিরোধী। মনে রাখা দরকার বিরোধ সৃষ্টি করার জন্য মানুষ ঈশ্বরের ভজনা করে না। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান অথবা বান্দা অথবা দাস, এই নীতি স্বীকার না করলেই বরং ঈশ্বরের মহান মর্যাদার অবমাননা করা হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রমুখ সাধকগণ এই প্রকার উদার ধর্মবোধের আদর্শ মানব সমাজকে দিয়েছেন। এই সব মহান সাধকগণ এই কথা বলেছেন যে ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। প্রাচীন আর্যঋষিগণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে যে তত্ত্ব বিশ্বকে দিয়েছেন তাতে সঙ্কীর্ণতার কোন স্থান নাই। তাই দেখি মধ্যযুগের ইউরোপের মত ভারতবর্ষে ধর্মের নামে রক্ত বন্যা বহে নি। ভারতবর্ষ উদারভাবে সকল বিরোধকে স্বীকার করেছে, বিশেষ করে হিন্দু-ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এ ধর্ম কোনদিন doctrine of exclusive salvation নীতিকে স্বীকার করে নি। সব ধর্মেই মুক্তি আছে—যত মত তত পথ ইহাই ভারতের শাশ্বত বাণী ও নীতি। নিরপেক্ষ উদারভাবে ইসলামধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এর মূল নীতির সহিত হিন্দুধর্মের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যেমন বহু মুসলমান হিন্দুধর্মের প্রামাণিক গ্রন্থাদি পাঠ করেন নি, তেমনি বহু হিন্দুও ইসলামের প্রামাণিক গ্রন্থ পাঠ করেন নি। তাই সাধারণের এ বিষয়ে জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ যে এতে তাদের ধারণার মধ্যেও আসে না কেমন করে এই দুই ধর্মের মূলনীতি এক হতে পারে। এই অজ্ঞতা দূর করবার দিন এসেছে। দুই ধর্মেরই গ্রন্থাদি পাঠ করে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব। খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। বিরোধ হতে আসে ধ্বংস। কিন্তু সমন্বয়ের পথ মুক্তির পথ, আত্মরক্ষার পথ, শান্তির পথ। যাঁরা কেবল বিরোধের বিষয়গুলি খুঁজে বেড়ান তাঁরা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কারুর বন্ধু নন। মৈত্রী ও ঐক্যের যোগসূত্র যাঁরা অনুসন্ধান করেন, তাঁরাই মানব-দরদী, তাঁরাই হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলের বন্ধু। আজ দিন এসেছে যখন এক ঐক্য সূত্রের বন্ধনে সকলকে বাঁধতে হবে। সকলের সহিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

"প্রাকৃত বুদ্ধির নিকট চিৎ ও জড় এ দুইটি একান্ত বিরোধী তত্ত্ব। তাই স্থূল জগতে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব মনে করিয়া, জীবন ও দেহ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া বা তাহাদের এড়াইয়া ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইবার যে চেষ্টা দেখিতে পাই তাহার প্রতিকার হইতে পারে যদি উপনিষদে যে সত্য উক্ত হইয়াছে যে 'জড় ও ব্রহ্ম' তাহাকে বুঝি ও স্বীকার করি এবং জড় জগৎকে শ্রীভগবানের দেহ বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে সে বর্ণনার পূর্ণ মূল্য দেই।"

—দিব্য জীবন বার্তা শ্রীঅরবিন্দ

ঋষি অরবিন্দ

॥ শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

সূর্য্যদেব ধরা ছোঁয়ার বাহিরে অবস্থান করেন কিন্তু তাঁর অরুণ কিরণ স্পর্শে ধরিত্রী ধন্যা হয়, বৃন্তিকায় ফুল প্রস্ফুটিয়া উঠে। এই সূর্য্যের মতই মহাপুরুষেরা তাঁদের সাধনার বিমল আলোক বর্ষণে যুগে যুগে সভ্যতা গঠীয়িত ক'রে তোলেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বল্প সময়ে জাতীয় জীবনের মরাগাঙে জীবন-ভাহ্নবী প্রবাহিত ক'রেছিলেন—আবার হিমাদ্রিসৃঙ্গে বাঁধা ঘুমন্ত স্রোতকে নূতন গঙ্গার প্রাণ-প্রবাহ ভগীরথের মত আনলেন আর এক মহাপুরুষ—তিনি শ্রীঅরবিন্দ। বিচিত্র তাঁর জীবন···।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ পুত্র অরবিন্দকে বিলেতী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ইংলণ্ডে রেখে এলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কিংস কলেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শেষে আই, সি, এস পরীক্ষায় হলেন অবতীর্ণ। সকল পরীক্ষাতেই কিশোর অরবিন্দ কৃতিত্বের সঙ্গে সাফল্য অর্জন ক'রলেন। কিন্তু যখন অশ্ব চালন পরীক্ষায় ব্রতী হলেন তখন তাঁকে এক অদৃষ্ট শক্তি বার বার বাধা দান ক'রল। তাই সাহেবভক্ত পিতা ডাঃ কে, ডি, ঘোষ মশায়ের মনের সাধ পূরণ না করে পুত্র বাসায় প্রত্যাবর্তন ক'রলেন। কিশোর অরবিন্দের খামখেয়ালিতে সকলে বিস্ময়ে হতবাক—কিন্তু সর্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত যে অন্য!

কবিগুরুর কবিতার কলি মনে পড়ে—

সম্মুখে গেছে অসীমের পানে জীব যাত্রার পথ
লেখা চল তুমি—বলো, কেবা জানে এ রহস্যের অন্ত।

জীবন নদীর স্রোত সহসা অন্যখাতে প্রবাহিত হ'ল। বরোদার মহারাজের প্রদত্ত শিক্ষা-বিভাগের উচ্চপদ নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ভারতের পবিত্র বৃন্তিকায় পদার্পণ করলেন। বরদা সরোবরের অরবিন্দের সৌরভ অচিরেই আসমুদ্র হিমগিরি বিকীর্ণ হ'ল। কে, এন, মুন্সী, আর, আর, দিবাকর প্রমুখ বহু জ্ঞানী, গুণী, মনীষী তাঁর পাদমূলে অধ্যয়নে ব্রতী হলেন। "Bengal thinks today what India thinks-tomorrow." এই সময় রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ শুধু বাংলাদেশ—অন্য প্রদেশ তখন যুগ যুগান্তের জড়তায় নিদ্রিত। ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রীঃ এ তাই বঙ্গ-জননীকে দ্বিখণ্ডিত করলেন। সারা বাংলার তখন দুর্জ্জটির মত কি রুদ্র-মূর্তি! রবীন্দ্রনাথও তুলে ধরলেন রুদ্র বীণাখানি—স্বদেশ প্রেমের পুণ্য জোয়ারে উদ্বেলিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়। ছাত্রগণ বর্জ্জন ক'রল সরকারী স্কুল কলেজ। নেতৃবৃন্দের অনলস পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হ'ল জাতীয় স্কুল কলেজ কিন্তু সকলেরই প্রাণে প্রাণে এক প্রশ্ন—জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষতার পবিত্র পদ বরণ ক'রবেন কে? শ্রীঅরবিন্দ তখন উচ্চ বেতনে বরোদা কলেজের সহ অধ্যক্ষ—ভাবী রাজ্যের মেরুদণ্ড। দেশের ডাকে সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি হরিশ্চন্দ্রের মত হাজির হলেন বাংলাদেশে।

বাহির পানে তাকায় না যে কেউ
দেখে না যে বান ডেকেছে
জোয়ার জলে উঠ্‌ছে প্রবল ঢেউ।—রবীন্দ্রনাথ

বাংলায় অগ্নিক্ষরা ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'বন্দেমাতরম্'। তিনি ঘোষণা করলেন—"আমি মুক্তি চাই না, শুধু জাতিকে তোলবার শক্তি····· লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ' ক্ষুদ্র আমিত্ব শূন্য মানুষ চাই"। তাঁর তেজোদীপ্ত বাণীতে উদ্বেলিত হল সহস্র সহস্র যুব প্রাণ। জাতীয়তার জোয়ারকে রুদ্ধ করার জন্য বৃটিশ সরকার শ্রীঅরবিন্দকে করল কারারুদ্ধ কিন্তু প্রধানা-ভাবে দেবে মুক্তি দিতে বাধ্য হ'ল। এবার মানিকতলার উদ্যান বাটীতে গঠিত হ'ল গুপ্ত সমিতি। সম্মুখে সাধু সন্ন্যাসীর উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত উপনিষদ গীতার শ্লোকাবলী—নিভৃতে চলছিল অজস্র বোমা প্রস্তুতি। পুলিশ আদালতের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড ছিলেন বিপ্লবীদের পরম শত্রু; মজঃফরপুরে তাঁকে হত্যার জন্য ক্ষুদিরাম ও

প্রফুল্ল চাকী বোমা নিক্ষেপ করলেন—নিহত হলেন কিংসফোর্ডের বিনিময়ে এক নিরপরাধ মহিলা। এই হত্যার 'নাটের গুরু' শ্রীঅরবিন্দকে সন্দেহ করে পুলিশ বন্দী করল। দীর্ঘ বর্ষব্যাপী চলেছিল ঐতিহাসিক আলিপুরের মামলা। সঙ্কটহারী শ্রীমধুসূদন রূপে দেশবন্ধু নিলেন বিপ্লবীদের পক্ষ। তাঁর অনলস পরিশ্রমে নির্দোষ প্রমাণিত হলেন শ্রীঅরবিন্দ —আজীবনের উদ্‌গাতা পেলেন মুক্তি।

আলিপুর কারাগার ছিল শ্রীঅরবিন্দের তপস্যার তীর্থ-ক্ষেত্র। সর্ব্বসত্তার মধ্যে কারারুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। বাসুদেবকে—অর্জুনের মত শ্রীকৃষ্ণের কাছে পেলেন গীতার অমৃতময়ী শিক্ষা।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

আদিত্যবর্ণ-জ্যোতির্ময়কে আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি। অজ্ঞান মোহের অন্ধকারের পরপার হতে তাঁকে দেখেছি। উত্তরপাড়ার অভিভাষণে শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠেও বুঝি ঐ কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

কারাগার মুক্ত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ করলেন ধর্ম ও কর্মযোগীন পত্রিকা। এদিকে বৃটিশের কর্মনীতি আকৃষ্ণ অপর দিকে দিতে থাকলেন দেশবাসীকে প্রকৃত পন্থার নির্দেশ। বৃটিশ প্রমাদ গণল; মহাবিপ্লবীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করার মতলব আঁটল। কর্মযোগীন অফিসে যখন স্বীয় কর্মে ব্যাপৃত তখন হঠাৎ কর্ণে শ্রুত হল শ্রীকৃষ্ণের সুস্পষ্ট আদেশ। নৌকা যোগে এসে উপস্থিত হলেন চন্দননগরে। যোগ সাধনার দ্বারা ব্রহ্মতেজে বলীয়ান হয়ে ভারত মায়ের পায়ের শিকল ছিন্ন করার জন্য মগ্ন হলেন তপস্যায়। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "My yoga is for liberation of my country"। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মার্চ তারিখে ডুপ্লের জাহাজ যোগে পণ্ডিচেরিতে পাড়ি দিলেন। জীবনকে দিব্যজীবনে রূপান্তরিত করার চলল দুষ্কর সাধনা। ১৯২৬ খ্রীঃ এ ২৪শে নভেম্বর সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন, "সমগ্র মানব জাতির নবরূপান্তরের মহাযজ্ঞে ভারতই নেতৃত্ব দান করবে"। বাসুদেবের চরণে প্রার্থনা জানাই শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন সফল হোক। নমঃ ভাগবতে শ্রীঅরবিন্দায় নমঃ।

একটুখানি

॥ শ্রীঅমিয়মোহন বসু ॥

প্রতিদিনের মত আজও ভোরে খোলা বিরাট মাঠে বেড়াচ্ছিলুম। হঠাৎ লক্ষ্য হল পায়ে চলা পথ-ঘেঁষা জরাজীর্ণ পুরাণো বট গাছটা—যেটা আমাদের অনেকের চোখেই অবহেলিত, মূল্যহীন। কিন্তু আজ প্রশ্ন এলো মনে—মূল্য-হীন মনে করলেও কি সে সত্যি মূল্যহীন? গাছপালার কি কোন দামই নেই? কিন্তু একটু ভাবলেই বুঝা যায় যে, যে-জীবন শুধু পরের জন্যেই উৎসর্গীকৃত—যে জীবন থেকে ফুলফল, লতাপাতা, ছায়া, কাঠ, গন্ধ নির্যাস, ভস্ম অঙ্গার কত কি সম্পদ আমরা পেয়ে থাকি সে-জীবন মূল্যহীন হয় কি করে? আমরা জানি—যাঁরা রোগ-শোক-বিপদে মুহ্যমান মানুষের আর্তি দূর করবার জন্যে নিজের প্রাণকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞানে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, সেই পরদুঃখ-মোচনশীল মানুষই মহৎ এবং প্রকৃত সাধু। বৃক্ষ শ্রেণীর কাছ থেকেও তো মানুষ যথার্থ সাধুসঙ্গের কাজই পেয়ে আসছে চিরকাল! ● ● ● বুড়ো বট গাছটার পরার্থ-পরতার কথা মনে আসে।

গ্রীষ্মের প্রখর দ্বিপ্রহরে শুচি অশুচি, ছোট বড় কত ধরণের শ্রান্ত পথিক, ক্লান্ত চাষী একটু বিশ্রামের সুখ পেতে বসে যায় তার নিভৃত নিঝুম স্নিগ্ধ শীতল স্নেহচ্ছায়ায়। কাছের দূরের কত পথিক আচমকা বৃষ্টি ধারায় রক্ষা পায়

তার অসংখ্য পত্রের ছাউনিতে। শুধু মাঠের চরা গাভী গুলিই নয়—বাস্তুহারা বিহঙ্গকুলও যে তাকে আশ্রয় করেছে নির্ভাবনায়। কিন্তু মনে হলো—বিচারশীল শিক্ষিত ধনী মানুষের বিশাল বাসভবনে তারই গৃহহীন নিরুপায় আত্মীয়ের ক'জন মাথা গুঁজতে সমর্থ হয় সেই বিরাট অট্টালিকার? কতদিন গাছটাকে দেখেছি, কিন্তু কোন দিন তেমন মনে কিছু আসে নি। যাকে প্রথম থেকেই অপাংক্তেয় বলে মনে করা যায় তার দিকে আর কে লক্ষ্য করে? তাই ভালো করে ওর দিকে তাকাইনি পর্যন্ত কোন দিন। কিন্তু আজকের দেখা অন্যদিনের মত নয়—মেঘ কেটে গিয়ে যেন ধরিত্রী হেসে উঠলো আলোর প্রসন্নতায়।

মনে হলো বাসন্তী প্রভাত আলোয় তারও তো জরাজীর্ণ দেহে আসে রোমাঞ্চ—শীতের রুক্ষ হাওয়ায় পত্র-রিক্ত উলঙ্গ শাখায় লাগে নতুন পাতার যৌবন জোয়ার। তার সেই যৌবন তরঙ্গের এক অনির্বচনীয় সবুজ সৌন্দর্যের আলো ঝলমল রূপের প্রকাশ আমার মনের পাতায় ভেসে উঠে। দেখলাম সেখানে সে-ছবি যেন জীবনের এক অফুরন্ত আশা, শান্ত শুচিতার একটি অনুপম প্রাণ-সমুজ্জ্বল জীবন-কবিতা। মনে হলো বিশ্বের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল গাছ পালারই নিঃস্বার্থ ভাবে পরম সুন্দরের তৈরী সুন্দর ভুবনকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার এক প্রচণ্ড সাধনা চলছে চিরকাল। কিন্তু জীব জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ তার প্রেম-প্রীতি, সেবা-করুণা, সৌর্য, আনন্দ ও পবিত্র মনুষ্যত্বের কতটা প্রকাশ ক'রে তার পৃথিবীর সৌন্দর্যকে বাড়াতে চেষ্টা করে? বরং "হলাহল সৃষ্টি ক'রে সমাজ-সংসার ধ্বংস করার—পৃথিবীর যা কিছু শোভন সুন্দর তা নষ্ট করার যেন এক দানবীয় অভিযান চলছে আজ প্রায় সকল মানুষের"।

মাথার উপরকার রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝাকে হাসিমুখে উপেক্ষা ক'রে দৃঢ়চিত্তে প্রতিকূলের সাথে লড়াই করার অটল সহিষ্ণুতায় অচল বনস্পতির দল স্বাধীন চিন্তা-সমর্থ অচল দাম্ভিক মানুষেরও যেন হ'তে পারে পথ প্রদর্শক। তবে মহত্ত্বকে পরিহার ক'রে মিথ্যা ও চাতুর্যের আশ্রয়ে শুধু নিজের ঘটি বাটি গুছিয়ে নিরাপদ কোণে থাকবার চেষ্টায় যে-মানুষ হয়ে উঠতে পারে ভীষণ ভাবে আত্মকেন্দ্রিক, হৃদয়হীন দানব, সে-মানুষও কিন্তু এ ধরণের উপেক্ষিত জীবনকেও লক্ষ্য ক'রে নিজের জীবনকে শোধরাবার চেষ্টা ক'রে হয়ে উঠতে পারে স্বার্থহীন, সুন্দর, আনন্দ-ভাস্বর।

একথা ঠিক যে, মানুষ চেষ্টা করলে তার উদ্বেগপূর্ণ নৈরাশ্য-জটিল গদ্য জীবনেও দৃঢ় সংকল্প, আত্মবিশ্বাস ও নিঃস্বার্থ ভালবাসায় ফিরে পেতে পারে তার জীবন থেকে বিদায় নেওয়া সরল সৌন্দর্য, পবিত্র মনুষ্যত্ব। পবিত্র এবং কলুষ স্বভাবের ভাবনাকে বদলিয়ে 'খদার-পায়শালা ধরণীকে' আরেক চোখে দেখার শিক্ষা সে শুধু সাধু-সন্তের জীবন থেকেই নয়—বটের কাছ থেকেও নয়—জগতের বহু অনুল্লেখ পশুপাখি লতাগুল্মের প্রচণ্ড আত্মত্যাগ ও সঙ্ঘ-শক্তির দৃষ্টান্তকেও লক্ষ্য করলে শিখতে পারে। বহুনারীর মহান স্বর্গকেও সে এই বাস্তব মাটিতেই লাভ ক'রে কৃতার্থ হতে পারে তার মনের ভুলের নেশা কাটলে, এবং তাতেও তার হ'য়ে উঠতে পারে স্রষ্টার সৃষ্ট মহান বিশ্বের গৌরব-দীপ্ত আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক পবিত্র মাটিতে জন্ম গ্রহণ করার সার্থকতা—সুন্দর ভুবনকে আরও সুন্দর আরও মহান করে গড়ে তোলার প্রকৃত যোগ্যতা।

"ভারতবর্ষ মোক্ষমন্ত্রে কুবেরের ঐশ্বর্য সঞ্চিত করেছে অধ্যাত্মলোকে, এ কথা মিথ্যা নয়; কিন্তু সেই সঙ্গে তার জীবন হয়েছে দেউলিয়া। তেমনি ইউরোপ উপকরণের বাহুল্যে···পৌঁছেছে ঋদ্ধির চরমে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার আত্মা হয়েছে কৃপণ; জড়বাদে জীবন সমস্যার সকল সমাধান খুঁজতে গিয়ে তার বুদ্ধিও আজ অতৃপ্ত, অশান্ত।" —শ্রীঅরবিন্দ

প্রাণের কথা

॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥

(২)

ব্রহ্ম-মায়া সমন্বিত ক্ষর-অক্ষর সমন্বিত পুরুষোত্তমের পরাপ্রকৃতিই প্রাণ। "রাধাকৃষ্ণ একই স্বরূপ, লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ"। প্রকৃতিরূপা শ্রীরাধার প্রাণ-স্বরূপ হইয়াই পুরুষোত্তম প্রাণবল্লভ। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীরামপ্রসাদ বলিয়াছেন—কালীই ব্রহ্ম ব্রহ্মই কালী এই পরাপ্রকৃতি বিশ্বরূপিণী এবং অণুর অণুর স্বরূপিণী, যুগে যুগে তিনি সূক্ষ্মেও তিনি। বর্তমান বিজ্ঞান অণু পরমাণুকে বিভাজন করিয়া একটি বিশ্বব্যাপ্ত অনন্ত শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম হইতেছে energy। জীব বিদ্যার অগ্রগতিতে অণু পরমাণুকে বিভাজন করিয়া তাহার মধ্যে বংশগতির সারভূত পদার্থ এই ক্ষুদ্রতম পদার্থ পাইয়াছেন। এই প্রাণ উৎপত্তির সারভূত পদার্থ হইতে বর্তমান যুগে ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা জীবকোশ সৃষ্টি করিয়াছেন। দর্শন এবং বিজ্ঞানের অন্বেষণমিলনে যে প্রাণ শক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা জৈবিক প্রাণ। মনস্তত্ত্বের প্রাণে দেহ, মন বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গোচর হওয়ার দিগদর্শন বর্তমান দর্শন হইতে পাওয়া যায়। এই প্রাণই intuition। এই intuitionকে ইন্দ্রিয় দ্বারা ছোঁয়া করিলে ধরা যায়। যাহা ছিল "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তান্ তর্কেন যোজয়েৎ" তাহা আজ সর্ব্ব ইন্দ্রিয় নিংড়ান ঘনরূপে ধরার ধূলিতে অবতীর্ণ।

এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ পুরুষোত্তমের একোঽহং বহুস্যাম্ ইচ্ছা-সম্ভূত। তিনি এক ছিলেন, বহু হইলেন এবং এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়া 'সূত্রে মণি গণা ইব' এই বিশ্বসংসার ধরিয়া রাখিয়াছেন। প্রতি ক্ষণ এবং খণ্ডের মধ্যে প্রেরণা-রূপে অবস্থান করিয়া বিশ্ব কর্মচক্র অনুষ্ঠান করিয়া অনাদি অনন্তে চলিয়াছেন। প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রাণ এবং প্রজা সমন্বিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের কানে কানে বলিয়া দিলেন—তোমরা উৎপত্তি বৃদ্ধি করিয়া চল, সৃষ্টি হইয়া চল, সৃষ্টি বাড়াইয়া চল। এই কর্ম-প্রেরণায় বিশ্বকর্ম-চক্রের প্রবর্তন হইয়াছে। তিনি তাঁহার বিশ্বকে এবং নিজকে পরকীয় না করিয়া পান না। এই কর্মপ্রেরণায় জীবের হাতে গড়া এই বিশ্বকে তিনি পুনরায় নিজের করিয়া পান। অখণ্ড অনন্ত কাল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব তাঁহার এক পাদ মাত্র, তিনি প্রতি ক্ষণের এবং প্রতি খণ্ডের মধ্যে কর্ম-প্রেরণা রূপে অবস্থান করিয়া খণ্ডের এবং ক্ষণের সংহতি গড়িয়া তুলিয়া সম্মুখে প্রধাবন করিয়া অনাদি অনন্ত ভাবে চলিয়াছেন। এই সৃষ্টি প্রেরণার মধ্যে রহিয়াছে প্রাণ ও প্রজার সমন্বয় প্রজাগণের মঙ্গলজনক কর্মানুষ্ঠান এবং তাঁহার বিশ্বকে স্বর্গরূপে গড়িয়া তোলা, ইহাই প্রজার নির্দেশ এবং প্রাণের নির্দেশ সর্বভূতকে আত্মায় হোম কর এবং আত্মাকে সর্বভূতে হোম কর; প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সকলে একাত্ম হও এবং একাত্মবোধে বিশ্বের কল্যাণ কর। জীব এই কর্মচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া এবং এই প্রেরণা কার্য্যাত্মক করিয়া বিশ্বছন্দে বিশ্ব-কর্মের অনুষ্ঠান করিবে ইহাই বিশ্বস্রষ্টার নির্দেশ। এই বিশ্বকে নূতন রূপে গড়িয়া সুন্দর ভাবে সাজাইয়া গোছাইয়া পাইবার জন্য প্রয়োজন মানুষের দু'খানি হাতের। তিনি তিল সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ তাহা হইতে তৈল উৎপাদন করিবে। তিনি ধান সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ তাহা হইতে তণ্ডুল বাহির করিবে। মানুষ আপেক্ষিক শক্তি; তাহার শক্তি দ্বারা আহরণ করিবে এবং বিশ্বসেবায় তাহা নিয়োজিত করিবে। বিশ্বকবি বিশ্বপিতার বিশ্বসৃষ্টির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া গাহিয়াছেন—

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে
কোনখানে অভাব কিছুই নাই।
পূর্ণ তুমি, তাই

তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
তাইতো একে একে
যা কিছু ধন তোমার আছে আমার করে লবে।
এমনি করেই হবে
এ ঐশ্বর্য তব
তোমার আপন কাছে প্রভু নিত্য নব নব।
এমনি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে চিনে
তোমার সূর্য্যোদয়।
এমনি করেই দিনে দিনে
আমার প্রেমের পরশমণি আপনি যে লও চিনে
আমায় পরাণ করি হিরণ্ময়।

রবীন্দ্রনাথ

জীবের বিশ্ব করিয়াই তিনি নিজের বিশ্বকে পান; তাঁহার কোন কিছুর অভাব নাই, তবুও তিনি এই বিশ্বকে জীবের বিশ্ব করিয়া পাইবার জন্য ভিখারী। চোর লম্পটের যেমন পরের ধন পাইবার স্পৃহা তেমন স্পৃহা লইয়াই তিনি তাঁহার বিশ্বকে জীবের করিয়া পাইতে আকুলি বিকুলী করেন।

বিশ্বেশ্বর যেমন নিঃশেষে নিজকে লুট বিলাইয়া দিয়া নিজের বিশ্বকে পরকীয় করিয়া জীবের করিয়া আবার ফিরাইয়া পান, জীবকেও বিশ্বকর্মযজ্ঞে নিজকে নিঃশেষ উৎসর্গ করিয়া বিশ্বের সাথে একাত্ম হইয়া, পুরুষোত্তমে লীন হইয়া সর্বারম্ভ পরিত্যাগী হইতে হইবে। তখনই তাহার কর্ম বিশ্বকর্ম হইবে। যেমন পুরুষোত্তম তেমনই তাঁহার সেবক স্বপরবর্জিত উপাধিবিধুর স্বাভাবিক সম্বন্ধে পুরুষোত্তমের সহিত এই পরকীয় ভাবে মিলিত হইলেই জীব ভাগবতী তনু লাভ করিয়া এই দেহেই পুরুষোত্তম বনিয়া যায়। এই পরকীয় প্রেমপথের রূপরেখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজলীলায়, ব্রজভূমিতে রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে স্বপর উপাধি বর্জন করিয়া পুত্র কন্যা স্বামী প্রভৃতির দুর্জয় গৃহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করিয়া, সর্ববিধ বসন ত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণসমীপে গিয়াছিলেন এবং নিরবদ্য সংযোগে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিলেন; যাহার মহিমা কীর্তন করিয়া ভগবান বলিয়াছেন—

ন পারয়ে অহম্ নিরবদ্য সংযুজাম্
স্ব সাধুকৃতং বিবুধায়ুষাপি বঃ
যা মা ভজন্ দুর্জয় গেহ-শৃঙ্খলাঃ।
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।

—'আমার সঙ্গে নিরবদ্য সংযোগে যোগিনী তোমাদের এই সংযোগের উপযুক্ত সংস্কার আমি দেবতার আয়ুষ্কালেও করিতে পারিব না। তোমরা দুর্জয় গৃহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমার ভজনা করিয়াছ। তোমাদের কর্মের প্রতিদান তোমাদের কর্মদ্বারাই হউক। এই প্রাণ-পথেই বর্তমান ভজনের মধ্য দিয়া যে যেমন ভাবে কৃষ্ণকে চাহিয়াছিলেন তেমনি ভাবেই তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ কেমন? যার কাছে যেমন। ব্রজগোপীগণ নিরবদ্য সংযোগে তাঁহাকে পাইয়াছিলেন; কংস কৃষ্ণ-বিদ্বেষ এবং বৈরী ভাবের মধ্যেই তাঁহাকে পাইয়াছিল; কুব্জা তাহার কামনা তৃপ্তির জন্য পাইয়াছিল; নারদ প্রভৃতি ভক্তগণ নিষ্কাম ভক্তি সাধনায় তাঁহাকে পাইয়াছিলেন।

সর্বসাধন ধন পুরুষোত্তম সাধন। এই সাধনে সকল সাধনের স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। অন্ধের হস্তি দেখার মত অনাদি অরূপ নির্গুণ জগৎকারণ পুরুষোত্তমকে যে যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে সে সকল মতবাদই সত্য। সর্বমতবাদপ্রতিরূপ পুরুষোত্তম প্রাণের স্তরে উপলব্ধ। তিনি প্রাণের স্তর হইতে সকলকে বলিয়াছেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"—যে যে ভাবে আমাকে ভজনা করে আমি সেইভাবেই তাহার কাছে ধরা দেই। এই সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের প্রথম পর্য্যায় দিয়া গিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ধর্ম মতে সাধন করিয়া দেখাইয়াছেন যে সকল ধর্মেই ভগবানকে পাওয়া যায়। কোন ধর্ম বড় বা কোন ধর্ম ছোট নয়। এই সমন্বয়ের দ্বিতীয় পর্য্যায় দিয়া গিয়াছেন সমন্বয়-মূর্তি শ্রীশ্রীনিতাগোপাল দেব; তাঁহার প্রাণ-দর্শন পুরুষোত্তম জগৎ-কারণকে সকল মতবাদের ঠাকুর রূপে, সমগ্র রূপে

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সর্ব্বসৃষ্টিকোণ হইতে উপলব্ধ পুরুষোত্তম বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানসম্মতরূপে এই প্রাণ-দর্শনে বিশ্বের সকল মতবাদকে তাহার ক্রোড়ে স্থান দিয়া এক-বিশ্ব গড়িবার পথ প্রস্তুত করিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে এক-বিশ্ব গড়িয়া উঠিবার ভাবধারা উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। শ্রীনিত্যগোপালই বলিতে পারিয়াছেন "I am a cosmopolitan" সকল দেশ কালের গণ্ডী ভেদ করিয়া একদিন এই ভারতবর্ষেই উচ্চারিত হইয়াছিল, "আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বে ত্রিপ্যন্ত।" এক বিশ্ব, এক বিশ্বেশ্বর এক মানব জাতিবোধ-জাগরণে শ্রীনিত্যগোপাল দেব বর্ত্তমান বিশ্বের পথ-প্রদর্শক। বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদ মনের স্তর হইতে ব্যাখ্যাত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে মিলনের ক্ষেত্র ইতিপূর্ব্বে ছিল না। শ্রীনিত্যগোপাল দেবের প্রাণদর্শন বিশ্বেশ্বরের সমগ্রতা এবং বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্য দিয়া প্রাণ সাধনায় যে কর্ম যোগে যুক্ত থাকিয়া বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বর পরস্পরকে গড়িয়া তুলিয়া অতীত হইতে বর্ত্তমানে এবং বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে ছুটিয়া চলিয়াছেন তাহাই প্রস্থাপন করিয়াছে। এই কর্ম বিশ্বকর্ম যজ্ঞ। এই কর্ম্মের সম্বন্ধে ভগবান গীতা-মুখে বলিয়াছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তাহা সমস্ত আমাতে অর্পণ কর। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল কর্মই যজ্ঞ যদি তাহা পুরুষোত্তম প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশ্বস্তরের বিশ্বকে ভরণের জন্য প্রত্যেকেরই কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, যে যে স্থানে আছে সে সেইস্থান হইতে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া বিশ্বের জীবন মঙ্গল বিধান এবং পুরুষোত্তমের প্রীতিপদ বিশ্বকর্মযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। প্রাণ ঢালিয়া বিশ্বকর্ম স্ব স্ব স্থানে এবং স্বধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্পন্ন করিলে সেই কর্ম বিশ্বকর্ম রূপে পুরুষোত্তমার্পিত হইয়া জীবকে পুরুষোত্তম-প্রীতিপদ করিয়া তোলে।

যদ্ যজ্ঞনো ভগবতে বিদধীত মানম্
তচ্চোন্নয়ন্নপ্রতিরূপং যথা দুবশ্রী। ভাগবত ৭।৯।১১

ভক্ত জীব পুরুষোত্তমে যাহা যাহা দান বিধান করে ঠিক তাহা তাহাই জীবের হয় যেমন বিম্বের মুখশ্রী চন্দন অনুলেপদ্বারা লক্ষিত হইলে প্রতিবিম্বেরও তাহা আপনা-আপনি হইয়া যায়। রাগদ্বেষরহিত পুরুষোত্তম-অর্পিত কর্ম-অনুষ্ঠান দ্বারা জীব ভাগবতী তনু লাভ করে। তখন তাহার কর্ম পুরুষোত্তম কর্মে রূপান্তরিত হইয়া বিশ্বের সহিত বিশ্বনাথের যোগে এই বিশ্বকর্মযজ্ঞ অনাদি অনন্ত কাল অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্ম সদা প্রাণবন্ত। কর্মানন্দে কর্মযোগী নিরন্তর কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া যান। পক্ষান্তরে প্রাণস্পর্শহীন কর্ম ক্লান্তি আনয়ন করিয়া মৃত্যু রূপে কর্মের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়।

বর্ত্তমান কালে প্রাণহীন কর্ম্মের বিষময় ফল শ্রমিক মালিক সংঘর্ষের মধ্যে দেখিতে পাই। শ্রমিক মালিক সম্পর্কের মধ্যে প্রাণ না থাকায় মালিকের ধন শ্রমিকের হইল না এবং শ্রমিকের শ্রম মালিকের হইল না। মালিক শ্রমিককে শোষণ করিয়া আয় বৃদ্ধি করিতে চায় এবং শ্রমিক মালিককে শোষণ করিয়া নিজেদের সুযোগ সুবিধা আদায় করিতে চায়। দুই পক্ষের মধ্যে যদি প্রাণ থাকিত তাহা হইলে শ্রমিকের শ্রম এবং মালিকের ধন গলিয়া গিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রাণের সেতু বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইত, উভয়েরই মঙ্গল হইত, উৎপাদন বৃদ্ধি করিত এবং বেকার সমস্যার সমাধান হইত। উভয়ের মধ্য হইতে প্রাণকে উৎখাত করিয়া তাহারা আর পরস্পরে মিলিতে পারিতেছে না। ইহাতে উৎপাদনও বাড়িতেছে না, বিবাদও মিটিতেছে না।

যজ্ঞ কর্ম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলায় গিরি-ধারণ প্রসঙ্গে কর্মানুষ্ঠানের নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই কর্মানুষ্ঠানের পথ-রেখা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগেও অবশ্য অনুকরণীয়। নন্দরাজ বৃষ্টিপাতের জন্য স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই ইন্দ্র-যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের ব্যর্থতা প্রদর্শন করাইয়া বলিয়াছেন জীবগণ কর্ম করিলে তাহাদের কর্মফল বাহিরের কোন দেবতা আটকাইতে পারে না। পক্ষান্তরে কর্ম না করিলেও কোন

দেবতা তাহাকে কর্মফল দিতে পারে না, কর্মের দ্বারাই জীব জন্ম জন্ম গ্রহণ করে এবং বাঁচিয়া থাকে, কর্ম-দ্বারাই সকল সিদ্ধ হয়। কর্মের দেবতা রহিয়াছে কর্মের প্রেরণাদানকারীরূপে কর্মীর অন্তরে। এই কর্ম-প্রেরণায় বিশ্বমঙ্গলের জন্য আয়োজিত কর্মে যাহারা দুঃস্থ বুভুক্ষু যাহারা বিশ্বের সেবক, তাহাদের আপ্যায়নেই যজ্ঞ-কর্মের সার্থকতা। যাহারা নীচ জাতি নানা দুঃখ কষ্টে দিন কাটায়, তাহাদের দুঃখ-ভার অপনয়নই বিশ্বেশ। বিশ্বের সেবায় যাহারা নিয়োজিত তাহারা আপ্যায়িত হইলে অধিকতর বলে বিশ্ব-সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃপরং—পরস্পর পরস্পরের ভাবনা ভাবিয়া, পরস্পরকে পরস্পর বুঝিতে চাহিয়া বিশ্বকর্ম অনুষ্ঠিত হইলে সকলেরই মধ্যে প্রাণের সেতুবন্ধন সৃষ্ট হইবে এবং বিশ্বকর্ম সুসম্পন্ন হইবে। শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়া যজ্ঞার্থে আহৃত দ্রব্যসম্ভার বিশ্ববাসীর ভোগের জন্য বিতরণ করিলেন।

এই যজ্ঞ কর্মের আদর্শে বর্তমান যুগে পূজা পার্বণ ও সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে তবেই তাহা সার্থক হইবে। আগামী ৺শারদীয়া দুর্গাপূজায় এই আদর্শে পূজা সম্পন্ন হইলেই সার্থক হইতে পারে মহামায়ার পূজা।

বর্তমানে এই পূজানুষ্ঠান যাহা দেখিতে পাই তাহা প্রকৃত পূজা কিংবা বাহ্যিক অনুষ্ঠান আড়ম্বর, বা প্রাণহীন ধর্মের পূজা কি না তাহা এই প্রসঙ্গে চিন্তার বিষয়। আজ দেশে ধরাজনিত পরিস্থিতিতে ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই। অনুরূপ ক্ষেত্রেই ইন্দ্রপূজার দ্বারা বারি বর্ষণের অভিপ্রায়ে নন্দ-রাজ ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হইয়া বারি বর্ষণ করিবেন এবং ব্রজভূমি শস্যশালিনী হইবে, প্রচুর গোখাদ্য বৃষ্টিপাতে উৎপন্ন হইবে এবং গোগণ তাহা ভোগ করিয়া প্রচুর দুগ্ধ দিবে। এই আশায় আজও আমরা ৺মহামায়া পূজা করি বা অন্য পূজা করি। কিন্তু যে সত্য শ্রীকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ বিজ্ঞানের যুগে অধিকতর সত্য। আকাশের দিকে বৃষ্টির জন্য তাকাইয়া না থাকিয়া আমরা কর্ম করিয়াই যেন এই বারি সংগ্রহ করিতে পারি। নহিলে কৃষ্ণ-তত্ত্বও ভুল, বিজ্ঞানও নিষ্ফল। আমাদের সমাজের যাহারা অনাহারী দুঃস্থ বেদনার্ত, তাহাদের জন্য কর্মের ব্যবস্থা করিয়াই মহামায়ার শ্রেষ্ঠ পূজা করিতে পারিব। প্রাণহীন অনুষ্ঠান এবং আত্মকেন্দ্রিক কর্মধারাই আমরা আজ সর্ব হইতে বিচ্ছিন্ন, তাই সকলের নিকট আমরা পরাস্ত। এই পূজানুষ্ঠানের সার্থকতা তখনই হইবে যখন আমরা সর্বের সাথে একাত্ম হইয়া সর্বভূত হিতে রত হইব। ভারতীয় সংবিধানে এই আদর্শ আছে কিন্তু নাই তাহা আমাদের আচরণে। আজ তাই সকল পূজা পার্বণ ইন্দ্র যজ্ঞের ন্যায় ব্যর্থ।

এই যজ্ঞ সাধনে সেব্য পুরুষোত্তম এবং সেবক জীব এবং সেবার সাধন বিশ্ব যখন একাত্ম ত্রিভঙ্গ হইবে তখনই হইবে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের সেবায় শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

ঊর্ধ্বে ব্রহ্মমূলে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম প্রাণ-সাধনায় প্রাণের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ভক্তকে আহ্বান করিতেছেন, "মাম্ এব একমি" "মামেকং শরণং ব্রজ",—আমাকে এই প্রাণ-সাধনায় প্রত্যক্ষভাবে পাইবে, তুমি আমি হইয়া যাইবে। তুমি লোকধর্ম, বৈদিক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি যে ভাবে বিশ্বকর্ম অনুষ্ঠান করি সেই ভাবে বিশ্ব কর্ম অনুষ্ঠান কর। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মাং নমস্কুরু। তোমার মন আমাকে দাও, তোমার মনের মত করিয়া আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। আমি তোমার সকল পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব। ব্রজে যে পরকীয় ভাবে আমি লীলা করিয়াছি সেই পরকীয় পথে অথবা প্রাণ-পথে আমার সাধনা কর। প্রত্যক্ষ পুরুষোত্তম ভজন বিশ্বজনের হইয়াছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীরামপ্রসাদের হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দের হইয়াছে। এই প্রত্যক্ষ ভজনের মধ্যেই জীব ব্রহ্ম এক হইয়া "ইহৈব ব্রহ্ম সমশ্নুতে"—ইহ জীবনেই ব্রহ্ম আস্বাদন করিবে।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ
শ্রীশ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

৮৩

১০. ৬. ৫৭—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন, মানুষ আত্মঘাতী—আত্মঘাতী বলে মানুষকে গাল উপনিষদও দিয়েছেন... প্রত্যেক মানুষ আত্মহত্যা করছে...। আত্মহত্যা না করে মানুষের অন্তরের প্রকাশ-সম্ভাবনাকে খুলে দেবার চেষ্টা করে নরনারায়ণ আশ্রম।...এই নরদেহে অনন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে—এই দেহ আদি, মূলত অথচ সুদুর্লভ। এই দেহ পাওয়ার আগে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে—অনেক যোনি ভ্রমণ করে এই মানব জনম লাভ হয়...এই দেহ-ভেলা সুকল্প, সমর্থযুক্ত—এই সংসার পাড়ি দিতে এই দেহভেলা সহজে ভাঙে না।...আমি কি একা? না, এই দেহের হাল ধরে আছেন গুরু—গুরুই কর্ণধার...। নিত্যগোপালই গুরু।...বাতাসও প্রতিকূল নয় সব সময়—অনুকূল বায়ু দ্বারাই ভগবান একে চালাবার সুযোগ রেখে দিয়েছেন...। অনন্ত সুযোগ ভগবান মানুষকে দেন...তাও যদি মানুষ এ সংসার-সমুদ্র পাড়ি দিতে না পারে তাহলে ভগবানকে দোষ দিয়ে লাভ নেই...। অনন্ত সমস্যা নিয়ে মানুষ এসেছে আবার অনন্ত সুযোগ নিয়েও সে এসেছে—গরু বাছুর বিড়ালের অসীম সুযোগ নেই—শিবানী বিড়ালী এটা খায় তো ওটা খায় না...সব ক্ষেত্রে বিচরণ করবার যোগ্যতা নেই বিড়ালের তথা জীব জন্তুর। কিন্তু মানুষকে সে যোগ্যতা দিয়েছেন ভগবান—কিন্তু মানুষ যদি সে যোগ্যতা কাজে না লাগায় তাহলে অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে লাভ কি? ভেতরে যে যোগ্যতা আছে তাকে ফুটিয়ে তোল...। মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন অনেক...আবার তাকে শিখতেও হয় অনেক।...জীব-জন্তুরা জন্মেই হাঁটতে পারে—মানুষকে কতদিন ধরে কত চেষ্টা করে শিখতে হয়।.....পশুর সংযম স্বাভাবিক—মানুষকে সংযম শিখতে হয়।...এত পেয়েও যে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা গেল না, সে আত্মহত্যা করল। ...আমি এখানে বসে বসেই বাস্তুঘুঘুটিবাসী হতে হতে বাঙালী, সেই সঙ্গেই ভারতবাসী, সেই সঙ্গেই বিশ্ববাসী, সেই সঙ্গেই বিশ্বাতীতও...আমি তো শুধু ব্যক্তি নই।...তুমি ব্যক্তি নিয়ে থাকলে তুমি আত্মহত্যা করছ... একই সময়ে তোমাকে ২৪ পরগণায় থাকতে হবে, বাঙ্গলায় থাকতে হবে, ভারতবর্ষে থাকতে হবে ঠিকানায় লিখব India অথচ আমি সর্বভারতীয় হব না—এটা মিথ্যাচার।.....অতটুকু আমি নিয়ে যারা রইল তারা আত্মহত্যা করল।...রাম শুধু অযোধ্যা দিয়ে রাম নন... আমি বিশ্বনাগরিক না হলে আমার সবটুকু পরিচয় হয় না...। নিত্যগোপালের এই মন্ত্র এখানে থাকতে হলে মুখস্ত করতে হবে...। এত বড় বিরাট আমি—সেই আমিকে একটা ঘটে বা ধলিতে ঢুকাব?...আকাশের মত উদার আমি—আমি ছোট হয়ে থেকে, কোথাও আটকে থেকে নিজেকে হত্যা করব?...কৃষ্ণ কোথাও আটকে পড়েন নি..... কৃষ্ণ নন্দনন্দন, গোষ্ঠবিহারী, রাধাবল্লভ...বৃন্দাবনের আকাশেই তিনি শুধু নন—অমনি তিনি মথুরার আকাশে গিয়ে উদিত হয়েছেন...। আমি বাবার ছেলে, ঠাকুরদার পৌত্র, ভাইবোনের ভাই, বন্ধুদের বন্ধু—সেই আমিই স্ত্রীর স্বামী, সন্তানের পিতা ইত্যাদি...আমি মনুর ছেলে মানব।... কৃষ্ণের মতই আমার পরিচয়ও ব্যাপক... আমি কাঁকরঘার সেবক, বরিশালের সেবক, বাংলার সেবাও করেছি..... তার বাইরে বৃন্দাবন বয়োদাতেও বক্তৃতা দিয়েছি, বৃন্দাবনের গোপাদের কুয়ার জলে অধিকার ছিল না—আমি বক্তৃতা দিয়ে তাদের সে অধিকার আদায় করে দিয়েছিলাম—এ সেবাটুকু তো বৃন্দাবনের করতে পেরেছি। ...বিশ্বকল্যাণ সভা করেছি আমার জীবনের প্রথম আরম্ভ-

কালেই। ...হত্যা অর্থ অনন্ত সম্ভাবনাকে না ফুটিয়ে নিজেকে ক্ষুদ্র করে রাখা...। আত্মহত্যার অপমান থেকে আশ্রম মানুষকে বাঁচাতে চায়...। যো বৈ ভূমা—সেই তো আনন্দকে পায়—নিজের গণ্ডী ক্ষুদ্র করে ফেললে প্রথম প্রথম মনে হবে খুব আনন্দ হচ্ছে—কিন্তু ব্যাপকতা নষ্ট হয়ে গেলে শুধু গভীরতার আনন্দ অল্পদিনেই নষ্ট হয়ে গিয়ে ক্লেদ উঠবে···তাই তো রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হল 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়'···। নিরুপাধি মানুষ যখন সকল উপাধিতে থেকেও নিরুপাধি হবে, তখনই সে নিজেকে জানবে···তখনই আত্মবিৎ হওয়া হবে, আত্মজ্ঞানী হওয়া হবে...তখনই জাতিতে জাতিতে টক্কর লাগবে না—তখনই জাতি-সমন্বয়···। হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে আশ্রম বসে আছে·····। তুমি ক্ষুদ্র নও, তুমি সাগর, তুমি জগন্নাথের গৃহিণী···এই বিরাট জগৎ আমার গৃহ···। ক্ষুদ্র গৃহ চূর্ণ হয়ে যাক···বিরাট বিশ্বই আবার গৃহ—the world is my home। ঠাকুর, এ কথা সবাইকে শিখাও।···

১১. ৬. ৫৭—এতকাল ভারতবর্ষ যে ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে, বর্তমানে তার বদল হয়ে গেছে। এতদিন আদি-কে অবলম্বন করে সমস্ত সাধন ভজন সমাজ-ব্যবস্থা চলেছে···। এখন আরম্ভ হবে পুরুষোত্তম বা পুরুষোত্তম স্থানীয় প্রতিনিধি থেকে...। নিজেকে কেন্দ্র করে নিজের সমস্যার সমাধান হয় না···গুরুর জীবনকে কেন্দ্র করলে আমার সমস্যার সমাধান হবে···কেননা আমার সমস্যার সমাধান করতে যে সব factor দরকার তা আমার কাছে ধরা পড়বে না—শিশু জানে না আগুন নিয়ে খেলা তার পক্ষে কি বিপজ্জনক—বিপদ হবে জানলেও কিভাবে কি উপায়ে তা সমাধান হবে তা শিশু জানে না—তাই যে জানে তার কাছে শুনতে হয়, জানতে হয়।···ব্যাধ যে হরিণকে মারবার জন্য বাণ নিয়ে বসে আছে, তা তো হরিণ জানে না—এটা তার অজ্ঞাত—এই অজ্ঞাত রাজ্যের সংবাদ রাখেন যাঁর জীবন একাধারে ব্যাপক ও গভীর···। মহর্ষি গৌতম বলেছেন—দুঃখের কারণ কি? দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াৎ অপবর্গঃ—...কি করে মুক্তি আসে?—আধ্যাত্মিক মুক্তিই হোক বা কয়েদীর মুক্তি হোক বা যে কোন সমস্যার মুক্তি হোক—মিথ্যাজ্ঞান দূর হলেই মুক্তি—যে কোন কিছু সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান।···দুঃখ আসে জন্মেছ বলে—যেই জন্মেছ অমনি এটা ভাল লাগে না, ওটা ভাল লাগে এই প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়···জন্মের কারণ প্রবৃত্তি—ধর্মাধর্ম প্রবৃত্তি···। জন্মাও কেন? এর উত্তর অনেক কিছু—কিন্তু মোটা কথা জন্মেছি—এখন কি করতে হবে, কি ভাবে চলতে হবে সমস্যা সেইটা···প্রবৃত্তি দূর করতে হলে দোষ দূর করতে হবে···দোষ দূর করতে হলে মিথ্যাজ্ঞান দূর করতে হবে—বস্তু সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞানই সমস্ত দোষের আকর ···। তোমার এটা ভাল লাগে না, সেটা ভাল লাগে না—তা দিয়ে তোমার উপরেই চাপ আসবে। বিশ্বের তাতে কি আসে যায়? তোমার ইচ্ছা অনুযায়ীই কাজ হয় না···তোমার ইচ্ছার উপরেও ইচ্ছা আছে···। দোষ অর্থ রাগদ্বেষ—রাগদ্বেষের কারণ মিথ্যা-জ্ঞান।...দুঃখ কারো ভাল লাগে না—অথচ শংকর বললেন দুঃখদের পরা পূজা।·· দিব্যজ্ঞান না হলে মিথ্যাজ্ঞান দূর হবে কি করে?···অহং শিবস্তি যে লেগে সে জানবে কি করে যে অহং শিবস্তি ভুল? শুদ্ধটা না জানলে ভুল বের করবে কি করে?···ভেদ তবো না—শুদ্ধের ভেদ, রাবণের ভেদ, হিটলারের ভেদ, আরও বহু বহু মানুষের ভেদ টেকে নি।···উপায়?···চল বৃন্দাবনে···। সেখানের দৃষ্টান্ত দেখে ঠিক কর তুমি শুদ্ধ না ভুল।·· ঘড়ি শুদ্ধ না ভুল কেমন করে বুঝব?···সূর্য হচ্ছে বিশুদ্ধ ঘড়ি।···তোমার শুদ্ধি অশুদ্ধির বিচার তুমি করতে যেয়ো না···। জড় সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান, অজড় সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান দুঃখের কারণ।··· জড়কে এতদিন যা বলে জানতে, যে মূল্য দিয়েছিলে তাই তার সত্যিকারের মূল্য নয়—দুঃখ আসে সেইখান থেকে।... এমনি সব ব্যাপারেই।···শুদ্ধ বোকা ভগবানের ধ্যানের মধ্য দিয়ে আসবে··· দীক্ষা মানে তাঁর standard লওয়া। ···এই অবস্থায় নিত্যগোপাল কি করতেন?···তাঁকে দেখে নিজের শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচার কর।···চক্ষুর রোগ দুটো দেখে... কানের রোগ অর্ধেক শোনে···এগুলি রোগ···এ রোগ

অনেকের আছে…। সমগ্র যেখেন গোবিন্দ—গোবিন্দ হচ্ছেন সূর্য ঘড়ি—তাঁর দিকে তাকিয়ে নিজের ভুলশুদ্ধি মেলাও।……এই কথাটায়, এই ঘটনাটায় ঠাকুর কি মীমাংসা করতেন?……জড় অজড় সব কিছু সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান দূর কর…। নারী সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞানে কাম সৃষ্টি হয়।…বস্তুর সাক্ষাৎ জ্ঞান ছাড়া দিব্য জ্ঞান লাভ হয় না…। কলি যুগে গুরুর নিকট ছাড়া দিব্য জ্ঞান লাভ সম্ভব নয় পাঠ এনে দেখাও কোথায় কোথায় কি ভুল হয়েছে।… গুরুর কাছে থাকার প্রয়োজন সেইখানে—গুরুর জীবনের টর্চ নিয়ে তোমার জীবনে focus করে দেখবে…। আমার হয়তো সে দাবী করার অধিকার আছে…। যাক্, নিত্যগোপালের জীবনের সঙ্গে, তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে আমার জীবন মিলিয়ে দেখ…। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি—বুদ্ধি লয় করতে পারলে অত্যন্ত শুদ্ধি হয়…। দুঃখেও আনন্দ আছে…না হলে সন্তান চায় কেন মানুষ? দুঃখও মানুষ চায়…দুঃখ হলেই কি নিরানন্দ হয়?…সুখ বিলাস, ওটা ভোগীর লক্ষণ…। আমার জীবনের সঙ্গে জীবন মেলাবার প্রয়োজন-বোধ কারো দেখতে পাচ্ছি না…। জীবনী শক্তি থাকলেই দেহমনের ক্ষত সারেই…। এখানে এসে প্রকৃতি বদলের সাধনা নিতে হবেই…। অন্য কোন সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে এ যুগে।

১২. ৬. ৫৭—মানুষ বাঁচতে পারে না যদি প্রাণবায়ু অন্তরে বাইরে সমানভাবে চলাচল করতে না পারে। বাইরের বায়ু শ্বাসের ভিতর দিয়ে নিচ্ছি, সেই বায়ু ফুস-ফুসের ভিতর দিয়ে দূষিত রক্ত নেয়—ভিতরের রক্ত তার কালিমা অপবিত্রতা দূর করতে পারত না যদি সে বাইরের বায়ুর সঙ্গে চলাচলের স্পর্শ না রাখত। সমস্ত দেহযন্ত্রের সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে বিষ উঠছে তা বাইরের সংস্পর্শে দূর হয়, শুদ্ধ হয়…সেইজন্য ভগবান অন্তরে বাহিরে রয়েছেন…তিনি অন্তরে, তিনি বাহিরে…। ব্যক্তিগত সত্তাকে বাইরে ছড়িয়ে দিচ্ছি, আবার বাইরেকে ভিতরে নিচ্ছি…নদীর জল সাগরে যায়,…সাগরের জল নদী আবার নিজের বুকে নেয়…সাগর ছাড়া কে নদীর জল বিশুদ্ধ করবে? অর্জুন, তুমি যোগস্থ হয়ে কাজ কর…আমি সাগর, আমার সঙ্গে যদি যোগাযোগ না রাখ তবে ব্যক্তিগত জীবনের সংঘাতের বিষ তুমি পরিশুদ্ধ করবে কি করে?… নিষ্কেদ সাগরের মধ্যে হারিয়ে ফেললে নদী শুদ্ধ হয়। কর্ম-ক্ষেত্রেই ঝঞ্ঝাটের ক্ষেত্র…কিন্তু গোবিন্দ-সাগর কর্মক্ষেত্রকে পরিশুদ্ধ করবার জন্যে ঢুকেছেন অর্জুন কর্মত্যাগ করতে চেয়েছিলেন—ভগবান বললেন, কাজ করতেই হবে…,কিন্তু আমাকে বুকে নিয়ে কর্ম কর।…কর্মক্ষেত্রে বিষ উঠবেই… নারদ তাই হরিনাম শুনিয়ে বেড়ান…আবার ঐ চাঁদ-মুখ দেখবার জন্য ব্যাকুল হন। একবার তাঁর মধ্যে ডুবতে হবে, আবার তাঁকে বুকে নিয়ে কর্ম করতে হবে। [গোকুল দাস আজ এই ভাষণের সময় উপস্থিত রয়েছে]…শুনলাম বেড়হাজার লোকের ভরণপোষণের জন্য বিষ ওঠে…। একবার ঘরে, একবার বাইরে, আবার বাইরে ঘরে…। ঘর না থাকলে বাহির মিথ্যা, আবার বাহির না থাকলে ঘর মিথ্যা.. রক্তের দু রকম গতির মত—একবার সব রক্ত ভিতরে আসছে, আবার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে…। হৃদয়েরও দুটো দিকে চলতে হবে—ঘরে আর বাইরে…। স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসা হৃদয়ের কাজ, আবার স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে বাইরে আসাও হৃদয়ের কাজ। এই দুটোই যে হৃদয় দিয়ে করতে পারে সেই পুরুষোত্তম স্তরের আনন্দ লাভের অধিকারী…পরীক্ষিৎ বলেছেন, সেই পুরুষোত্তমের বীর্য তুমি বল, সেই মায়া মানুষের জীবন তুমি বল—যিনি অন্তরে অমৃতপুরুষরূপে এবং বাইরে কাল রূপে বিদ্যমান থেকে নেচে চলেছেন।… নিত্যগোপাল এসেছেন সর্বসমন্বয়ের বার্তা নিয়ে…কোন্ কৌশলে চললে স্ত্রীপুত্র নিয়েই এখানে বাসুদেব-ক্ষেত্র রচনা করা যায় সেই বার্তা নিয়ে…। নিত্যগোপালকে দিয়ে জীবনকে শুচিয়ে নেব…। নিত্যগোপাল, অন্তরে বাইরে সহজভাবে বিচরণ করবার সামর্থ্য দেও কোথাও আটকা পড়ব না। ঈশিত্ব সহজাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা…। স্ত্রীপুত্রসংসারকে রেখে ছাড়া, ছেড়ে রাখা…, সন্ন্যাসী হয়ে সংসার কর, সংসার করে সন্ন্যাসী হও…। শ্রীকৃষ্ণ সংসারী-সন্ন্যাসী…, মহাসিদ্ধাবস্থায় সাইস্থা সন্ন্যাস এক বলিয়া বোধ হয়—শ্রীনিত্যগোপাল লিখেছেন।…

১৮. ৬. ৫৭—আমি সারা জীবন একটা সন্ন্যাসের দর্শন

ও লড়াইয়ের জীবন যাপন করে এসেছি…। মোটামুটিভাবে বলা যায় ভারতবর্ষ লড়াইয়ের ভিতর যায় নি। কিন্তু প্রীকৃষ্ণ লড়াইয়ে ভগবান…লড়াই করে প্রতিপক্ষকে এক করে নেবার শাস্ত্র ও জীবন তিনি দিয়ে গেছেন …এ লড়াই আমি নিত্যগোপালের কাছ থেকে শিখেছি।…আমি একক লড়াই করে এসেছি…। বাঘকে না খাইয়ে তার দাঁত নখ ফেলে দিয়ে তার সাথে লড়াই করা যায়, আবার লড়াই-র বন্ধকে পুষ্ট করেও তার সাথে লড়াই করা যায়…। আমার দর্শনে বিষয়কে খাঁচায় পুরে রাখা হয় নি, খাঁচার দ্বার খুলে দিয়েছি…। খাঁচায় পুরে মেয়েদের উপর কর্তৃত্ব করা সহজ। এতদিনকার প্রতিক্রিয়ায়…আজকের আবেষ্টনে তাই মেয়েরা একেবারে এমন হয়ে গেল।…পোষ মানাতে হবে তার সমস্ত শক্তিকে অব্যাহত রেখে, সে শক্তিকে বাড়িয়ে তুলে—সে লড়াইয়ের খবর তো এরা জানে না…। বিষয় ও ইন্দ্রিয় দুই-ই স্বাধীন…কেউ কারো নাগাল পায় না,…কেউ কারো ছোট নয়…তাহলেই তো আস্বাদনে আনন্দ! এতকাল বিষয়কে ছোট করে রাখা হয়েছে… বেঁধে ভোগ করলে কি রস হয়?—ছেড়ে দাও…. বিষয়কে, সংসারকে বেঁধে, কয়েদী বানিয়ে কি ভোগের সুখ হয়? বিষয়কে সংসারকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছি—তারপরে যদি পাওয়া যায় তাইতে থাকে আনন্দ…। আজ যে আমার কেউ নেই তার কারণ আমি সব কিছুকে মুক্তি দিয়েছি…। যাদের মুক্তি দিলাম তারা সব বিরুদ্ধ হয়ে এসে দাঁড়াল…! সংসারে লড়াই করেই থাকতে হবে, লড়াই করতে না পারলে সংসারে থাকা যাবে না।…আমি এখানে আশ্রম করেছি—চতুর্দিকের কত বড় লড়াইর মধ্যে বসে আছি…! একমাত্র গুরুবলে লড়াই করে চলেছি…। তোমাদেরও গুরুর প্রতি শরণাগতি থাকলে লড়াই করতে পারবে।… আমার এই সারা জীবনের লড়াইয়ের জয়ের কাহিনী কে শুনছে!…বিষয়কে মুক্তি দিয়ে, তার উপর 'আমার' এই ছাপ না দিয়ে ভগবানের রূপরসস্পর্শকে আস্বাদন করা এক অপূর্ব ব্যাপার।…লড়াই যার নেই, সে তো পরাজিত।…মৃত্যু ভেদ করি ছুলিয়া চলিছে তরী…দিতে হবে পাড়ি…। সখের বেদান্ত, সখের আশ্রম আমি করি নি…আমার রক্তারক্তির জীবন…। এই রক্তারক্তির জীবনের অংশীদার যাতে হতে পার, তার জন্য প্রস্তুত হও

২২, ৬, ৫৭। বর্ণাশ্রমব্যবস্থা-পরিচালিত হিন্দুর সংসারে বর্তমানেও বিধবাদের জন্য অনুশাসন চলছে—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক এ তারা মানতে বাধ্য।…আজকালও অনেককে পাওয়া যাবে যারা না মানলে ভবিষ্যৎ জীবনে 'অমঙ্গল ইত্যাদি ভেবে ঔচিত্য-বোধেই এসব মানে। ঋষিদের এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলে এসেছে।…এর পেছনে আছে নারীদের জন্য সংযমের চেষ্টা …আমার সঙ্গে যাদের সংযোগ আছে, তাদের আমি এটা করতে নিষেধ করেছি। নিষেধ করার কারণ সংযমের উদ্দেশ্য ওটা করলেও রক্ষিত হয় না।…অথচ মানুষের দেহ বর্তমানে এমন অবস্থায় এসেছে যে, এর উপর উপবাসের কৃচ্ছ্রতা চাপালে দেহ থাকে না …দেহরক্ষার জন্য উপবাস আর এ উপবাস তো এক নয়।…তবে কি সংযমের দরকার নেই?…সংযমের দরকার নিশ্চয়ই আছে…এখানে যারা আছেন তাদের মনে রাখা উচিত যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাও মানব না, ভাগবতধর্মে সংযমের রূপ যা আছে তা-ও মানব না, তাহলে তো চলবে না। ভাগবত ধর্মে সংযমের গভীরতর রূপ রয়েছে…। ঋষিদের কথা না শুনতে পারি, কিন্তু কৃষ্ণের সংযম-ব্যবস্থা তো মানতেই হবে…। শুশ্রূষু তো কেউ নয়—তাই কৃষ্ণের সংযম আর ঋষিদের সংযম ব্যবস্থার তফাৎ বুঝতে পারে না।…দুটো সংযমে তফাৎ আছে…। ভাগবত ধর্ম ভগবান নিজ মুখে বলেছেন…। একটি দৃষ্টান্ত ধর—একটী ২৫ জনের পরিবারে সুস্থ হয়ে থাকতে হলে প্রত্যেকেরই খাওয়ার সংযম করতে হয়…। ১ সের দুধে ২৫ জনের চালাতে হলে প্রত্যেকেরই বিবেচনা করতে হয়…। এ সংযম কেমন করে আসবে? ব্যক্তিগত জীবন থেকে বঞ্চনা হলে আমাকে এই ভাবে ভাবতে হবে যে লোভ করা পাপ, লোভ সংযম করতে হবে, যেহেতু ২৫ জন থাকতে হবে, অতএব লোভ করা চলে না…এই ভাবে ভেতরে ইচ্ছা থাকে কিন্তু যেহেতু অতএব কর্তব্য—এইভাবে লোভ দমন করতে হয়। এ সংযমে কষ্ট হয়। বর্ণাশ্রম কর্তব্যের ভাষায় কথা বলে

এবং সেটা না মানলে রীতিমত শাস্তির ব্যবস্থা আছে। ভাগবতধর্ম এ ভাবে দেখে না—সে বলে লোভের সাধনে কর্তব্য ভেসে যায় ...না খাওয়ার কষ্ট কেমন করে আনব? ...সমস্ত পরিবারকে, পরিবারের সকল ব্যক্তিকে পরিবারের কর্তাকে ভালবাসা—ভালবাসলেই অপরকে না দিয়ে নিজে একলা খেতে ইচ্ছা করে না। ভালবাসার শক্তি খাওয়ার লোভের থেকে বড় হতে হবে। নিজের ভাললাগা মন্দ লাগা দিয়ে চলা আর পরিবারের বা পরিবারের কর্তাকে ভালবেসে পথ চলা আলাদা হয়ে যায়।...আমার থেকে আরম্ভ করলে বর্ণাশ্রম, ভগবান থেকে আরম্ভ করলে ভাগবত।...বর্ণাশ্রমের উপবাসে এ দেশের যত বিধবাদের শরীর গেছে, আমি যে উপবাস করেছি তাতে আমার শরীর যায় নি। আমার চেয়ে কম খাওয়া কতজন পুরুষ খেয়েছে? আমার উপবাসের পিছনে থাকত একটা আদর্শের প্রতি তীব্র প্রেম, সেই প্রেমে শরীরে আঘাত লাগে না। দেশের সর্বসাধারণ এত কম খায়, আমি সেকথা মনে করে বেশী অর্থাৎ ভাল খেতে পারি নি—সারা জীবনই তো সংসারী লোকের হিসাবে কত কম খেয়ে চললাম—এতে কি শরীর নষ্ট হয়েছিল?... ঠাকুরকে খুশী করব, বাবাকে খুশী করব,—এ প্রেরণা থাকলে লোভ আগ্রতই হয় না, তখন ভাইদের ফেলে খাওয়ার কথা মনেই হয় না।...ঠাকুরকে ভালবাসলে, ঠাকুরকে খুশী করলে ভাল লাগে—এই অবস্থাটা যখন আসে তখন কম খাওয়া, না খাওয়ার কষ্ট হয় না।...ঠাকুর (শ্রীনিত্যগোপাল) জিজ্ঞেস করলেন, শরৎ, তুমি এটা খাও, ওটা খাও না কেন? বললাম, গোবিন্দকে ফেলে ছানা রাবড়ী খাব—কষ্ট হয়; যদি গোবিন্দকে রাবড়ি খাওয়াতে পারি তাহলে খাব। শুনে তিনি হেসে বললেন, তবে নাকি তোমার কৃষ্ণপ্রেম নেই? আমি বললাম, আশীর্বাদ করুন।...নিজেকে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে—এই মনোভাব, এই মাতৃভাব আসলে ঋষিদের রাজ্য অর্থাৎ তাদের ব্যবস্থা ছেড়ে আসতে পার—কিন্তু তখন ভগবানের এই সংযম-ব্যবস্থা মানতে হবে। প্রথম যেদিন আমাকে ছুত্রিকের বক্তৃতা দিতে হবে (তখন আমি একটু একটু বক্তৃতা দেই, রাজনীতিতে নামি নাই) ৪ দিন উপোস করে নিলাম...তবু একটু একাগ্রতা-বোধ আনবার জন্যে... বর্ণাশ্রমের উপবাস কর্তব্যবুদ্ধির..., কৃষ্ণের বর্ণাশ্রমে উপবাস বা কম খাওয়া বা সকলকে দিয়ে খাওয়া প্রাণের দরদের... ঠাকুরকে খুশী করার মধ্যে যে দরদ—সেই দরদেই সংযম আনে... আমি সারাজীবন আনন্দের কান্না, প্রেমের কান্না কেঁদেছি, আমার মত কোনো সন্তানহারা মা বা স্বামী-হারা স্ত্রী কেঁদেছে কি? বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ছাড়লে ভালবাসার শাস্ত্র, হৃদয়ের শাস্ত্র, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার শাস্ত্র...মহা-প্রভুর ভাষায় রাগমার্গ গ্রহণ কর গুরুর মধ্যে নিজেকে দেখ। যতটুকু ঠাকুরকে দিয়েছি ততটুকু জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। আনন্দের মধ্যে ভিল ভিল করে নিজেকে সেবার মধ্যে ভালবাসার মধ্যে বিলিয়ে দাও...। এ যেন তোমাদের সুবিধাবাদে না হয় এ বিষয়ে খুব সাবধান থাকবে ভাগবত-ধর্মের ভিতর দিয়ে পরম সংযম দরকার হয়ে পড়েছে—উপবাস-কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করবে না যদি তাহলে ভাগবত ধর্মের দেওয়ার আনন্দ, ভাল-বাসার সংযম গ্রহণ কর।...

২৯. ৬. ৭৭—আজ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা—লক্ষ লক্ষ লোক এই উৎসবে যোগ দিয়েছে, কিন্তু এর প্রকৃত কি অর্থ তার খোঁজ অনেকেই রাখে না.....। রথযাত্রার ভিতর দিয়ে মানুষের সাধনার পথ খুলে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।...তিনটী মূর্তি—বলরাম সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণ—জগতের সঙ্গে নাথের যোগসূত্র যোগমায়া সুভদ্রা।...যোগমায়ার প্রয়োজন জগৎকে নাথের সঙ্গে, নাথের কাছে উপস্থিত করা।...দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ জগৎ ও নাথের সঙ্গে মিলন করতে পারে নি—জগৎ আর নাথকে সম্পূর্ণ বিপরীত-লক্ষণ বলে মনে করেছে।...যে জগতের নাথকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, রথযাত্রায় সেই জগন্নাথ জগতের পথে পথে রথে বেরিয়ে পড়েছেন—গতির পথে বিশ্ব-পরিক্রমায় বেরিয়েছেন.....তিনিই তো আদি যাত্রী...। জগতের পথে—এই গতিক্ষেত্রে—কি ভাবে চলতে হবে পথে চলে তিনিই তা শেখাবেন...। নাথকে না হলে জগতের পথে মানুষ একলা চলতে পারবে না...জগতের সঙ্গে মেলামেশা করে নরনারায়ণ এক ব্রজ-পথ ধরেছেন—মানুষকে তাঁর সাথে পথে চলতে হবে—walking with God...। নরনারায়ণ

আশ্রমের সাধনা নাথকে জগতের কাছে উপস্থিত করা, জগৎকে নাথের কাছে উপস্থিত করা।···জগৎ গতিধর্মী, নাথ স্থিতিধর্মী—এই দুইয়ে মিলে জীবন জীবন্ত।····· ঈশোপনিষদের ভাষ্য এই রথযাত্রার দিনেই আরম্ভ করেছিলাম···। রথে বেরিয়েছেন তিনি তাঁকে আমরা দেখব···। ঐ জগন্নাথকে (বামনকে) যে দেখে তার আর পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ তার জন্ম লীলায় গড়ে ওঠে। ···কঠোপনিষদে রয়েছে—আত্মা রথী, দেহ রথ, বুদ্ধি সারথি—বুদ্ধি না থাকলে রথ তো চলবে না···। আমার এই দেহরথে তিনি আসীন হউন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যত রকম ভোগক্ষেত্র আছে, তা আমি আস্বাদন করব...। জগৎ ও নাথের সমন্বয়ই জড়াজড়, নিত্য অনিত্য সমন্বয়...। জগন্নাথ যখন জগতে নামলেন তখনই সকলের ডাক পড়েছে—এসো ব্রাহ্মণ, এসো চণ্ডাল—সকলে এক হওয়ার কথা তিনিই এসে বলতে পারেন—তিনি যখন যা যেখানে নেই সেখানে বড় ছোট, ধনী নির্ধন, কুলীন, অকুলীন, নরনারীতে ভেদ। তিনি এসে সকলকে মেলালেন—বৃন্দাবনে তিনি তাঁই রাখাল রাজা, রাজসূয় যজ্ঞে তিনি তাই পা ধোয়ার কাজ নিলেন, গুহক চণ্ডাল—সবরীকে নিয়ে তিনি বনে বাস করলেন, মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিচ্ছেন ঐ ধূলায়। ধূলোকে যে আমরা অবজ্ঞা করতাম, ঘৃণা করতাম সেইজন্য তিনি ধূলায় গড়াগড়ি দেন।·····বৈকুণ্ঠের ঠাকুর মাটিতে এলে আর ভেদাভেদ নেই—জগন্নাথ জগতে এলে জগতের কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হবে...জগতের সকল বিকার গায়ে মেখে তিনি সার্থক।··· নিত্যগোপাল জগন্নাথ, বিশ্বনাথ··। জগতের সকল সম্পর্কের মধ্যে নাথকে দেখতে হবে, নাথের ভাবে ভাবিত করতে হবে—এইখানে বিষয়ীর সঙ্গে, সংসারীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ...। জগন্নাথ, তোমার রথযাত্রায় আমরা সঙ্গী হব, তোমার সঙ্গে চলব—walk with you···। পথে দাঁড়িয়েছি—উপরে আকাশ, নীচে মাটি, বিশ্বমানব আমার বন্ধু···। সকলকে কোলে তুলে আপন করতে চেষ্টা করব...। জগন্নাথ বিশ্ব-জীবনে অনুসূত হউন···। কাউকে, কিছুকে ছোট করে যেন না দেখি···। নর-নারায়ণ আশ্রমে থাকা মানে বিশ্বের মাঝে থাকা...। শুধু ছেলেমেয়ে স্বামী সংসার বিষয় নিয়ে থেকো না···। জীবনের সকল নেংরামিকে দূর করে যদি বিশ্বমানবের সঙ্গে রওনা হতে পার—এখানে সেই চেষ্টা কর

১. ৭. ৫৭—গত পরশু শনিবার জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা হয়েছে—৭ দিন পর উল্টোরথ। মহাপ্রভু এই ত্রিমূর্তির মহিমা বিশেষভাবে ঘোষণা করে গেছেন—তিনটী মূর্তি—বলরাম, সুভদ্রা, (শ্রীকৃষ্ণ) জগন্নাথ মানবপানের যোগ-চিহ্নটী হুতন্ত্র—বলরাম সর্বভাব, বাসুদেব বিশ্ব। একদিকে জগৎ, আর একদিকে নাথ। জগতের খবর রেখেছে · জড়বাদী···। আর একদল নাথের উপাসক··· তাদের কাছে জগৎ ছিল না সত্য···এই দুই অর্ধসত্যকে পরস্পরের মধ্যে কে এক করবে? যোগমায়া। এমন একটী জীবন যাপন করতে হবে যার মধ্যে জগতের কথা নাথে, নাথের কথা জগতে যোগমায়ার মধ্য দিয়া পৌঁছতে পারে·····। যেখানে জগন্নাথ সেখানে universal federation, universal brotherhood···। জগৎ থেকে নাথ সরে দাঁড়ালেই উচ্চ নীচ অবস্থা এসে পড়ে—কিন্তু পিতার কাছে বড় ছেলে ছোট ছেলে এক। নিত্যগোপাল লিখেছেন একই ব্রহ্মাপিতার সন্তান বড় ছেলে ছোট ছেলের অন্ন খায় না?...নাথ এলেই ব্রাহ্মণ মুচিতে ভেদ নেই।···বর্ণাশ্রমেই এই ভেদ আছে।··· জগন্নাথ রথযাত্রায় বেরিয়েছেন মানে এই সংসার-পথ তিনি পরিক্রমা করবেন। পথে পথে তিনি তাঁর পশ্চাৎ রেখে যাবেন। তাঁর রথ টানবে কে? মানুষ। তিনি নিজে অচল—তাঁর ভার বইবে মানুষ...। তুমি তাঁর ভার বও, তোমার ভার হাল্কা হয়ে যাবে, তখন তোমার ভার তিনি বইবেন...। অহমিকা কিংবা আসক্তিবশতঃ নিজের ভার নিজে বইতে যেয়ো না···বিশ্বের ভার বইলে তোমার ভার হাল্কা হবে। ···কুয়োর ব্যাঙকে তিনি সাগরে নিয়ে যেতে রওনা হয়েছেন···। যদি মনে হয় কুয়োর ব্যাঙ সাগরে গেলে কুয়োর লোকদের কি ব্যবস্থা হবে?...প্রহ্লাদের পিতাকে তিনি রক্ষা করেছেন।···নিত্যগোপাল জগন্নাথ হয়ে এসেছেন···সকলে ভাই ভাই অধ্যাত্ম ক্ষেত্রেও, সমাধিস্থ পুরুষকেও বিশ্বনাগরিক হতে হবে—এই কথা বলতে

এসেছেন। শব চলায় তখন আনন্দ যখন জগতের তার বই···। তাঁর চরণচ্ছায়ায় একত্র হয়ে আমরা যদি তাঁর বিশ্বনাথিত্ব জীবনে না আনি তাহলে নরনারায়ণ আশ্রমে এলাম কেন?···ছোটকে ছোট না রেখে জগতের মস্তকে দাঁড় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি আমি সমগ্র জীবন When it will to be late তখন বুঝবে তোমার ছোট সংসার নিয়ে থাকলে তা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।...তিনি কর্মের সাগর, ভক্তির সাগর, জ্ঞানের সাগর···· জাগরণে লিখছেন—তোমার পেটে বিশ্ব, আবার তুমি দেবকীর পেটে...কি মায়া!···মধু নাপিত মহাপ্রভুর মাথা মুড়িয়ে কাঁদছে—এ হাত আবার কার পারে দেব? মহাপ্রভু বললেন আর তোমার নাপিতের কাজ করতে হবে না... ১৯১৯-এ যেদিন অশ্বিনীবাবুদের চাকুরী ছেড়েছিলাম, সেদিন থেকে আর কোথাও চাকুরী করব না-ই স্থির করেছিলাম। ...এত ডাকা ডাকলাম, ঠাকুর, মানুষ তো পেলাম না··· আজ বোধ হয় প্রাণ ভেঙে গেল...। তোমার রথ সব স্থানে গিয়ে পৌঁছুক।···জগন্নাথ থেকে জগৎ, জগৎ থেকে জগন্নাথ—রক্তের দুটো স্রোতের মত... জগন্নাথের মন্দির থেকে জগতের প্রান্তে, জগতের প্রান্ত থেকে মন্দিরে ...জীবনে এই দুই চলাচল অব্যাহত রাখতে পারলেই আনন্দ পাওয়ার সম্ভাবনা···। পুরুষোত্তম নিত্যগোপাল, তোমার এই দর্শন তুমি প্রচার কর...' দিনরাত্রি বেদনা নিয়ে চলেছি এ বেদনা আমার শেষ করে দাও কেউ তো এল না—একলা ডেকে ডেকে গলা ভেঙে গেল।...তোমার এই গীতা-বেদান্ত-উপনিষদ আমি কোথায় রেখে যাব?... এক বন্ধু বলছিল এ কাব্য ছাড়া বিশ্ব বাঁচবে না কিন্তু কই? মানুষ তো বেশ আছে!...কতবড় সমস্যার ভিতর মানুষ পড়েছে—কিন্তু কারো ভিতরে বেদনা চেতনা জাগৃতি নেই...! ঠাকুর, মানুষকে তার সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করে তোল···। মহাপ্রভু এক পাগল, সাগর আর এক পাগল! জগন্নাথ নিত্যগোপাল, তোমার রথযাত্রার ঘর্ঘর শব্দে মানুষের জীবনে বেদান্ত স্ফুরিত হোক...।

আনন্দিত জীবনের স্বপ্ন

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

আনন্দিত জীবনের স্বপ্ন আজো দুটি চোখ ভ'রে :
অথচ কোথাও সেই আনন্দের রূপ দেখি নাক
তবু সেই স্বপ্ন ছবি বুকে নিয়ে কাটাই প্রহর—
আসবে, সে আসবেই—মনে মনে বলি বারংবার।

মাঝে মাঝে কী হতাশা, বিষণ্ণতা সারা মন ছায়,
কী দুঃসহ লাগে সেই বেদনার ক্লিষ্ট দিনগুলি!
অসহায় প্রবঞ্চিত মানুষের পানে চেয়ে থেকে
কী যন্ত্রণা জাগে মনে। কে ঘোচাবে এদের যন্ত্রণা?

অনেক আলোর দীপ্তি এর ঘরে ওর ঘরে দেখি,
অনেক উচ্ছ্বাস—তবু প্রাণহীন মনে হয় সব;
এই আড়ম্বর, এই মহামূল্য বাহুল্যের মাঝে
কোথায় সে প্রাণ কই, সহজ প্রাণের উত্তরণ?

চোখ-জলসানো আলো, ঘনঘটা গভীর আঁধার—
এ দু'য়ের মাঝে যেন কোথায় হারিয়ে যাই আমি!
মনের গভীরে গিয়ে রুদ্ধ করে সমস্ত দুয়ার,
এ জীবন শেষ হোক—বারংবার বলি মনে মনে।

দূর ক'রে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব গ'ড়ে তুলি আমার স্বপ্নের
সে-জীবন আনন্দিত, সে-পৃথিবী প্রসন্ন সুন্দর;
সেখানে মানুষ তৃপ্ত, ললাট উজ্জ্বল গরিমায়,
বেদনার বঞ্চনার কোন চিহ্ন নেই সে ললাটে।

সেই আনন্দের ছবি সঙ্গী আজ আমার জীবনে!
জানি না সে সুখস্বপ্ন কোন দিন রূপ নেবে কি না।

দায়ী কে ?

॥ শ্রীকৃষ্ণদাস সাহা ॥

বছর দুই পরে বাড়ী ফিরে একদিন সুশান্তদের বাড়ী গিয়ে ওর মাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছেন, কাকীমা ? সুশান্ত কোথায় ?

কাকীমার মুখে সেই সুপরিচিত স্নেহপূর্ণ হাসি না দেখে প্রথমেই মনে কেমন যেন একটা খটকা লেগেছিল, তার উপর তাঁকে আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে দেখে আমি তো বিস্মিত হয়ে গেলাম, কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে, কাকীমা ? আপনার চোখে জল কেন ?

কাকীমা মাথাটা একটু তুললেন, বললেন—সে তো এখানে নেই বাবা ! সন্তু আমার তো চলে গেছে ! সে কেমন যেন হয়ে গেছে !

কেমন যেন হয়ে গেছে ! আমার মস্তিষ্কে আঘাত হানলো। বাক্‌শূন্য হয়ে রইলাম।

কাকীমা বলে চললেন—কোথায় থাকে, খাওয়া জোটে কি জোটে না কিছুই জানি না। অনেক রাত বোধ করি ঘুমুতেও পারে না। সব মিলিয়ে চেহারা হয়ে গেছে বিবর্ণ, স্বাস্থ্য হয়ে গেছে জীর্ণ।

একটু থামলেন কাকীমা।

কী সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল আমার সন্তুর—বলেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। বাক্‌শূন্য হয়ে বসে থাকা সম্ভব হলো না। উঠে দাঁড়ালাম। সান্ত্বনা দিলাম, বললাম—কাঁদবেন না, কাকীমা। মনটাকে হালকা করার উদ্দেশ্য নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ও আসে না, কাকীমা ?

ওকে আসা বলে না, বাবা। কদাচিৎ আসে, মাসে হয়তো একদিন। একা কিন্তু কখনও আসে না। দু' একজন সব সময়ই সঙ্গে থাকে। আর যখনই আসে—রাত্রে, দিনে আসে না। আবার ভোরের আগেই চলে যায়। যতক্ষণ থাকে পাশের ঘরেই থাকে— মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে।

থামলেন একটু, আবার বলে চললেন—আমার সঙ্গে কথাও বলে না, ওদের খোঁজ খবরও রাখে না। অথচ এই সন্তুই একদিন চোখে ঘুম থাকতো না যদি আমার অসুখ করতো, ওদের চোখে জল দেখলেও ওর চোখে অশ্রু ঝরতো।

বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন কাকীমা। আমি বললাম—কেঁদে কি লাভ কাকীমা ! জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, কাকীমা, ও এমন হলো কি করে ?

তা তো জানি না, বাবা। শুধু জানি, ও কোথায় যেন যেত। প্রথম বলতো—আমি বেরোচ্ছি মা, দেরী হলে ভেবো না। সত্যিই দেরী হতো, অনেক রাত হয়ে যেতো। কয়েক মাস পরে আমাকে বলে যেতো—আমি বের হলাম মা, না ফিরলে ভেবো না। সত্যিই সেদিন ফিরতো না, ফিরতো দু' এক দিন পরে। আর আমি দরজা খুলে পথ চেয়ে বসে থাকতাম আর প্রতি মুহূর্তে ভাবতাম এই বুঝি আমার বাবা এসে গেল।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন কাকীমা—ওর চেয়ে বছর দুয়েকের বড় একটি ছেলে মাঝে মাঝেই আসতো ওর সঙ্গে ; কোন কোন দিন এখানে রাত্রি কাটাতো। ঐ ছেলেটির কাছে একদিন কেঁদে ফেলেছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তুমি বল না, বাবা, আমার সন্তু কোথায় যায় ? কেন যায় ? কোথায় থাকে ? ও যে আমার অন্ধের যষ্টি বাবা।

আমার কান্নার কোন মূল্য দেয় নি ছেলেটি, দেয় নি কোন নির্দেশনা। উপরন্তু রূঢ় কণ্ঠে বলেছিল—সে সব জেনে আপনার কি প্রয়োজন ? আমরাও তো মায়ের ছেলে !

আবার থামলেন কাকীমা। একটু থেমে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আবার বললেন—সেদিনে সে রূঢ় আচরণে আমার সন্তুও রূঢ় হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, তুমি ওর

কথায় মনে কষ্ট করো না মা।

কাকীমা বললেন—বলেছিলাম কষ্ট আমি করিনি বাবা, তবে কি বাবা, তুই যাসনে ও পথে।

তখন কথা দিয়েছিল আমায়, বলেছিল—আর যাবো না মা। কিন্তু তবুও গিয়েছিল। বারবার গিয়েছিল দিনের পর দিন বাইরে বাইরে কাটিয়েছিল। কোনদিন কিছু বলেনি, অনেকদিন খবর পাইনি একদিন বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। বলেছিলাম—তুই আমায় ছেড়ে যাসনে বাবা। আমার কথা শোনেনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে সে চলে গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল আমার মত অনেক ছেলেই গিয়েছে, আমিও যা যাবো না কেন?

কাকীমা এসব বলছিলেন আর কাঁদছিলেন। সেই কান্নার মাঝেই আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে অনুরোধের সুরে বলেছিলেন তুমি তো এসেছ বাবা। তুমি একটু দেখ না, আমার সন্তুকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো না!

আমি কাকীমাকে আশ্বাস দিলাম। বললাম—ঠিক আছে কাকীমা, আমি দেখবো, ওকে আমি ফিরিয়ে আনবো। এই বলে সেদিন ফিরে এসেছিলাম।

ফিরবার পথে কাকীমার বেদনার্ত অবস্থাটা আমার মনটাকে বেদনায় ভারিয়ে দিয়েছিল। তবে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবো এই বিশ্বাস ছিল বলে। কারণ, আমি তো সুশান্তকে জানি: সে যে কেমন ছেলে তা আমার অজানা নয়। এমন বিনয়ী, এমন নম্র, এমন শ্রদ্ধাশীল খুব কম ছেলেই হয়।

সুশান্তদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের ভিত্তি আত্মীয়তা নয়, আত্মীয়তার অনেক উর্ধ্বে যা সেই হৃদ্যতা। ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হৃদয়ের গভীরে। একই গ্রামে আমাদের বাড়ী। সুশান্তর বাবাকে ডাকতাম কাকা বলে। কাকা হঠাৎ একদিন পরলোক গমন করলেন। তারপরই সুশান্তদের অসহায় অবস্থা। অমিজমাটুকুই সম্বল। তাতে পাঁচজনের একটি সংসার চলতে পারে না। পাঁচজনের মধ্যে কাকীমা, সুশান্ত, ওর ঠাকুমা আর তিনটে বোন। তাই সুশান্তর অনেকটা সময় কেটেছে আমাদের বাড়ী। দারিদ্র্যতার মধ্যেও সুশান্ত পড়া চালিয়ে গিয়েছে। তার জন্য কষ্ট করতে হয়েছে—অনেকদিন হয়তো একবার জুটেছে। অবশেষে একদিন অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করে বেরিয়েছে। তখন একদিন আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এবার কি করবি সুশান্ত? আরও পড়বি?

সুশান্ত উত্তর দিয়েছিল—না, পরিদা, আমি আর পড়ব না, আমি আর পড়তে পারব না আমি চাকুরী করব, মা-ঠাকুমা-বোনেদের অর্দ্ধাহার থেকে বাঁচাব। বোনেদের বিয়ে দেবো।

নাম আমার পরিতোষ। সুশান্ত ডাকত আমায় পরিদা বলে। বয়সে আমি ওর চেয়ে বছর চারেকের বড়। ও আমাকে ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো, আমার কাছে সব কথা বলত। আমার প্রশ্নের উত্তরে এ কথাগুলো বলতে বলতে ওর মুখমণ্ডল সেদিন উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল। আমি সেদিন আশীর্বাদ করেছিলাম, বলেছিলাম—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন ভগবান তিনি তোমার একটা প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন, তুমি পরীক্ষায় পাশ করেছ।

মৃদুস্বরে সেদিন প্রতিবাদ করেছিল সুশান্ত। বলেছিল পরিদা, আমি ভগবানে বিশ্বাসী, মনে-প্রাণে তাঁর অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি, তাঁকে প্রণাম করি—কিন্তু কোন কিছুর জন্যে প্রার্থনা করি না কোনদিন। কেনই বা করব—তিনি তো সবই দিয়েছেন আমায়। দিয়েছেন হাত-পা, বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি সামর্থ্য। এখন এগুলো কাজে লাগানোই আমার কাজ, সে দায়িত্ব আমার নিজের।

আমি সেদিন আর একটি প্রশ্ন করেছিলাম—তুমি ভাগ্যকে মান সুশান্ত?

না, ভাগ্য আমি মানি না। ভাগ্য আবার কি? ভাগ্য তো মানুষেরই তৈরী। উত্তর পেয়েছিলাম। মানসিকতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম।

ওর আনন্দ দেখে আমিও আনন্দিত হয়েছিলাম পরের একদিন। এসে আমায় খবর দিয়েছিল—সিভিল এভিয়েশান-এ আমার চাকুরী হবে পরিদা—আমি ইন্টারভিউ পেয়েছি। কালই আমার ইন্টারভিউ।

আমি বলেছিলাম—ভাল কথা, ভাই। তোমার

চাকুরীর একটা বিশেষ প্রয়োজন। তারপর কথায় কথায় জেনে নিয়েছিলাম কি পেশা, জেলা কত—প্রভৃতি।

দেখা করেছিলাম পরদিন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তোমার চাকুরীর কি হলো, সুশান্ত? দেখলাম—যে আনন্দ নিয়ে ও ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল ঠিক ততটা নিরানন্দ নিয়েই সে ফিরে এসেছিল। বলেছিল—এখানে চাকুরী হবে না, পরিদা। দশ জন নেবে কিন্তু হাজার জনকে ইন্টারভিউতে কল করেছে। আবেদন পড়েছিল দশ হাজারের উপরে।

তারপর সুশান্ত অনেকদিন আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে। অনেক কথা বলেছে, অনেক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছে।

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তোর চাকুরীর কিছু হলো, সুশান্ত?

উত্তর দিয়েছিল সুশান্ত—না পরিদা। কালও গিয়েছিলাম একটি স্কুলে যে-কোন মাইনেতে একটি শিক্ষকতার জন্যে। কিন্তু পেলাম না। আমাকে বলে দিয়েছে এম. এ. পাশ করে যেতে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তুই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজেষ্ট্রী করেছিস্? কোন কল পেয়েছিস?

উত্তরে বলেছিল—করেছি সে অনেকদিন। কিন্তু আজও কোন কল পাইনি। যতদিন না করেছিলাম ততদিন ভেবেছিলাম—কি জানি না করেছি। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করছি—করাও যা, না করাও তাই।

অন্য একদিনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল সে—গিয়েছিল এক ভদ্রলোকের কাছে, অনেক কষ্টে তাঁর টিকানা সংগ্রহ করে। কিন্তু সেখান থেকে বিফল হয়ে ফিরে এসেছিল সুশান্ত। ভদ্রলোক আফশোষ করে বলেছিলেন—আর কয়েকটা দিন আগে এলেও তোমার একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম, কিন্তু আজ আর সম্ভব নয়।

এই অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে সুশান্ত বলেছিল—এমন আফশোষ অনেকেই করেছেন, সময় মত যাইনি বলে দুঃখ করেছেন, কিন্তু কোন্‌টা যে প্রকৃত সময় তা কিন্তু কেউ বলে দেননি।

অপর একটি দিনের অভিজ্ঞতার কথা। একটি বড় কার্মে একটি পদের জন্যে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল সুশান্ত। সেখানে গেয়ে দেখেছিল অসংখ্য প্রার্থী। তাদের মধ্যে ওর চেয়েও অধিকতর শিক্ষিত। ওখানে গিয়ে শুনেছিল ভেতরে ভেতরে লোক নিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ—ইন্টারভিউ শুধু লোক-দেখানো।

অনাহারে থেকেও চাকুরীর জন্যে সে একটি লোককে এক শ' টাকা দিয়েছিল। মাসের পর মাস গেল। তবুও চাকুরী কিন্তু হলো না। লোকটিকে আর দেখা গেল না।

একদিন অসময়ে হঠাৎ আমাদের বাড়ী সুশান্ত চলে এলো। চোখে মুখে ওর হতাশার চিহ্ন সুস্পষ্ট। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে, ভাই? অসময়ে যে এলে?

চাকুরী আমার হবে না, পরিদা। দোপজোড়া এই বেকারত্বের মধ্যে আমার চাকুরী আর হতে পারে না। এক পশ্চিমবঙ্গেই বেকারের সংখ্যা কত জানেন? নিজেই উত্তর দিয়েছিল—প্রায় চল্লিশ লক্ষ।

সুশান্ত থামলো একটু। পরক্ষণেই প্রশ্ন করলো—আচ্ছা পরিদা, দেশে কোন সরকার নেই? এত বেকারের জন্যে ওঁদের একটু ভাবনা হয় না? দেশের যুব শক্তি যে এ ভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে এ কথাটা কি ওরা ভাবেন না? এর জন্যে কোন বিদ্রোহ নেই কেন?

আমি উত্তরে বলেছিলাম—দেশে যে সরকার আছে তা তো তুমিই জান? তাঁরা কি আর না ভাবছেন এ সমস্যার কথা! আর বিদ্রোহের কথা বলছ? দেশে তো আন্দোলন কম হয় নি। তাতে নীট লাভ হয়েছে আর কতটুকু! এ কথাগুলো বল্লাম বটে, তবে এই প্রথম ওর মধ্যে একটা বিদ্রোহী মনোভাব লক্ষ্য করলাম। আর তাই দেখে ওকে বল্লাম—হতাশ হলে চলবে কেন, ভাই? চেষ্টা তোমাকে করে যেতেই হবে। তার ফল ফলবে নিশ্চয়ই। তাতে একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম—দেখলে না, অমরেশের কেমন চাকুরী হয়ে গেল ব্যাংকে।

অমরেশ লাহিড়ীর কথা বলছ পরিদা? ওর চাকুরী তো চেষ্টায় হয় নি, হয়েছে খুঁটির জোরে। ওর দাদা ঐ ব্যাংকেই চাকুরী করে, তাই ওরা ওখানে চাকুরী হয়েছে।

অথচ ও তিন বছরের চেষ্টায় কোন ক্রমে এবারে প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা পাশ করেছে। অন্যদিকে কত বি, এ, , এম, এ, রাস্তায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে —তাদের চাকুরী জুটছে না। একটু থেমে প্রশ্ন করলো সুশান্ত—এ কেমন দেশ, পরিদা।

বললাম—দেশের কি দোষ, ভাই। দেশ কি আর না চায় তার সন্তানেরা সুখে থাক চাকুরী পাক! চেষ্টা করে যাও, ভাই।

তার পর সুশান্তর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটেছে—আমি চলে গিয়েছি উত্তরপ্রদেশে। আর ও পড়ে রয়েছে এখানে।

এবার দেশে ফিরে কাকীমার মুখে সুশান্তর পরিবর্তন কাহিনী শুনে সেই সুশান্তকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার সংকল্প গ্রহণ করেছি অতীতের উপর ভিত্তি করে, সফলতার আশাও মনে পোষণ করেছি।

কাকীমার দেওয়া খবর পেয়ে সেই আশা নিয়ে উৎসাহ সহকারে একদিন গভীর রাতে সুশান্তদের বাড়ী পৌঁছালাম। সুশান্ত সে-দিন একাই এসেছিল। ভরসা আমার তাই বেশী হলো। এগিয়ে গেলাম। ডাকলাম।

ঘরের অভ্যন্তর থেকে প্রশ্ন এলো—কে?

উত্তর দিলাম—আমি তোমার পরিদা।

বিরক্তিকর কণ্ঠে আবার প্রশ্ন এলো—কি চাই?

এ প্রশ্ন শুনে আমি তো অবাক! এতদিন বাদে কথা, কোথায় আমাকে দরজা খুলে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবে, আমার কুশলতা জানতে চাইবে। তা না করে এমন প্রশ্ন।

প্রথমেই একটু নিরাশা হলাম। তবুও বললাম—আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

না, আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা হতে পারে না। শুনে তো আমি আরও অবাক। তবুও আমি নাছোড়-বান্দা! অনেক কথা, অনেক অনুরোধ আর অনেক উপরোধের পর শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে দিল সুশান্ত।

সত্যিই কি এ সুশান্ত! এ কি চেহারা ওর! কী ভয়ংকর চোখের দৃষ্টি!

বলল—আপনার বুর্জোয়া আদেশ চালানো আমি বরদাস্ত করব না।

আমি বললাম—আদেশ চালাতে আমি আসিনি, অনুরোধ জানাতে এসেছি।

কি আপনার অনুরোধ?

তোমার মা-ঠাকুমা-বোনেদের অবস্থাটার কথা একটু ভেবে দেখো—এই অনুরোধ।

ও সব বুর্জোয়া মানসিকতার কথা। এ রকম কোটী কোটী মা-ভাই-বোন রয়েছে এদেশে যাদের কথা কেউ ভাবে না।

কথা শুনে ভাবলাম—এ কি হয়েছে সুশান্ত! পরিবর্তন ঘটেছে ওর জীবনে!

একটু থেমে আবার বলল সুশান্ত—মানবতার স্থান নেই আমাদের দর্শনে, ব্যক্তিগত সুখ সুবিধের কথাও ভাবি না আমরা।

আমি বললাম—কিন্তু আমি তো জানি মার্কস একজন মানবতাবাদী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম—তোমাদের লক্ষ্য কি?

উত্তর দিলাম—বুর্জোয়া আর প্রতিক্রিয়াশীলদের খতম করে মাওবাদের প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম—উদ্দেশ্য কি তোমাদের?

উত্তর দিলাম—মাওবাদের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে বাঁচার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

সফল হতে পারবে কি তোমরা?

এমন সন্দেহ বুর্জোয়ারাই পোষণ করে থাকে, আমরা করি না।

আমি বললাম—সংবাদপত্রে তোমাদের সম্পর্কে যে সংবাদ বের হয় তা লক্ষ্য কর তোমরা?

বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো কি লিখল আর কি লিখল না তার জন্য আমরা ভাবি না। ওগুলো আমাদের সম্পর্কে হয় ভুল তথ্য প্রকাশ করে, নয় তো কিছুই প্রকাশ করে না।

বলেই আমাকে আদেশ করল—এক্ষুনি বেরিয়ে যান আপনি। আর সময় দেওয়া সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।

কিন্তু আসল কথা সম্পর্কে তো কোন সুরাহা হলো না। তোমার মায়ের চোখের জল যে আমি সহ্য করতে পারি না।

জ্বলে উঠলো সুধান্ত। উত্তেজিত কণ্ঠে আদেশ করল—আপনি বেরিয়ে যান, আর কোন কথা শুনতে চাই না আমি। আমার কথা যদি না শোনেন তবে খতমের তালিকায় আপনার নামও পড়তে পারে।

বলেই কিছু কাগজপত্র দেখিয়ে আমাকে বললে—এই দেখুন খতমের প্ল্যান। আজকেও কয়েকজনকে খতম করার পরিকল্পনা রয়েছে এতে।

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আর কিছু বলা উচিত মনে করলাম না। এক পা দু' পা করে বেরিয়ে এলাম। অন্যমনস্ক হলাম। সেই অন্যমনস্কতা মনে মনে পুলিশে খবর দিতে পরামর্শ দিল। এতদিনের স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্কে তা সম্ভব হলো না। বাকীদার যারা বেঁচেছিল তাদের বাঁচাতে বেদনাও এ কাজ করতে দিলে না।

এরও বছর খানেক পরে। তখন আমি কর্মস্থলে। একটি বন্ধুর সঙ্গে রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি। হাতের কাছের সংবাদপত্রটা তুলে নিয়েছি। একটার পর একটা সংবাদ পড়ছি। পড়তে পড়তে একটা শিরোনামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। শিরোনাম—পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকজন নকশাল নেতা নিহত। পড়ে গেলাম সংবাদটি। দেখলাম, নিহত হয়েছে যারা তাদের মধ্যে সুধান্ত রায়ও একজন।

আমার দেহটা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলো। ব্যথায় ভরে গেল হৃদয়। চোখে দু' এক বিন্দু অশ্রু ঝরল। ওর মায়ের কথা ভেবে মনটা আবার আরও বেদনার্ত হয়ে গেল। ভাবলাম—পুত্রশোকে ওর মায়ের অশ্রু বুঝি আর থামবে না, ওর মা-ঠাকুমা-বোনেরা বুঝি আর বাঁচবে না।

সুধান্ত বলেছিল—সংবাদপত্রগুলো ওদের সংবাদ হয় প্রকাশ করে না, নয়তো বিকৃতভাবে প্রকাশ করে। এখন ভাবলাম—তা হলেই বুঝি ভাল হতো। মা পুত্রের মৃত্যু সংবাদ জানতে পেতেন না, মায়ের জীবনে কঠিন পরিণতি ঘটতো না।

সুধান্তর মৃত্যু সংবাদে আমি যে ভীষণভাবে মর্মাহত তা বন্ধুটি বুঝতে পেরে আমাকে ধমকের সুরে বলে উঠল—এদের জন্যে অনুশোচনা ক'রো না। কারণ, বিপথগামীদের এটাই স্বাভাবিক মৃত্যু। চাকুরী পাচ্ছিল না বেশ তো সে অন্য পথে যেতে পারতো। যে কোন কাজে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত? খতম করার পথ কি মানুষের পথ? ওটা তো বনের পশুদের পথ। তবে ভুল নেতৃত্বই এই সব ছেলেদের শেষ করে দিল—শুধু তো সে বিপথেই এগেছিল। তার জন্যে অনুশোচনা কেন?

বিরতিহীন গতিতে বলে গেল বন্ধুটি। কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তেমন মানসিকতা ছিল না। টেবিলে গরম চা দিয়ে গেল। উপরে সুতলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে থাকলো। সে গুলোর প্রতিটিই আমার কাছে দেখা দিল এক একটি প্রশ্নবোধক চিহ্নরূপে। পথ যে ভুল তা তো বুঝি—কিন্তু ওদের সত্য পথ দেখাবে কে? কেন ওরা গেল এ পথে? এমন পরিণতির জন্যে দায়ী কে?

শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৪৩)

নিত্যগোপাল, প্রাণ, বিশ্বপ্রাণ, প্রাণবল্লভ আমার, তোমারই কোলে বিশ্ব জনম নিতেছে, ভাসিতেছে, ডুবিতেছে। 'কো জাগর্ত্তি'—কে জাগে এই বিশ্বে? তুমিই জাগো শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে। তুমি সর্বত্র, সর্বাত্ম। তোমার মত নিলিপ্ত, সন্ন্যাসী কে আছে? সকলকে ব্যাপিয়া আছ, অথচ কিছুতেই নাই। প্রাণ হইতেই সব কিছু নিঃসৃত, প্রাণে সব কিছু 'এষতি' প্রাণ অদ্বৈত, প্রাণ দ্বৈত। প্রাণ একাকী, প্রাণ সর্বব্যাপী, প্রাণসাধনা একাকিত্বের সাধনা, প্রাণসাধনা সর্বব্যাপিত্বের সাধনা। প্রাণ সংসারী, প্রাণ সন্ন্যাসী ....মঠের অবস্থা ভাবিয়া আর কিছু করিবার জন্য প্রাণ আগায় না। সকলে মিলিয়া মঠটিকে শেষ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। —— প্রধান। উজ্জলভারতের জন্য প্রাণপণ না করিলে দাঁড়াইবার স্থান নাই। কুমারও তো আসিতেছে না। অতুলের বাপ মার বাড়ীঘরের ইতিহাস শুনিলাম।

৩রা জানুয়ারী

ঠাকুর, তোমারেই বরিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। উত্তাল তরঙ্গায়িত ঘটনাস্রোতের মাঝে তোমাকে যখন সামনে দেখি, তখনই পথ পাই সামনে না থাকিলেই দিগ্‌বিদিগ্‌শূন্য হইয়া পড়ি, পথ হারাই। সূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তখন চন্দ্র পথ দেখায়, চন্দ্র যখন ডোবে তখন তারকা, তারকা যখন লুক্কায়িত হয় তখন অগ্নি, অগ্নি যখন নির্বাপিত, তখন গুরুর বাণী, গুরুর কৃপা। তোমার আদর-মাখা আহ্বান, তোমার করুণাস্নাত চাহনী পথের সন্ধান দেয়। কত দিন হয় ফেলিয়া গিয়াছ এই জটিল কুটিল সংসারে। আজ কাঁদিলেও চোখের জল মুছাইবার কেহ নাই। তোমার প্রতিষ্ঠা কে চায় জীবনে? নিজের সুবিধা ছাড়া কে তোমাকে নিয়া বসিয়া আছে? তাও দিতে হবে পাড়ি, পারি আর না পারি বহিয়া চলিতে হবে তরী। না জানি কোন্ ঘাটে হব পার··· সকল শ্রান্তি ক্লান্তি দলিয়া চলিবার শক্তি দেও, বুদ্ধি দেও, সুযোগ দেও। বেণু সকালে তুষারকান্তি ঘোষের বাসায় জন্য নিমন্ত্রণ ঘোষের ওখানে পরে অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্যের ওখানে যায় পর হঠাৎ কুমার আসিয়া উপস্থিত। নীলু আসে সাড়ে চারটায়। সে উজ্জলভারতের আমার প্রবন্ধ ও সনেটটি পড়িয়া শুনায়। কুমার আসায় সকলেই খুব প্রফুল্ল। ১১টার পর মঠে সে এক টাকার কলা ঠাকুরের ভোগের জন্য দিয়া আসে। পরে এখানে মজলিসের উপবাস হইলেও প্রসাদ পায়। বিশ্রামের জন্য বিরিঞ্চিপুর যায়....বেণু বাহির হইয়া রাইটার্স বিল্ডিং...২টায় আসে।...নীলু ৪টায় যায়। নীহু নলরাজা ৬টি করিয়া সেলাই নিয়া আসে। অল্ সেকশন ট্রাম টিকেটের জন্য কুমারের নামে দরখাস্ত দেওয়া হয়....।

৪ঠা জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমিই আমার মূল-সমূল, আমি live and move and have my being in you। সচ্চিদানন্দ-ঘন জীবন মন্থন করিয়া আদি-জীবাত্মা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আবার অসংখ্য জীবাত্মা মন্থন করিয়া অসংখ্য পরমাত্মা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোমার বৃক্ষ ও বীজের উদাহরণ কি অভিনব! দুই-ই দুইয়ের স্রষ্টা, সেই কেহই তো শ্রীক্ষেত্র, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে দুই দুই থাকিয়াই এক, এক এক থাকিয়াই দুই। দুই 'এক' মিলিয়াই দেখানে তুমি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। আমার

প্রাণসর্বস্ব নিত্যগোপাল! নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত তুমি আমার জীবনে সহজ হও। আমার প্রাণবল্লভ তুমি। রেণু ও কুমার ১টার পর বাহির হইয়া যাবে যায়···। সন্ধ্যার পর রেণু-কুমার হিসাবটা ঠিক করে। হিসাবপত্র রাখা যেন জটিল একটা ব্যাপার না হয়। দপ্তরতন্ত্র অগ্রগতির পক্ষে বিপদ। কাজের অনেক সময় ও টাকাও ব্যয় হয় হিসাব রাখিতে। অবিশ্বাস যেখানে, সেখানেই অত ভাউচারের হড়াহড়ি। অথচ তাহাতে কি চোর আটকানো যায়? তারিণীবাবু ৯ টার পর আসে। ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউট হল ভাড়ার জন্য গিয়াছিল। হল বাবদ ৩৫৲, মাইক ৩৫৲, breakage বাবদ কি দেয় তাহা Hony. Secretary-র বিচার্য। ধীরেনবাবু (নবদ্বীপ) এখানে চিঠি না পাইয়া উদ্বেগের সঙ্গে চিঠি দেন। উত্তর দেওয়া হয়।

৫ই জানুয়ারী

ঠাকুর, ব্রজধামে যে 'চলা'র দর্শন প্রচারিত হইয়াছিল, যাহার বীজ স্থাপিত হইয়াছিল সেই বোন্ বৈদিক যুগে ইতরার পুত্র মহীদাস দ্বারা 'চরৈবেতি চরৈবেতি' মন্ত্রযোগে, সেই চর-দর্শনই সৌরক্রমে তুমি আবাহিলে ধরার ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া, তাহাই আবার বর্ত্তমান যুগে প্রচারিলে বিশ্বকে সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, জড়-অজড় সমন্বয় বিধান করিয়া। আজ জড়ের বুকে জড়াজড় সমন্বয়, চঞ্চলের বুকে অচলের সমন্বয়, বিকারের বুকে নির্বিকারের সমন্বয়, রাসনৃত্যের মধ্যে স্থিতির সমন্বয়, তাল-মান-ছন্দের সমন্বয়। সব অনিত্য আজ নিত্যনাচন নাচে, সব চলা আর পৌঁছানো আজ সমন্বিত। ধরার 'কান্না' ঘুচাইতে তুমি আসিয়াছ, ধরার আদর ও সৌরব বাড়াইতে তুমি আসিয়াছ।... চলার দর্শন সফল হউক। কুমার ৮টার পর আসে। সলরামপুরে কিতীশবাবুর কাছে রেণু চিঠি দেয় আমার সেখানে যাইবার সম্মতি জানাইয়া ও ২৫৲ টাকা পাথেয়স্বরূপ পাঠাইবার জন্য। সঙ্গে ঊর্বাণিদী ও কুমার যাইবে। সকালে রেণু প্রিয়রঞ্জনবাবুর কাছে যায় মাঘ মাসের প্রবন্ধের জন্য।···৪টার পর রেণু ও তারিণী বাবু আনন্দবাজারে যায়। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদক সুধাংশু কুমার ঘোষকে আগামী ১৬ই জানুয়ারী মহানির্বাণ মঠে অনুষ্ঠীয়মান সভার সভাপতি ঠিক করিয়া আসে। আমি ৪টার পর মঠে যাই। নগেনদাদা হাসপাতাল হইতে আসার পর আবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন···। তেমন করিয়া সেবা করিবার জন্য ওখানে কেউ নাই। অথচ ঠাকুর কি প্রাণ দিয়া আমাদের সেবা করিয়াছেন। ঠাকুর, কোথায় তুমি? ৬টার পূর্বেই চলিয়া আসি। ঠাণ্ডা লাগিয়া আবার দাঁতের বেদনা আরম্ভ হয়।···সকালে 'চলার দর্শন' প্রবন্ধের কিছু লিখি। কুমার সংহতিতে ঠাকুর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ রেণু লিখিয়াছে, তাহার হিন্দী অনুবাদ করিতে চেষ্টা করে।

৬ই জানুয়ারী

নিত্যগোপাল, ধার যেন মোর সকল ভালবাসা তোমার পানে, তোমার পানে—আমার পিতামাতা, স্ত্রীপুত্রকন্যা, বান্ধবস্বজন ধনজনের প্রতি ভালবাসা তোমাকে অর্পিত হ'ক। আমার জীবনের গভীর আশা—তোমার প্রতিষ্ঠা, তোমার তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা এই সংসারের বুকে গড়িয়া তোলা—তোমার কাজে যেন যায়। আমার চিত্ত যখন যেখানে থাকে, তোমার ডাকে যেন সাড়া দেয়, পথের বাধা সব তোমার টানে টুটিয়া যাক্। বাহিরের এ ভিক্ষাঝুলা থাক্—জন্ম জন্ম ভরিয়া তেন-বুদ্ধি যাহার যাহা কিছু অপমানের দানদ্বারা ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়াছি, সব আজ নিঃশেষ হউক। আমি রিক্ত হইব। তোমার সম্মানের দানে আমার অন্তর পূর্ণ হউক। নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ডোরে। হে প্রিয়, হে অন্তরতর, আমার জীবন-বীণা তোমার গানে বাজিয়া উঠুক। তুমি যে গান গাইতে এসেছ, আমার জীবন যেন সেই গান ছাড়া আর কিছু গায় না। অমিতাভ আসে ১২টায় কিছু পূর্বে···। কুমার ২বার মঠে যায় তারিণীবাবু ওখানে এখানে আসিবার কথা বলিতে।...বি, কে, পাল সন্ধ্যা ৮টার পূর্বে আসেন। ন্যায়বৈশেষিক উদাহরণের মধ্যে Formal Material, Deductive-Inductive Process harmonised হইয়াছে বলিয়া ডাঃ ব্রজেন শীলের লেখা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। নির্গুণ নিষ্ক্রিয়ের মধ্যে অব্যক্তভাবে

শুধকর্ম থাকে—ঠাকুরের এই উক্তির আলোচনা হয়। পরমীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়। শক্তি-শক্তিমান পরমীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্বন্ধ। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'ঐক্য এক্যের মধ্যে নাই। অনেকের সঙ্গে এক্যের সম্বন্ধের মধ্যেই ঐক্য' —আলোচনা হয়। প্রায় ৯টায় যান। তারিণীবাবু আসেন —১৬ই জানুয়ারীর মহানির্বাণ মঠের সভার পোষ্টার ও চিঠি মুদ্রাবিদা করা হয়। তিনি পোষ্টার ছাপাইতে দিবেন, রেণু চিঠি ছাপাইবে। খগেনবাবু ১০।১২ দিন যাবৎ মঠে আসেনও না, টাকাও জমা হয় না, চাবিও পাঠান না। কাগজপত্র সবই আটকা পড়িয়া আছে। বড় reactionary। কোনও কিছু construction work করিবার মত বুদ্ধি নাই। বি, কে পাল ১ টাকা দিয়া যান।

৭ই জানুয়ারী

রাধারাণী আমার, তোমার আত্মনিবেদনময়ী সাধন-প্রণালীতে আকাশ চুম্বিল ধরার ধূলিকে, ধরা নিজ বক্ষে ধারণ করিল আকাশকে। তোমার জীবন বিপ্রবেধন—তাই পরস্পরবিরুদ্ধ সব ধর্ম তোমাতে সমন্বিত হইতে পারিয়াছে। আমি তো আমাকে তুমি বলিয়াই দেখিয়াছি সিংহা শ্রীনিত্যগোপাল দেখাইয়াছেন। ওগো আমার আমি, তুমি আমার হৃদয়সম্পুটমণি, গোপনে সারা জীবন বহন করিয়া চলিয়াছি। ব্রহ্মময়ী, সুষমাময়ী আমার, তোমার সুষমায় 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' মন্ত্র আমার জীবনে বাস্তব হউক, সার্থক হউক। আমি সব কিছুর অন্তরে বাহিরে অনন্ত ব্রহ্ম সম্ভাবনা দেখিয়া আস্বাদন করিয়া ধন্য হইব। তোমাকে আমার 'আমি' বলিয়া যে দেখিয়াছি তাহা সার্থক হউক। তুমি আমার সর্ব, তুমিই আমার নিত্য-গোপাল। কুমার বিদিরপুর হইতে সোজা বি, কে, পাল এস্টিমেটে সন্তোষ রায়ের ওখানে যায়, ২১ টাকার চেক্ নিয়া ফেরে। খাওয়ার পর রেণু ও কুমার প্রেসে যায়। ১৬ই জানুয়ারীর সভার চিঠি ছাপাইতে দিয়া আসে। রেণু আবার ২৷৷টায় যাইয়া ৫০০ নিয়া আসে···। আমার আর মঠে যাওয়া হইল না। 'চলার দর্শন' একরূপ শেষ করি। শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যার স্তর পর্যন্ত এবং শ্রীনিত্য-গোপালের অবিদ্যার স্তর পর্যন্ত নামার প্রসঙ্গ এইবার উঠিয়াছে। জয়া ২ জন গ্রাহকের ৮ টাকা নিয়া আসে···। ঠাকুরের দর্শন বেশ কঠিন, কেননা প্রচলিত চিন্তাধারার সঙ্গে ইহার পার্থক্য গুরুতর। তবে যে মানুষ নিবে তাহা জানিনা। সকল বিশ্বের সঙ্গে এক হইয়া, বিশ্বাসীর ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্য মিলাইয়া চক্রনতার পিচ্ছিল পথে অচল জগন্নাথকে বুকে লইয়া অনন্তকাল ধরিয়া 'যুগ যুগ ধরি জেনো মহাকাল চলার নেশায় হয়েছে মাতাল'—এই মাতলামি বুকে লইয়া চলিতে কে চাহিবে এই স্থিতির উপাসকদের দেশে? 'অচলের চলা' কি মধুর। 'জগন্নাথের রথযাত্রা' বিশ্বজীবনে কবে সার্থক হইবে? নিত্যগোপাল আমার!

৮ই জানুয়ারী

ঠাকুর, সকল বিশ্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে, বিশ্ব হইয়া, বিশ্বাত্মা বলিয়া নিয়া তোমার ভজনা করিয়া চলিব। সর্ব ধর্ম, সর্বার্থ, সর্ব কাম, সর্ব মোক্ষকে আস্বাদন করিতে 'চরৈবেতি চরৈবেতি'—এই তোমার আহ্বান শুনিয়া চলিব, চলার নেশায় মাতাল হইয়া চলিব, অচলের অমৃত বরিষে চক্রনতার নাচে নাচিয়া চলিব। আমার তো চলা ছাড়া গতি নাই। তুমি আমার অগ্রগামী, বিশ্বনাগরিক, cosmopolitan, তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিব। যেখানে যেখানে তোমার পদ ধরাকে চিহ্নিত করিবে, সেখানে সেখানে একটী করিয়া চুম্বন রাখিয়া দিয়া চলিব।···৩টায় রেণু কুমার বাহির হয়। রেণু যায় ট্রপিকালে জয়ন্তী দেবীর সঙ্গে দেখা করিতে, কুমার যায় পি. সি. ঘোষের ওখানে। টালিগঞ্জের ইন্দুলেখা আসে...। বলিয়া দিলাম···'আমার সঙ্গে যুক্ত থাকিও, তোমার ভয় নাই। আমাকে ছাড়িতে পারিতেছ না। ঠাকুর তোমাকে কোলে রাখিবেন। আমার অনেক সেবা করিয়াছ। ঠাকুর তাহা গ্রহণ করিবেন। আমার সম্পদ ঠাকুরের আশীর্বাদ তাহা তোমার হউক'। আমি মঠে চলিয়া যাই। তারিণীবাবু নীলরতন বাবুর সঙ্গে কথা হয় আগামী রবিবারের সভা সম্বন্ধে। সকালে প্রণবানন্দের শিষ্যা গুপ্তিপাড়ার বীণা ও শিষ্য বিভূতি আসে গুপ্তিপাড়া মঠে আগামী ১৭ই মাঘ বক্তৃতা দিবার জন্য। ছাড়িবে না কিছুতেই। আমাকে আর অপমান কে কতদূর করিবে? যাইব—একরূপ

বলিয়া দিয়াছি। মঠের ওদের সঙ্গে কথা বলিব—ইহা বলিয়া দেই। কুমার আমাকে আনিতে মঠে যায়, তাহার পূর্বেই আসি। তারিণীবাবু আবার ৯টায় আসে। মাধবানন্দের ২টী ছেলে পোষ্টার লাগাইতে পারে বলিল। সকলের সঙ্গে ঠাকুরের মত নিয়া আলোচনা করিতে বলে। ইহাতে সঙ্ঘর্ষ আরও বাড়িবে। যাহারা জানিবার জন্য প্রস্তুত নয়, তাহাদের নিয়া আলোচনা চলে না। উহাদের অভিসন্ধি আছে। তারিণীবাবু বলে ঠাকুরের বই-ই বিচারক। তাহা যদি হইত, তবে একই উপনিষদ-এর বিভিন্ন ভাষ্য হইত না, একই আইনের পুঁথি লইয়া দুই পক্ষের উকিল ভিন্ন ব্যাখ্যা করিত না। আজ এখানে আলোচনা হয়—বিশ্বের সব কিছু—মাটি জল আগুন—ব্রহ্মের জ্ঞান দিতে সক্ষম—কবির নিজ ইহাদের কাছ হইতে ব্রহ্মের এক একটী কলার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শরৎগতের পক্ষে সংই ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্‌ঘাটন করে।

৯ই জানুয়ারী

আমার জীবনের ধ্রুবতারা, অনন্তায়িত দেবতা, তুমি নিত্যগোপাল, তোমাকে লইয়া কি তাড়াতাড়ির মধ্যেই না পড়িয়াছি? আমি তোমাকে যে চোখে দেখিয়াছি, তুমি কি তাহা নও? সকল দৃষ্টিকোণ হইতে তুমি যাহা, তাহাই তো আমি মানুষের কাছে বলি। উহারাই তো তোমাকে ঐকদেশিক করিয়া রাখিতে চায়। একদিন নিত্যগৌরবানন্দ বলিয়াছিল, তোমার চিন্তাপ্রণালী আমাদের চেয়ে ব্যাপক, তাই তোমার সঙ্গে আমাদের মেলে না। নিত্যগোপাল, তোমার মত ব্যাপক ও গভীর জীবন লইয়াই আমি বিপদে পড়িয়াছি। তোমার জীবন তো গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস কিছুতেই আটকাইয়া যায় নাই। তুমিই লিখিয়াছ—'মহাসিদ্ধ-বন্ধায় গার্হস্থ্য .সন্ন্যাস এক বলিয়া মনে হয়, সন্ন্যাসীর পক্ষে সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্য স্নেহ-বোধও বন্ধন'। জীবনের পক্ষে দুই-ই তো উপাধি। জীবন গার্হস্থ্যসন্ন্যাস-উপাধি-রহিত। তাই না মহানির্বাণ তন্ত্রে 'অবধূতাশ্রম'কে সন্ন্যাস বলা হইয়াছে। তুমি অবধূত, সর্বসংস্কারবর্জিত, সহজ।...কুমার প্রেসে আমার প্রবন্ধের বাকি অংশ দিয়া থাকে।...বিজ্ঞাপনের অনেক পার্টির কাছে—ফকিরবাবু, ওরিয়েন্ট প্রভৃতি—যায়। পি, সি, ঘোষের কাছ হইতে পত্রিকার ও নিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনের টাকা আনে।...ফেরে ১০টায় —১০:টায় খিদিরপুর যায়। মঠে যাই ৪॥ টায়। সন্ধ্যায় গুটিয়ানিবাসী সুরেন সেনের সঙ্গে ঠাকুরের জীবন ও দর্শনে সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মূলতঃ inductively ও deductively শ্রীনিত্যগোপাল বিচরণ করিতে পারিতেন। অবিদ্যা-মায়ার স্তরই তাঁহার নিম্নস্থ স্তর। তাই তিনি কামুক ক্রোধী লোভী মোহা-ন্ধকে লইয়া এমন সহজ ব্যবহার করিতে পারিতেন। যেন পরমহংসদেবের পায়ে হাত দিলে সিংহাসের কাঁটার মত পায়ে বিদ্ধ হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের আশেপাশে সব বিদ্বান, আর শ্রীনিত্যগোপালের চারিদিকে সব অবিদ্বান। শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্চনে ভীত, শ্রীনিত্যগোপাল সেখানে 'অভয়'। শ্রীরামকৃষ্ণ মন-বন-কোণের উপাসনার কথা বলেন অথচ আছেন কলিকাতার বড় লোক লইয়া। আর শ্রীনিত্যগোপাল 'I am a cosmopolitan' হইয়াও থাকেন দুনিয়ার আড়ালে মনে বনে ও কোণে আর প্রকাশিত হইতে চাহিতেছেন।

১০ই জানুয়ারী

সখা আমার, পাখী যেমন দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশ পথে উড়িয়া যায়, আমিও তেমনি আমার স্বরূপ-বিশ্বরূপ পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশ পথে উড়িয়া যাব, আমিও তেমনি আমার স্বরূপ বিশ্বরূপ পক্ষ, এক ও বহু পক্ষ, প্রকৃতি ও পুরুষ পক্ষ বিস্তার করিয়া প্রেমের আকাশ পথে ভ্রমন করিয়া চলিব। তোমার পদপ্রান্তকে উদ্দেশ করিয়া চলিব। তোমার শ্রীচরণ আমার সর্বতীর্থ কাশী-বৃন্দাবন-রামেশ্বর। ঐ পাদপদ্মই বিষ্ণুপাদপদ্ম। তোমার পাদপদ্ম হইতে সর্বতীর্থময়ী গঙ্গার উদ্ভব! আরোহ অবরোহ গতি তোমারই চরণে মিলিত। Mill's Universal property ও Aristotle-এর Universal property তোমারই জীবনে মূলতঃ ঘন।.....রেণু ও কুমার বাসন্তী যাইতেছি, এ মুখার্জী প্রভৃতি জায়গায় যায়। আমি মঠে যাই ৩॥ টার পর। পোষ্টার আজ পাওয়া

যাইবে না। ৬টার পর ফিরি। যে পর্যন্ত না ঠাকুরের সত্তা বাস্তব রূপে ফুটিয়া উঠিতেছে, সে পর্যন্ত মঠে কিছুতেই শৃঙ্খলা আসিবে না। কোনও মতবাদ এখানে নাই। ঠাকুর অতীত মতবাদের পরেও অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন, অথচ ইহারা তাহা ধরিতে পারে নাই। কাজেই ইহারা অতীতেও নাই, বর্তমানেও নাই। ঠাকুর অনন্ত অতীত পরিপাক করিয়া বর্তমান। ইহারা না অতীতে, না বর্তমানে, ভবিষ্যতের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। ইহাদের দাঁড়াইবার নিজস্ব কোন স্থান নাই। সীতা শ্রীরাধার differentia আলোচনা হয় খুব স্পষ্ট ভাবে। সীতার পরধর্মী রূপ রাধা। সীতা শুধুই বিনীতা, রাধা বিনীতা ও বিদগ্ধা। যে অপমান সীতা শ্রীরামের কাছ হইতে পাইয়াও তাঁহার সঙ্গে লঙ্কায় অগ্নি-পরীক্ষার পর অযোধ্যা আসিলেন, সে অপমান রাধা সহ্য করিতেন না। তিনি যে স্বাধীনভর্তৃকা। রাধাকে বনে পাঠানো সহজ ছিল না। রাধা স্বর্ণমৃগ দেখিয়া ভুলিবার মত মেয়ে নন, রাধা লক্ষ্মণের দেওয়া গণ্ডী ভাঙিতেন না বা দেবর লক্ষ্মণকে ঐ রূপ কটু বাক্য বলিতেন না—ইহা তাঁহার বিপ্লবী মন দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয়। অথচ শেষ পর্যন্ত সীতাকে ধানের দায়ে পাতাল প্রবেশ করিতে হইলই। সীতা-সতীর পর রাধা-সতী। রাধা বিপ্লবী হইলেও 'গুর্বার্পিত গুরুস্নেহা'—কি বিনয় অথচ কি দৃঢ়তা, কি আত্মসম্মানবোধ! ত্রেতায় যিনি সীতা, দ্বাপরে তিনিই রাধা। কেউ বড় কেউ ছোট নন। যুগ-পার্থক্যে রূপগত পার্থক্য।···সেবানন্দ সকালে আসিয়া সভার জন্য ২০ টাকা নিয়া যায়···।

১১ই জানুয়ারী

ঠাকুর, আমার তুমি ছাড়া আর কি আছে? অখিলের নাথ তুমি—তবুও জানি আমি তোমার, তুমি আমার—ইহা তো মনে না করিয়া পারি না। আমি তখন পূজন জানি না—জানি আমি তোমার, তুমি আমার।···নারী প্রকৃতির চরম ও পরম রূপ শ্রীরাধা—বিনীতা বিদগ্ধা, গুর্বার্পিতগুরু-স্নেহা, লাবণ্যসিন্ধু, বৈদগ্ধসিন্ধু, করুণাসিন্ধু, সুখরসৈকসিন্ধু, অমৃতসিন্ধু আমার শ্রীরাধারাণী। তোমাকে বুকে লইয়া আমি চলিয়াছি। আমার তুমিই গর্ব, তুমিই শরণ। বিনয়ের খনি অথচ বিপ্লবময়ী—আমার পরাণপুতলী শ্রীরাধা! ৯টার পর নীলু আসে।···রেণু ও কুমার ১টার পর বাহির হয়—কুমারেশ, লেক ডিপোজিট, বাসন্তী কটন্, সি, কে, সেন প্রভৃতি হইয়া ফেরে ৬টার পর। আমি মঠে যাই ৪টার পর।···সেবানন্দ বলিল, 'চৈতন্য, তাহাকে বলিয়াছে যে আমি বলিলে—বাজ করিবে'। যে—তারিণীবাবুকে শাস্তি দিবার জন্য মঠের ক্ষতি করিবে বলিয়া ভয়ভক্তি দেয় এবং শ্যামসুন্দরানন্দের নিকট চিঠি দিবে বলিয়া বলিয়াছে, যাহাকে একদিন আমিই নিয়াছিলাম, যে একদিন আমাকে দাশরথি বাবুকে দিয়া অপমান করাইয়াছে, সেই হইতে যে আমার সঙ্গে কথা কয় না, আমি তাহাকে একদিন ভাবের উচ্ছ্বাসে —টিনের চালার ভিত্তি পত্তনের দিন—পা ধরিবার জন্য ছুটিয়াছিলাম, তাহাকে দিয়া কোনও কাজ আমার হইবে না। সে যদি ভুল বুঝিত, হাজারবার ডাকিতাম। আমার পরাপেক্ষা নাই—যেমন তেমন করিয়া যাকে তাকে দিয়া কাজ হয় না।—কাজের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। আমার বলা অর্থ তাহার আস্পর্দ্ধা আরও বাড়াইয়া তোলা।

১২ই জানুয়ারী

ঠাকুর, আমার উপর দিয়া সারা জীবন, আজিও যে ঝড় যাইতেছে, তাহা কি তুমি দেখিতেছ না? কি আমার অপরাধ? আমি তো কাহাকেও আঘাত করি নাই কথা-দ্বারা, শরীরদ্বারা বা মন দ্বারা। প্রাণের পথ—মধ্যম পথ—বহিয়া চলিয়াছি; তাই এ কূলের ও কূলের লোকেরা আমাকে লইয়া কি না করিতেছে? আমার জীবনদ্বারা আমি জবাব দিব—কথা দিয়া নয়—ইহাই আমার ব্রত। আমি কাহারও নই, অথচ সকলেই আমার। আমি কি আমাকে কাহারও কাছে বুঝাইতে পারিলাম? সকলের আপন হইয়াও আমিই আজ সকলের 'পর',···সুখে দুঃখে শোকে আঁধারে আলোকে তোমার চরণ চাহিয়া চলিব, তোমার ছাঁচা-পথে চলিব। কুমার···দুপুরে অনেক স্থান ঘুরিয়া আসে। রেণু ও তারিণী বাবু ৪।৫ টার পর বৃন্দাবন ঘাট, সুধাংশুবাবুর সঙ্গে দেখা হয় না।···মঠে যাই ৫টার পর। ক্ষিতীশ আসিয়াছে। আমি যখন ঠাকুরের প্রচারই করিতেছি, তখন কোনও বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ থাকিলে ঠাকুরের ভক্তদের তাহা গ্রাহ্য

করা উচিত নয়—ইহা কিতীশ বলিল। আমি বলি—যাহার যাহা মত, ঠিক ততটুকু বলিয়াই সে মত প্রচার করা যায় না, বই-এর লেখা দেখিয়া চিকিৎসা করা যায় না; অনেক বাহিরের কিছু জানিতে হয়, সময় সময় পরিবিতও করিতে হয়। সমস্ত শঙ্কর-ভাষ্যের মধ্যে দুইটি শঙ্কর আছেন—একটি আসল শঙ্কর আর একটী 'ঠ্যাটা' শঙ্কর। সে-ই ভাল উকিল, যাহার প্রত্যুৎপন্নমতি আছে ইনিয়ারী বুদ্ধি আছে। 'বই পড়া' এক কথা, প্রচার করা অন্য কথা। আসল কথা হইতে কিছু বাহিরে যাইতে হয়। নইলে অন্নকে দেওয়া হয় না। মঠের অঙ্গন, বিভূতি ও কালিদাস সোডার লাগাইবার জন্য বাহির হয়। নীচে দেওয়ালে ২ খানি লাগায়। উহাদিগকে ৪ খানি করিয়া বিস্কুট ও ২টি করিয়া সিদ্ধারা খাওয়াই।...সন্ধ্যার পর হরিদাসী চাউলের গুড়া, নারিকেল···প্রভৃতি পাঠাইয়া দেয়। বলরামপুরের কোনও চিঠি আসে নাই।

১৩ই জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি আতপ আমি ছায়া, তুমি সূর্য আমি সূর্যপ্রিয়া,...যেমন light shade সমন্বিত হইয়া হাফটোন গড়িয়া উঠে, তেমনি তুমি আমি সম্মিলিত হইয়া বর্তমান যুগ-সমস্যার সমাধানমূর্তিরূপে গড়িয়া উঠিব।···ঢাকার ব্রহ্ম-মোহন ঘোষের পুত্র কবিরাজ মুরারীমোহন ঘোষ তাহার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে ও ব্রহ্মমোহন বালিকাবিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি হইবার জন্য আগামীকাল শনিবার ৪টায় যাইতে বলে। রাজি হই। নিয়া যাইবে।—দাস আসে ৯টার পর। সে যে একটী সধবা ব্রাহ্ম কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমর্থন সে তাহার বন্ধুদের নিকট পাইবে না, কেননা তাহারা জানে না। সে জন্যও আমার কাছে তাহার আসা উচিত ছিল। বন্ধুদের যাবীয় সমর্থন বেশীদিন ও বেশীদূর কাজে লাগে না। তাহার একটী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। যাহা তাহার বন্ধুদের নাই। ঠাকুর সমস্ত জটিল ও intricate সমস্যার সমাধান দিয়া গিয়াছেন। একই সময়ে self-life ও cosmic life আরম্ভ করা উচিত। আগে স্ত্রীর সেবা, পরে ভাই-বোন সেবা—ইহা হয় না কেননা ব্যক্তির সেবাও অনন্ত। গ্রাহকের ৪৲ টাকা ও শতবার্ষিকীর জন্য ৬৲ টাকা—দিয়া যায়। বেণুর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। সুধাংশু ডাক্তারের ওখানে ৪টার পর যায়, আজও পায় নাই। বসুমতীতে বিজ্ঞাপন ছাপিবার জন্য দিয়া আসে। এস্, সরকারের ৪০৲ টাকা নিয়া আসে। সুমার সকালে ও বৈকালে বহু জায়গায় ঘোরে।···

১৪ই জানুয়ারী

ঠাকুর, তোমার আমার মধ্যের ভেদবুদ্ধি, ভিন্ন ভাব দূর হউক, ভেদ-অভেদের ভেদভাব গলিয়া যাউক। তুমি-আমি অভিন্নকলেবর, অভিন্নপ্রাণ, অভিন্নমন-বুদ্ধি, অভিন্ন-আত্মা হইব। বিচ্ছেদের আলা ঘুচিয়া যাউক। আমার দেহপ্রাণমন ছাপাইয়া 'আমি'-র স্থানে তোমার 'আমি' প্রতিষ্ঠিত হউক।···আমি ব্রহ্মমোহন বালিকা বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী সভায় যোগদানের জন্য ৪:০ টায় রওয়ানা হইতে পথে মুরারীমোহন ঘোষের মোটরের সঙ্গে দেখা হয়। তাহাতে যাই।...আমি সভাপতি হই। ব্রহ্ম-মোহনের পুত্র-কন্যা, পৌত্র-দৌহিত্রীগণ মিলিয়া ১লা মাঘ মৃত্যুদিনে প্রতিবৎসর এই অনুষ্ঠান করে। তাহার এক পুত্র অধ্যাপক সুকুমার ঘোষ বক্তৃতা দেন। ব্রহ্মমোহনের জীবনে সংসার ও সন্ন্যাস মিশিয়াছিল। তাহার বুকে ছিল জলবার মত। স্ত্রীপুত্র লইয়া পথে বাহির হইবার সাধনা আমি জানি। তিনিও বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা শান্তিসুধা মল্লিক আমার সিনেমার উপন্যাসের সময়ে ঢাকা হইতে বরিশাল গিয়াছিল। পৌত্র গোপাল কিছু বলে। ভাল লাগিল।···মঠে কিছুক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া আসি।···

১৫ই জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি বিশ্বৈকশরণ। সকল ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, শুচি-অশুচি, শবরী-অহল্যা, বুদ্ধা তোমার পাদপদ্ম বুকে লইয়া দিব্যরূপে উদ্ভাসিত। এই পচা-গলা বিশ্ব তোমার পাদপদ্ম বুকে লইয়া গোলোকের সুষমায় ভরপুর হইয়া ব্রহ্মধামে গড়িয়া উঠিয়াছে। তুমি আসিয়াছ বিশ্বের জটিল-কুটিল সমস্যার 'সমাধান-মূর্তি' হইয়া। কিন্তু কি লজ্জা, তোমার

কিছুই সেবা করিতে পারিলাম না, তোমার কথা বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করিতে পারিলাম না। এত রাখিয়া গেলে, অথচ তুমি অপরিচিত রহিয়া গেলে। এমন দর্শন, এমন জীবন আজ কার আছে? অথচ তুমিই সব চেয়ে অপরিচিত। তোমাকে বিশ্বের সামনে উপস্থিত করিবার শক্তি দেও। ৬। টায় রেণু ও তারিণীবাবু কারবালা ট্যাঙ্ক রোডে সুধাংশুবাবুর ওখানে যায়। দেখা হয়। আমি কুমার মোহন মঠে যাই। প্যাণ্ডেলের খুঁটিগুলি কাপড় দিয়া মোড়াই, প্রত্যেকটীতে ঠাকুরের ও অন্যান্য লেখা লাগাই। সুরেশ গুপ্ত এখানে হইয়া মঠে যায়। এই বৎসর ১৭ই মাঘ অশ্বিনীকুমারের শততম বর্ষ। কি করা যায় সে জন্য আসিয়াছে। নীলু এই সময়ে মঠে যায়।—৪। টার অল্প পরে সভা আরম্ভ হয়। নীলু 'প্রেম পাথারে শ্রীনিতাগোপাল' গান গায়। সভাপতি সুধাংশু বাবুকে বরণ করেন ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ধীরেনবাবু প্রবন্ধ পাঠ করেন—শ্রীনিত্যগোপালের দার্শনিক দিক। দার্শনিক বিপ্লব না হইলে যে কোনও নূতন গঠন সম্ভব নয় তাহা বলেন। আমি ইহা বিস্তৃতভাবে বলি। সভাপতিও ইহা খোলা প্রাণে সমর্থন করেন। বেশ বলিলেন। শ্রীনিত্যগোপাল যে বর্তমান বিশ্বসমস্যার সমাধান দিয়াছেন তাহা স্পষ্টভাবে বলেন। সভাপতি বলিয়াছেন যে কেন তাহাকে সভাপতি করা হইল তাহা তিনি বোঝেন নাই। আমি বলি, আমরা এক অপরিচিত ঠাকুরকে লইয়া রওয়ানা হইয়াছি ভবে ভরে। সুধাংশুবাবু একটী প্রসিদ্ধ পত্রিকার নেতা। তাহাকে সগোত্ররূপে পাইলে আমরা বাঙ্গলা দেশে দাঁড়াইতে পারিব—ইহা ভাবিয়াই তাঁহাকে এখানে ডাকিয়াছি। সকলেই মুগ্ধ। দিনাজপুরের জমিদার শরদিন্দু রায়চৌধুরী (৮২ বৎসর) রমিদপুর হইতে আসিয়াছেন। তিনি বলেন, There is a fall in the effort of man। তিনি উজ্জয়ন ভারতের গ্রাহক হইবেন। এক দল যুবক শিষ্য হইয়াছে। সেবানন্দ, কালিদাস, অরুণ ও বিভূতি পোস্টার লাগাইতেছে।

১৬ই জানুয়ারী

ঠাকুর,...তোমার সমন্বয়-বার্তা বিশ্বের দেহপ্রাণমন মন্থন করিয়া ফুটাইয়া তুলিব, কার্যকরী করিব—শক্তি দেও। ৭। টার পর ট্যাকসীতে আমি উষাদিদী ও কুমার বলরামপুরের জন্য হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হই। ৯টার পর গাড়ী ছাড়ে। ষ্টেশনে পূর্ণেন্দু ঘোষের সঙ্গে দেখা। তিনিও বলরামপুর যাইতেছেন।...গাড়ীতে 'গিরিধারী' প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। ১২টার পূর্বে বড়গপুর পৌঁছি। ষ্টেশনে কেহ ছিল না। শুনিলাম নৃপেনবাবু গিয়াছিলেন। ...বৈকালে অনিল গুপ্ত, পরে ঈশ্বর প্রামাণিক আসেন। তাহার সঙ্গে প্রদর্শনী দেখি। সন্ধ্যার পর বিনোবার 'গীতা-প্রবচন' পাঠ করি। ইহার মধ্যে দেহ-দেহীর, দেব-অসুরের সমন্বয় নাই। ইনি কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিকে 'এক' বলেন, সমন্বয় স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা তো হয় না। Psychologically তিনটী যে ভিন্ন পথের প্রেরণা করে। ভক্তির সঙ্গে হৃদয়ের, জ্ঞানের সঙ্গে মস্তিষ্কের, কর্মের সঙ্গে বহির্মুখী ভাবের যোগ রহিয়াছে। খাওয়ার সময়ে মস্তিষ্কের তীব্র চালনা করিলে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়, গর্ভাবস্থায় তীব্র চিন্তা নিষিদ্ধ। তিনকে তিন রাখিয়া পারস্পরিক আনুগত্যে 'এক করাই' সমন্বয়। ঈশ্বর সর্বত্র দলাদলির কথা বলিল।...ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাণ-উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মনের স্তরই বিভেদের স্তর। পরিচ্ছিন্ন গঠন কর্মকে তামসিকতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে অপরিচ্ছিন্নতার সঙ্গে সমন্বয় প্রয়োজন। প্রাণ ছাড়া এ সমন্বয় কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

১৭ই জানুয়ারী

বলরামপুর। প্রার্থনা সভায় আজ বিনোবাজী ভারতীয় আশ্রম-ব্যবস্থার মহিমা ও মাধুর্য কীর্তন করেন। ঠাকুর, আমাকে প্রাণ দেও, সকল বিভেদ বিচ্ছেদ হইতে রক্ষা কর। কেহই তো সঙ্ঘ গড়িতে পারিতেছে না—আমি তো সারা জীবন 'সঙ্ঘ সঙ্ঘ' করিয়া কাঁদিলাম। সেই সঙ্ঘই তো হইল না। প্রাণের স্পর্শে সঙ্ঘ গড়িয়া উঠুক। সকালে চিড়া-দই খাইয়া ৮। টায় ভূদানকর্মী সম্মেলনে যোগদান করি।...বিনোবাজী...কাঠামো বদলাইবার কথাই বিশেষ ভাবে বলেন। ইহা রাজনীতি নয়। ইহা 'লোকনীতি'। আমি এই জন্যই বলিতে চাহিয়াছিলাম।

আমাকে এই সুযোগ দিলে ইহাদ্বারা জিনিষটা পরিষ্কার হইত। যে চিন্তাধারা রহিয়াছে অতীত কাঠামোর পিছনে বা গোড়ায়, সেই কাঠামো হইতেছে মায়াবাদ ও বর্ণাশ্রম ধারায়। ইহা না বদলাইলে 'ভূমি'র কান্না, ভূমির অন্তরূপ, শোষণমুক্ত ভূমির তত্ত্ব কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিবে না। আমাদের দৃষ্টিই ভূমি-বিমুখিনী। ভূমিমুখিনী দৃষ্টি করিতে হইলে আমাদের দৃষ্টি, বুদ্ধি ও দর্শন-শাস্ত্র বদলাইতে হইবে। কিন্তু সে বৈপ্লবিক দর্শন কোথায়? আজ প্রফুল্লবাবু বলেন, 'অহিংসাকে মানিতে হইলে ঈশ্বরকে মানিতে হয়'। বাঙ্গলাদেশ বা ভারতবর্ষ কি এতদিন একান্ত রাজনীতিই করে নাই? আজও কি তাহাই করিতেছে না? বিনোবা বলেন, হৃদয়ের পরিবর্তন হইলে সে আইনের 'কান পাকড়েগা'—কান মলিয়া দিত। হৃদয় আগে, আইন পরে। ইহা সত্য। মোটরে আমাদের পৌঁছাইয়া দেয়, সঙ্গে নৃপেন বসু। ৩টার পূর্বে আবার গাড়ীতে রথতলা মাঠে বিনোবাজীর প্রার্থনা-সভায় যোগদান করি। প্রবন্ধ ব্যানার্জী ও মাখন সেনের সঙ্গে সেখানে দেখা। সকালে বীরেন দাসের সঙ্গে দেখা। প্রদর্শনী খোলার সময়ও গিয়াছিলাম, দেরী দেখিয়া চলিয়া আসি। অনর্শীর শশীপালের সঙ্গে দেখা। এখানে অসুবিধা হইতেছে প্রচুর। বাজার হইতে রুটি তরকারী কুলার কিনিয়া আনে। কিতীশবাবু আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। দুধ দিলেন বলিয়া গেলেন। তাহাও আসে খাবার পর। বলিলেন, heavy programme। সত্যই তো। না আসিলেই ভাল হইত। কাল চলিয়া গেলে ইহারা অপ্রস্তুত হইবে, তাই পরশুই যাইব। প্রার্থনা সভার শেষে বিনোবাজী তাহার গীতা-প্রবচন প্রত্যেককে কিনিবার জন্য বলেন। ভূদানযজ্ঞের গ্রাহক হইতে বলেন।

১৮ই জানুয়ারী

বিনোবাজীর প্রার্থনা-সভায় বসিয়া বসিয়া ঠাকুর, তোমার কথাই বারবার মনে হইতেছিল। একমাত্র তুমিই যে সর্বপ্রথম সর্বক্ষেত্রে চাচা, অর্থাৎ কাঠামো বদলাইবার বার্তা শুনাইয়া গেলে। তুমি কর্মের এমন ব্যাপক ও গভীর রূপ দিলে যাহার মধ্যে ধর্মনীতি, সমাজ-নীতি, রাজনীতি সব সমন্বিত হইয়াছে। তোমার কথা নিয়াই ইহারা ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত। আর মূলাধার তুমি? ৭০ বৎসর পূর্বে তুমি আনিলে 'অস্পৃশ্যতা বর্জন', মহাত্মাজী তাহা প্রচার করিলেন সেদিন।...প্রকাশিত হও, প্রকাশিত হও। বিনোবাজী সকালের সাংবাদিকদের কাছে বলেন তাঁহার সাহিত্যের মূল উৎস মায়ের প্রেরণা, মায়ের ভাল বাসা। মায়ের কথা বলিতে বলিতে তিনি বিহ্বল হন। কিন্তু পরে আমি যাই বৈকালে প্রার্থনা সভায় যোগ দিই। 'শক্তি' আসিলে 'অস্ত্রশস্ত্র' আসে, 'যুক্তি'র পথে আইন। 'ভক্তি' দ্বারাই এই ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন বাড়িয়া চলিবে। চাই ভক্তিশালী হওয়া, শক্তিশালী নয়। আমার 'লোকনীতি', রাজনীতি নয়। চাই 'বিশ্বাস'। পারস্পরিক বিশ্বাস ছাড়া 'সঙ্ঘ'ই গড়ে না।...কংগ্রেস, প্রজাসোস্যালিষ্ট কেহ পারিবে না, পারিবে শুধু ভগবানের ভক্ত। 'কঞ্জুস'দের সম্বন্ধে বলেন —সকলে সব জায়গায় দেয় না, দিতে পারে না। বিশেষ কোন ক্ষেত্র বা মানুষ পাইলে কঞ্জুসও অজস্র দিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে 'অহিংসা'র পথে অনেক অস্ত্র আছে। একটী উপায় ব্যর্থ হইলে অন্যটি প্রয়োগ করিবেন, অনন্ত পথ তাঁহার সামনে খোলা। আমিও তাই বলি যে, এই বিশ্ব আকাশে ঘেরা। আকাশ অর্থই অবকাশ, ফাঁকা এক পথ রুদ্ধ হইলে অপর পথ নিশ্চয়ই আছে।...জয়প্রকাশ নারায়ণ আসিয়াছেন, আরও কত আসিয়াছে। কোনও দলের আমি নই। ইহারা ৫।৭টার বক্তৃতা 'অভয় আশ্রমে' হইবে বাইকে ঘোষণা করিল। তাহা হয় নাই। ইহাদের সর্বত্র অব্যবস্থা। রাত্রিতে পাউরুটি কিনিয়া খাই। ১০টার পরে রুটি তরকারী দিয়া যায়, তখন শুইয়া পড়িয়াছি। খোঁজ খবর নিবার কেহ ছিল না। হৃদয়-বৃত্তি ইহাদের খোলে নাই। কিতীশবাবু উজ্জীবনভারতের ৩ টাকা দেন আসিবার পূর্বে। মাখন সেনের সঙ্গে সকালের সভায় কিছু আলোচনা হয়।

১৯শে জানুয়ারী

ঠাকুর, তোমার যাত্রাপথে জীবন-ভরা কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই না লাভ হইয়াছে। তুমি অনন্ত বৈচিত্র্যময়। সৃষ্টির জটিলতাই তোমার লীলা। লীলা সর্বদাই বক্রপথে

চলে, বহুপথে নয়। বক্রতাই এ দেশের দর্শনে মায়া। তুমি সরল, তুমি বক্র বঙ্কিম। 'টাকা' কাল রাত্রিতে না পাইয়া কিতীশবাবুর ভ্রাতার নিকট ৫৲ টাকা হাওলাত চাই। ইতি মধ্যে কিতীশবাবু ৩৪৲ টাকা হাতখরচ বাবদ দেন। রিক্সায় রওয়ানা হই। দশগ্রাম স্টেশনের সামনে আমার, উষাঙ্গিনীর, গীতার ও অন্যান্যদের ফটো ঈশ্বর প্রামাণিক তোলে। তাহারা আমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। কিছু না খাইয়া চলিয়া আসি। কেহ বলেও নাই। গাড়ী ১ ঘণ্টার উপর লেট—প্রাটফর্মে প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়।...২ ০ টায় পৌঁছি।...অশ্বিনীকুমার দত্তের শততম জন্মদিবস আগামী ১৩ই মাঘ। সেই উপলক্ষে শতবার্ষিকীর উদ্যোগ করিবার জন্য এক আলোচনা-সভা জিতেন দাসের ওখানে ২৭, ল্যান্সডাউন টেরেসে হইবে—এই চিঠি পাই। ৪।০ টায় রওয়ানা হই। আলোচনা হয়।...কুমারের সঙ্গে কিন্তু লীলা ও তাহার পুত্রকন্যা সন্ধ্যার পর আসে। কাল বৈকালে নবদ্বীপের ধীরেনবাবু আসিবেন। রসিকলাল গুহ ৫৲ টাকা প্রণামী পাঠাইয়াছে। ভাদ্রমাস হইতে অসুখ। কোথায়ও যাইতে হইলে রেণুকে নেওয়া উচিত। নহিলে প্রচার হয় না—এই অভিজ্ঞতা এবার স্পষ্ট হইল। রেণু থাকিলে বলরামপুরে বিজয়লাল, সতীকান্ত, তারাশঙ্কর, ফণিভূষণ, গজেন্দ্র মিত্র ও সুরেন নিয়োগীর সঙ্গে আলোচনা হইতে পারিত। আরও অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা হইত। গত রবিবারের বক্তৃতার রিপোর্ট গতকাল বাহির হইয়াছে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে ও অমৃতবাজারে, আজ বাহির হইয়াছে বসুমতীতে। রেণু মঙ্গলবার দিয়া আসিয়াছিল।

২০শে জানুয়ারী

ঠাকুর, তোমাকে বিশ্বাস করিব, তোমার বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বাস করিব, প্রকৃতির প্রতিটি স্পন্দন, প্রতিটি অংশ যে তোমারই ছাঁচে গড়িয়া উঠিবার জন্য লালায়িত হইবার জন্য আকুপাকু করিতেছে, তাহা আমাকে দেখিতে দেও, উপলব্ধি করিতে দেও। জীবন রসে 'সমূহ' (সঙ্ঘ) রচনা করিতে দেও। পরস্পরের মাঝে বিশ্বাসের সম্বন্ধ, নিবিড়তার সম্বন্ধ, অনন্যতার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে দেও। তোমার 'মায়া' যোগমায়ার গড়িয়া উঠিবে ইহার জন্য অনন্ত ধৈর্য লইয়া অপেক্ষা করিতে দেও, তোমার যন্ত্র কর যেমন অর্জুনকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গীতা-প্রচারের জন্য করিয়াছিলে। তোমার অনন্ত কথা আছে, তুমি চুপ করিয়া থাকিবে? তবে কেন আমার বুকে এমন উন্মত্ততা দিলে? সুরেশ গুপ্ত আসে—ঠাকুরের শতবার্ষিকীর দুইখানি করিয়া আবেদন ও বিজ্ঞপ্তি নিয়া যায়।...তারিণীবাবুও আসেন। আজিকার যুগান্তরে গত রবিবারের বক্তৃতার রিপোর্ট হংস বসুমতীর মত বাহির হইয়াছে। বাহিরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকার সম্পাদকের কাছ হইতে এরূপ অকুণ্ঠ সমর্থন এই প্রথম আসিল। ইহা impartial, কোনও দলের কথা নয়। এইবার ঠাকুর ধীরে ধীরে পথ করিয়া লইবেন। হিন্দুস্থানের ৫ম পৃষ্ঠায়ই বিবরণ বাহির হইয়াছে। ৩টায় নীলু আসে—বড়সহে জমি পাওয়া যাইতেছে, কিনিবে কি না। কিনিলে সোমবারেই ৩০০৲ টাকা বায়না-স্বরূপ দিতে হইবে। আলোচনা হইল—এখান হইতে যখন নিশ্চয়ই জমি কেনা হইবে, তখন তাহার সঙ্গেই কেনা হইবে। জীবনে একত্র হইয়া থাকার কথাই আলোচনা হয়। আজ আমার শক্ত হইবার প্রয়োজন হইয়াছে। আর আমার সঙ্গের সম্পর্ককে ঠিক রকম করিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। ছাড়িয়া দিয়া চলা চলিবে না। গা ছাড়িয়া চলিলে সব পণ্ড হইবে। ধীরেন ব্যানার্জী আসেন। ২ ঘণ্টা থাকেন। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের কথা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়।...বহুপুরুষের জীবনী রোমাঁলার কায়দায় লেখা অন্যায়। পাশ্চাত্যেও ঐরূপ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা চলে নাই। এখানেও উহা চলিবে না।...মলিনা ছুটি বাঁধা কপি ও কিছু টম্যাটো দিয়া যায়।...

২১শে জানুয়ারী

ঠাকুর, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। তোমার মুখ, তোমার অঙ্গুলি নাড়িয়া নাড়িয়া কথা বলা, তোমার উচ্ছহাস্য, তোমার আদরপূর্ণ আহ্বান, করুণ নয়নের চাহনি জীবন-ভর বহিয়া চলিয়াছি। তোমার বিশ্বমঠে পাদ পরিক্রমা করিয়া ভূতেষু ভূতেষু

তোমাকে বিচরণ করিয়া আমি বিশ্ব পরিক্রমা করিব। খুব কাঁদিলাম এইবার তোমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া, আমার প্রাণধন। চরৈবেতি চরৈবেতি—শুনিয়াছি তোমার ডাক। কত লাঞ্ছনা, কত উপেক্ষা, কত অনাদর আমার জীবনে। চলিবার শক্তি দেও, ধৈর্য দেও, অনন্যতা দেও। আমি তোমাকে বুকে লইয়া চলিব।···রেণু বাহির হইয়া বিজ্ঞাপন নিয়া আসে। কুমার ২ বার বিজ্ঞাপনের টাকা আনিতে বাহির হয়।···মঠে নীলরতনবাবুর সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা। বঙ্গমতী হইতে সভায় বিবরণ পাঠ করিয়া শুনানো হয়। গুটিয়ার সুরেন সেনের সঙ্গে আলোচনা হয়—রাস ও মহারাসের পার্থক্য। সব discordant, সব contradictory লইয়া মহারাস। শ্রীনিত্যগোপাল তাহারই দর্শন দিয়া গিয়াছেন। ঐক্য একের মধ্যে নাই। ঐক্য এক ও অনেকের সমন্বয়ে। ইহার পর ইংলণ্ডের এক ১৬ বৎসরের নাবিক কিশোর আসে। মুরারি বহু নিয়া আসে। সে যোগ সম্বন্ধে জানিতে চায়। ঠাকুরের পূর্ণযোগের কথা বলি—এক-অনেকের সমন্বয়, হোয়াইটহেডের কথা বলি, 'Spiritual life is at the same time a self-life and cosmic life' ইত্যাদি বলি এক ঘণ্টা বসিয়া। সর্বধর্মনির্ণয়সারের ইংরেজী তর্জমা তাহাকে দেওয়া হয়। ১টার পূর্বে ফিরি। কুমার আমার খোঁজে মঠে যায়।

২২শে জানুয়ারী

ওগো জগন্নাথ নিত্যগোপাল, তুমি জগতের প্রেম যাচ্ঞা কর, সকলের সব ভার বইবার জন্য ভার যাচ্ঞা কর। 'বহামহম্'। যে যাচ্ঞা করে সে-ই পায়। তুমি তো কাহারও ভার বইতে কোনও দিন পরাঙ্মুখ হও নাই, পথের মাঝে বোঝা ফেলিয়া আরাম করিতে বস নাই। ওগো ভিখারী ভগবান, যাচক ভগবান, আমি তোমার ভার বহিব। আমার ভার তোমার হউক, তোমার ভার আমার হউক, আমরা সমভারবাহী হইব, এক-হৃদয় হইব। 'যদস্তু হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম'—তুমি আমি এক-হৃদয় স্পন্দনে স্পন্দিত হইব—তাহাই যেন আমার হয়। জগন্নাথ আমার, তোমার বিশ্বমৈত্রীর আস্বাদন আমাকে দেও। বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে তুমি বিশ্বের সব ভার চাহিয়া বেড়াইতেছ, কিন্তু অনন্ত না হইলে তো ভার নেওয়াও যায় না, দেওয়াও যায় না। আমাকে অনন্ত কর, তুমি তো অনন্ত আছই। তোমার চরণ অনুসরণ করিয়া আমিও সারা জীবন 'ভার'ই বহিয়া আসিয়াছি। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভার, প্রতিষ্ঠা-রেণু প্রভৃতির ভার 'বহাম্যহম্'। যাহাদের ভার বহিতে পারিলাম না, তাহারা ভার দিতে পারে নাই। আমি তো চাহিয়াই ছিলাম, তাহারা মুক্তি দিয়া গিয়াছে। 'অনন্ত' না হইলে ভার দেওয়া যায় না। অল্প-বুদ্ধি যাহার আছে, তাহার ভার কি বিষম ভার! বোঝা ফেলিয়া কোনও দিন বিশ্রাম করিতে বসি নাই। সুধাংশু কুসুম, মালতী প্রণতি, শিশির কমলা, সন্তোষ শান্তী কার না ভার বহিতে চাহিয়াছি? গুরুর কাজই তো ভার বওয়া। সেই গুরু হইতেই চাহিয়াছিলাম। আজ কুমার-নীলু-বিন্নুর ভারও বহিতে চাহিতেছি। ২টায় নীরদবরণ দে (পাতিপুকুর) আসে ১৩ই মাঘ অশ্বিনী-বাবুর জন্মদিনে তাহাদের সভায় সভাপতিত্ব করিতে বলিতে। আমি অশ্বিনীকুমার-শতবার্ষিকীর সঙ্গে যুক্ত হইবার কথা বলিলাম। মঠে যাই। গুপ্তিপাড়ার বীণা নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাইয়াছে। তাহাতে বক্তার নামের মধ্যে বিজ্ঞানানন্দ ও ধীরানন্দের নাম চুকাইয়াছে। অথচ যে খসড়া সে আমাকে দেখাইয়াছিল তাহাতে উহাদের নাম ছিল না। আমি না যাওয়াই একরূপ স্থির করিলাম। বিভূতিকে ইহা বলিলে সে বিশ্রী রকমের তর্ক করে। ইহারা একবার নিমন্ত্রণ পত্রে লিখিয়াছিল—'ওঁ নমো ভগবতে প্রণবানন্দায়'। ইহার সমর্থন করিয়া আমাকে বিভূতি শাস্ত্র শুনাইতে আসে। কিতীশ, নীলরতন, রমাপতিবাবুর সঙ্গে বিভূতির তর্ক হয়।···

২৩শে জানুয়ারী

সাময়িকী

ভারতবর্ষ ও তাহার ধর্ম—আমরা ভারতবাসী—কিন্তু আমরা এই ভারতবর্ষকে কতটুকু জানি? ভারতবর্ষকে জানা বোঝা সহজ নয়। ভারতবর্ষ যে বিচিত্র দেশ একথা মনে রাখিতে না পারিলে ভারতবর্ষকে বোঝা সহজ হইবে না। বহু রকম চিন্তাধারা, বহু রকম জীবন যাপন প্রণালী ভারতবর্ষের কয়েক হাজার বৎসরের সভ্যতার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এখানের আনাচে কানাচে পিছড় গাড়িয়া বসিয়া আছে। এই বহু রকমত্বের মধ্যে পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা বা জীবন-যাপন প্রণালীও আছে। ইহাদের কোনটা বহু শতাব্দী ধরে সর্বভারতীয় মনোবৃত্তি হিসাবে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে তাহাও সত্য—তথাপি কোন একরকম ভাবে বুঝিতে চাহিলে ভারতবর্ষকে বোঝা যাইবে না তাহাও সত্য। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' মতবাদ কয়েক হাজার বছরে প্রচারিত হইয়া ভারতবর্ষকে জীবন-বিমুখ করিয়াছে একথা যেমন সত্য, আবার এই ভারতবর্ষেই সাড়ে পাঁচহাজার বৎসরের অধিক-কাল হইল পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া মাটিকে ব্রহ্ম-মূল্যে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই পলায়নপর অর্জুনকে বজ্রকণ্ঠে আহ্বানে জানাইয়া বলিলেন 'রাজ্যং ভুংক্ষ'। তবে এ রাজ্যভোগ যে আসক্তি বিদ্বেষে আচ্ছন্ন বিষয়ীর রাজ্যভোগ নয় সে কথা মনে রাখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে রাজ্য ভোগ করিতে বলিয়াছিলেন তাহা সামাজিক জীবনে রূপ পায় নাই। ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে রূপ পাইয়া-ছিল ঐ জগৎ মিথ্যাবাদ অর্থাৎ কর্মহীনতা এবং রূপ পাইয়াছিল ঐ জগৎ-মিথ্যাবাদেরই অনুসিদ্ধান্ত সিঁড়িতন্ত্রীয় ছোটবড় কুলীন অকুলীন ব্যবস্থাতন্ত্র বর্ণাশ্রম। শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করার কৌশল ভাগবত-ধর্ম যেমন ভারত-বর্ষের সমাজ জীবনে ছিল না, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত কুলীন অকুলীন ভেদবাদহীন সমস্ত মানুষের সম মান মর্যাদা স্বীকৃতি সম্বলিত বর্ণাশ্রমও সমাজ-জীবনে রূপ পায় নাই। পায় নাই সত্য, তাই বলিয়া ভারতবর্ষ ধর্ম বলিতে হাচি টিকটিকি বা সহস্র বেড়াজালে আবদ্ধ জীবনবিমুখ মনো বৃত্তির কথাই শুধু জানিত তাহা যে সত্য নয় সে কথাও মনে রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কথার মধ্যে মানুষের জন্য—সমস্ত মানুষ যেখানে নরনারী ধনিক শ্রমিক, ব্রাহ্মণ শূদ্র কোন ভেদ নাই—শোষণহীন জীবনকে ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে শোষণহীন জীবনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আনন্দময় বার্তা রহিয়া গিয়াছে, প্রাণের যে জীবন-চেতনাকে তুলিয়া ধরিতে পরপর বহু মহা-পুরুষ এই ভারতেই জন্মলাভ করিয়াছেন, সেই রকম সর্বাঙ্গীণতার জীবন-চেতনার তথা সমাজ-চেতনারই আনন্দময় বার্তা আজ পর্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই। ধর্মকে ভারতবর্ষের একটি চিন্তা-ধারা ছোট করিয়া ফেলিয়া জীবনের বাইরে কতকগুলি আচার নিষেধে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল একথাও অবশ্যই সত্য এবং এইজন্যই সমাজের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানকে টানিয়া আনিতেই নানক, মহাত্মা রামমোহন প্রমুখ পূর্বাপর বহু মহাজীবনকে উল্লেখ না করিয়াও আমাদের ধরা ছোঁয়ার সময়ের মধ্যে পাই ঋষি অরবিন্দ ও সমন্বয়-মূর্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে। ইহাদের প্রদত্ত জীবন-চেতনা অনুশীলন করিলেই দেখা যাইবে তাঁহারা এই জীবনেই সমস্ত মানুষকে লইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকেও ব্রহ্মজ্ঞানে সমুদ্ভাসিত করিবার বার্তা রাখিয়া গিয়াছেন। অথচ ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গালীর মধ্যেই এই জীবন-চেতনা রহিয়া গেলেও উহা সাধারণ্যে আজও দর্শন ও ধর্ম-ক্ষেত্র হইতে প্রচারিত ও স্বীকৃত হয় নাই। তাই ভারতবর্ষের ধর্ম ভারতবর্ষকে ডুবাইয়াছে এই অর্ধ সত্য কথাটি সহজে বলিতে পারা যাইতেছে। যেমনা আমাদের 'অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, অধিসত্তর 'বা রাজনীতির সঙ্গে আমাদের ঠাকুর ঘরের বিরোধ মিটাইয়া' চিন্তাজগতে ও চিন্তক্ষেত্রে জন-সাধারণের কাছে আজও ঐ পূর্বোল্লিখিত চিন্তাধারাটী পৌছায় নাই। যে প্রাণ-দর্শন শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়া উদ্ভূত হইয়া ভগবান বুদ্ধ

ও পরবর্তী সময়ে নানক, কবীর এবং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, আজ তাহা মূর্তরূপে সমাধিস্থ পুরুষ শ্রীনিত্যগোপালে আসিয়া উচ্চারিত হইল 'আমি বিশ্বনাগরিক'। সমাধিস্থ হইলেও মানুষকে বিশ্বনাগরিকও হইতে হইবে এই কথাটি প্রস্থাপন করিয়া এই সামগ্রিক সমন্বয়ের মধ্যে পরস্পর বিপরীতকেও গ্রথিত করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল সূত্র দিলেন "নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার-সাকার নিরাকার সমন্বয়। জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব সমন্বয়।"—এই সর্ব সমন্বয়ে জড়বাদ ও অজড়বাদ মিলিয়া ধর্মের যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে সে সম্বন্ধে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মূল কথা হইতেছে—বস্তুজগতের সঙ্গে আত্মজগতের কেবল পার্থক্যই নাই, একই সঙ্গে আত্মীয়তাও আছে। এতদিন পার্থক্যটাকেই একান্ত করিয়া তোলা হইয়াছিল বলিয়া ধর্মের যে রূপ ছিল, উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তা স্বীকার করায় ধর্মের রূপ গেল বদলাইয়া, সংসারেরও। এই ধর্মে 'জগৎটা প্রবাসও নয়, শুধু ব্যবহারিক সত্যও নয়, পরিপূর্ণ বাস্তব। অথচ বিষয়ীদের মত সংসারটার মূল্যেই সংসারটার একমাত্র মূল্যও নয়। সব কিছুরই মূল্য নির্ধারণে দুইটি বিচার রহিয়াছে—একটি তাহার নিজের মূল্যে নিজের বিচার, আর অপরটি অপরের মূল্যে নিজের বিচার। বিষয়ীর কাছে সংসারের মূল্যেই সংসারের মূল্য, প্রচলিত ধর্মের কাছে সংসারের নিজের কোন মূল্যই নাই। কিন্তু এই ধর্মে ধর্মের মূল্যে যেমন সংসারের মূল্য, তেমনি সংসারের মূল্যেও ধর্মের মূল্য"। এমনি হওয়াতে ধর্ম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা হইতেও এই ধর্ম আলাদা, সংসার সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা হইতেও ঐ ধর্মের সংসার-ধারণা আলাদা। এই বিপরীতের মিলন প্রাণহীন বুদ্ধির কচকচানিতে পাওয়া যাইবে না। জীবনের মধ্যেই সমস্ত বিপরীতের মিলন-ভূমি রহিয়া গিয়াছে। এই ধর্ম তাই জীবনকে দেখিয়াছে জীবিতের দৃষ্টিকোণ হইতে। জীবন্ত জীবনে স্থিতিগতি অঙ্গাঙ্গী মিলনে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—সে জীবনের সঙ্গে যৌবনেরও তাই কোনও বিরোধ নাই, স্থবিরও বিরোধ নাই। প্রয়োজন আছে শুধু সব কিছু সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এই রকম জীবনে অতলস্পর্শী গভীর হইতে গেলে অন্তর্মুখী গতিতে তলাইয়াও যাইতে হয়, আবার আকাশের মত বিস্তৃত হইতে গেলে জন-সমাজের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়াও দিতে হয়। মানুষের জীবনের individuality, universality, transcendance—ব্যক্তিত্ব, বিশ্বজনীনত্ব ও অত্যতিষ্ঠৎভাব—এই তিন অবস্থাকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে আস্বাদন করিবার প্রচেষ্টাই এই ধর্মের মূল কথা। এই ধর্ম বলিতে চায় "জীবনের যতগুলি দিক আছে সবগুলি এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট যে ইহাদের কাহাকেও বাদ দিলে জীবন আর জীবন থাকে না। ধর্ম বাদ দিয়া অর্থনীতি কিংবা রাজনীতি, শিক্ষানীতি কিংবা সমাজনীতি যাহা হয় তাহাতে অর্থের ক্ষেত্রে হয় অর্থ লইয়া কাড়াকাড়ি, রাজনীতি ক্ষেত্রে আসে ক্ষমতা লইয়া উন্মত্ততা, শিক্ষা-ক্ষেত্রে কি হয় তাহা ছাত্রসমাজের দিকে চাহিলেই দেখিতে পাই—সমাজের ক্ষেত্রের কথা না হয় অনুক্তই রাখিয়া দিলাম। আপার রাজনীতি-সমাজনীতি বাদ দিয়া যে-ধর্ম সম্ভব, তাহাকে ক্লীবের ধর্ম বলা ছাড়া আর কি বলা চলে"? এই ক্লীবের ধর্মের স্থলে এই ভারতবর্ষেই আর এক নূতন ধর্মের জন্ম হইয়া গিয়াছে—সে ধর্মের খোঁজ সকলে পায় নাই, অনেকে পাইয়াছেন। বলিয়াছি একেবারে বর্তমানকালে সে ধর্ম-প্রস্থাপক ধর্মের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ শ্রীনিত্যগোপাল, আর সাহিত্য দ্বারকৃত রামমোহন, রবীন্দ্র শরৎচন্দ্র প্রমুখ। "বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, 'The religion that does not infuse strength into the heart is no religion to me—be it of the Upanishadas, the Gita or the Bhagabatam. Strength is religion and nothing is greater than strength'। আত্মার ক্ষেত্রে শক্তিমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের সকল ক্ষেত্রেও শক্তিমান হইতে হইবে। যে ধর্মে

আত্মার মুক্তি দেহের মুক্তি হইতে একেবারে নিরপেক্ষ, অন্নের ক্ষেত্রে পরপদানত থাকিলেও যে-ধর্মে আত্মার মুক্তি সম্ভব, সে কি আর ধর্ম? শোষণ হইতে মুক্তি চাই—দেহের ক্ষেত্রের শোষণ হইতেও চাই, আত্মার ক্ষেত্রের শোষণ হইতেও চাই।"

এই কৃষ্ণ-ধর্মকে, এই নূতন ধর্মকে, বিশ্ব ধর্মকে আজ মানুষের কাছে তুলিয়া ধরিতে হইবে। এই নূতন ধর্মে "বাস্তব কাহাকে বলিব? তুমি আমি যাহা আমাদের এই স্থূল পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিতে পারি, আমাদের সেই বিচ্ছিন্ন বোধগুলিকেই শুধু বাস্তব বলা যায় না। খালি চোখে যাহা দেখিতে পাই না, আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি দ্বারা তাহা দেখিতে পাই; শুধু কানে যাহা শুনিতে পাই না, আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রাদিদ্বারা তাহা শুনিতে পাই। রেডিও যন্ত্রের কাঁটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আমরা সমস্ত পৃথিবীকে শুনিতে পাইয়া থাকি। তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আমি আমার সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু বোধ করিতেছি তাহা যেমন আছেই, আবার সেইটুকুতেই বস্তুর সবটুকু শেষ হইয়া যায় না। শুধু চোখে যাহা দেখি, মাইক্রোস্কোপ সাহায্যে তাহা অপেক্ষা বেশী দেখি, তাই বলিয়া কি সবটুকুই দেখি? তাহা নয়—আমরা কিছু দেখি, কিছু দেখি না; কিছু জানি অথচ সবটুকু জানি না; কিছু বুঝি অথচ সবটুকু বুঝি না। বাস্তব বলিতে জানা-না জানার, বোঝা-না বোঝার, দেখা-না-দেখার এই দুইটি রাজ্যকেই বুঝায়। আমরা এই বাস্তবকেই জীবনে স্বীকার করিতে চাই। আমি যাহা জানি আর আমি যাহা জানি না—এই দুইটিরই বাস্তবিকতা আছে। এই দুইটিকে মিলাইয়া যে বাস্তবিকতা—সেই বাস্তবকে স্বীকার করা সহজ নয়।...খাতাপত্রে কাগজে কলমে যাহাকে মেলান যায় না, জীবনের দিকে তাকাইলে দেখি তাহা একই সঙ্গে অস্তিত্ববান—একই সঙ্গে একই ক্ষেত্রে। অর্থাৎ যাহাকে একদিক হইতে মেলান যায় না বলিয়া দেখি, তাহাকে আর এক দিক হইতে মেলান যায়। ভালবাসা ও বিদ্বেষ আপাতঃবিরুদ্ধ কিন্তু একই সময়ে একই মানুষের মধ্যে তাহাদের সাক্ষাৎ মেলে। যুক্তিতে দেখি আলো ও অন্ধকার পরস্পর-বিরোধী—আলো মানেই যাহা অন্ধকার নয়, অন্ধকার মানেই যাহা আলো নয়—অতএব উহাদের একত্র অবস্থান সম্ভব নহে। কিন্তু বাস্তব জগতে তাকাইয়া দেখি অতি প্রত্যূষে ও গোধূলি সময়ে আলোও আছে, অন্ধকারও আছে। কে অস্বীকার করিবে? বিজ্ঞান যে ফটো তোলার তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহা লাইট ও লেন্সের সম্মিলনে উদ্ভূত। হাক্সলীন উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ...মনের স্তরে পরস্পর বিরোধী দুই বস্তুর মিল নাই, সেখানে তাহারা চিরদিন পরস্পর হইতে পরস্পর পৃথক। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা নয়। এমনও একটি অবস্থা জীবনের মধ্যে আছে, যেখানে উহারা মিলিয়া মিশিয়া একত্র অবস্থান করিয়া জীবনকে আগাইয়া লইয়া চলিতেছে। মনের পরস্পর অসহিষ্ণুতার স্তর ডিঙাইয়া এই জীবনের স্তরে, প্রাণের স্তরে বিশ্বসত্যতা আজ পৌঁছাইতে চাহিতেছে"। নর-নারী, ধনিক-শ্রমিক, আমেরিকা-রাশিয়া বা চীন যাহাদের একান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া জানিতাম—এই জীবনের এই প্রাণের দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিলে দেখিতে পাইব উহাদের মধ্যে কেবল বিরুদ্ধতাই নাই—পরস্পর পরস্পরকে পরিপূরণ করিয়াই পরস্পর টিকিয়া আছে। আজিকার পদার্থবিজ্ঞান ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই 'বাস্তবে'-র ধর্ম এই ভারতেই জন্মিয়া ছিল—কিন্তু ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই। আবার এই ভারতে এই আধুনিকতম সময়ে এই বাঙলাতে তাহা রূপ পাইতেছে, পাইবে।

"শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ ইউরোপীয় জড়-বিজ্ঞানে এবং পাশ্চাত্য ইউরোপীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানে। প্রাচ্য পাশ্চাত্য এই দুই রকমের ইউরোপীয়ানা লইয়া মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছিল। মুখোমুখি দাঁড়ানোর অন্তরের কথা হইতেছে উহাদের সমন্বয়-বিধান। এ দেশের শাস্ত্র ও সমাজ-ব্যবস্থা এমন করিয়া জড়বাদকে অস্বীকার করিয়াছিল বলিয়াই না তাহার প্রতিক্রিয়ায় এদেশের সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা সব পাশ্চাত্যের জড়বাদের প্লাবনে ভাসিয়া যাইতে পারিল, এ দেশ পর পদানত হইল, একান্ত অন্তর্মুখী সাধনার ফাঁক দিয়া বহির্মুখী পাশ্চাত্য এ দেশের সব কিছুর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, অসূর্যম্পশ্যা মেয়েরা ঘর ভাঙিয়া রাস্তায় বাহির

হইল, অস্পৃশ্যের দল উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে জোট বাঁধিবার সুযোগ পাইল, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা চূর্ণীকৃত হইল।" আজ ভারতবর্ষই এমন ধর্মের বার্তা আনিয়াছে "যে-ধর্মের ভিতর জড়বর্ম ও অজড় ধর্ম পরস্পরের দাবী স্বীকার করিবে, আদর্শকে মাটির বুকে টানিয়া নামাইবে, মাটির জগৎকে ব্রহ্মমহিমায় গড়িয়া তুলিবে।...এই ধর্মই ভবিষ্যৎ মানব জাতির ধর্ম।"...শ্রীনিত্যগোপাল-প্রস্থাপিত এই জড়-অজড় সমন্বয় ধর্মের কথা ডঃ রাধাকৃষ্ণণও বলিয়া গিয়াছেন। এই ধর্মকে বুঝিতে পারিলেই ভারতবর্ষকে বোঝা হইবে। বিশ্বের বুকে বিদ্যমান দুই পক্ষ আজ যে আবার পরস্পরকে বুঝিতে চাহিতেছে, প্রতি পক্ষই বুঝিতেছে যে অপরকে নস্যাৎ করিয়া সে বাঁচিবে না—ইহা এই সমন্বয় ধর্মের আকর্ষণে। এই সমন্বয় ধর্ম, সামগ্রিক ধর্ম—এই ভারতবর্ষের—দেখানে শোষক নাই, শোষণ নাই, উচ্চনীচের কৌলীন্য নাই, আছে প্রত্যেকের যথাস্থানে তাহার মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি আর আছে পরস্পরকে দিয়া পরস্পরকে গড়িয়া তুলিয়া সমগ্রকে গড়িয়া তোলা—বাদ দিয়া শুধু ভারতবর্ষের কেন কোন দেশেরই সর্বাঙ্গীণ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়—ব্যক্তি বা সমষ্টি কাহারও শেষ মুক্তিও সম্ভব নয়। একান্ত সমষ্টি নিরপেক্ষও ব্যক্তি হয় না, ব্যক্তি-নিরপেক্ষও একান্ত সমষ্টি হয় না। ভারতবর্ষ দেখাইয়া গিয়াছে পিতা-মাতা, গুরু, রাজা হইলেই তাহারা শাসক হয় না—শোষক না হইয়াও পারেন—তাঁহারাও বন্ধু ও পথপ্রদর্শক হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে শোষণ কোথাও নাই—তিনি শোষণমূর্তি: এই শোষণঘন সমগ্র-ধর্মী শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া ভারতবর্ষকে চিনিতে হইবে।

উজ্জলভারত সূচীপত্র : শারদীয়া ১৩৭৯, ১৯৭২

শ্রীশ্রীদুর্গা (কবিতা)
শ্রীনিত্যগোপাল

পূজা ও জীবন
শ্রীরেণু মিত্র

পূজার ভাবনা ১৩৫
শ্রীসুনীতি সান্যাল

শাসককেন্দ্রিক সভ্যতার পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সভ্যতাই ব্যক্তি মানুষকে মুক্তি দিতে পারে ১৩৮
শ্রীবলেশরঞ্জন দাস

ভারতীয় সংস্কৃতি ১৪৬
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

ধর্ম-সমন্বয়
জনাব রেজাউল করীম

ঋষি অরবিন্দ
শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

একটুখানি
শ্রীঅমিয়মোহন বসু

প্রাণের কথা (২)
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১০। প্রার্থনাকালীন ভাবণ
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রসঙ্গ

আনন্দিত জীবনের স্বপ্ন (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ

১২। দায়ী কে ১৬৮
শ্রীহরিদাস সাহা

১৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী
—১৯৪৪—(৪৩)

১৪। সাময়িকী : ভারতবর্ষ ও তাহার ধর্ম ১৮০

২৪-পরগণা জেলার অধিবাসীদের কাছে আবেদন।

- এবারের শারদোৎসবকে সার্থক আনন্দময় করে সার্বজনীন উৎসবে পরিণত করুন।
- আপনার আনন্দ যেন অপরের নিরানন্দের কারণ না হয়।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন।
- শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করুন এবং সরকারকে এই ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করুন।

* ২৪-পরগণার জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত।

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

অতি যত্নের সহিত অর্ডার অনুযায়ী
গৃহসজ্জার যাবতীয়
আসবাবপত্র
সরবরাহ করিয়া থাকি।

মৃণালিনী সেলস্ এম্পোরিয়াম্
দেশবন্ধুনগর বাগুইআটি
কলিকাতা-৫৯

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "কলিযুগ বিদ্রোহের যুগ, নির্বিকল্প যুগ। যে বেদবেদান্ত, যে দেব-পিতৃপূজা মানুষকে স্রষ্টা না করিবে, সে ক্লীব শাস্ত্র ভাঙ্গিয়া বীর্যবান, আত্মবান ভাগবত শাস্ত্র প্রদানই আমার প্রয়োজন। সর্বক্ষেত্রে দাসত্ব প্রবর্তনের বিরোধী আমি, উচ্ছৃঙ্খলতারও বিরোধী আমি। মানুষ আমার দাস হয়—ইহা আমার অসহ্য। আমাকে বিশ্ব হইতে তুলিয়া দিবার দুঃসাহস লইয়া যে পুরুষ আমাকে ভালবাসিবে, সেই পুরুষেরই আমি বশীভূত। না-মানাতেও আমার মানা রহিয়াছে, অর্জুন।"—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

"'অনির্বচনীয়তা'-বাদ যুক্তিক্ষেত্রে হোঁচট খাইবার মত বেশ একটা শক্ত প্রকাণ্ড স্তম্ভ-বিশেষ বটে। 'মায়া অনাদি, অনির্বচনীয়'—যুক্তির দরকারও। ব্রহ্মে মায়া আসিল কবে, কোথা হইতে? জীবই বা কবে মায়াগ্রস্ত হইল, কি করিয়া? প্রত্যক্ষ জগৎ দিতেছে 'বাধা', সেই বাধাকে হজম করিতে না-পারার ফলে বাধা-দানকারী বস্তু-গুলি প্রতিভাত হইতেছে হেয়রূপে। একদল দোষ দিল বাহিরের বস্তুকে, আর একদল বলিল, 'না, হজম শক্তিই কমিয়া গিয়াছে'।···দুই-ই অর্দ্ধ সত্য।···অন্ন কি স্বরূপতঃ বিষ? অন্নের বিষত্ব আপেক্ষিক···।···রোগ থাকিবে অন্তরে বাহিরে দুই জায়গায়, কিম্বা কোনও এক জায়গায়ই নয়।···দুই দিক দিয়াই রোগ নির্ণয় দরকার। দুইয়েরই অতীত অথচ দুই-ই একাধারে এমন যে জীবনীশক্তি যাহা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের 'পরাশক্তি', তাহাই প্রজ্ঞা ও প্রাণের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। অনন্তপ্রসারিত জীবনের মধ্যে এমন কিছু সামঞ্জস্যের নিশ্চয়ই অভাব হইয়াছে, যাহার ফলে হজমশক্তি কমিল, অন্ন বাধা দিল। একটী সুস্থ জীবনকে ধরিতে না পারিলে কিছুতেই সাংখ্যমত ও বিবর্তবাদের ব্যাখ্যার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।"

—অবধূতভাষ্য-ব্রহ্মসূত্র ১ম খণ্ড—পৃঃ ৯৩

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি ক্রিস্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। শ্রীমদ্ভাগবত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সর্ব-মত-সমন্বয়ের সঙ্গে সর্ব পথ-সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা সমন্বয়-মূর্তি শ্রীনিতাগোপালের জীবনের দৃষ্টান্তে সে সংবাদ আছে। আর আছে; ধার্মিক নির্বিকল্প সমাধিস্থ পুরুষ কি করে বিপ্লবী হতে পারে, একজগৎ ইচ্ছার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে—

নীচের বইগুলিতে তার খোঁজ পাবেন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
- ১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
- ২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
- ৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)

ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে
স্বরাজের পূর্ণরূপ
গীতাজয়ন্তী
উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)
মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে
পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা
(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২·০০

পাণ্ডুলিপি

৺প্রতিভা রায়ের

নারী-প্রগতির ভ্রমকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ -শিষ্য নিতাগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন
ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত
রবীন্দ্র-হৃদয়
প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (ভায়া—কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা। ফোন : ৫৭-২৫৪০

প্রতি সংখ্যা ০·৮০, বার্ষিক ৫·০০ শারদীয়া ১·২৫

for Your requirements of

Superphosphate, Sulphuric acid, Sulphate Alumina (ferric & iron free) Cryolite, Lime Sulphur Solution and Granulated Fertilisers mixtures of all grades

Contact :

THE PHOSPHATE CO. LTD.

14. Netaji Subhas Road,
Calcutta-1

Telephone : 22/0771/73

Gram : Superalum

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীবিত্যাগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয় সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহামঠ"

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৯, ১৯৭২ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র পঞ্চবিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রেকারিং ডিপজিট স্কীম

ইউবিআই-তে

সুদের হার বাড়লো

১লা মার্চ ১৯৭২ থেকে ইউবিআই-এর রেকারিং ডিপজিট স্কীমে টাকা জমানো আরও লাভজনক। আপনার সুবিধেমত ৪৮, ৬০ অথবা ৮০ মাসের কিস্তিতে জমাতে পারেন।

- আপনার সঞ্চয় চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে বাড়ে।
- জমা করতে কষ্ট হয় না। ৫ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে যে কোন নির্দিষ্ট টাকাই মাসে মাসে জমাতে পারেন। টাকা অবশ্য পাঁচের গুণিতক হওয়া চাই।
- অপ্রয়োজনে যে টাকা থাকেও না আবার কাজেও লাগে না সেটা মাসে মাসে জমানোই মোটা টাকা পাবেন। সত্যিকার প্রয়োজন মিটবে।
- বারো মাসের মেয়াদে কেপিটল্যাল অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। উৎসব পার্বণে খরচের ধাক্কা সামলাতে কাজে লাগে।

মাসিক কিস্তি টাকা	মেয়াদ শেষে আপনি পাবেন		
	৪৮ মাস টাকা	৬০ মাস টাকা	৮০ মাস টাকা
৫	২৭৭	৩৬০	৫১৮
১০	৫৫৪	৭২০	১০৩৬
২০	১১০৮	১৪৪০	২০৭২
২৫	১৩৮৫	১৮০০	২৫৯০
৫০	২৭৭০	৩৬০০	৫১৮০

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBF-38-72

উজ্জ্বলভারত

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭২ পঞ্চবিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

'তব কথামৃতম্'—
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কথামৃতম্

।। শ্রীসুনীতি সান্যাল ।।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়
ওঁ নমো পুরুষোত্তমানন্দায়

আজকের এই দিনটীতে আমরা আপনাদের সকলের সাথে মিলিত হবার আহ্বান জানিয়েছি। যিনি এই দিনটিতে ভারতের তথা বাংলার পুণ্য ভূমিতে এসেছিলেন ভারতের কথা, ভারত-আত্মার কথা সমগ্র বিশ্ববাসীকে শোনাবার জন্য, বিশ্ববাসীকে নতুন ছাঁচে গড়বার জন্য, সেই মানুষ-পাগল মানুষটী শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ, বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ। নিখিল বিশ্বের সাথে একাত্ম হয়ে তাঁকে আমার অনন্ত জীবন ধারার প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই জীবন ও জগৎ-তত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে। তাঁরই স্পর্শে এবং শক্তিতে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বিশ্বের সকল মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের বারতা সারা জীবন ধরে বহন করে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে চোখের জলে ঘুরেছেন, জীবন-যাত্রা শেষে তারই বারতা রেখে গেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রমে। বলে গেছেন প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখো, মানুষ আসবে। তাঁর এই জন্মলগ্নকে কেন্দ্র করে আপনারা এসেছেন, আপনাদের আমার শ্রদ্ধা জানাই। আজ স্বামীজী কত খুশী হয়েছেন। তাঁর আনন্দ আজ সকলের ওপরে বর্ষিত হচ্ছে। তাই আমরাও আনন্দিত। পুরুষোত্তমানন্দের আশ্রম ভারতবর্ষের আর পাঁচটা আশ্রমের মত নয়—এখানে ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্য নেই, বহু মানুষের আনাগোনা নেই—এক কথায় চোখ ঝলসানো কিছুই নেই, বর্ত্তমান কালের মানুষকে আকর্ষণ করবার মত একান্ত বাহ্য বস্তু কিছুই নেই। আমরা সাধারণতঃ এটাই বুঝি মঠ মন্দির বা আশ্রম মানুষকে দিয়ে থাকে পরলোক বা জগদাতীত লোকের কথা, জপ তপ ধ্যান ধারণার কথা অথবা অলৌকিকত্বের আশ্চর্য্য নিদর্শন। কিন্তু শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যে আশ্রম গড়লেন তাতে রেখে গেলেন যে কী বস্তু তার খবর আজও মানুষের হৃদয়ের দুয়ারে পৌছাতে না পেরে আমরা বেদনায় ভারাক্রান্ত। তবু তাঁর কথা—প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখো, মানুষ আসবে—তাই প্রদীপ জ্বালিয়ে আজও নরনারায়ণ আশ্রম সকল মানুষের আশায় বসে আছে, অনন্ত কাল ধরে বসে থাকবে। মানুষ আসবে—মানুষের মন মানুষ বুঝে নেবে, নরনারায়ণ আশ্রম সার্থক হবে, আশ্রম-দেবতা তৃপ্ত হবেন।

পুরুষোত্তমানন্দ এসেছিলেন আমাদের মধ্যে আজ থেকে ৮৯ বৎসর আগে। ভারতবর্ষ তখন বৃটিশ-শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষ। ভারতের মানুষ ছিল বিদেশীদ্বারা শোষিত, লাঞ্ছিত। পাশ্চাত্যের চোখ ঝলসানো ভাবধারায় ভারতের মানুষ ভারতত্ব হারিয়ে দিশেহারা। একদল মানুষ ভারতবর্ষের স্থাণুধর্মী অন্ধ ব্রহ্মবাদের নেশায় জড় জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞানে আগন্তিক লাঞ্ছনা, পর পদানত থাকায়

অপমানকে অপমান বলে আঁকড়ে ধরতেন না। আরেক দল পাশ্চাত্যের বিলাসোপকরণের মোহে ভারতীয় ভাবধারা বিসর্জন দিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরবাসী, বিদেশবাসী হতে লাগলেন।

এমনই যুগসন্ধিক্ষণে পূজনীয় শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বহু মনীষী ভারতের মাটীতে জন্ম নিলেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারত-মাতাকে মুক্ত করবার জন্য আত্মাহুতি দিলেন। ভারতের দিকে দিকে নব জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। বরিশালের এক পল্লীগ্রামে মাতা মুক্তকেশীর কোল আলো করে শরৎকুমারও এলেন। শিশু শরৎকুমার বড় হতে লাগলেন কিন্তু কথা বলতে পারলেন না। ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শরৎকুমারের মুখে কথা ফুটল না। মাতা মুক্তকেশী পুত্রের জন্য তপস্যা করতে লাগলেন। মায়ের তপস্যায় বালক শরৎকুমারের মুখে ভাষা ফুটল। মায়ের তপস্যায় পাওয়া ভাষা দিয়ে সারা জীবন শরৎকুমার বিশ্ব-মাতার সেবা করে গেলেন। পুরুষোত্তমানন্দের ছোটবেলার এতটুকু তথ্য আমরা জেনেছি শিশুকাল থেকে স্বামীজী কেমন আপন ভোলা ছিলেন। ধর্মীয় যাবতীয় অনুষ্ঠানের ভেতর থেকে বিশেষ কথা কী আছে তা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতেন। শিশু বয়সে একটি পাত্রিতে একটা ছবি দেখেছিলেন—একজন মানুষ আর পৃথিবীর একটা মানচিত্র, মানুষটা পৃথিবীটাকে যেন সযত্নে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী ঐ ছবিটা দেখে পুলকিত হলেন এবং ওইটুকু বয়সেই তাঁর প্রাণের ভেতরে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল তিনিও পৃথিবীটাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁর সারা জীবনের চলার ছন্দই ছিল এই পচা গলা বিশ্বটাকে বিপ্লবের ধাক্কা দিয়ে পুরুষোত্তম-বিশ্বে গড়ে তুলবার দিকে। আপন-ভোলা পুরুষোত্তমানন্দ ছাত্র-জীবন থেকেই কেমন যেন আনমনা, বুকের ভেতরে কেমন যেন অসহ্য কান্না। বলতেন, কান্নায় যখন বুক ভারাক্রান্ত তখন মা মরে গেছেন এই কথা মনে মনে চিন্তা করে খানিকটা কাঁদতাম। এই কান্নাই ছিল তাঁর সারা জীবনের সাথী। রাজনৈতিক জীবনে বাংলার হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে পুরুষোত্তমানন্দের চোখের জল। মানুষকে পুরুষোত্তম-মানুষ, ব্রহ্ম-মানুষ রূপে গড়বার বেদনায় তাঁর এই কান্না। মানুষের দুঃখ, বেদনা, শোক তাপ, সাধনাকে নিজের জীবন দিয়ে শুষে নেবার জন্য, মানুষকে সকল তাপ থেকে মুক্ত করবার জন্য ছিল তাঁর এই কান্না।

এমনই মানসিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র দিয়ে স্বামীজী সাক্ষাৎ পেলেন সমন্বয়াবতার ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের। যে জগৎ ছিল শাস্ত্র ব্যাখ্যার মিথ্যা মরীচিকা, শ্রীনিত্যগোপাল সেই জগৎকে ব্রহ্ম-মূলে স্বীকৃতি দিয়ে ধার্মিক জগতে এনেছেন মহা বিপ্লব। এই শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলেছিলেন "টাকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব"। টাকা এবং সমাধি যে ব্রহ্মেরই বিবিধ আস্বাদন শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে তার প্রমাণ করে গেছেন এবং তারই বিশ্লেষণ রেখে গেছেন পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর অমূল্য গ্রন্থাদির মাধ্যমে। শ্রীনিত্যগোপাল বললেন—"এই বিশ্বই আমার মহামঠ —আমি বিশ্বনাগরিক"। কেমন করে প্রতি মানুষ বিশ্ব-নাগরিক হতে পারে, ব্রহ্ম-মানুষ হতে পারে তার কর্মসূচী দিয়ে গেলেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের হাতে।

শ্রীনিত্যগোপাল-শক্তিতে শক্তিমান শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর চির আকাঙ্ক্ষিত পথের যেন সন্ধান পেলেন। শিশু-কালের সেই পৃথিবীটাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বপ্ন যেন সফল হতে চলল। মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার, শোষণ, লাঞ্ছনা, জাতি ভেদের ঘৃণ্য আচরণ, সর্বোপরি পরাধীনতার গ্লানি তাঁর অন্তরকে দাগল করে তুলল। তিনি উপলব্ধি করলেন মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পথ দেখাতে ভারতের মাটী থেকে বিদেশী শোষণ দূর করতেই হবে। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং অষ্টাদশ কর্ম পদ্ধতি তাঁর প্রাণে সাড়া জাগাল। তিনি এই আন্দোলনকে জীবনে গ্রহণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের সেবায়, দেশের মানুষের সেবায়।

পিতা-মাতা পুত্রকে সংসারী করবার জন্য ধনীর সুন্দরী কন্যার সঙ্গে ১৯ বৎসর বয়সের শরৎকুমারকে বিবাহ দিলেন। তিনি পত্নীকে তাঁর যাত্রাপথের জীবন-সঙ্গিনী-রূপে গ্রহণ করলেন। এই সময় স্বামীজী কংগ্রেসের কাজে বাংলার গ্রামে, শহরে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে বের হলেন।

কাজ করতে অর্থ সংগ্রহও করতে হতো। [illegible] আবেদন তাঁর ঘরের ধন বিলিয়ে না দিয়ে কি করে কাছে চাইবেন? তাই একদিন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী সমক্ষে তাঁর আচার্য্যদেব শ্রীনিতাগোপালকে সাক্ষী রেখে স্ত্রীর প্রায় ৪০ ভরি সোনা আর নিজের ইনসিওরেন্সের ৭০ টাকা কংগ্রেসের ভাণ্ডারে দান করলেন। তাঁর প্রাণ-প্রাচুর্য্য ভরা বক্তৃতায় শত শত নারী গায়ের গহনা কংগ্রেস ভাণ্ডারে সে দিন দান করেছিলেন। যারা সমাজে পতিতা বলে গণ্য, তাদেরও তিনি "বাজারের মা" সম্বোধনে স্বরাজ মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। সাংবাদিক শ্রীদুর্গামোহন সেন মহাশয় লিখছেন, "তিনি আনলেন অসহযোগের নূতন ব্যাখ্যা। সে ব্যাখ্যায় মিশ্রিত হল রাজনীতির নীরস কাঠ কঠিন দর্শনের সহিত নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের আত্মা-পরমাত্মার সমন্বয়। স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি দেখাইয়াছেন ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পার্থ সারথীর সহিত বর্ত্তমানের যুদ্ধের কতখানি সামঞ্জস্য। তুলনা উপমা ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি শ্রোতৃবর্গের প্রাণে অভিনব ভাব সঞ্চার করিতেন—মানুষ তখন সর্ব্বপ্রকার ত্যাগদ্বারা স্বরাজ যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।" এই ছিল পুরুষোত্তমানন্দের স্বরাজ আন্দোলন। বৃটিশ সরকার তাঁকে কয়েকবার কারাগৃহে প্রেরণ করেছেন, আবার কতবার বক্তৃতা ক্ষেত্রে তাঁকে বন্দী করবার জন্য এসে হতভম্ব হয়েছেন তাঁর বক্তৃতা শুনে। তিনি যে তাঁর বক্তৃতায় সামগ্রিক আলোচনা করতেন তাই ব্রিটিশের শোষণের বিরুদ্ধে বলতে বলতে বেদান্ত বলতেন, কৃষ্ণ-কথা বলতেন। কারাগারে গিয়েও নিরস্ত থাকেন নি—পুরুষোত্তম দর্শনের ভিত্তিতে গীতা উপনিষদ ব্রহ্মসূত্রের অপূর্ব ভাষ্য রচনা করলেন। তাঁর এই ভাষ্যে শুধু পরলোকের পাথেয়ের কথা নয়, আছে জীবন্ত মানুষের সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্নার ভেতরে সুন্দর মানুষ, ব্রহ্ম মানুষ হবার চলার ছন্দ। তাই ত তাঁর কথায় বিশ্বাস করে আশা রাখব সুষ্ঠ মানুষ, দুঃখী মানুষ সবাই আসবে তাঁর অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ দর্শনের খোলে, সার্থক করবে মনুষ্য জীবন।

এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে দেশমাতৃকার সেবাযজ্ঞে কাজ-করবার পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবন চলে যান। বৃন্দাবনের মত জায়গায়ও জাতি-ভেদের কঠোরতা দেখে পুরুষোত্তমানন্দ ব্যথিত হলেন চর্ণীদাসের কুয়োর জল নিম্নবর্ণীয় যোগারা পেতো বৃন্দাবনের জলটুই সর্ব্বজন-বিদিত। তিনি এর [illegible] করতে লাগলেন বৃন্দাবনের সুধী [illegible] ব্যাখ্যা করে এই ঘৃণ্য আচরণ বন্ধ করতে [illegible]। কোন মানুষকে তার জাতি সম্বন্ধে [illegible] বৈষম্যমূলক আচরণ করা স্বামীজীর নীতি-বিরোধী মানুষ সত্য এই-ই ছিল তাঁর নীতি। তাই যে কোন স্তরের মানুষকে তিনি প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে তাঁকে সত্য মানুষরূপে গড়বার জন্য প্রাণপণ করতেন।

বৃন্দাবন থেকে ফেরার পর আবার দেশের ডাকে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গয়াক্ষেত্রে একবার তাঁকে বলতে শুনেছিলাম—বৃন্দাবনে থাকাকালীন স্বপ্ন দেখলেন শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর বুকের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন—"বাংলায় যা—বাংলায় কাজ আছে"। বাংলায় এসে সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দ গান্ধীজী প্রবর্তিত স্বরাজের বাণী আর শ্রীনিত্যগোপাল দেব-প্রবর্তিত জড়াদ্বৈত সমন্বিত বেদান্তের বাণী বাংলার ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর জীবনে রূপায়িত করবার জন্য চোখের জলে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরলেন। রাজনীতি নিয়ে যদিও তাঁর জীবনের প্রথম চলার সুরু, কিন্তু তাঁর জীবনে ও দর্শনে রাজনীতি, ধর্মনীতি, কর্ম্মনীতি, পরিবার নীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির কোন কোঠা-বিভাগ ছিল না। তাই তাঁর পরিবার-জীবনেও বেদান্ত-জীবন বাদ পড়েনি—বাদ পড়েনি রাজনীতি, সমাজনীতি-জীবনও। কবীর হীরেন দত্ত শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন—He has a life, he has a call of the life, he feels the life। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে তিনি বলেছিলেন—"আজ বেদান্তের নূতন রূপ দেখলাম"। স্বামীজী যে জীবনখানি নিয়ে এসেছিলেন এবং সকলের জন্য জীবনের যে আহ্বান এনেছিলেন, তা বিশ্ব-মানুষের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট করাতে পারলে সত্যই আজ বিশ্বের মানুষ বিশ্ব-নাগরিক হয়ে সার্থক হতে পারত। তিনি ডেকে গেছেন এবং অনন্ত কাল

ধরে ডাকবেন, কিন্তু আমরা বধির হয়ে বসে আছি। ১৯০২ সনে অর্থাৎ আজ থেকে ৪৭ বছর আগে তাঁর প্রতিষ্ঠিত উদ্বোধন পত্রিকায় লিখছেন, "১৯২০ সনে কলিকাতায় কংগ্রেসে অসহযোগ নীতি গৃহীত হল, আমি তখন বেদান্ত ও ভাগবত আলোচনা নিয়ে ছুটাছুটি করছিলাম। ধীরে ধীরে ঠাকুরের কৃপায় যখন কংগ্রেসের লক্ষ্য, তাহার আকৃতি প্রকৃতি, তার সাধনা ও কর্ম তালিকাকে বেদান্ত ও ভাগবতের কার্যকরী ব্যাখ্যানরূপে বোধ করতে লাগলাম, তখন কংগ্রেসকে মূর্তিমান বেদান্ত, ভাগবত বা জনসাধারণের রূপে দেখে তার মাঝে ঝাঁপ দিলাম। বেদান্ত ভাগবত বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ গ্রন্থ নহে। ধার্মিক, সামাজিক, রাজনীতিজ্ঞেরা ভুলা ভাবেই আস্বাদন করতে পারেন বলেই না উহা নির্বিশেষ। ব্রহ্মও যেমন নির্বিশেষ, বেদান্ত যেমন নির্বিশেষ, আমার কংগ্রেসও তেমনি হবে নির্বিশেষ; ধর্ম, সমাজ পরিবার ও রাষ্ট্রের সমন্বয় হবে কংগ্রেস। বেদান্তের ছাঁচেই ভারতের সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম সব মূর্ত হয়ে বেঁচেছিল। যে বেদান্ত ছিলেন মনে মনে কোণে, তাঁদের আজ বাইরে দুনিয়ার বুকের উপর প্রকাশ্য রাজপথে ছড়িয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে হবে—ব্রহ্মও যেমন অদ্বৈত, জড় জগৎও তেমনই অদ্বৈত, তার সাধনাও তেমনি অদ্বৈত। এই অদ্বৈত সাধনাই ভারতের প্রাণস্পন্দনকারী রাষ্ট্রনীতিতন্ত্রের জীবন কাঠি ও মরণ কাঠি। সেই আমার জীবনে প্রথম কংগ্রেসে যোগদান, হয়ত বা সেই শেষ। ভারত আজ প্রাণের উপাসনা ছেড়ে দিয়ে মনের উপাসনায় রত, মন হতে উৎপন্ন মনোজ কাম তাই ভারতের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করছে। ধূলা-ধূলির ভিতরে যে কামের তাণ্ডব নৃত্য, তা আজ বেশ পরিস্ফুট দেখছি"। তাঁর ধ্যানের এই কংগ্রেসের ভেতর ধূলাধূলির চিত্র তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল সেদিন। তিনি বললেন কংগ্রেসের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের ও কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ ভাববার সুযোগ পেয়েছি। আর এক জায়গায় লিখছেন "Truth in itself"—আস্বাদনই ভাগবতের কৈতবশূন্য রস। ধর্মরক্ষার জন্য, অর্থ বৃদ্ধির জন্য, ভোগ সুখের জন্য বা পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যও ভারতবর্ষকে ভজনা করি না। ভারতকে ভজনা করি ভারতের জন্য, ভারতের পুরুষোত্তমকে পাবার জন্য। India in herself ভজনাই বর্তমান ভাগবত আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেবক নিজে এই ভজনানন্দে মাতাল হয়ে প্রত্যেক জাতিকে তার দেশের স্বরূপ ভজনে নিযুক্ত করবে। যতই ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত হতে চাইব ততই পরাধীনতার প্রকৃতি আমাদের অধিকতর গ্রাস করবে। মুসলমান তাড়াতে গিয়ে অধিকতর পরাধীনতার বন্ধন ব্রিটিশের হাত থেকে পেয়েছি, আবার ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত চাইতে গিয়ে আমরা অজ্ঞাতসারে বন্ধনের যা মূল কারণ তাতেই লীন হব। তবে কি বন্ধন মোচন নেই? নিশ্চয়ই আছে। যদি ভারতকে ভাল-বাসতে পারতাম, যদি মুসলমান-বিদ্বেষ অপেক্ষা ভারত-প্রেম আমাদের হৃদয়ে প্রধান স্থান অধিকার করত, ইংরেজ আসতে পারত না। বর্তমানে আমরা বিদ্বেষের ভিতর দিয়ে মুক্তি চাইতে গিয়ে বন্ধনকে আরও গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছি। মুক্তির অভিসন্ধি থাকলে মুক্তি আসে না। মুক্তির নামে যা আসে তা এক অত্যা-চারীর হাত থেকে অন্য অত্যাচারীর হাতে যাওয়া—(From frying pan to fire)। যারা দীন দরিদ্রের প্রতি কৃপাবশতঃ নিরন্ন উলঙ্গের প্রতি সহানুভূতির অছিলায়, বেকার সমস্যার সমাধানের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তাড়নায় দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান তারা বেদব্যাসের মত 'অসম্পন্নই' থাকবেন। কৃপা করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাহাকেও কৃপা করা যায় না, সেটাও একটা অত্যাচার। কৃপার ভিতরে জন্মে যে democracy, তা demeracy-র নামে আমলাতন্ত্রের অত্যাচারেরই একটা নূতন সংস্করণ মাত্র। ধর্মের জন্য নয়, অর্থের জন্য নয়, মুক্তির জন্য নয়, শুদ্ধ নিষ্কাম ভারত-ভজনের ভিতর দিয়েই ভারতের ধর্ম, ভারতের অর্থ, ভারতের কাম ও মুক্তি ভারতে ফিরে আসবে। আমার কামনা সুখের স্বরাজের মরণময় ভজনে ধর্মময় ভারত সোনার ভারত, কামময় ভারত মোক্ষময় ভারতরূপে বিশ্বজননীরূপে উদ্ভাসিত হবেন"। আবার লিখছেন, "রাজনীতিকে ধর্মনীতি হতে বিচ্ছিন্ন

করার ফলে এসেছে ভারতবর্ষে যত ভ্রাতৃবিরোধ। ইংরেজ আমাদের সাধারণ শত্রু—এই প্রচার করে ভাইয়ে ভাইয়ে কিছুক্ষণ মিলন আনতে পারবে বটে কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে লড়বার পূর্বেই বা মধ্যেই ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ অনিবার্য অপরের উপর বিদ্বেষ-বুদ্ধি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা বাতুলের কার্য; পক্ষান্তরে রাজনীতি ক্ষেত্রের সংস্কার ফেলে রেখে কেবল ধর্মসংস্কার ও জাতিকে অধিকতর ক্লীব করবে"।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি পুরুষোত্তমানন্দ আজ থেকে ৪৭ বৎসর আগে যে কথা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন সেই ভ্রাতৃ-বিরোধের বিভীষিকা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তথা বাংলার মানুষ আমরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। ভারতের মানুষের ভারতীয়ত্ববোধ জাগিয়ে তুলে তাকে বিশ্ব-মানবে গড়ে তোলার সাধনাই ছিল স্বামীজীর সারা জীবনের ধ্যান। তাই তিনি বলতেন "আমি রাজনীতি করি মানে রাধানীতি করি"। আজকের দিনে এই রাধানীতি সমন্বিত রাজনীতিই জনসাধারণের সামগ্রিকভাবে পরম প্রয়োজন।

নরনারীর জীবনে শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা উল্লেখ করে স্বামীজী তাঁর ভাষণে লিখছেন, "বিশ্বের বর্তমান শিক্ষা-সভ্যতা একটা মহা প্রহেলিকা, মহা সন্দেহ। পুরুষের আছে বুদ্ধি, শিখতে হবে প্রাণ; মেয়েদের সবল প্রাণ, লাভ করতে হবে বুদ্ধি। মেয়েরা প্রাণের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সেবা সহায়ে বুদ্ধির রাজ্যে ব্রহ্মময়ী হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। পুরুষের জন্য ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ বুদ্ধির সংকোচ, নারীর জন্য সেবা অর্থাৎ বুদ্ধির প্রসার। ব্রহ্মচর্য পথে পুরুষের বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা কাটে এবং প্রাণের নাগাল পায়, সেবার পথের নারীর প্রাণের তামসিকতা দূর হয় এবং বুদ্ধির সাক্ষাৎ মেলে। ব্রহ্মচর্যবিহীন জীবন পুরুষের পক্ষে নরক, সেবাবিহীন জীবন নারীর জন্য নরক। পুরুষের শিক্ষা হবে বুদ্ধির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মচর্য দ্বারা বুদ্ধির সংকোচ ও প্রাণের প্রসার; মেয়েদের শিক্ষা হবে প্রাণের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সেবার ভিতর দিয়ে তার inertia-র সংকোচ ও বুদ্ধির প্রসার। মেয়েরা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে বাইরে যাবে না, ঘরকে ঘর রেখে ঘরকে বড় করতে করতে তার ভিতর থেকে বাহিরকে ফুটিয়ে তুলবে। যে শিক্ষায় পুরুষ ব্রহ্মচারী, মেয়েরা সেবাপরায়ণা হয় না, সে শিক্ষা ত আসুরী। এই আসুরী শিক্ষার হাত থেকে সমাজকে বাঁচাবার জন্য দীর্ঘকাল আগেই স্বামীজীর সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। এইভাবে তাঁর সারা জীবনের ঘটনার সকল ক্ষেত্রের বৈপ্লবিক সংস্কার সাধনাই ছিল তাঁর জীবনলীলা। কী পরিবার নীতি, কী রাজনীতি, কী সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় বিশ্বকে এক নতুন আলোকের সন্ধান দেয়।

আজ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রমে তাঁর সমাধিতলে তাঁরই আলোকে জগৎ ও জগৎবাসী সকল মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনে চলার ছন্দ শিখব, এবং ঐ ছন্দের চাবিকাঠি তাঁর ঐ অমূল্য গ্রন্থরাজি ও অগণিত ভাষণ তাঁর ধ্যানের মানুষের হাতে তুলে দেব এই ভরসায় আছি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন নরনারায়ণ আশ্রম—আমরা কেউ বা একান্ত নরের উপাসক, কেউ বা একান্ত নারায়ণের ধ্যানে বিভোর। পুরুষোত্তমানন্দ নর ও নারায়ণ উভয়ের সেবা করেছেন প্রতি কর্মের ভেতর দিয়ে। কালের প্রচণ্ড বিবর্তনে মানুষী সভ্যতা এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে যতই জড়বাদের চরম অভিব্যক্তি হচ্ছে, ততই মানুষের অন্তরের শূন্যতা বেড়ে চলেছে। সর্বদা কী যেন চাই, কী যেন নাই, কী যেন হতে হবে; শুধু আরও চাই, আরও চাই। কী হতে হবে সেই কথাটিই পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর সারা-জীবনের কর্মে ও বাণীতে পথের নিশানা দিয়ে গেছেন।

বর্তমান যুগে মানুষ প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধির কারসাজির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির মারপ্যাঁচই তাদের কাছে সকল ক্ষেত্রের সমাধানে সক্ষম —তাই বার বার মনে পড়ে ঐ প্রাণপ্রাচুর্যা ভরা সুন্দর মানুষটীর কথা। প্রাণ ঢেলে শোনাতে ইচ্ছা করে সকল মানুষকে তিনি কেমন করে প্রাণের চোখ দিয়ে সকলকে দেখতেন, প্রাণসমন্বিত বুদ্ধি দিয়ে সকল ক্ষেত্রের ব্রহ্মসমাধান আস্বাদন করতেন।

তাই আবার বলি—আপনারা স্বামীজীর নরনারায়ণ আশ্রমকে সার্থক করুন, তার মানুষ-পাগল প্রাণ মানুষ আপনাদের পেয়ে তৃপ্ত হোক, তাঁর আনন্দ সকলের ওপর বর্ষিত হোক। তিনি চেয়েছিলেন ধরার ধূলি হবে ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হবে ব্রহ্ম-মানুষ। তাঁর এই চাওয়া আমাদের জীবনে মূর্ত হোক। শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হোন্, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জয়যুক্ত হোন, বিশ্ব ও বিশ্ববাসী জয়যুক্ত হোন।

অনুধ্যান

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

মন খুঁজে পেতে চায় একটি মনের মত মন,
হৃদয় সান্নিধ্য চায় সেই হৃদয়ের
সহৃদয় যে হৃদয় :
মেলে না কোথাও বুঝি, তাই মন কেঁদে কেঁদে মরে
নেই বুঝি কোনখানে সেই মন, সেই সে হৃদয়।
রিক্ততার বেদনায় দিন কেটে যায়।
বিভ্রান্ত সবাই যেন লক্ষ্যহারা এলোমেলো চলে—
কেউ খোঁজে পথরেখা, যে-পথ গিয়েছে তীর্থে
জীবন-সঙ্গমে :
কেউ বীতশ্রদ্ধ হয়ে এ-জীবন শেষ করে দেয়,
জীবনের মূল্য কিছু নেই তার কাছে।

মাঝে মাঝে খুঁজে পাই দুই এক জন,
যাকে পেয়ে মন খুশি হয়,
যার কাছে এসে তৃপ্ত অশান্ত হৃদয় ;
যে বলে প্রাণের কথা, যার কাছে সব কিছু 'ইতি',
নরর্থক নয় কিছু, ভালমন্দ সব কিছু নিয়ে
যে-মানুষ পরিতৃপ্ত, কণ্ঠে যার অজস্র ধারায়
ঝরে জীবনের কথা, যে-জীবন অমৃত-আস্বাদী,
মৃত্যুঞ্জয়ী যুগ যুগ ধরে।

কী ভালো যে লাগে সেই কথা !
কী আশ্বাস পাই সে-জীবনে :
বলিষ্ঠ উদার স্নিগ্ধ সে-জীবন সন্নিধানে এসে,
প্রাত্যহিক জীবনের বেদনা বঞ্চনা
কোথা যে হারিয়ে যায়, প্রজ্বলিত দীপশিখা থেকে
আর এক দীপের প্রজ্বলন,
ঊর্ধ্বশিখা স্থির অচঞ্চল।

তোমার জীবনখানি যখনই স্মরণ করি,
এইসব কথাগুলো মনে পড়ে যায়।
তোমার সান্নিধ্য আসে মনের গহনে,
যেমন মন্দিরে এসে দেবতার অমূর্ত অনুভব :
সম্মুখে দেবতা নেই,
অধিষ্ঠান মনের গভীরে।
সেইখানে প্রণামের নিঃশব্দ অঞ্জলি,
আশীর্বাদ স্বতঃস্ফূর্ত সস্মিত বচনে !

তারপর ফিরে আসা প্রসন্ন হৃদয়ে,
পাথেয় সঞ্চয় ক'রে দ্বিধাহীন সম্মুখ জীবনে। *

---

* শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৯০তম জন্মদিনে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-স্মৃতি-চারণ

।। শ্রীহৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ ।।

আজ আমরা ভারতীয় প্রজ্ঞানন্দনের অবধূত ভাস্কর শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের ৯০তম জন্মতিথি উদ্‌যাপনে সমবেত হয়েছি। ভগীরথ যেমন মন্দাকিনীর পুণ্যস্রোত দ্যুলোক হ'তে ভূলোকে অবতারণ ক'রে উষর ধূসর বৃত্তিকাকে সঞ্জীবিত ক'রেছিলেন, তেমনি জীবন্ত বেদান্তের পবিত্র প্রবাহে সহস্র সহস্র মানবের হৃদয়-সৈকত তরঙ্গায়িত ক'রে ছিলেন আমাদের অবধূত মহারাজ। কিন্তু যাঁর প্রবল অনভিভবনীয় ব্যক্তিত্ব, উদগ্র স্বাজাত্যবোধের সঙ্গে উদার সার্ব্বভৌম মানবপ্রেম, সেই যুগাচার্য্যের অমিয়-কথা কি তাঁর ভক্ত শিষ্যের সম্মুখে পরিবেশন ক'রতে পারব? মন যখন সংশয় দোলায় দোদুল্যমান তখন হরি-ভক্তি সুধোদয়ের সুধামাখা শ্লোকটি হৃদয় উদ্দীপ্ত করে—

অহো ফলং তাদৃশ দর্শনং হি
তস্য ফলং তাদৃশ গাত্রসঙ্গ।
জিহ্বা ফলং তাদৃশ কীর্ত্তনং হি
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে॥

সংসারে ভাগবতগণের সাক্ষাৎ লাভ দুর্লভ। তাদৃশ তৎসদৃশ ভক্ত দর্শনই নেত্রের ফল, তাঁদের গাত্র-সঙ্গই দেহ ধারণের ফল এবং তাঁদের গুণ বর্ণনে জিহ্বার ফল। তাই সেই গুণান্বিত পুরুষের গুণ-কীর্ত্তনে প্রয়াসী হ'লাম।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ছিলেন আদর্শ গৃহী, বিপ্লবী, আবার অবধূত সন্ন্যাসী। কি ভাবে জীবনে এই বিপরীত সমন্বয় সাধিত হ'ল সে কাহিনী যেমন বিস্ময়কর তেমনি চমকপ্রদ। আদর্শ গৃহীর দেহেই অবতীর্ণ হয়েছেন অবতারবৃন্দ বুদ্ধ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ। নীলকমলের আসনে মুক্তকেশীর অঙ্কে জন্মগ্রহণ ক'রলেন শরৎচন্দ্রনিভ নিষ্কলঙ্ক শিশু শরৎকুমার···।

সেকালে দেবতা গোলক ছেয়াগী, মাটির ঘরায় নরের দেহে
লইত জনম নরশিশুরূপে, বাড়িয়া উঠিত নারীর স্নেহে।

—কাঙ্কিনী রায়

শশীকলার ন্যায় দিনে দিনে ফুটে উঠতে লাগল তখন-কার খোকাটি, কিন্তু শিশুর ষষ্ঠ বর্ষেও কণ্ঠে বাক্ ফুটে না। নন্দনের মুখে ভাষা নাই, জননী মুক্তকেশী নিরানন্দ! করলেন যোষা রাজার ব্রত—শিশুর মুখে কথা ফুটে উঠল। পরবর্তীকালে দুঃখ সমস্যার সমাধানের বাণী সোমুখী ধারার ন্যায় তাঁর কণ্ঠ হ'তে নিঃসৃত হয়েছিল।

ভক্তিপরায়ণ মায়ের শিশু শরৎকুমার, বয়স বোধ হয়, ১০।১১ বৎসর, প্রত্যহ স্কুলের ছুটির পর গৃহে যখন প্রত্যাবর্তন করতেন সে সময় বাটীর বকুল তরুতলে ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথতেন। সেই ফুলহার বাড়ীর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের গলায় পরিয়ে দিতেন। কিন্তু এই মালা গাঁথাই তাঁর শেষ মালা গাঁথা নয়, সারাজীবন তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব আর রাধাতত্ত্বের মালা গেঁথে গিয়েছিলেন। তাই তো কবিগুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ব'লতে ইচ্ছে করে—

জীবনের ব্রত পূজা হ'ল না সারা
জানি হে জানি, তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।

তাঁর প্রাণ-প্রবাহ সংসারের মরুবালুচরে হারিয়ে যায়নি। ঐ পুণ্যধারা উত্তরকালে পদ্মাগঙ্গার দুই তটে বিপুল তরঙ্গ তুলে কালিন্দীর কূলকেও প্লাবিত করেছিল।

বিপ্লবময়ী রাধারাণী যে ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁকে বিপ্লবের পথে নিয়ে যাবেন তার সংকেত আমরা কৈশোর কালেই কিঞ্চিৎ জানতে পারি। যখন তিনি ১৪।১৫ বৎসরের বালক তখন হঠাৎ একদিন লক্ষ্য পড়ল বৌদিদের খাবার থালার উপর। অগ্রজদের খাদ্যের তুলনায় ভ্রাতৃবধূদের খাদ্য অনেক নিকৃষ্ট! গৃহকর্ত্রী জ্যেঠীমাকে তিনি দারুণ অগ্নিবাণে আক্রমণ ক'রলেন। তাইতো জাতির প্রতি কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল, "তবু মানুষ তোমরা, সত্যিকার মানুষ হও, কেউ

কাউকেও শোষণ কোর না, সকলে সকলকে নিজবোধে ভালবাস"।

শৈশব থেকেই শরৎকুমার ছিলেন সংসারে উদাসীন। লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না, কিন্তু কীর্তনাদি সৎ আলোচনায় ছিল অত্যন্ত অভিরুচি। পুত্রের বৈরাগ্য-ভাব দেখে পিতা ১৩১০ সালের অগ্রাণ মাসে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ক'রলেন। কিন্তু সংসারে নীলকমলের নন্দনের মন বস'ল কৈ? অবশ্য সৌভাগ্য ব'লে উষার মত শুদ্ধ উদ্বাসিনীকেই সহ-ধর্ম্মিনী রূপে লাভ করেছিলেন। পত্নীকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন, তাইতো পত্নীপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমে পাগল হ'য়েছিলেন।

বিবাহের ঠিক দুই বৎসর পরে আলোক-সন্ধানী শরৎ-কুমার অকস্মাৎ আলোকের সন্ধান পেয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল তখন নবদ্বীপে, ব্যাকুল-চিত্ত ভক্ত ভগবানের পদপ্রান্তে পতিত হ'লেন। অমৃতের স্পর্শ পেয়ে স্বপ্নালু মন নেচে উঠল মর্ত্যে অমৃতময় বৈকুণ্ঠ সৃষ্টির সাধনায়। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—

পেয়েছি সত্য লভিয়াছি পথ
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ
নাহি সংশয় নাহি আর ভয়
নাহি আর আগু পিছু।

বিত্তার্জ্জনের পথে ছেদ প'ড়ল। কাঁকুরগাছি থেকে এলেন কলকাতায়। মনের বাসনা বাণী-অর্চনা ছেড়ে এবার মা লক্ষ্মীর উপাসনা। কাটা কাপড়ের দোকান খুললেন—নাম দিলেন "বন্দেমাতরম্ ষ্টোর"। কিন্তু যুগাবতার শ্রীনিত্যগোপালের যিনি লীলা-সহচর রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর কাছে এ বৃত্তি মনঃপূত হবে কেন! রাধা-কৃষ্ণের পদরজঃমণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের জন্য প্রাণ হঠাৎ উতলা হ'য়ে উঠল। শ্রীমদ্ভাগবতের অমিয়কথা জীবনকে কেন সার্থক রূপদান করল—

পাদৌ হরেক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষিকেশ পদাভিঃ বন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কাম কাম্যয়া যথোত্তমঃ শ্লোক জনাশ্রয়া রতি॥

পদদ্বয়কে হরিক্ষেত্র বিচরণে, মস্তককে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনায়, সমস্ত কামনাকে তাঁহারই দাস্যে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। কোন ইতর কাম্যবস্তুতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। ভগবৎ ভক্তগণের প্রতি রতিই তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল।

গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে উপস্থিত হ'লেন ব্রজধামে। কিছু দিন পরে হঠাৎ একদিন স্বপ্ন দেখলেন—মহাপ্রভু বক্ষে চরণ অর্পণ করে ব'লছেন, "তুই বাংলায় ফিরে যা, এত বৎসর পর আবার বাংলায় দেখা হবে"। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলেন গৌড় রাজ্যে। সৌভাগ্যক্রমে বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পেলেন আচার্যের পদ। কয়েক বৎসর আদর্শ শিক্ষক রূপে দায়িত্ব পালন ক'রলেন কিন্তু নানা দুর্নীতি দর্শনে শেষে ত্যাগ ক'রলেন। প্রাণে বুঝি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির দীপশিখা। উপস্থিত হলেন কলকাতায় গুরু ভ্রাতাদের কাছে—সেখানে অনুপ্রেরণা পেলেন বেদান্তকার রচনার। সঞ্জীবনী মন্ত্রের ন্যায় তাঁর বেদান্তের নূতন তত্ত্ব লক্ষ লক্ষ মানবের জীবন উজ্জীবিত করে তুলবার শাস্ত্র রচনা করলেন।

১৯২০ সাল, অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ তখন দেশ জুড়ে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের ত্রিবেণীস্রোত যাঁর প্রাণে প্রবাহিত, তাঁর আর বিরাম কোথায়? তাই বেদান্তের বাণীকে বাস্তবে রূপ দিতে কংগ্রেসের আন্দোলনে আত্ম-সমর্পণ ক'রলেন। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিলাতী বস্ত্র বর্জন ক'রে চরকা কাটা, বিলাসিতার আবিলতা থেকে দূরে থাকা, বৃটিশের সোলামী না করা ব্যাপারে যে অগ্নিঝরা ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা জাতিকে উদ্দীপ্ত না ক'রে পারেনি—

দারুণ অগ্নিবাণে
হৃদয় তুষার হানে
রজনী নিদ্রাহীন দীর্ঘ যত দিন
আরাম নাহি যে জানে।

—রবীন্দ্রনাথ

একদিকে আমাদের অবধূত মহারাজ কৃষ্ণতত্ত্বে বিলসিত

হয়ে প্রেমের মোহন মুরলী ধ্বনিতে যেমন নবদ্বীপ, ব্রজপুরী, মথুরা, প্রয়াগ, সুরাট, বরদার জনমনকে বিমোহিত ক'রলেন, তেমনি বিপ্লবময়ী রাধারাণীকে অন্তরে জাগ্রত করে বিপ্লবের তূর্যনিনাদে সারা বঙ্গের যুবপ্রাণকে মধুরঙ্গে নাচিয়ে তুললেন। কবি নজরুলের ভাষায় তাইতো বলতে ইচ্ছা হয়,

"এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
আর হাতে রণ তূর্য।"

যুগাচার্যগণের দিব্যদৃষ্টিতে পরবর্তীকালের ঘটনা সবই দৃষ্ট হয়। তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী কোনদিনই বিফল হয় না। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী কে, এম, মুন্সী মহাশয় ১৯৫০ সালে যখন পণ্ডিচেরীতে যান তখন তিনি শ্রীঅরবিন্দের মুখনিঃসৃত আশ্বাস বাণী পান—

"This partition must go; It will end or will be ended. Pakistan must be brought within the ambit". আমাদের অবধূত মহারাজও আজ থেকে বাইশ বৎসর পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন "হাজার বছরের যে ঝড় আজ পূর্ব পাকিস্তানে জমাট বাঁধিয়াছে, পূর্ববঙ্গেই তাহার মীমাংসা হইবে পূর্ববঙ্গ আবার পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেদিন সুদূর নয়"। সত্য দ্রষ্টা ঋষিদের বাণী আজ সফল হতে চলেছে ভারত বাংলাদেশ বর্তমানে দুটি পৃথক রাষ্ট্র, দুটি পৃথক সত্তা। তথাপি একথা অনস্বীকার্য রাষ্ট্রের আদর্শ ও ভাব ভাবনার দিকে থেকে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই সেখানে ভারত বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সত্যই ছিলেন ভারতাত্মার বাণীমূর্তি। তাই তাঁর স্মরণ মননের দ্বারা আমরা নিশ্চয়ই অশেষ কল্যাণলাভ ক'রতে পারব। আজ এই সঙ্কটাপন্ন যুগে তাঁর স্মৃতি-চারণ সর্বার্থই করণীয় কর্ম। অমৃতলোক থেকে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করুন—আমরা যেন তাঁর মহাদর্শ থেকে চ্যুত না হই সব শেষে তাঁর পাদপদ্মে আমার স্বরচিত কবিতা কয়টি অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করি—

তব কর্ম জ্ঞান ভক্তির ত্রিবেণী ধারায়
এ জাতিরে তোল সঞ্জীবিয়া;
তোমার দুমার ধরজা ধরে তুলি যেন দৃঢ় হাতে
শুদ্ধ মন সর্ব সমর্পিয়া।

বিপ্লবী পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

ওঁ নমো শ্রীশ্রীনিত্যগোপালায়
ওঁ নমো শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দায়

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৯০ তম জন্মকে স্মরণ করে তাঁর পূণ্য সমাধিতলে আজ আমরা মিলিত হয়েছি—আপনাদের সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তাঁকে আমাদের প্রণাম জানাই। সেই সঙ্গে প্রণাম জানাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জীবন-দেবতা, সমন্বয়-মূর্তি শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালকে যাঁর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম যোগাচার্য শ্রীমদ্ জ্ঞানানন্দ অবধূত। বিপ্লবীদের সমন্বয়-সূত্র প্রস্থাপন করেই

শ্রীনিত্যগোপাল সমন্বয়-মূর্তি। এই সামগ্রিক সমন্বয়ের যে সূত্র শ্রীনিত্যগোপাল রেখে গিয়েছিলেন ১১৭ বৎসর আগে আবির্ভূত হয়ে, তাঁর থেকে ২৮ বৎসর পরে এসে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীনিত্যগোপালের সূত্রগুলি এই সামগ্রিক সমন্বয়ের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে বেদান্ত, এসার খানি প্রধান উপনিষদ্ ও গীতার ভাষ্য দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে রচনা করে রেখে গেছেন। সে ভাষ্য মানুষের অধ্যাত্ম-জীবনে যেমন, তেমনি তার এই বাস্তব জীবনের প্রতি স্তরে শোষণ থেকে মুক্তির পথ দেখাবে, প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রতি

স্তরে শোষণের বার্তা নিয়েই সে ভণ্ড আজকের মানুষের সভ্যতার দুয়ারে দাঁড়ায়। শোষণ-ঘন এই সামগ্রিক সংবরণের অন্তর্নিহিত সুরটি নানাভাবে দিকে দিকে ধরা পড়ছে, কিন্তু ভারতীয় প্রস্থানত্রয়ের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রগতভাবে তাকে মানুষের কাছে উপস্থিত না করা পর্যন্ত তো মানুষের জীবনে, সমাজ জীবনে তা স্পষ্ট রূপ নিতে পারছে না। আমরা আজ এই যে সমবেত হয়েছি এই পুণ্য মুহূর্তে আমরা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে একটু বুঝতে চাই, জানতে চাই, তাঁর জীবন ও তত্ত্বকে আস্বাদন করতে চাই। পঞ্চাত্তর বৎসরের সে জীবনখানি কেমন করে হয়ে উঠেছিল প্রেমে অনন্ত, কর্মে বিরাট, ভক্তিতে আপ্লুত, জ্ঞানে মহীয়ান সে কথা জানবার মত, ভাববার মত, অনুধ্যান করবার মত কিন্তু এমন একটা ব্যাপকতা গভীরতা দিয়ে সে জীবনখানি তৈরী ছিল যে তাকে প্রকাশ করা একেবারেই সহজ নয়। অল্প সময়ে অল্প পরিসরে কিছু তো বিশেষ বলা হয়ে উঠবে না, তবু তাঁর জীবন ও তত্ত্ব যে মানুষকে মানুষ হিসেবে কি ছন্দে আহ্বান করে ছিল যেখানে নেই শোষণ, নেই ভেদবাদ, নেই এতটুকু অমর্যাদা অসম্মান—অথচ কর্ম-জগতে বিরাট বিশ্বের মধ্যে ছিল যে জীবন ছন্দের প্রবাহ—সেই ছন্দেরই একটু পরিচয় নিতে চেষ্টা করব।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন অর্থাৎ সব কিছুর বাইরে ছিলেন, সব কিছুর অতীত ছিলেন একথা যেমন সম্পূর্ণ সত্য, তেমনি একই সঙ্গে সত্য যে পুরুষোত্তমানন্দ এ বিশ্বের গৃহিণীও ছিলেন—নিজেকে তিনি তাই মনে করতেন। অর্থাৎ তিনি বলতেন, বিশ্বনাথের এই যে সুন্দর সংসার একে যে আমাদের বুদ্ধি দোষে আমরা অসুন্দর করে ফেলেছি—একে আমি বিশ্বনাথেরই মত সুন্দর করে, নূতন করে গড়ে তুলব, গুছিয়ে তুলব—তাই তাঁর সংসারের আমি গৃহিণী। তাঁর ব্যক্তি-সংসার নিয়েই পুরুষোত্তমানন্দ এই বিশ্ব-সংসারে যাত্রা করেছিলেন—তাঁর ব্যক্তি-জীবন ব্যক্তি-জীবন থেকেও তা বিশ্ব-জীবনে পরিণত হয়েছিল। তাই fixed static ধারণা দিয়ে যারা জীবনকে দেখে তাদের কাছে তাঁর জীবন মোটেই সহজ-বোধ্য নয় এবং সেজন্য এই বুদ্ধিপ্রধান প্রাণহীন মানুষদের কাছে তাঁর সাধনাও কম হয় নি। জীবনের প্রতি স্তরে একটি মুক্ত জীবন-প্রবাহ রেখে যেতে প্রয়াস করে গেছেন তিনি—সে প্রবাহ দুদিকের তট ছুঁয়ে ছুঁয়ে সম্মুখ-প্রসারিত—আর তার অতলতাও সীমাহীন।

সমগ্র মানুষ পুরুষোত্তমানন্দকে যদি ভেঙে ভেঙে দেখি তাহলে দেখি শুরু হয়েও তিনি গুরুগিরি করেন নি, স্বামী হয়েও কোন একদিনের জন্য তিনি পুরুষ-কৌলীন্যের ভাষা বা ব্যবহার দিয়ে স্বামীগিরি ফলান নি, পিতা হয়েও তিনি ছিলেন বন্ধু—পিতৃত্বের কৌলীন্যের কোন গ্লানি কোনদিন তাঁতে প্রকাশ পায় নি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বলতেন, আমি এমন শিষ্য চাই যার শিষ্য আবার আমি হতে পারি। সব দেশের মানুষদের মধ্যেই এমন একটা স্তর আছে যেখানে গুরু হওয়া মানে গুরুগিরি করা। এর অত্যাচার সমস্ত দেশের সমাজের দিকে চাইলেই দেখতে পাব। মানুষকে এই গুরুগিরি কতখানি অমানুষ বানিয়েছিল তার পরিচয় পাব যখন মনে করতে পারব মানুষ সাধারণভাবে গুরু-মাত্রকেই আজ কতখানি অবজ্ঞা করছে। এই গুরুগিরি প্রত্যেক দেশেই মানুষের সহজ বিকাশের সহায়ক না হয়ে তাকে দাস করে রেখে তাকে শোষণ করেছে এ যেমন একশবার সত্য, তেমনি আমাদের শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এমনই একজন গুরু ছিলেন যিনি মানুষকে দাস বানাতে কত বেশী অপছন্দ করতেন তা বোঝা যাবে ঐ কথায় যে তিনি তেমন মানুষকেই শিষ্য করতে চেয়েছেন যার শিষ্য আবার তিনি হতে পারেন। গুরু হওয়া মানেই যে গুরু-গিরি করা নয়, শিষ্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যই যে গুরু এবং তিনি যে তাকে এতটা এগিয়ে দেওয়াতে চান যে আবার তার কাছেও কিছু শিখতে পারেন, কেননা প্রকৃতি দিনে দিনে নিজেকে বিচিত্রভাবে উদ্ঘাটিত করে চলেছে—নূতনতর ঘটনা, নূতনতর বৈচিত্র্যের আবেষ্টনের মধ্যে পথ দেখাবে অগ্রগামী শিষ্য—শেষ কথা বলে এ বিশ্বে তো কিছু নেই—পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে আমরা তা দেখতে পাব। পুরুষোত্তমানন্দ এমন ভাবেই ভেবেছেন, শিষ্যদেরও ভাবতে বলেছেন। শিষ্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ মানে কেবল

আত্মিক বা আধ্যাত্মিক বিকাশ নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জগতের সুন্দর সুন্দর কল্যাণকর বিকাশ তো অবশ্যই হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের অন্নময়, মনোময়, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষকে বিকশিত করে তুলে তাকে স্থিতি ও প্রগতি দান করাই হচ্ছে তাঁর মতে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। গুরু হয়েও এই মন নিয়েই পুরুষোত্তমানন্দ শিষ্যকে গ্রহণ করবার দিনে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা প্রথমে পাঠ করালেন যেখানে আছে যে পুরণো যুগ চলে গেছে, নূতন যুগ আসছে—চারদিকে এত অন্যায় এত বঞ্চনা বিধাতা আর সইবেন না, নূতন সমুদ্রতীরে নূতন সমাজ নূতন মানুষ তৈরী হবেই। কবিতা পাঠান্তে গুরু বললেন, এই নূতন সভ্যতা, নূতন সমাজ—প্রাণের সমাজ—তৈরী করতে হবে—যদি সাহস থাকে এস আমার সঙ্গে। সেই নূতন সমাজে কেউ কাউকে শোষণ করবে না, অথচ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হয়েও অপরের সঙ্গে বিধৃত হয়ে পূর্ণতর জীবন-সত্তায় সত্তাবান হবে। জীবনের এই নূতন মূল্য দিয়ে ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্ব সৃষ্টি করবার যে মন্ত্র সেই মন্ত্রই এই গুরু শিষ্যকে দিলেন। সঙ্গে দিলেন বন্ধকে প্রতি মুহূর্তে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার, বন্ধকে বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ারও মন্ত্র। গুরুগিরি যেখানে সেখানে গুরুরা পেয়েই থাকেন, শিষ্যরা দিয়েই থাকে। এই নিয়ম বলেই শিষ্যরা শোষিত হয়, আর গুরুর তহবিল ফুলে উঠতে থাকে। আর আমাদের শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ছিলেন এমনই কয়েকটী মানুষের গুরু, দেবার সামর্থ্য ছুরে থাক—গুরুর কাছ থেকে নিতেই যাদের হয়েছে। গুরু হয়েও শিষ্যের সুখদুঃখ ভালমন্দের জন্য এমন নিখুঁত সংবেদন-শীলতা পুরুষোত্তমানন্দের ছিল যে, তা ভাবলে স্তব্ধ হতে হয়! এত সূক্ষ্ম স্তরে বিচরণ করেও কোন বিষয়ে —না ঘটনায় না মানুষে—ছিল না তাঁর এতটুকু আসক্তি যা অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এইখানেই তিনি ছিলেন অদ্ভুৎ সুন্দর। এমন মুক্ত একজন মানুষ-গুরু যখন দেখেছি, পেয়েছি তখন কেমন করে বলব যে গুরু মানেই আমার ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতা হরণকারী? শিষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তিকে মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে জাগরিত করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, বিচারবুদ্ধি জাগিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নম্রতা, সংঘের প্রতি একনিষ্ঠতা, ঋজুমনস্কতার দিকটি তিনি সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করবার শিক্ষা দিয়েছেন। বিশ্বাসহীন বিচার বা বিচারহীন বিশ্বাস কোন একটী পথকেই জীবনের চলার পথ বলে তিনি মানতেন না। এই রকম গুরু পুরুষোত্তমানন্দকে তাই আজকের মানুষের পক্ষে প্রয়োজন বলে মনে করি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ স্বামী ছিলেন। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে এই কথাই শিখিয়েছিলেন যে তোমার আমার মধ্যে যখন একদিকে বিশ্ব ও আর একদিকে বিশ্বনাথ থাকবেন তখনই শুধু তোমার আমার প্রেম সত্য ও সার্থক। বিশ্ব ও বিশ্বনাথকে বাদ দিয়ে কোন দুইটি মানুষের মধ্যে সত্যকার মিলন সম্ভব নয় এই তত্ত্বটি তাঁর মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কার্যকরী-ভাবে ছিল। স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই যেখানে বিশ্বরূপ জীবন যাপন করেন আবার স্বরূপের ক্ষেত্রেও তাঁরা একীভূত—সেই খানে প্রেম বাস্তব ও মহান। পুরুষোত্তমানন্দের স্ত্রী যেমন ঘরের গৃহিণী হয়ে তাঁর সাথে একাত্ম, তেমনি তাঁর আদর্শের সঙ্গেও তিনি একাত্ম হতে সারাজীবন চেষ্টা করেছেন। তাই বাইরে স্বামীর সাথে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি যেমন সক্রিয় সহযোগী ছিলেন তেমনি বাইরের লোককে ঘরে আপন জনের মত সেবা করতেও তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন। স্বামী যে দেশের কাজে, মানুষের কাজে, বিশ্বনাথের কাজে সমস্ত জীবনটা সর্বতোভাবে দিয়েছেন, এতে তাঁর এতটুকু আপত্তি কোন সময় প্রকাশ পায় নি। সব চেয়ে বড় কথা এই যে পুরুষোত্তমানন্দ জীবনে কোনদিন তাঁর স্ত্রীকে এতটুকু অপমান করেন নি, কোনদিন অশ্রাব্য কটুবাক্য বলেন নি—যেহেতু আমি স্বামী সেই হেতু আমি কর্তা এবং আমার স্ত্রী অন্যায় বললেও আমার ইচ্ছা কেবল নিবিবাদে পালন করে যাবে—এ ব্যবস্থা তিনি কোনদিন করেন নি। কেবল তাই নয়—তাঁর স্ত্রীকে তিনি বলে রেখেছিলেন যে তাঁর থেকে যোগ্যতম স্বামী যদি তাঁর স্ত্রী পান তবে তাঁর স্ত্রী তাঁকে পরি-ত্যাগ করে যেতে পারেন—কত বড় বৈপ্লবিক চিন্তাধারা!

সত্যিকার প্রেম এ দুঃসাহস রাখে! পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর স্ত্রীকে তাঁর অন্তরের এ আকাঙ্ক্ষাও জানিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি যদি তাঁর স্ত্রীর আগে দেহত্যাগ করেন তাহলে তিনি মৃত এই চিহ্নস্বরূপ বিধবার বেশ যেন তাঁর স্ত্রী গ্রহণ না করেন। তাঁর স্ত্রীর জীবনে তিনি মৃত এ কথা তাঁর স্ত্রী মনে করবেন এটা তাঁর পক্ষে গভীর বেদনার কারণ হবে। তবে তাঁর এ বাসনা রক্ষা করতে যদি তাঁর স্ত্রীর ওপর কোন চাপ পড়ে তাহলে সে চাপও তিনি রেখে যেতে চান না—তা-ও বলে গিয়েছিলেন। কত বড় বিশ্বাসস্নিগ্ধ মুক্ত মনের পরিচয় এই সব ঘটনায় পাওয়া যায়। গভীরতম প্রেমের একাত্মতা অথচ কোন চাপ নেই। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই গান—ভগবৎ প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়ে যা লিখলেন—

এ সংসারে আর যাহারা আমায় ভালবাসে।
তারা আমায় ধরে রাখে বেঁধে কঠিন পাশে।
তোমার প্রেম যে সবার বাড়া
তাই তোমারি নূতন ধারা
বাঁধ নাকো, লুকিয়ে থাক—
ছেড়েই রাখ দাসে॥

সংসারী ভালবাসা বেঁধে রাখে, ধরে রাখে—ছেড়ে দিতে ভয় পায়—পাছে হারিয়ে যায়—কিন্তু ভগবান মানুষকে ওতপ্রোত করে ঘিরে রেখেছেন—তবু ছেড়ে রেখেছেন, বেঁধে রাখেন নি। পুরুষোত্তমানন্দের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে ছিল এই ছেড়ে রাখার সম্পর্ক, গভীর একাত্মতা। সে একাত্মতা আদর্শের—বিশ্বনাথ শ্রীনিত্যগোপালের জীবন-চেতনার। ব্যক্তিগত আসক্তি স্তরের ব্যাপারই তা নয়। তাই তো অদ্বৈত, জীবনে মরণে তা একই! পুরুষোত্তমানন্দ প্রতিটি মানুষের সঙ্গে ভাবে অর্থাৎ আদর্শে, কর্মে ও দ্রব্যে অর্থাৎ বস্তুতে গভীরভাবে একাত্ম হতে চাইতেন বলেই তাদের ঘরে বেঁধে রাখতে চাইতেন না—ছেড়ে দিয়েই রাখতে চাইতেন এবং সেই ছেড়ে রাখার চঙও জানতেন। তাঁর বিস্তীর্ণ ব্যাপক জীবনে তিনি শত শত মানুষকে প্রাণের এই একাত্মতায় অথচ তাদের স্বাতন্ত্র্য এতটুকু নষ্ট না করে সারাজীবন এক ভাবে ভালবেসে গেছেন। সাধারণতঃ মানুষ অন্যকে নিজের অধীনস্থ না করে ভালবাসতে পারে না। ধনিক শ্রমিককে অধীন করতে চায়, শাসক শাসিতকে অধীন না করে শাসন করতে পারে না, যে কোন ভাবে যে একটু উঁচুতে আছে, সে-ই অপরকে নিজের অধীন না করে পারে না কিন্তু তুমিও স্বাধীন স্বতন্ত্র, আমিও স্বাধীন স্বতন্ত্র—অথচ আমরা দুয়ে মিলে মিশে এক—এ কথাটা সমাজ-জীবনে আসতে চাইছে—এখনও রূপ পাচ্ছে না সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এরই জন্য। পুরুষোত্তমানন্দ স্বাধীনে স্বাধীনে মিলনের এই দর্শন রেখে গেছেন। তিনি নিজের অহং-এর ছাপ দিয়ে কোন কিছুই গ্রহণ করতেন না। তাই প্রেমের এই একাত্মতা তাঁর দেহে মনে এক অনন্য-সাধারণ মুক্তি এনে দিয়েছিল। তাই পুরুষকৌলীন্য তথা বহুবিধ কৌলীন্য অধ্যুষিত সমাজে তিনি ছিলেন এক অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রম। স্বামী হয়েও যে স্বামীত্বের কৌলীন্য না ফলিয়ে পারা যায়, অথচ তাতে পৌরুষত্বের অভাব থাকে না এতটুকু, থাকে না এতটুকু স্ত্রৈণতা, তাই থাকে না সেখানে কোন শোষণ—এ যখন দেখতে পেয়েছি পুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে, তখন কেমন করে বলব যে স্বামী মাত্রই শোষক, স্বামী মাত্রই অপরের স্বাধীনতাহরণকারী?

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ পিতা ছিলেন—সন্তানের জন্য পিতা হয়েও তিনি যে মায়ের অধিক অনুভবশীল ছিলেন সে সম্বন্ধে দৃষ্টান্তগুলি শুনলে বিস্মিত হতে হয়। এই তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাঁর শুধু তাঁর নিজের কয়েকটি সন্তানের জন্যই ছিল তা নয়—যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে এই মাতৃ-হৃদয়ের আকুতির পরিচয় পেয়েছে; আরও পরিচয় পেয়েছে ছোট বড় সকলের তাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রয়োজনের কথা তাদেরও আগে বুঝতে পারা ও তা সাধ্যমত মিটিয়ে রাখার হৃদয়ের। গুরু ও স্বামী হিসেবে যেমন, পিতা হিসেবেও তেমনি তিনি সন্তান ও সন্তান-সদৃশদের তীব্রভাবে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে সর্বাঙ্গীণভাবে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করে গেছেন। বেদান্তের ভাষ্যকার পুরুষোত্তমানন্দ বেদান্তের আলোচনা করেছেন যে প্রাণ নিয়ে, সেই প্রাণ দিয়েই বৃদ্ধ বয়সেও

পথহারা বিপর্যস্ত জীবন নিয়ে বিপদগ্রস্ত অশিক্ষিত মেয়েকে bat cat পড়িয়েছেন এই জন্য যে, যদি তাকে জীবনে স্বমর্যাদায় নিজ পায়ে দাঁড় করানো যায়। একটা মানসিক আদর্শ—যার মধ্যে রয়েছে যে কোন শোষণ থেকে মুক্তি আর আত্মমহিমার স্বাতন্ত্র্যে প্রত্যেকে মানুষের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের দিব্য রূপান্তর—সন্তান তথা সন্তানসদৃশদের সামনে শিশুকাল থেকেই তা তিনি তুলে ধরে ছিলেন। তাঁর সন্তানরা তাঁর আদর্শের পথে চলতে চলতে যখন ছুটি চাইল, বেদনার সঙ্গে হলেও তিনি নিজের পথে চলে এসেছেন তাদের পথে তাদের চলতে দিয়েছেন, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাখেন নি—তবে বিপদের দিনে তিনি সাধ্যমত তাদের সঙ্গে থেকেছেন।

এইভাবে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে জীবনের কোন স্তরে নিজে তিনি ছোট-বড় কাউকে শোষণ করেন নি, অন্যের দ্বারাও যাতে শোষিত না হন সেই ভাবেই জীবন চালিয়েছেন। চাকুরী করলে অন্যায় দেখলেও বলবার পথ থাকে না। অতএব তাতে শোষিতই হতে হয়, মুখ্যতঃ এই জন্যই বরিশালের মহাপ্রাণ অশ্বিনী দত্তের ব্রজমোহন স্কুলের চাকুরী পর্যন্ত তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজ শোষণ করছিল বলেই ইংরেজের শাসনের প্রতিবাদের আন্দোলনে সর্বতোভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এ জন্যে তিন বার তিনি কারাবরণ করেছিলেন, পুলিশের লাঠির আঘাতে তাঁর একটী আঙুল অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

ভারতবর্ষে ধর্মের যে কাঠামো তখন প্রচলিত ছিল এবং যে কাঠামোর অনুশাসন দিয়ে এ দেশের সমাজ তৈরী হয়েছিল, তা ছিল এই শোষণের ভিত্তিতে। তাই প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধেও তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। এই দুইয়েরই যে ব্যবহারিক কাঠামো ছিল, উচ্চ নীচ, কুলীন অকুলীন ভেদবাদদ্বারা তাতে শোষণের ব্যবস্থা ছিল কায়েম, তাই এই দুইয়ের বিরুদ্ধে তিনি ঐ শাস্ত্রেরই ভাষ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন চিন্তাবিদ যেমন সমাজের মধ্যে এই ভেদবাদ এবং তারই ফলে শোষণ কায়েম করেছেন, তেমনি পুরুষোত্তমানন্দ ঐ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনিতাগোপালের জীবনালোকে দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষের গীতা উপনিষদ্ বেদান্ত ভাগবত মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের ব্যবস্থা দিয়ে যান নি, মানুষ যা বস্তু যাই হোক কাউকে ছোট বা বড় বলে নির্দিষ্ট করে ছাপ মেরে দেন নি। যে সমাজ ও ধর্মীয় ব্যবস্থার ফলে মানুষে মানুষে ভেদের দুস্তর প্রাচীর তৈরী হয়েছে, হরিজনদের ব্যাপার নিয়ে আজও এত করে ভাবতে হচ্ছে, যে ব্যবস্থা বহুকাল হাজার বছর চলছিল, সেটা বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের দ্বারা প্রস্তাপিত হয়েছিল—সেটাই ভারতবর্ষের একটুকু কথা নয়। জন্মের দ্বারা জাতি নির্ণয় অর্থাৎ ছোট বড় স্পৃশ্য অস্পৃশ্য নির্ণয়ও ঐ সব ব্যবস্থাকারদেরই। এর পেছনে সেদিনের শাস্ত্রকার তথা সমাজপতিদের যুক্তিটি ছিল এই রকম—সত্ত্ব রজো তমো তিনটি গুণের মধ্যে ছোট বড় ভেদ করে নিয়েছিলেন—তাঁদের মতে সত্ত্ব গুণ সব চাইতে কুলীন, তারপরে স্থান দিয়েছেন রজোগুণের, তারপরে তমো গুণের। এইভাবে ভেদবাদের সিঁড়ি গুণের মধ্যেই স্থাপন করেছিলেন বলে যে যে গুণের অধিকারী তাকে সেই গুণী বলে চিরন্তন ছাপ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনিতাগোপালের জীবন-দর্শন অনুসরণ করে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বললেন, গুণের মধ্যে কুলীন অকুলীন করে ভেদ সৃষ্টি করাই জীবধর্ম-বিরোধী। মনুষ্য-বিজ্ঞান বলছে মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচতে সত্ত্ব রজো তমো তিনটি গুণই অপরিহার্য—স্থান কাল পাত্র ভেদে কোনটা কখনও বেশী, কখনও কম প্রয়োজনীয়। যেটা যার মধ্যে অধিক মাত্রায় তাকে সেই নামে অভিহিত করা যাবে বৈকি কিন্তু এদের মধ্যে কোনোটা কুলীন কোনোটা অকুলীন বলা যেমন কোনমতেই যাবে না, তেমনি এ ব্যবস্থা জন্মগত বলেও চিহ্নিত করে দেওয়া যাবেই না। সত্ত্ব গুণে যতখানি যেটাতে প্রয়োজন, সেটাতে তমোগুণের প্রয়োজন ততখানি নয় নিশ্চয়, কিন্তু যেখানে তমোগুণের একান্ত প্রয়োজন সেখানের সে প্রয়োজনকে অস্বীকার করা বা ছোট করে দেখা বা কম মূল্য দেওয়া কোনমতেই যাবে না। রজোগুণের যেখানে প্রয়োজন সেখানে তো রজোগুণ

ছাড়া কিছুতেই সে কাজ হবে না—তাহলে তার মূল্যও তো কম নয়। কিন্তু যার যার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনকে না দেখে যদি সোজাভেই একটাকে বড় আর একটাকে ছোট করে রাখি তাহলে যে মিথ্যাকে আশ্রয় করবাম, যে অমনস্তাত্ত্বিকতার, যে অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিলাম তা-ই আমাদের সমাজের বিকৃতির ও অবক্ষয়ের কারণ। প্রত্যেকের মূল্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে না পারলে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, কুলীন অকুলীনের ভেদবোধ বন্ধ করা যাবে না। শোষণের সোড়ার ইতিহাস এইখানে। রাষ্ট্রগত সাম্যবাদের স্বীকৃতিতে যে সমাজের শোষণের সোজাকার মনোবৃত্তি বদলায় নি তা বর্তমান ভারতের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালেই প্রমাণ পাওয়া যাবে—উচ্চবর্ণে আজও নিজেকে বিশেষ বলে চিহ্নিত করার মনোবৃত্তি যেমন ত্যাগ করতে পারে নি, হরিজনদের ব্যাপার নিয়ে সারা ভারতে যত ঘটনা ঘটছে তাও বন্ধ হয় নি। নরনারী, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনিক শ্রমিক, রাজা প্রজা—বৈপরীত্য বা বিরুদ্ধতা-সম্বন্ধিত কোন দুই বস্তু বা মানুষের কোন একটি অংশকে যদি ঐকান্তিকভাবে ও চিরন্তনভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া যায়, তাহলে একে অপরকে, সবল দুর্বলকে, কুলীন অকুলীনকে, শ্রেষ্ঠ নীচকে চিরদিন শোষণ করে যাবে—এতে আর আশ্চর্য কি! পুরুষোত্তমানন্দ এই সোড়ার চিন্তাধারায় কুঠার হানলেন—তিনি বললেন এ বিশ্বে বিপরীতধর্মী দুই বস্তু নিয়েই একটি পূর্ণ বা সমগ্র বস্তু—বৈপরীত্য বা বিরুদ্ধতা আছে বলেই এরা চিরদিন একে অপরকে অস্তিত্ব করেই চলবে তা নয়—এদের মধ্যে বৈপরীত্য আছে মানেই অপরকে দিয়ে নিজেকে পূর্ণতর করে নেবার জন্যে এদের মধ্যে আছে চিরন্তন আকর্ষণ। সেইটেকেও স্বীকার করে নিলেই আমরা দেখব সংসারে বিরুদ্ধতার সমস্যার মীমাংসা চিরন্তন শ্রেণী সংগ্রাম নয় মীমাংসা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অপরার্ধ—উভয়ে মিলে এক সমগ্র—তাই মিলতে এদের হবেই—এই চিন্তাধারার উপরে। পুরুষোত্তমানন্দ তাই দেখিয়েছেন গুণে গুণে বৈপরীত্য আছে, আকর্ষণও আছে—এরা সবাই মিলে মিশে সমগ্র জীবন—যার যথাস্থানে তার মূল্য অনন্ত। এই যথা মূল্যের স্বীকৃতিতেই বিশ্বের বস্তু বা শক্তি সব কিছুরই রূপ গেল পালটে—এই বিশ্বই তখন মধুময় হয়ে যায় তার সমস্ত অপূর্ণতা নিয়েও। এমনই মধুময় বিশ্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা রেখে গেলেন পুরুষোত্তমানন্দ যেখানে পারস্পরিক শোষণ থাকবে না, থাকবে না শ্রেণিতত্ত্বের ভেদবাদ। এমনই সামগ্রিক মুক্তি প্রদানকারী পুরুষোত্তমানন্দকে আপনাদের সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আজ আবার নমস্কার জানাই।

নবইতম জন্মদিনে—স্মরণে-চিন্তনে

॥ শ্রীকুহিদাস সাহা ॥

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের নবইতম জন্মতিথি উপলক্ষে আজকের এই মিলন-সভা—এ সভার উদ্দেশ্য অবধূত মহারাজের জীবনবাদ আলোচনা। শুধু আলোচনা নয়, আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের যা মহত্ত্ব তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করাও আজকের সভার উদ্দেশ্য। সর্বোপরি সেই মহৎ গুণাবলীগুলি জীবন-ধারায় প্রবাহিত করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আজকের জনসভা তথা মিলন সভার সার্থকতা। এই সার্থকতাতেই অনুসরণকারী ভক্তদের মঙ্গল। বিশ্ব-কবির ভাষায় বলা যায়—মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনায় মহাপুরুষদের কোন লাভ নেই, লাভ তাদের—যারা আলোচনা করে, মঙ্গল হয় তাদেরই।

প্রথম জীবনে যিনি ছিলেন শরৎ কুমার ঘোষ, পরবর্তীকালে তিনি হলেন পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত। নাম,

দুই হলেও ধারা এক—সারা জীবন সে ধারা প্রবাহিত। তিনি একাধারে গৃহী ও সন্ন্যাসী। একক গৃহী বা সন্ন্যাসী-রূপে তিনি অসম্পূর্ণ। দুয়ে মিলে তিনি সম্পূর্ণ। তিনি গৃহী-সন্ন্যাসী। গৃহকে তিনি মন্দির করতে চেয়েছেন—গৃহীজীবন ও সন্ন্যাসী জীবনের মাঝে সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছেন দুই জীবনের মাঝে একটা সেতু রচনা করেছেন তাঁর গুরু শ্রীনিত্যগোপালদেবের সমন্বয়বাদের একনিষ্ঠ সমর্থক তিনি, জীবনে সেই সমন্বয়বাদের সাধনাই তিনি করেছেন। প্রাত্যহিক জীবনে সেই সমন্বয়বাদের প্রকাশ ঘটাবার উদ্দেশ্যই গৃহকে তিনি মঠ করেছেন। 'জড়—অজড়' সমন্বয়বাদের প্রবক্তা শ্রীনিত্যগোপালদেব সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলা যায়—ট্যাঁকে টাকা আর মনে ঈশ্বর-উপাসনা দুইই এক সঙ্গে সম্ভব শ্রীনিত্য-গোপালে।

'জড়-অজড়' সমন্বয় অবাস্তবও নয়, অসম্ভবও নয়। জড়বাদ আর অজড়বাদ পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরি-পূরক। দুয়ে মিলে সম্পূর্ণ, জীবনে দুয়ের মিলনে জীবনের পরিপূর্ণতা। এটাই শ্রীনিত্যগোপালের বাণী—ভারতাত্মার মর্মবাণী। সেই বাণী-সাধক পুরুষোত্তমানন্দ গৃহকে মঠ করতে চেয়েছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে এ এক ব্যতিক্রম, এ এক স্বতন্ত্র ধরণের। কারও কারও দৃষ্টিতে এটি দৃষ্টি-কটুও বটে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ভগবানের আগমন ঘটুক,—মানুষের গৃহে ভাগবতী সত্তার প্রবেশ ঘটুক এটা তাদের অভিপ্রেত নয়। তাদের অভিপ্রায় ধর্মীয় জীবন যাপনের জন্যে জনপদ থেকে অনেক দূরে বন-জঙ্গলই শ্রেষ্ঠ-তম স্থান। কিন্তু ধর্ম মানে যে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা স্নেহ-বাৎসল্য, দয়া-মায়া, কর্তব্য-পরায়ণতা, এ কথা তারা জানে না। সাংসারিক কদর্যতা, পাঙ্কিলতা আর স্বার্থ-পরতার মাঝে এই সব গুণাবলীই প্রতিটি গৃহকে স্বর্গে রূপান্তরিত করতে পারে। সেই স্বর্গই দেখেছি জনক রাজার গৃহে। রাজর্ষি জনক—একাধারে রাজা ও ঋষি। তিনি রাজ-কার্য পরিচালনা করেছেন, এমন কি কৃষিকার্যও করেছেন—সঙ্গে সঙ্গে আবার আধ্যাত্মিক জীবনও যাপন করেছেন। এভাবেই জীবনকে পূর্ণতায় ভরিয়ে দিয়েছেন। শুধু প্রাচীনকালের রাজর্ষি জনক কেন? বর্তমানের এই বাংলায় এক মহামানবকে দেখেছি আমরা। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ। আজীবন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের নির্দেশে পরবর্তীকালে হয়েছিলেন গৃহী। তাই বলা যায় শ্রীনিত্যানন্দের সাধক-উত্তরসূরী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত।

পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-ধারা অনেক দিকেই প্রবাহিত। রাজনীতিতে তাঁর অবদান কম নয়। বৃটিশ রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে তখন যে আন্দোলন চলছিল, তার অংশী-দার ছিলেন তিনি। দেশমাতৃকার বন্ধন দশায় বেরনাইত পুরুষোত্তমানন্দ গ্রামে-গ্রামে ঘুরেছেন—স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। এভাবেই একদিন গান্ধীজির সংস্পর্শে এলেন তিনি। কারাবরণও করতে হলো তাঁকে, সেই সঙ্গে ভোগ করলেন কারা যন্ত্রণাও। তিনি একজন দার্শনিকও ছিলেন। দর্শন জগতে তাঁর রচনা সামান্য নয়। ভারতীয় প্রস্থানত্রয়ের অবধূত ভাষ্যকার তিনি। জীবনের এই ব্যাপকতার মাঝে একজন সমাজ-সংস্কারকরূপেও তাঁর অবদান রয়েই। হিন্দু-সমাজের বড় অভিশাপ অস্পৃশ্যতা। এই অস্পৃশ্যতা হিন্দু-সমাজের কুষ্ঠরোগ। যে হিন্দুধর্ম প্রচার করেছে মানুষের জয়গান, সেই হিন্দু-সমাজে অস্পৃশ্য-তাকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে মানুষের চরম অপমান। শত-শত বছরের পরাধীনতার সঙ্গে হিন্দু সমাজদেহে অস্পৃশ্যতা কুষ্ঠরোগ রূপে হয়েছে। এই কুষ্ঠরোগের দংশনে হিন্দু সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছে, পঙ্গু হয়ে গেছে। আর সেই সুযোগে হিন্দুদের উপর আঘাত এসেছে বার-বার। এই অবস্থা দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন পুরুষোত্তমা-নন্দ। হিন্দু-সমাজে সমন্বয় ঘটাতে তিনি হয়েছিলেন তৎপর। সে উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'শ্রীগৌরাঙ্গ সোসাইটি'। তিনি বলেছিলেন—শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত পথেই সামাজিক সমন্বয় সম্ভব। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেবই একদিন এই অভিশাপের বিরুদ্ধে সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। আর সে কারণেই অবধূত মহারাজ শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত জীবন-ধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বর্ণভেদকে কেন্দ্র করে জাতিভেদ দেখা দিয়েছে আর অস্পৃশ্যতা এসেছে জাতি-

ঘেরাকে কেন্দ্র করে। দেখা দিয়েছে উচ্চনীচের বিভেদ। ব্রাহ্মণ উঁচু, আর শূদ্র নীচু। অবধূত মহারাজ বললেন—কেউ উঁচুও নয়, কেউ নীচুও নয়—সকলেই সমান, সকলেরই সমান প্রয়োজন সমাজে। তিনি চারি বর্ণকে একটি মানুষের সঙ্গে তুলনা করে বললেন—ব্রাহ্মণ যদি মাথা হয়, তবে শূদ্র হলো পা। কিন্তু পা ছাড়া তো মাথা চলতে পারে না।

শ্রীনিত্যগোপালের 'ভক্ত-অভক্ত' সম্বন্ধবাদের একনিষ্ঠ সাধক অবধূত মহারাজ বললেন—ভক্ত আর অভক্তে কোন বিরোধ নেই। বরং উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। পেটে ক্ষিদে নিয়ে আধ্যাত্মিকতা চলে না—ঈশ্বর-উপাসনা সম্ভব হয় না যদি পেট খালি থাকে। তাই প্রথমে চাই ক্ষুধা থেকে মুক্তি। উদর পূর্তির সঙ্গে জীবনকে সর্বাঙ্গীণ করার প্রয়োজনে চাই আধ্যাত্মিকতার বিকাশ। তখনই পশু জীবন থেকে মানুষের জীবনের পার্থক্য ধরা পড়ে—তখনই জীবনের পরিপূর্ণতা আসে। সে কারণে অবধূত মহারাজ মার্কসবাদের বিরোধী ছিলেন না, আবার তাকে একান্ত করেও স্বীকার করেন নি। শ্রীগৌরাঙ্গকে বলেছেন তিনি মূর্তিমান মার্কসবাদ। সাধকশ্রেণীর একটা বিশেষ অংশের তুলনায় অবধূত মহারাজের চরিত্রের পার্থক্য এইখানে, আর এটাই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

যুগ-সমস্যায় স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীসত্যব্রত ঘোষ ॥

বর্তমান যুগের সমস্যার সমাধান কোন পথে তাহার কথা বলিতে যাইয়া শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ বেদান্ত দর্শনের অবধূত ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ত্রয়োদশ সূত্র সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন এই যুগই কণাদ শংকরের, বেদান্ত-বৈশেষিকের সমন্বয়ের যুগ। সমবায়ের স্বরূপমূল্য প্রচার করিয়া বৈশেষিক দর্শন অমর। বৈশেষিকের ভিত্তিতে বেদান্তের সৌধ বাস্তব সত্তা। ব্রহ্মসূত্রের অবধূত ভাষ্য ইহারই প্রচারক।

স্বামীজীর উপরিউক্ত লেখাটিকে ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে মহর্ষি জৈমিনী লিখিত পূর্ব মীমাংসা দর্শন, সাংখ্যকার কপিল লিখিত সাংখ্য দর্শন, মহর্ষি কণাদ লিখিত বৈশেষিক দর্শন, মহর্ষি গৌতম লিখিত ন্যায়দর্শন, মহর্ষি পতঞ্জলি লিখিত যোগদর্শন এবং মহর্ষি বেদব্যাস লিখিত বেদান্ত দর্শন নামে ভারতবর্ষে যে ছয়খানা দর্শন শাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহাদের সব কয়টি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক হইতেছে—

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

এই সূত্রের অর্থ হইল, উপরের দিকে মূল এবং নীচের দিকে শাখাবিশিষ্ট অব্যয় যে চলার পথ, তাহাকে শ্রুতিগণ অশ্বত্থ বলেন। বেদসমূহ তাহার পত্র। যিনি এই অশ্বত্থকে চেনেন তিনি বেদবিৎ।

গীতার উপরি উক্ত শ্লোকে রাগমার্গের সাধনার কথা বলা হইয়াছে, পক্ষান্তরে বেদান্তদর্শন এবং যোগদর্শন বাদে অন্য সব কয়খানা দর্শনে বিধিমার্গের সাধনের কথা বলা হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রগুলির তফাৎ এই খানে।

মহর্ষি জৈমিনী লিখিত পূর্বমীমাংসা দর্শনে যজ্ঞকে ভিত্তি করিয়া যে ভাবে সমাজ গঠন করা হইলে মানুষকে

উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী করা যায় তাহার হইয়াছে।

সাংখ্যকার কপিল লিখিত সাংখ্য দর্শনে—অন্ধের ঘাড়ে পঙ্গুকে বসাইয়া—এক কথায় বুদ্ধিশ্রমীদের পরিচালনায় শ্রমজীবীদের দ্বারা কাজ চালাইয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজ গঠন করার পদ্ধতির দ্বারা যে ভাবে উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী করা যায় তাহার কথা বলা হইয়াছে মহর্ষি কণাদ লিখিত বৈশেষিক দর্শনে সমবায়ের পদ্ধতি এক কথায় একাধারে বুদ্ধিশ্রমী এবং শরীরশ্রমীদের নেতৃত্বে কর্ম পরিচালনার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া সমাজ গঠন করা হইলে মানুষকে যে ভাবে উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী করা যায় তাহার কথা বলা হইয়াছে।

মহর্ষি গৌতম লিখিত ন্যায়দর্শনে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার কথা বলা হইয়াছে। জীবাত্ম জ্ঞানীর জ্ঞান কিছু কম, পক্ষান্তরে পরমাত্মজ্ঞানীর জ্ঞান কিছু বেশী। মনুষ্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এতটুকু পর্যন্ত তফাৎ এই চিন্তাধারায় যাহারা বিশ্বাসী তাহারা ছোটদের মোটেই ঘৃণা করেন না এবং সকলের সব কাজে অধিকার আছে তাহাও মানেন। এই জাতীয় মানুষেরা একাধারে বুদ্ধিমান এবং হৃদয়বান হন। এই জাতীয় ব্যক্তিদের নেতৃত্বে সমাজ গঠন করা হইলে যে ভাবে মানুষকে উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী করা সম্ভব তাহার কথা বলা হইয়াছে।

ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন, সাংখ্য দর্শন, বৈশেষিক দর্শন এবং ন্যায় দর্শনের কথা বলা হইল। তাহাদের সকলের চলার পথকে বিধিমার্গের সাধন পদ্ধতি বলা হয়। অন্য দিকে ষড় দর্শনের অন্তর্গত যোগ দর্শন এবং বেদান্ত দর্শনে যে চলার পথের কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে রাগ মার্গের চলার পথ বলা হয়।

বিধিমার্গের সাধনে প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের সাধন, তাহার পর গার্হস্থ্য, তাহার পর বাণপ্রস্থ, তাহার পর সন্ন্যাস আশ্রমের সাধন গ্রহণ করিবার কথা বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে রাগমার্গের সাধনে প্রথমেই সন্ন্যাস আশ্রমের সাধন গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। সন্ন্যাস আশ্রমের সাধন সমাপ্তির পর বিধিমার্গের বাণপ্রস্থ আশ্রমের সাধনের অনুরূপ মহাকালীর সাধনার স্তর অতিক্রম করিবার কথা বলা হইয়াছে মহাকালীর স্তরের সাধনার সমাপ্তির পর বিধিমার্গের গৃহস্থ আশ্রমের সাধনার অনুরূপ মহালক্ষ্মীর স্তরের সাধনা করিবার কথা বলা হইয়াছে। মহালক্ষ্মীর স্তরের সাধনার সমাপ্তির পর বিধিমার্গের ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সাধনের অনুরূপ পরবর্তী স্তরের সাধনার কথা বলা হইয়াছে। যদিও পাতঞ্জল যোগ দর্শনে এবং তন্ত্র শাস্ত্রে রাগমার্গের সাধনার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইলেও ঐ দুই সাধন পদ্ধতি নেহাৎই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এই কারণে বেদান্ত দর্শনের অবিরোধ অধ্যায়ের প্রথমেই যোগশাস্ত্রকে একদেশদর্শীতার অপরাধে অপরাধী করা হইয়াছে

বেদান্ত দর্শনের পথ হইতেছে বিশ্বের পথ—ভারতীয় সাধকদের ভাষায় রাগমার্গের পথ, সেই হেতু সর্ব্ব সমন্বয়ের পথ। বিধিমার্গের পথ এমন কি পাতঞ্জল যোগ অথবা তন্ত্রশাস্ত্রের পথে মহাবিপ্লবী হওয়া সম্ভব নহে। সর্ব দেবতাদের তেজের সমষ্টি হইতে মহা বিপ্লবী দেবী দুর্গার উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছিল এই কথা বলার ভিতর দিয়া চণ্ডীর লেখক আমাদের কাছে মহাবিপ্লবী হইবার পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। মহাবিপ্লবীর আবির্ভাবের পথ অতীত কালেও যাহা ছিল, বর্ত্তমান কালেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সমাজে যখন সমস্যার সৃষ্টি হয় সেই সময় সমাজের সর্ব ক্ষেত্রের প্রধানেরা সেই সমস্যা সমাধান করার জন্য নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধিমত চেষ্টা আরম্ভ করেন এবং যেহেতু সমাজের এক ক্ষেত্রের প্রধানদের সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রের প্রধানদের চিন্তাধারার তফাৎ থাকে সেই হেতু এক ক্ষেত্রের প্রধানরা সমস্যা সমাধানের যে পথের কথা বলেন, অন্য ক্ষেত্রের প্রধানরা সমস্যার সমাধানের জন্য অন্য পথের কথা বলেন। এই প্রকার অবস্থায় সমাজে এমনতর এক এক জন ব্যক্তির আবির্ভাব হয় যাহার মতকে সর্বমতের প্রধানরা দেখিতে পান যে ঐ মতে তাহাদের সকলের মতকে মানা হইয়াছে এবং তিনিই সেই সময়তে মহাবিপ্লবী আখ্যায় ভূষিত হন।

মহাবিপ্লবী হওয়ার প্রথমতম শর্ত হইল জন-সমর্থন—চণ্ডীর ভাষায় মহাকালীর স্তর—অতিক্রম করা প্রয়োজন। মহাবিপ্লবী হওয়ার দ্বিতীয়তম শর্ত হইল তাহার অবশ্যই

জনগণের অর্থনৈতিক সমাধান কি ভাবে সম্ভব তাহার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন চণ্ডীর ভাষায় মহালক্ষ্মীর স্তর অতিক্রম করা প্রয়োজন মহাবিপ্লবী হওয়ার তৃতীয় সর্ত হইল, বিপ্লব-আন্দোলনে যোগ দিয়াছে তাহাদের কি ভাবে সুসংগঠিত রাখা যায় সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন চণ্ডীর ভাষায় মহাসরস্বতীর স্তর অতিক্রম করা প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র জন-সমর্থন পান অথচ মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতীর স্তর সম্বন্ধে অজ্ঞ হন তাহা হইলে তাঁহার কার্যকর্মকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথমে সন্ন্যাস ও বাণপ্রস্থ, তাহার পর গার্হস্থ্য, সর্বশেষে ব্রহ্মচর্য—বিপ্লবী তৈয়ারী হওয়ার এই যে পথের কথা বলা হইল এই পথকে যদি কোন সম্প্রদায় চলিবার পথ হিসাবে গ্রহণ করে তাহা হইলে সেই সম্প্রদায়ের ধারাবাহিকতা থাকে না।

বিপ্লববাদী সম্প্রদায়কে ধারাবাহিকতা রাখিতে গেলে তাহাকে মহাকালী মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী স্তর অতিক্রম করিবার পরিবর্তে ঐ সম্প্রদায়কে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চাশীতিতম শ্লোকে বর্ণিত পথে চলিতে হয়। ঐ শ্লোক হইতেছে—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

বিপ্লববাদীকে প্রথমে বিধি-মার্গের সাধনে সন্ন্যাস আশ্রমের অনুরূপ নির্দ্বন্দ্ব অবস্থার সাধন গ্রহণ করা প্রয়োজন। নির্দ্বন্দ্ব অবস্থার সাধনার পর বিধিমার্গের বাণপ্রস্থের অনুরূপ নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থার সাধন গ্রহণ করা প্রয়োজন, নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থার সাধনের পর বিধিমার্গের গার্হস্থ্য আশ্রমের নির্যোগক্ষেম অবস্থার সাধন গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহার পর বিধিমার্গের সাধনের ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অনুরূপ আত্মবান অবস্থার সাধন গ্রহণ করা প্রয়োজন ভারতবর্ষে বিপ্লববাদকে ভিত্তি করিয়া যে সব গুপ্ত সম্প্রদায় আছে সেখানে ঐ রীতির প্রচলন আছে, কিন্তু ঐ পথ যে উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হইয়াছে অর্থাৎ ঐ পথে এক জনের পর বিপ্লবী তৈয়ারী করা সম্ভবপর হয় নাই।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপাল বিপ্লবী তৈয়ারীর পদ্ধতি হিসাবে মহাকালী, মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী স্তর অতিক্রম করিবার পথে বিশ্বাসী ছিলেন শ্রীনিত্যগোপালদেবের সান্নিধ্যে যাহারা গিয়াছেন তিনি তাহাদিগকে ঐ পথের নির্দেশ দিয়াছেন। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ঘর-সংসার ছাড়িয়া শ্রীনিত্যগোপালদেবের শরণাপন্ন হওয়ার পর তাঁহাকে কিছু দিন তাঁহার নিকট থাকিয়া সন্ন্যাস এবং বাণপ্রস্থের সাধন সমাপনের পর এক বৎসর মহাকালীর স্তরের সাধনার পর তাঁহাকে সংসার আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। স্বামীজী আট বছর শিক্ষকতার পেশা অবলম্বন করিয়া কাটাইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার পক্ষে মহালক্ষ্মীর স্তরের সাধনা শেষ হয়। তাহার পর বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য লেখা রূপে মহাসরস্বতীর স্তরের সাধন আরম্ভ হয়। বেদান্তদর্শন লেখার ভিতর দিয়া তাঁহার পক্ষে মহাসরস্বতীর স্তর অতিক্রম করা সম্ভব হয়। তাঁহার পর তিনি জনকল্যাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

সমাজের সর্বমতবাদের প্রধানরা যখন কোন একটি সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টিত হয় তখন বিপ্লবী সৃষ্টি হয়। এই সূত্রকে কার্যে পরিণত করিতে গেলে রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থায় সর্বমতবাদের প্রতিনিধিদের প্রধানদের থাকা প্রয়োজন। সর্বমতবাদের প্রধানদের যদি কোন দেশে থাকিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই দেশে সর্বমতবাদের ধারাকে পূর্ণ বিকাশের জন্য তাহার সর্ব পদ্ধতিকেও থাকিতে দেওয়া প্রয়োজন। কোন দেশে যদি সর্বমতবাদের ধারাকে তাহার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়ার নীতিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে সেই দেশে অতি অবশ্যই অহিংসাকে রূপায়নের পথ হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্য দিকে যেহেতু সর্বমতবাদের ভিতর হিংসার সহায়তায় স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও একটা মতবাদ, সেই হেতু সমস্ত মতবাদে বিশ্বাসী রাষ্ট্রকে যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন এবং যদি দরকার হয় তাহা হইলে শক্তি প্রয়োগদ্বারা বিদ্বেষবাদীদের দমন করা প্রয়োজন।

বিপ্লবের পথই হইতেছে সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ পথ। যদিও এই কথা বলিবার জন্য ভারতবর্ষে চণ্ডী, গীতা, বেদান্ত-

দর্শনের সৃষ্টি, তাহা হইলেও এই ধারা স্থায়ীভাবে সমাজে সর্বসময় বর্তমান থাকে নাই। মাঝে মাঝে এই ধারার কোন কোন মানুষের দেখা মিলিয়াছে এবং তাহাদের তিরোধানের পর এই দেশে পুনরায় বিধিমার্গের ধারায় সমাজ চলিয়াছে। বৈশেষিকের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় সভ্যতার এক অংশীদার বৃটীশ রাজত্বের শাসন এবং শোষণ ভারতবর্ষে ভাল ভাবে কায়েম হইবার পর ঐ শাসনের নাগপাশ হইতে এই দেশকে মুক্ত করিবার জন্য একদিন এই দেশে দিকে দিকে পথ খোঁজার কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। গ্লানি-মুক্ত বিধিমার্গের পথে সেই সময়তে সমাজ যে ভাবে চলিতেছিল তাহার মধ্যে বৈশেষিকদর্শনের ত্রুটী যোগ হইয়া সমাজ যে চেহারা নিয়াছিল তাহাকে যদি এই দেশে বহুদিন চলিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে হিন্দু সভ্যতাকে চিরতরে যখন বিদায় লইবার পথে চলিতেছিল, সেই সময়ে রাজারামমোহন রায় গ্লানিযুক্ত বিধিমার্গের পথকে পরিহার করিয়া বিপ্লবের পথে সমাজ পুনর্গঠনের ডাক দিলেন। ভারতবর্ষে বিপ্লববাদী সমাজ তৈয়ারীর তাগিদে তিনি বেদান্তদর্শনের বাংলা অনুবাদ করিয়া সকলকে ঐ মতবাদ কি তাহা বুঝাইতে চেষ্টিত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের এবং তাঁহার অনুগামীদের মত হইল ব্রহ্ম বস্তুর রূপ সম্ভবপর নহে, ব্রহ্মবস্তু নিরাকার, ব্রহ্মবস্তু অব্যবহার্য্য এবং জ্যোতির্ময় স্বরূপ। সেই কালে হিন্দু সমাজে পূজা-অর্চনা আচার-ব্যবহার জাতিভেদ-প্রথা এমন কি এই দেশে যোগী ভক্ত প্রভৃতি যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তপস্যা করে তাহার দ্বারা ব্রহ্মবস্তু পাওয়া সম্ভব ইহাও তাঁহারা মানিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের আদি প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার এই মতবাদ এই দেশে বিপ্লবভাবে প্রচারিত হইয়া ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মাধ্যমে প্রায় এক শত বছরের পর। অনুরূপ সময়তে বিধিমার্গের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈশেষিক সমাজ ব্যবস্থাদ্বারা বিশ্বের সব দেশের সমস্যার সমাধান সম্ভাবনা নাই বলিলেন কার্ল মার্কস এবং তিনিও পৃথিবীতে বিপ্লববাদের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করিবার এক বিধান দিলেন। পূর্বে যে বৌদ্ধমতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল বর্তমান কালে ইউরোপে কার্ল মার্কস এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মরা যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাকে উপরিউক্ত বৌদ্ধ-মতবাদের আধুনিক সংস্করণ বলা চলে।

বর্তমানে উচ্চমৌল যুক্ত পদার্থের সঙ্গে আরও কতকগুলি মৌল যোগ করিয়া যেভাবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের অধিকারী ইউরেনিয়াম ২৩৮ তৈয়ারী করা হয়—অনুরূপ ভাবে বহুগুণ সম্পন্ন মানুষদের চরিত্রের সঙ্গে আরও কতকগুলি গুণ যোগ করা গেলে মানুষকে বুদ্ধত্বের অধিকারী করা সম্ভব। জাতকের কাহিনী বলার ভিতর দিয়া বৌদ্ধরা বহুজন্মের তপস্যাদ্বারা বহুগুণসম্পন্ন মানুষদের চরিত্রের সঙ্গে আরও কতকগুলি গুণ সংযোজনের পথে বুদ্ধত্ব পাওয়া যায় এই কথা বলিয়াছেন। বুদ্ধত্ব পাওয়ার অর্থ হইল মহাশক্তির অধিকারী হওয়া—মহা বিপ্লবী হওয়া। বুদ্ধত্ব পাইবার পথ হিসাবে বৌদ্ধরা যে কথা বলিয়াছেন তাহা লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বুদ্ধত্ব পাইবার পথ হিসাবে তাঁহারা সমাজের ভিতর যাহা যাহা থাকা প্রয়োজন পরবর্তীকালে সমাজ গঠন করিতে যাইয়া সেই সব উপাদানকে সমাজে রাখিবার বিরোধিতা করিয়াছেন। মানুষকে যদি বহুজন্ম তপস্যা করিয়া বহুপ্রকার জ্ঞানের অধিকারী হইতে হয় তাহা হইলে এমন সমাজ-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যে সমাজ-ব্যবস্থায় বহু প্রকার আচার ব্যবহার চাল চলন বর্তমান আছে। কিন্তু বৌদ্ধরা সমাজে বহুপ্রকার বিশ্বাসবাদীদের থাকিতে দিতে প্রস্তুত নহে। তাহাদের বিবেচনায় পৃথিবী শুদ্ধ সবলকে বৌদ্ধ সঙ্ঘে রাখিয়া বর্তমানকালের ভাষায় বলিতে রাখিয়া মানুষদিগকে শিক্ষিত করিবার কথা বলিয়াছেন। এই ত্রুটির ফলেই বৌদ্ধ সভ্যতা দ্বারা বিপ্লববাদকে বাঁচাইয়া রাখা যায় নাই। বহু মতবাদযুক্ত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া দিয়া তাহার স্থলে এক খাবলম্বী সমাজ তৈয়ারী করার পর তাহা দ্বারা দ্বিতীয় বুদ্ধ তৈয়ারী না হওয়ার জন্য পূর্বের সমাজ ত গেলই, নূতন সমাজ-ব্যবস্থার ভিতর বহুপ্রকার অনাচারের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় তাহাকেও ঠেকাইয়া রাখা যায় নাই। এই কারণে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ মত-বাদকে অবৈদিক এবং সর্বপ্রকার সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংসকারী

ব্যবস্থা—শূন্যবাদী—এই আখ্যা দ্বারা নিন্দা করা হইয়াছে।

এই দেশে ব্রাহ্ম সমাজের প্রধানরা ব্রহ্মের সংজ্ঞা বলিতে যাইয়া যে সব লক্ষণের কথা বলিয়াছেন তাহাকে বর্ত্তমান যুগের আণবিক বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে তুলনা করা চলে। আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইলে প্রচণ্ড ক্ষতি হয় কিন্তু সেই বিস্ফোরণকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহার পথ আবিষ্কার করা হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে আণবিক বোমা নিয়ন্ত্রিত ভাবে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে আণবিক বোমা কেবল ধ্বংস কার্য্যে ব্যবহৃত হইত কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ বোমার ধ্বংস কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করার ভিতর দিয়া সৃষ্টি কার্য্যে লাগান হইতেছে। আণবিক বোমা ব্রহ্মের মত অব্যবহার্য, প্রচণ্ডশক্তির আধার —পক্ষান্তরে আণবিক বোমা হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি মোটেই অব্যবহার্য্য নয়। এই বিদ্যুৎশক্তির ভিতর বিরাটত্বের গুণ থাকিলেও মোটেই বিরাট নহে। এক কথায় আণবিক বোমা হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তি একাধারে বিরাট এবং ছোট।

এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বলিলেন, বর্ত্তমান যুগে যাহারা ব্রহ্ম বস্তুকে কেবল মাত্র অব্যবহার্য—বিরাট—মহাশক্তির আধার প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন তাহারা ব্রহ্মের সাধক অবস্থার কথা বলিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন ব্রহ্ম বস্তু একাধারে বিরাট এবং ছোট দুই-ই—ব্রহ্ম বস্তু একাধারে রূপবান এবং রূপহীন। তাঁহার বিবেচনায় হিন্দুরা যে কালীর অর্চ্চনা করেন সেই কালী ব্রহ্মের ঘনীভূত মূর্ত্তি। আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইবার সময় কোন বাহনের দরকার হয় না, তাহা বায়ু মণ্ডলে বিস্ফোরিত হয়। কিন্তু আণবিক বোমা হইতে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক প্রকাশ দেখিতে হইলে ইলেকট্রীক বাল্‌ব অথবা ইলেকট্রীক মোটর জাতীয় কোন ভিত্তি ভূমি দরকার।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপাল বলিলেন যে কেবলমাত্র বিগ্রহের ঘনীভূত মূর্ত্তি কালিকা দেবীকে মানিলেও এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে, আধুনিক যুগের সমস্যার সমাধান পাইতে গেলে শিবের বুকে কালীকে মানা প্রয়োজন। এই কথাটাকে দার্শনিকের ভাষায় শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে বলিয়াছেন বৈশেষিকের ভিত্তিতে বেদান্তের যোগে এই যুগের সমস্যার সমাধান সম্ভব।

এই যুগে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীরামকৃষ্ণ দেব এবং সমন্বয়াচার্য্য শ্রীনিত্যগোপাল দেবের এইসব অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান বেদান্ত দর্শনের পথে পান নাই, পাইয়াছেন যোগ দর্শনের পথে এবং যেহেতু যোগ দর্শনের ক্ষেত্র নেহাৎই ব্যক্তি-ভিত্তিক, সেইহেতু তাঁহাদের এই মতবাদ সর্ব্বজনীন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার পরবর্ত্তীদের হস্ত ন্যস্ত করিয়া দিয়া তাঁহারা তিরোহিত হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীনিত্যগোপাল দেব দুই জনই ছিলেন সমন্বয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যত মত তত পথের কথা বলার ভিতর দিয়া তাঁহার বিশ্বাসের কথা পরিষ্কার ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিত্যগোপালদেব সমন্বয়বাদী হওয়া সত্ত্বেও, সর্ব্ব মতবাদকে সম্মান দেওয়ার পথে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বৈশেষিকের ভিত্তিতে বেদান্তের যোগে এই যুগের সমস্যার সমাধান সম্ভব এই কথা বলার ভিতর দিয়া অন্যান্য দর্শনের চাইতে বৈশেষিকের বিশেষ মূল্য আছে বলিলেও কিভাবে সমন্বয় ধর্ম্মকে বজায় রাখিয়াছেন তাহার কথা এখন বলিব।

যেহেতু নিত্যগোপালদেব সমন্বয় মতের বিশ্বাসী সেইহেতু, বেদান্তের যোগে—পূর্ব্বমীমাংসা—সাংখ্যদর্শন—বৈশেষিক দর্শন—ন্যায় দর্শন প্রভৃতি সব পথকেই তিনি তুল্য মূল্য দানে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষ বৈশেষিকের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ সভ্যতার দ্বারা শাসিত এবং শোষিত হইতেছে এবং যেহেতু এই দেশকে সমৃদ্ধশালী করিতে গেলে এই দেশে সাংখ্যের ভিত্তিতে যে শিল্প এবং কৃষি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার স্থলে বৈশেষিকের ভিত্তিতে শিল্প এবং কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেই হেতু এই যুগে এই দেশে বেদান্তের যোগ দ্বারা বৈশেষিক উৎপাদন পদ্ধতির ত্রুটি দূর করিয়া এই দেশে বৈশেষিকের ভিত্তিতে বেদান্তের যোগে সভ্যতাকে দাঁড় করাইবার কথা বলিয়াছেন।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময়েতে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব কায়েম ছিল। বাংলাদেশের বাহিরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সেই সময়তে শিখগুরু নানক, কবির প্রভৃতি আরও কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। উপরিউক্ত সব কয়েকজন মহাপুরুষ সেই সময়েতে হিন্দু সমাজকে বাঁচাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের এবং মহারাষ্ট্রের শিবাজীর নেতৃত্বে যুদ্ধের পথে ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান রাজত্বকে বিদায় দেবারও চেষ্টা হইয়াছিল। শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখেরা এবং স্বামী রামদাসের শিক্ষায় শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠারা মুসলমান রাজত্বকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইবার জন্য যে জাতীয় চেষ্টা করিয়াছিলেন বাংলা দেশে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শিষ্যদের ভিতর কাহাকেও সেই জাতীয় প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইতে দেখা যায় না। ভারতবর্ষের শাস্ত্রে আছে ধর্মের যখন গ্লানি হয় তখন ভগবান আবির্ভূত হইয়া সমাজের ভার লাঘব করেন। যেহেতু গৌরাঙ্গদেবকে তাঁহার শিষ্যরা ভগবানের অবতার বলেন সেইহেতু গৌরাঙ্গদেব অথবা তাঁহার কোন অনুগামীর দ্বারা ভারতবর্ষে মুসলমানেরা যে অত্যাচারীর রাজত্ব কায়েম করিয়াছিল, তাহার অবসানের জন্য চেষ্টা করা উচিত ছিল। কিন্তু গৌরাঙ্গদেব অথবা তাঁহার কোন ভক্ত তেমনতর কাজ করেন নাই। এই প্রকার অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে অবতার বলা ঠিক কিনা তাহা লইয়া সেইকালেও প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভার হরণ
স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন।
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার কাল
ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল।

স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভার হরণ বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে কথা বলিয়াছেন সে কথা ঠিক। আধুনিক কালে কার্লমার্কস কমিউনিজমের কথা বলিয়া সত্যদ্রষ্টা হিসাবে সমাদৃত হইলেও তাঁহার দ্বারা কোন দেশে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। রুশ দেশে মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—এই দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবির স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভার হরণ কথা বলার ভিতর দিয়া ঠিক কথা বলিয়াছেন।

সেইকালে মুসলমান রাজত্বের কুশাসনের জন্য সমাজে প্রচুর ভারের সৃষ্টি হইয়াছিল এই প্রকার অবস্থায় ভার হরণের কালও অবশ্যই উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু গৌরাঙ্গ দেবের তরফ হইতে অসুর দলনের কোন চেষ্টা হয় নাই তাহার উত্তরে কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীমহাশয় বলিয়াছেন—

আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ।
প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর এই কয়টি লাইনের অর্থ গান্ধীজী কথিত—কংগ্রেসীরা যদি আমার চরখা নীতিকে না মানে তাহা হইলে তাহাদের উচিত আমাকে খারিজ করিয়া দেওয়ার সহিত মেলে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে শ্রীরাধার প্রাধান্যে কৃষ্ণের যোগে যে সমাজ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা নিত্যগোপালের ভাষায় শিবের বুকে কালীর অবস্থানে—স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ভাষায় বৈশেষিকের ভিত্তিতে বেদান্তের যোগে সমাজ গঠনের কথা। কিন্তু সেইকালে ভারতবর্ষে বৈশেষিকের ভিত্তি ভূমি এই দেশে ছিল না। সেইহেতু সেই সময়েতে গৌরাঙ্গদেবের পক্ষে সমাজের ভার হরণ করার সময় হয় নাই। উপরিউক্ত চার লাইনের ভাবার্থ ইহা হইলেও ঐ চার লাইনদ্বারা এই অর্থ পরিস্ফুট হয় নাই—ফলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ও বিরুদ্ধবাদীদের সঠিক উত্তর দিতে পারেন নাই।

মুসলমান সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি হইল সাংখ্যের ভিত্তিতে বেদান্তের যোগ করিলে যে সভ্যতা হয় তাহা। এই একদেশদর্শী সভ্যতা যখন ভারতবর্ষে কায়েম হইয়া বসিল তখন তাহাকে বিদায় করিয়া এই দেশে সমন্বয়

সভ্যতা প্রবর্তন করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই কালে এই দেশে সমন্বয় সভ্যতার এক অঙ্গ বৈশেষিক ভিত্তিক বেদান্তের যোগ যে সভ্যতা তাহা উপস্থিত ছিল না। এই প্রকার অবস্থায় সাংখ্যভিত্তিক বেদান্তের যোগে এই দেশ হইতে একদেশদর্শী মুসলমান সভ্যতাকে বিতাড়ন করিবার জন্য গুরু নানকের শিখ সভ্যতা এবং স্বামী রামদাস শিষ্য শিবাজী কর্তৃক মারাঠারা এই দেশ হইতে মুসলমান সভ্যতাকে বিদায় করিতে পারে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীনিত্যগোপালদেবের তিরোধানের পর এই দেশে পূর্ব মীমাংসা সাংখ্য দর্শন বৈশেষিক দর্শন এবং ন্যায় দর্শনের ভিত্তিতে বেদান্তের যোগে মহা শক্তিধর ব্যক্তিদের আবির্ভাব দেখা গেল। এই পর্যায়ের প্রথম ব্যক্তি হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার বক্তব্য হইল, পূর্ব মীমাংসা দর্শনের অর্থাৎ যজ্ঞের ভিত্তিতে বেদান্তের যোগে সমাজ গঠন করা প্রয়োজন। এই আদর্শ সামনে রাখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের দ্বারা অশিক্ষিত ভারতবাসীদের সেবায় লাগিবার পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন। যে পরাধীনতা ভারতবর্ষের সর্ব দুরবস্থার কারণ তাহার মীমাংসা স্বামী বিবেকানন্দ কথিত পথে সম্ভব হয় নাই। এই প্রকার অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ সাংখ্য দর্শনের ভিত্তিতে বেদান্তের যোগে মানুষ তৈয়ারী করা গেলে তাহাদের দ্বারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা সম্ভব এই কথা বলিলেন এবং এই দেশে বিপ্লববাদী তৈয়ারী করিবার এক বিরাট সংগঠন গড়িয়া দেশ হইতে বিদেশী শাসনকে তাড়াইবার কাজে লাগিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে বিপ্লববাদীরা এই দেশে ত্যাগের অপূর্ব আদর্শ রাখিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের প্রচেষ্টা দ্বারা ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আসে নাই।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বেদান্ত দর্শনের অবধূত ভাষ্য লেখা সমাপ্ত করেন। তাহাতে বৈশেষিকের ভিত্তিতে বেদান্তের যোগে বিপ্লববাদীদের দ্বারা এই যুগের সর্ব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর হইবে এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামীদের সর্ব ভারতীয় সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগের পথে মুক্তি-সংগ্রাম চালাইলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যাইবে এই কথা সেই কালের কংগ্রেস নেতাদের বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং অহিংস অসহযোগের পথে মুক্তি সংগ্রাম চালাইবার সর্বময় কর্তৃত্ব পাইয়াছিলেন। গান্ধীজীর চলার পথের দার্শনিক ভিত্তি হইল বৈশেষিকের ভিত্তিতে বেদান্তের যোগ করিলে যে পথ হয় তাহা। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্ণধার বলিয়া খ্যাত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মত আরও অনেক প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ী গান্ধীজীকে সমর্থন করিলেন এবং তাঁহারা আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়াছিলেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে, সর্ব দেবতাদের তেজে দেবী দুর্গার আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। অনুরূপ অবস্থা দেখা গেল গান্ধীজীর আন্দোলনের সময়েতে বর্তমান কালে। গান্ধীজীর এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ভারতবর্ষের সর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজদের এক যোগে কাজ করিতে দেখা গিয়াছে। গান্ধীজী প্রবর্তিত এই অসহযোগ আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী, আবেদন নিবেদন পথে বিশ্বাসী, বিপ্লববাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, হিন্দু-মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সেই যুগের সর্বশ্রেণীর লোকের সহায়তায় এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের সুযোগ হইয়াছিল। চণ্ডীতে বর্ণিত অসুরদের বিরুদ্ধে দেবী দুর্গার যুদ্ধের অনুরূপ ব্যবস্থা। তবে সেই যুদ্ধ ছিল অস্ত্র দ্বারা, পক্ষান্তরে গান্ধীজীর এই যুদ্ধ অহিংসদ্বারা। চৌরীচৌরার পুলিশ-গাড়ী পোড়াইয়া দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জনগণ অহিংস থাকে নাই এই ঘটনার ভিত্তিতে গান্ধীজী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া নেন। এই ব্যাপার লইয়া গান্ধীজীর চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের সঙ্গে মত বিরোধ হয়। দেশবন্ধু দাস স্বরাজ্য দল গঠন করেন এবং কাউন্সিলে প্রবেশ দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক অচল অবস্থা সৃষ্টিদ্বারা আন্দোলন চালাইবার

ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গান্ধীজীর সমর্থন চান। এই ব্যাপার লইয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে নেতৃত্বের এবং অন্যান্য দলের ভিতর বিরোধ উপস্থিত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগে সুরাট কংগ্রেসে শ্রীঅরবিন্দের অনুগামীদের সঙ্গে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দলের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিরোধের ফলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে কংগ্রেস হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গান্ধীজীর অনুগামীদের অনেকে শ্রীঅরবিন্দের পথের অনুসরণে দেশবন্ধুর দলকে কংগ্রেস হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা দেওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজী দেশবন্ধুর দলকে কংগ্রেস হইতে বিদায় দিবার ব্যবস্থা নেন নাই। সর্বদলের উপস্থিতি না থাকিলে বিপ্লব থাকে না তাহা গান্ধীজীর এই আচরণদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। গান্ধীজীর এই আচরণদ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত যত মত তত পথকে তাঁহার চলার পথ হিসাবে গ্রহণ করার ভিতর দিয়া মহা বিপ্লবী এই আখ্যা পাইবার অধিকারী হইয়াছেন। বহু প্রকার মতবাদে বিশ্বাসী সর্বপ্রকার রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে মুক্তি-সংগ্রাম চালাইবার পথে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া গান্ধীজীর নেতৃত্বে যতদিন ছিল ততদিন ভারতবর্ষে সব রাজনৈতিক দলের পক্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দরজা খোলা ছিল। গান্ধীজী ভারতবর্ষে অহিংস অসহযোগের পথে মুক্তি-সংগ্রাম চালাইয়াছেন। তাহা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিল না। ঐ সংগ্রাম ছিল বৈশেষিক মতবাদের বিশ্বাসী ইউরোপীয়েরা এই যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা বড় বড় কলকারখানার সহযোগিতায় বিপুলভাবে কৃষি এবং শিল্প পণ্য উৎপাদনের দ্বারা পৃথিবীর অনুন্নত দেশ গুলিকে শোষণ করিতেছিল তাহার বিরুদ্ধে। গান্ধীজীর বিবেচনায় পৃথিবীতে যদি বিপ্লববাদকে চিরতরে বাঁচাইয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে বর্তমান কালে ইউরোপীয়েরা বৈশেষিকের ভিত্তিতে যে ভাবে শিল্প এবং কৃষি পণ্য উৎপাদন করিতেছে তাহার স্থলে বৈশেষিকের ভিত্তিতে বেদান্তের যোগে এক কথায় চরখা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

বৈশেষিকের ভিত্তিতেই বেদান্ত-সৌধ বাস্তব সত্য। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত ব্রহ্মসূত্রের অবধূত ভাষ্য তাঁহার প্রচারিত স্বামীজীর বিবেচনায় গান্ধীজী-প্রবর্তিত চরখাভিত্তিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে দার্শনিক সংজ্ঞা দিতে গেলে তাহা বৈশেষিকের ভিত্তিতে বেদান্তের যোগ করিলে যে চলার পথ হয় তাই। এবং যেহেতু স্বামীজী এই মতবাদে পূর্ব হইতেই বিশ্বাসী ছিলেন সেই হেতু তিনি গান্ধীজী প্রবর্তিত চরখাভিত্তিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। প্রতিভা রায় তাঁহার শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বইয়ের ১৬০ পাতায় লিখিয়াছেন—শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ গান্ধীজীকে শ্রীনিত্যগোপালদেবের দ্বিতীয় কলেবর হিসাবে দেখিতেন। গান্ধীজী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে সর্বময় নেতা নির্বাচিত হইবার পর যে সব বিপ্লবী তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন তাহাদিগকে চরখাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার কাজে লাগানর ভিতর দিয়া মহাকালী মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতীর স্তর অতিক্রম করিবার তপস্যায় লাগাইয়া ছিলেন। কিন্তু যেহেতু উপরিউক্ত তপস্বীদের মহাসরস্বতীর স্তর অতিক্রম করার পথ হিসাবে বেদান্তদর্শন চর্চার ব্যবস্থা করেন নাই, সেইহেতু খাদিবর্ষে নিযুক্ত তপস্বীদের পক্ষে মহাসরস্বতীর স্তর অতিক্রম করা সম্ভব হয় নাই। স্বামীজী বেদান্তদর্শন চর্চার উপর কেন বেশী জোর দিয়াছেন তাহার কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় উপনিষদসমূহ গীতা এবং বেদান্ত দর্শন এই তিনখানা বইকে এই দেশে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। এই প্রস্থানত্রয়ের প্রথম প্রস্থান হইতেছে উপনিষদসমূহ। উপনিষদসমূহ কোন একজন ব্যক্তি বিশেষের লেখা নহে। তাহা বিভিন্ন সময়কার বিভিন্ন সাধকের অনুভূতির কথা। এই সব অনুভূতির ধারাবাহিকতাযুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয় নাই। দ্বিতীয় প্রস্থান হইতেছে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ—বক্তৃতার স্থান যুদ্ধক্ষেত্র; শ্রোতা একমাত্র অর্জুন। যদিও গীতার ধারাবাহিকতা আছে কিন্তু যেহেতু এই বক্তৃতার শ্রোতা মাত্র একজন এই জন্য এই

ক্ষেত্রেও সার্বজনীনতার অভাব। এই কারণে ঐ বইয়ের উপর ভরসা করিলে সর্বশ্রেণীর মানুষের সর্ব সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রস্থানত্রয়ের শেষ প্রস্থান হইতেছে বেদান্ত দর্শন—এই বইয়ের লেখক কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। এই বইতে পৃথিবীর যতরকম মতবাদ এবং পথের কথা আছে তাহার সবগুলির গুণ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে এবং সাধন-পথের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। এই বই লইয়া চর্চা করা হইলে পৃথিবীতে যত প্রকার মত এবং পথ আছে তাহাদের সকলের সম্বন্ধে জানা যায়। যাহারা সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে চায় তাহাদের পক্ষে অতীতের সব মত এবং সব পথ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। তাহা না থাকিলে অতীতকালের লোকেরা যে ভুল করিয়াছিল নূতন ভাবে যাহারা সমাজ গঠন করিতে চায় তাহাদিগের নূতন করিয়া ভুল করা সম্ভব। এই কারণে বিপ্লবীদের অতি অবশ্য বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিপুল জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের যদি বিপ্লবী করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহায়তা নিলেই কাজ চলে, কিন্তু যদি অল্পজ্ঞান সম্পন্ন বহু ব্যক্তিকে বিপ্লবী বানাইতে হয় তাহা হইলে বেদান্তদর্শনের শরণ নেওয়া ছাড়া পথ নাই।

বিপ্লবীদের পক্ষে মহাকালী মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী এই তিনটি ধাপ অতিক্রম করা প্রয়োজন। এই তিনটি ধাপ অতিক্রম করা না গেলে তাহাদের দ্বারা প্রগতিমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অথবা চালান কোনটাই সম্ভবপর নহে। গান্ধীজীর অতিবিশ্বস্ত সহকারী যাহারা তাহারা কর্মের ভিতর দিয়া মহাকালী এবং মহালক্ষ্মীর স্তর পর্যন্ত যাইয়া আর আগাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর সার্বজনীনতার অভাব প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে তাহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতার অতিরিক্ত সম্মান অথবা অধিকার দেওয়া গান্ধীজীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। যেহেতু গান্ধীজীর অতি ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের ভিতর সর্বমত এবং সর্বপথ সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী এক কথায় মহা সরস্বতীর স্তর অতিক্রমকারী লোকের অভাব ছিল—অথচ গান্ধীজীকে সেইকালে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আনিতে হইবে সেই কারণে গান্ধীজীকে বিধিমার্গের পথে যাহারা সন্ন্যাস আশ্রম পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন তাহাদের এবং অতি বিপ্লবীদের নেওয়া ছাড়া পথ থাকে নাই।

গান্ধীজী কর্তৃক প্রবর্তিত চরখা ভিত্তিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের এই অবস্থায় স্বামীজীর ধারণা হইল যে দেবী দুর্গা কর্তৃক অসুর নিধন করার পর যেমনভাবে সেই সময়েতে বিধিমার্গের পথে যাহারা প্রধান হইতে পারিয়াছিল তাহাদের হাতে দেশ এবং সমাজ চালাইবার ভার দিয়া দেবী দুর্গাকে অন্তর্হিত হইতে হইয়াছিল, অনুরূপ ভাবে গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় এই দেশে স্বাধীনতা আসিলেও তাহাকে চালাইবার ভার বিধিমার্গের পথে যাহারা প্রধান হইয়াছে তাহাদের চালাইতে দেওয়া ছাড়া পথ থাকিবে না। গান্ধীজীর চরখার এই পথদ্বারা এখনই এই দেশে বৈদেশিকের ভিত্তিতে বেদান্তের যোগে যে সমাজ-ব্যবস্থা হয় তাহা প্রবর্তিত হইবে না।

এই চিন্তাধারার বশবর্তী হইয়া স্বামীজী ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে নরনারায়ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাদ্বারা মানুষকে সার্থক বিপ্লবী হইতে গেলে যে স্তর যথা মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহা সরস্বতীর স্তর অতিক্রম করা প্রয়োজন এবং মহাসরস্বতীর স্তর অতিক্রম করিতে গেলে যে বেদান্ত দর্শনের চর্চা করা অতি অবশ্য কাজ তাহা জন-সমাজে তুলিয়া ধরিবার জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় এবং তাঁহার নেতৃত্বে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনভার পড়িল। বিধিমার্গের পথে যাহারা প্রধান হইয়াছেন তাহাদের নেতৃত্বে অতি বিপ্লবী এবং কতিপয় গান্ধীবাদী নেতাদের লইয়া এক কথায় যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় ব্যবস্থার উপর।

এই প্রকার ব্যবস্থার দ্বারা আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না—ফলে দেশে অশান্তি ধূমায়িত হইতে লাগিল। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে কংগ্রেস দলকে ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রদেশের শাসনভার হারাইতে হইল।

এই প্রকার অবস্থায় নূতন আর একদল বিপ্লবীর আবির্ভাবের ভিতর দিয়া বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে

ভারতবর্ষে আবার নূতন করিয়া সমন্বয়বাদ-বিশ্বাসী কংগ্রেসীদের সপক্ষে রাজা শাসনের অধিকার পাওয়া সম্ভব হইয়াছে।

কিন্তু যে মূল ত্রুটির জন্য একবার কংগ্রেস দলকে ক্ষমতা-চ্যুত হইতে হইয়াছিল—অর্থাৎ বিপ্লবীদের মহাকালী মহা-লক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতীর সুরের শিক্ষা দিয়া কাজে লাগান উচিত ছিল তাহা করা হয় নাই, ফলে এই দেশে বর্ত্তমান ব্যবস্থার দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভব একথা ভাবা যায়না।

তিনি ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের মহাকালী মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতীর সুরের শিক্ষা দিয়া এই দেশের সর্ব সমস্যার সমাধান দিতে পারিবেন তাহার আবির্ভাবের জন্য নরনারায়ণ আশ্রম পথ চাহিয়া আছে।

আমার শিল্প সাধনা

॥ ডাঃ ধীরেন্দ্র চৌধুরী ॥

কেবল দৈহিক সুখ-স্বচ্ছন্দ্য নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। মানুষের মত বাঁচতে হ'লে চাই তার মনের খোরাক—চাই মানুষের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মানুভূতিসমূহের সম্যক বিকাশ—সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধি।

আমার বাল্য ও কৈশোর জীবন কেটেছে ঢাকা বিক্রমপুরে পদ্মানদীর ধারে বানারি গ্রামে। সুতরাং পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছাপ যে পড়েছিল আমার বালক-মনে তা বলাই বাহুল্য। আবার আমার মা ছিলেন শিল্পী; পূজাপার্বণ ও বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি যেই আলপনা দিতেন—ঘট, পিড়ি ও কুলোতে দিতেন আলপনা—তা ছিল দেখবার মত। মার এই চিত্রাঙ্কণ দেখে আমার বালক-মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থাকত। কেবল মনে হ'ত কবে পারব মার মত আলপনা দিতে? লক্ষ্য করেছি অতি সাধারণ জিনিষ দিয়ে মা করে নিতেন আলপনার জন্য নানা রং, যেমন চালের গুড়ো দিয়ে হত সাদা রঙ, হলুদের গুড়ো দিয়ে হলুদ, পোড়া মাটি দিয়ে গৈরিক, কাঠ করলা দিয়ে কাল, সিঁদুর দিয়ে লাল, বেলপাতা শুকিয়ে গুড়ো করে হত সবুজ, এমনি আরও কত কি। নানা প্রকার তরল রং করে নিতেন ডিমের সাদা অংশটায় নীল হরিতাল চকের গুড়ো মেটে সিঁদুর প্রভৃতি রং মিশিয়ে। এ ছাড়া ছেঁড়া কাপড় ও অব্যবহার্য কাগজ দিয়ে গড়তেন নানা রকমের পুতুল যা আজকাল পোশিরাশ মোসে নামে পরিচিত। তারপর নারকেলের ছোবরা, শাঁস আর বাঁশ দিয়ে গড়তেন নানা জীবজন্তু, ফল, গাছ, বাগান বাড়ী পর্য্যন্ত। সূচী ও বাটির কাজেও ছিল মার সমান দক্ষতা। এমন কি মা ফুটনো কেটে তা এমন ভাবে সাজিয়ে রাখতেন যা দূর হতে দেখে মনে হত যেন ফুল ফুটে আছে। বহু প্রদর্শনীতে তিনি লাভ করেছেন বহুবার প্রথম পুরস্কার। মনে আছে মার তৈরী রঙ লুকিয়ে নিয়ে বাগানে গিয়ে অদ্ভুত সব আলপনা এঁকে দেখাতাম বন্ধুদের। তাতে যেতাম কত আনন্দ, তা আর ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বলতে গেলে সেই থেকেই আমার শিল্পী জীবনের সুরু। মার শিল্পী মনের প্রভাব যে আছে আমার শিল্পানুশীলনের পেছনে তা বলাই বাহুল্য।

আর প্রভাব আছে আবাল্য দেখা প্রকৃতির দৃশ্য—কাল বৈশাখীর প্রলয়ঙ্কর ঝড়, অমানিশার অন্ধকারের ভীতি

সঞ্চারিত হল আবার জ্যোৎস্না-প্লাবিত নিশীথ রাতের মাধুরী। গ্রামের উন্মুক্ত প্রান্তর কোথাও হরিৎ বর্ণের সরষে ফুল, কোথাও নীলাভ কলাই ফুলে ভরা মাঠ, আবার কখনও বা সোনালী রং-এর ধান ক্ষেত এই সব দৃশ্যও করেছে শিল্পী মনকে ব্যাপ্ত।

উপেক্ষা করা যায় না গ্রামের পাশে খালের ধারে ফুটে থাকা সোনালী রং এর হিজল, আর নাম না জানা কত রঙ্গ ফুল। সেই খালে বর্ষার জল এলে স্রোতের টানে ছুটে চলতো ঝরা ফুলগুলি। আহা! কি সুন্দরই না দেখাত। উর্দ্ধে সীমাহীন নীলাকাশ, নিম্নে বিস্তীর্ণা পদ্মা -কখনও কালবৈশাখী-ভীতিনাশা আবার কখনও বা শান্ত স্নিগ্ধ। বর্ষার ঘরে শুয়ে করালবদনা ভীষণা, শীতে হয় কমলা। পদ্মার সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্তের দৃশ্য তরুণ জীবনকে করেছে প্রভাবিত। কেননা আর পদ্মার 'কালা ধলার' দিন সূর্য্য উদয়ের রক্তরাগে রঞ্জিত। আবার দিনের শেষে ক্লান্ত সূর্য্য গোলাকার রক্তিম পিণ্ডের মত ডুবে যায় অন্তহীন জলরাশির অন্তরালে। ঐ অপরূপ দৃশ্য আজও আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কত বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে জ্যোৎস্না-প্লাবিত নিশীথ রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে। উর্দ্ধে নক্ষত্র-খচিত নীল আকাশ —ভেসে চলেছে খণ্ড খণ্ড মেঘ যেন কার বার্তা নিয়ে, নীচে পদ্মার জলে প্রতিফলিত মাঠ—চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল বীচিমালা ছুটে চলে ঢেউয়ের তালে তালে: লাল, সাদা শাপলা আর নীলাভ শালু ফুলগুলি চেয়ে থাকে চাঁদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে। আর স্নিগ্ধ সমীরণ বয়ে চলেছে অবিরাম শন্, শন্, শন্—অসীমের গান।

এই দীর্ঘ প্রাকৃতিক বর্ণনা দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, আমার সুকুমার মনে এদের প্রভাব—এরা জীবনের সাথী—এদের অস্বীকার করা যায় না।

গ্রাম্য জীবনের প্রাকৃতিক শোভা শিল্পী মনে উৎসাহের স্রোতক—জাগিয়ে তুলত এক অব্যক্ত অসীমের অনুভূতি। প্রকাশের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠত। বাল্য ও কৈশোরের সেই অনুভূতি রূপ পেল যৌবনে লেতার যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যখন রিপন কলেজের ছাত্রাবাসে ছিলাম। অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সেই সাধনা বন্ধ হল বটে কিন্তু সুর-সাধনা আর ছবি আঁকার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠত।

মাঝে বহু বছর কেটে গেছে, ডাক্তার হয়েছি —মানুষ, রোগ আর ঔষধের মধ্য দিয়ে দিন কাটছে। সম্ভবতঃ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এক অভাবনীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে আমার আবাল্য বাসনা পূরণ হল। ময়মনসিংহ শহর, বোধ হয় আষাঢ়, শ্রাবণ মাস হবে। রোগী দেখতে গেছি এক বাড়ীতে, দেখি দেওয়ালে রয়েছে একখানি জল রঙে আঁকা ছবি। বাউল একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে নেচে নেচে চলেছে নদীর ধার দিয়ে একান্ত মনে। একেবারে জীবন্ত, আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম দূরে থেকে ভেসে আসা বাউলের গানের সুর। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম সেই ছবিটির দিকে কতক্ষণ জানি না—চমকে উঠলাম আমার সহিস কাশেমালির ডাকে। ছাত্রাবাসের থেমে যাওয়া সেতারের সুর, যা ছিল অবচেতন মনে, ঝংকার দিয়ে উঠল চিকিৎসকের মনে, জেগে উঠল সুপ্ত শিল্পী-সত্তা দুর্বার গতিতে আর সেই দিন থেকেই আবার চলল বিশ্ব শিল্পীর অন্বেষণ রং তুলির মাধ্যমে।

শিল্পী সৃষ্টির ব্যাকরণ জানি না আর জানবার সুযোগও পাইনি তেমন। সহায় ছিল মায়ের স্মৃতি আর দেশ বাড়ীর প্রাকৃতিক শোভা যা পূর্বে বর্ণনা করেছি বাল্য ও কৈশোরের মনের কথা। মনে পড়ে খালের ধারে ফুটে থাকা হিজল ফুল আর খসে পড়া সেই ফুল ছুটে চলে জলের টানে। আবেগের টানে তুলি চলে, রঙের ছোপ পড়ে একের উপরে আরেক, বর্ষার জল উপছে পড়ে মাঠে, ধান ক্ষেতে, চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল বিন্দুগুলি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, অব্যক্ত সৃষ্টির ব্যাকুলতা তুলিতে আঁচড়ে প্রকাশ পায়—রঙ হয়ে উঠে উজ্জ্বল চাঁদের আলোর মত। মায়ের কথা মনে পড়ে, ব্যাকরণ জানা না থাকলেও সাহস আসে তুলিতে। এমনি করে চলে চিকিৎসকের অন্তর-সত্তা প্রকাশের সাধনা। মুগ্ধ হয়েছি অব্যক্তকে অনুভব করে আপন সৃষ্টির মাঝে।

উপসংহারে নিজের আঁকা দু' একটি ছবি আমার শিল্পী মনে কি ক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা আলোচনা

করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একে ছিলাম একটি সিংহী, চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে তার দুটী বাচ্চা নিয়ে। সিংহীটি সদা সন্ত্রস্ত আর বাচ্চা দুটী চলেছে খেলে দুলে পেছনে নিশ্চিন্ত মনে। অনুভব করলাম বাচ্চা দুটী জীবন্ত—স্নেহ মমতায় ভরে উঠল আমার অন্তর। শেষে এমন হল যে বাচ্চা দুটীকে না দেখে আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারতাম না। তাদের গাড়ীতে নিয়ে চলতাম, শুতাম রাত্রে তাদের পাশে নিয়ে। কেউ ছবিটি ধরলে আমি চিৎকার করে উঠতাম—পাছে বাচ্চারা দুঃখ পায় তাই ভেবে এই আবেগ-প্রবণতা ছিল আমার অনেক দিন ছবিটার উপর।

আর এক দিনের কথা বলে শেষ করব আমার শিল্পী মনের কথা চারদিকে পাহাড়—মাঝে একটি হ্রদ—নিশ্চল। উষার আবরণে ঢাকা চারদিক—নিস্তব্ধ! এমন নিস্তব্ধ যে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকও শোনা যাচ্ছে না! আমি একা। আমার গা ছম্ ছম্ করতে লাগল, সেই নিস্তব্ধতা ঘিরে রইল চারদিকে। শেষে নিস্তব্ধতায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হল—প্রাণের মাঝটা উঠলো ছট ফট করে। ঐ অসহনীয় নিস্তব্ধতা আর সহ্য করতে না পেরে তাড়াতাড়ি উষার আবরণকে উন্মোচন করে দিলাম তুলিতে লাল রঙ নিয়ে আকাশকে রঞ্জিত করে। ছেলে বেলায় পড়ায় দেখা সূর্যোদয়ের আভাষ প্রকাশ পেল ক্যানভাসে। আবার হ্রদের নিশ্চল জলটাকে দিলাম সচল করে তুলির টানে ঝরণা এঁকে—নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মুক্ত জলরাশি কর্ণায় শব্দ করে ছেগে উঠল। আমি বাঁচলাম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আর ঝরণার ঐ সুমধুর কুলু কুলু ধ্বনি ডুবিয়ে দিল আমার মনকে বিশ্বনিদ্রার অন্তর্ধানে।

মোনালিসা

॥ শ্রীশংখচিল ॥

তুমি তো বিরামহীন নির্বাক নিস্তরঙ্গ স্থগিত জীবন,
অনন্ত সমুদ্রতটে ময়ূরের পক্ষপুটে শুনি তব হৃদিগুঞ্জন।
শতাব্দী পেরিয়ে গেল কত যুগ হল;
হৃদয় তটিনী মাঝে যুগে যুগে জেগে যায় সহস্র উপল।
দাঁড়া! দাঁড়া তোরা দাঁড়া!
ক্ষণিকের দৃষ্টি এক বিন্দু অশ্রু ফেলি দাঁড়া,
ঘুমন্ত প্রেয়সী শিরে বাজা না নাকাড়া।
দুরন্ত বটিকা যায় নাকাড়া বাজায়ে যায়
হৃদয়ের নিশীথ বাসরে;
ক্ষণিকের দৃষ্টি মেলি একবিন্দু অশ্রু ফেলি
মোনালিসা হাস রে হাস রে!
হাসি যে ফুরায়ে গেছে যুগে যুগে মিশে গেছে
কালজয়ী প্রস্তর সাথে
হৃদয়ের অতৃপ্ত বেদনা পিপাসা
তুমি কি ঘুমায়ে গেছ ওগো মোনালিসা?
হয়ত ঘুমায়ে গেছে স্বপ্নে তো আছে,
হৃদয়ের আনাচে কানাচে।
তাই নিয়ে এক বিন্দু অশ্রুমাখে একটুখানি হাসা,
তুমি কি বিরামহীন সুপ্ত মোনালিসা?

জীবনে জীবনে কত ঘাত প্রতিঘাতে,
ওঠ প্রিয়া, প্রস্ফুটিয়া সুনির্মল প্রাতে।
লহরী কাঁদিছে ঐ শোন তার ডাক,
যেয়ো না যেয়ো না ওরে থাক থাক থাক!
থাকিতে হইবে তোরে যুগ যুগ ধরি,
তুই যে জগতীতলে কালজয়ী ডানাকাটা পরী
উঠিতে পার না কেন নীলিমার গায়ে
কবরে কবরে খুঁজি হেরি তোরে সুশীতল ছায়ে।
কোন সে শিল্পী হায় কোন সে নিঠুর,
প্রাণ দিলে রূপ দিলে কোথা দিলে সুর।
সুরের বাঁশরীখানা বাজা না বাজা না,
প্রাণহীন দেহখানি সাজা না সাজা না।
গগনপটুয়া পরে বসায় মনে,
হে রূপসী উড়ে যাও সুরের গগনে।
রেখে যাও জীবনের শেষ ভালবাসা,
তুমি কি স্বপ্নের মাঝে সুপ্ত মোনালিসা?

'৭২ অলিম্পিকে নিহত ইজরায়েলীদের প্রতি

॥ শ্রীসুদীপ্ত সরকার ॥

(১)

ছোট্ট বালক কটি—
সকাল থেকে সাঁঝ অবধি
করতো ছুটোছুটি ॥

নদীর চরে, বনের পারে
গাছের ডালে, ফুলের সাথে
হরেক রকম খেলা তাদের
হরেক রঙ ধরে ॥

সন্ধ্যা যখন নামত ধীরে
সূর্য্য যেত ঢলে,
ফিরত তারা মায়ের বুকে
সকল খেলা ফেলে ॥

খবর এল দূর গাঁয়েতে
বসবে খেলার আসর
মন ছুটে যায় সে দিক পানে
সয় না যেন তর ॥

মায়ের মানা নেয় না কানে
শোনে না কোনো কথা,
ছুটলো তারা সেই গাঁয়েতে
দিয়ে মাকে ব্যথা ॥

(২)

বাহির থেকে দস্যু এসে
হানল বিষ বাণ,
একে একে পড়ল লুটে
ছোট্ট কটি প্রাণ ॥

শিউরে ওঠে মায়ের মন
অজানা এক ভয়ে,
নদীর পারে গিয়ে ডাকে
আয়—আয়—আয় ॥

কেউ দিল না সাড়া তাকে
কেউ এলো না ফিরে,
উঠল কেবল দীর্ঘশ্বাস
বুক ফেটে, বুক চীরে ॥

মাতাল হাওয়া সনসনিয়ে
বনের পাতা মরমরিয়ে
বলে গেল ফিসফিসিয়ে,
হায়—হায়—হায় ॥

সন্ধ্যা যখন নামল ধীরে
সূর্য্য গেল ঢলে,
ফিরল না কেউ মায়ের বুকে
ফিরল না তো কোলে ॥

সাময়িকী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জীবন-কথা :—বিগত ১ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ শনিবার (২৫শে নভেম্বর ১৯৭২) তারিখে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে ভারতীয় প্রস্থানত্রয়ের অবধূত-ভাষ্যকার, উত্তর-ভারত ও নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৯০-তম জন্মতিথি নরনারায়ণ আশ্রম-দেবতা সমন্বয়মূর্তি শ্রীশ্রীনিতাগোপালের পূজা কীর্তনাদি দ্বারা স্মরণ করা হইয়াছে। পরদিবস ২৬শে নভেম্বর রবিবার এই উপলক্ষে সকলের সহিত সমবেত উৎসব অনুষ্ঠান পালিত হয়। সকালের বাল্যভোগের পর নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা—সাঙ্গদলাঞ্ছিত সৈরিক পতাকা—শঙ্খধ্বনির মধ্যে উত্তোলিত হয় এবং এই পতাকার তাৎপর্য সম্বন্ধে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ব্যাখ্যা পঠিত হয়। অতঃপর সকালের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীনিতাগোপালের পূজার সঙ্গে সকাল ৯ ঘটিকা হইতে ভজন, কীর্তন ও পূজার সঙ্গীত পর পর কয়েকজন অতি সুকণ্ঠে বেলা ১২টা পর্যন্ত পরিবেশন করেন। অতঃপর ১২টা হইতে দ্বিপ্রহরের খিচুরী ভোগ প্রসাদ বেলা ২।টা পর্যন্ত প্রায় ৪৫০ শত জনকে বিতরণ করা হয়। ইহার মধ্যে ভক্তজনসহ দুই স্কুলের শিশু প্রায় ২৫০ এবং শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্রের ছাত্রীরাও রহিয়াছেন। অতঃপর বিকাল ৪টায় শ্রীশ্রীনিতাগোপালের সামগ্রিক সমন্বয় ধর্ম কেমন ভাবে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা কয়েকজন আলোচনা করেন। সেই প্রবন্ধগুলি ও কবিতা বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। দুইজন মৌখিক ভাষণে তাঁহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। সুলতান মহম্মদ আলী খানের মধ্যে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সমন্বয় ধর্মের যে সহজ ও প্রাণপূর্ণ প্রকাশের ব্যবস্থা নরনারায়ণ আশ্রমে লাভ করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্তসহ স্বামীজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন মঠ, মন্দির, গীর্জা, মসজিদে তিনি গিয়াছেন। কিন্তু মানুষকে মানুষ হিসাবে এত সহজ করিয়া গ্রহণ করা—জাতির প্রশ্ন নাই, কুল-শীলের প্রশ্ন নাই—এমন তিনি এই আশ্রমে যেরূপ পাইয়াছেন, তেমন কোথাও পান নাই। শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সভাপতির ভাষণে বিশ্লেষণাত্মক ধারায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-প্রস্থাপিত প্রাণপূর্ণ সমন্বয় ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। শ্রীশ্রীনিতাগোপালের জীবন ও তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যের মধ্য দিয়া এই চিন্তাধারা যে নরনারায়ণ আশ্রমে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ক্রমে মানুষের মধ্যে পৌঁছাইবে ইহা আকাঙ্ক্ষা করিয়া প্রাণের সহজ বোধের মধ্য দিয়া সমন্বয়-তত্ত্ব আলোচনা করেন।

সভায় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা আনন্দ লাভ করেন বলিয়া জানান। দ্বিপ্রহরে যাহারা প্রসাদ গ্রহণ করেন নাই, সভাশেষে তাঁহাদের অন্ন প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

"ধান কাটার মরশুম এসে গিয়েছে"

★ আপনার ও সকলের স্বার্থে ফসল কাটার সময় শান্তি বজায় রাখুন।

★ বর্গাদারকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবেন না।

★ কোন বিরোধ দেখা দিলে আপনার এলাকার কাম্প কোর্টের মাধ্যমে বিরোধ মিটিয়ে ফেলুন। প্রয়োজনে ভাগচাষ অফিসার ও জে. এল. আর ও-এর সাহায্যও নিতে পারেন।

★ মনে রাখবেন—দেশের কৃষি-উন্নয়ন বর্গাদার ও জমির মালিকের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। নিজেদের দায়িত্ব পালন করে দেশের কৃষি-অগ্রগতির অংশীদার হোন।

২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ কর্তৃক প্রচারিত।

এই মরশুমে বাটার ক্যানভাস জুতোর বিপুল সমারোহ

ক্যানভাস জুতো যে কত রকমের, বাটার জুতো না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। এত নতুন নকশা, রকমারি রঙ, ক্যানভাসের জুতোর এর আগে আর দেখা যায়নি। সব নকশাই এমনভাবে তৈরি, পরামাত্রেই পায়ের আরাম বোল আনা। হাঁটাচলা: অবাধ স্বচ্ছন্দ। আজই একজোড়া পরে দেখুন।

Bata

২৪ পরগণা জেলার বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলের মাটি তুলা, চীনাবাদাম ও সূর্য্যমুখী ফুল চাষের উপযোগী।

আমন ধান কাটার পর জমি পতিত না রেখে ঐ জমিতে তুলা, চীনাবাদাম, বা সূর্য্যমুখী ফুলের চাষ করুন।

পরামর্শ ও সাহায্যের জন্যে আপনার এলাকার গ্রামসেবক বা ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৮·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৩·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
বাংলার ঋষি	৩·৫০
বাংলার বিদুষী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৫০
জীবন গড়া	·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

পশ্চিমবঙ্গের
জনজীবনে ইউবিআই

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসারে

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দেবার কাজে এবং ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষিকাজে সাহায্যদানে ইউবিআই-এর ভূমিকাই অগ্রণী।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসারের কথাই ধরা যাক। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে এই রাজ্যে গ্রাম ও আধাশহর অঞ্চলে সব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মোট ৩৭৭টি শাখা ছিল। এর মধ্যে ইউবিআই-এর শাখার সংখ্যাই হলো ১২৭ অথবা শতকরা ৩৪ ভাগ। শহরাঞ্চল ও মহানগর এলাকায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের শাখার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭২ ও ২৮৫। তার মধ্যে শহরাঞ্চলে ইউবিআই-এর অংশ ছিল ১৯টি শাখা অথবা শতকরা ২৬ ভাগ, মহানগর এলাকায় ইউবিআই-এর ছিল ৪৪টি শাখা, অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ। সারা রাজ্যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের মোট ৭৩৪টি শাখার মধ্যে একা ইউবিআই-এর অংশ হলো ১৯০ অথবা শতকরা ২৬ ভাগ।

শহরাঞ্চল ও মহানগর এলাকার চেয়ে গ্রাম ও আধাশহর অঞ্চলেই ইউবিআই-এর শাখার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। এতে বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত গ্রাম ও আধাশহর অঞ্চলের মানুষের কাছাকাছি শাখাস্থাপনে ইউবিআই বেশী সচেষ্ট।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

naa/UBI-72

উজ্জ্বলভারত সূচীপত্র : অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৯, ১৯৭২

'ভব কথামৃতম্'—
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কথামৃতম্
শ্রীসুনীতি সান্যাল
অনুধ্যান (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ স্মৃতিচারণ
শ্রীউদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ
বিপ্লবী পুরুষোত্তমানন্দ
শ্রীরেণু মিত্র
নবতমোত্তম জন্মদিনে—স্মরণে-চিন্তনে
শ্রীকৃপাদাস সাহা
যুগ সমস্যায় স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ
শ্রীসত্যব্রত ঘোষ
আমার শিল্প সাধনা
ডাঃ বীরেন্দ্র চৌধুরী
মোনালিসা (কবিতা)
শ্রীশংখচিল
৭২ অলিম্পিকে নিহত ইজরায়েলীদের প্রতি (কবিতা)
শ্রীসুদীপ সরকার
সাময়িকী
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দজীবন-কথা

প্রতি সংখ্যা ০·৮০, বার্ষিক ৫·০০